কালিদাস সমগ্র

কালিদাস সমগ্র

সম্পাদনা ঃ জ্যোতিভূষণ চাকী

নবপত্র প্রকাশন

ISBN 81-85325-21-9

❑ প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮২

❑ অষ্টম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০০

❑ প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

❑ মুদ্রক : স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিয চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

❑ প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

❑ মূল্য : ১০০

যাও মেঘ, বর্ষায় সম্ভৃতশ্রী হইয়া অভিলষিত প্রদেশে বিচরণ কর। বিদ্যুতের সহিত তোমার যেন ক্ষণমাত্রও বিরহ না হয়। বিরহ-কাতরের হৃদয়ের আশীর্বাদে মেঘদূত সমাপ্ত হইল। আমরা বিদায় গ্রহণ করি। প্রার্থনা এই যে, কালিদাসের সৌন্দর্যে আমাদের হৃদয় যেন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়—তাঁহার সৌন্দর্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দলোকে

কালিদাসের সর্বস্ব—না, শুধু শকুন্তলা নয়, কবির অন্যান্য সম্পদও এখানে ভাষান্তরে একত্র সমাহৃত (এ এক উৎসব, যেখানে 'the soul is charmed, enraptured feasted and fed'. 'উৎসব' কথাটির মধ্যে একটা পুনঃপ্রসূত হওয়ার অর্থ আছে। কালিদাস আমরা আরও বেশি করে পড়ব নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে।

বড়ো কবিদের সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই, সপ্রশংস শ্লোক আউড়েও লাভ নেই। কালিদাস আমাদের আপন জন, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হই অন্তরের টানে। আমরা তাঁর মধ্যে নিজেদের বেশি খুঁজে পাই; তাই তিনি আমাদের মনের মানুষ।

আশ্চর্য মানুষটা। একটুও বললেন না কোথাকার আলো-হাওয়ায় তিনি মানুষ, কোন্ সময়টা তিনি অবাক চোখে এই পৃথিবীর দিকে চেয়েছিলেন। সোনার ধানে নৌকোটা ভরে গেল, তাঁর ঠাঁই হল না বুঝি! কোন্ নদীর পারে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল মৃদু হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন কে জানে? সে কি রেবা? সে কি বিন্ধ্যা? না কি বেত্রবতী?

অনেক রহস্যের সন্ধানী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন কবির জন্মভূমি হয়তো মালবপ্রদেশের মান্দাসোর (দশপুর)। স্মিথসাহেবও বলেছেন হয়তো তাই। হয়তো সেখান থেকেই উজ্জয়িনীর রাজসভার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

সময়টা কি তাহলে গুপ্ত আমলই ধরা হবে? দ্বন্দ্ব তো মেটে নি। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতক—যে কোনো সময়ই হতে পারে। পণ্ডিতদের লড়াই না বলে বরং আমরা বলি—সময়গুলো ঐ মানুষটাকে নিজের করে পাবার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে।

ও কথা থাক। আমরা বরং তাঁর মনোভূমিতে বিচরণ করি।

মেঘদূত

আকাশে নতুন মেঘ। রামগিরি পাহাড়ে বিরহী যক্ষ তার দিকে চাইল। এই মেঘই তো অলকাপুরীতে তার বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে দূত হয়ে—তার প্রিয়ার কাছে। কিন্তু অচেতন মেঘ কি পারবে এ কাজ করতে? মন বলল নিশ্চয়ই পারবে। বিরহের তীব্রতায় যক্ষ মেঘ চেতন না অচেতন তা ভুলেই গেল। যাও না বন্ধু, পথ বলে দিচ্ছি আমি। পথ তোমার ক্লান্তিকর হবে না। পাবে জল, পাবে ছায়া, পাবে সৌধোৎসঙ্গের উষ্ণতা। চোখ-কান দুই-ই জুড়োবে তোমার। দেখবে মধুর দৃশ্য, শুনবে কিন্নরীদের গান, শুধু একটু মন্দ্রধ্বনি যদি কর মৃদঙ্গের সঙ্গত হবে শিবসঙ্গীতে। কেকাধ্বনিতে স্বাগত জানাবে সজলনয়ন ময়ূরেরা। নদীদের ভ্রূভঙ্গী তো দেখবেই, নগরবধূদের ভ্রূলতাবিলাসও নিশ্চয় তোমার দৃষ্টি এড়াবে না। চোখ তুলে তারা তোমার দিকে যখন চাইবে মনে হবে কৃষ্ণভ্রমরের পঙ্‌ক্তি। এ সব দেখতে দেখতে তুমি কৈলাসে এসে পড়বে, আর কৈলাসের কোলেই তো অলকা। কুবেরের গৃহের উত্তরেই আমার গৃহ, একটা মন্দারতরু আছে তার সামনে। ওই গৃহেই আছে আমার প্রিয়া, যুবতিসৃষ্টিতে তিনিই বিধাতার প্রথম নির্মিতি।

যক্ষ নিশ্চিত, মেঘ তার প্রিয়াকে দেবে কুশলবার্তা, শোনাবে বিশেষ দিনের নর্মকথা, কারণ সেটাই হবে অভিজ্ঞান। সবার শেষে প্রার্থনা :

বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক, বন্ধু বন্ধুর আশিস লও।

মেঘদূত একটি চলচ্চিত্র। ছবির পর ছবি আর তার সঙ্গে গান—হৃদয়ের গান।

দ্বিতীয় শতকে চীনদেশীয় কবি সিন্‌কান্‌ যক্ষের মতোই মেঘকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ওগো ভেসে-চলা মেঘ, ওগো আকাশে-সাঁতরে-চলা মেঘ,
তোমার পাখায় বয়ে নিয়ে যাও আমার প্রাণের বাণী
আমার প্রিয়ার উদ্দেশে।

মহাভারতে আছে হংসদূতের কথা, জাতকেও আছে কাকদূতের কথা। দূত-কল্পনায় রামায়ণের কাছেও কবির ঋণ থাকতে পারে। অশোককাননের বিরহিণী সীতার ছায়াই হয়তো অলকার যক্ষপ্রিয়া। কিন্তু ঋণ যার কাছেই থাক তাকে তিনি যেভাবে উপহার দিয়েছেন, যেভাবে মাটি-পাহাড়-নদী মানুষের মন সবকিছুকে একসুরে বেঁধেছেন বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতে রূপকার্থ লক্ষ্য করেছেন। মেঘদূতে তিনি মানুষের চিরবিরহবোধের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। এ বিরহ আনন্দলোক থেকে বিচ্ছেদে অশ্রুসজল। মহৎ কাব্যে এমন সব সংকেত থাকতে পারে কবি নিজেই যা হয়তো তেমন করে ভাবেন নি। তবে যক্ষের ব্যক্তিগত বেদনাকে যে কবি সর্বজনীন করতে পেরেছেন এ উপলব্ধি সকলেরই :

'মেঘমন্দ্র শ্লোক বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।'

মেঘদূত খণ্ডকাব্য, কিন্তু প্রতিটি শ্লোকবন্ধই যেন অখণ্ড কাব্য। গীতিকবিতা বললেই অবশ্য এর প্রাণের পরিচয়টি পাওয়া যায় যে-পরিচয় পরে বহু দূতকাব্যের প্রেরণা দিয়েছে। সে-সব দূত সুদূরে অনেক বার্তাই বয়ে নিয়ে গেল কিন্তু মেঘদূতের সেই নবীন মেঘের সুর লাগল না তাতে।

কুমারসম্ভব

দেবতাত্মা হিমালয়। দেবর্ষি নারদ এলেন হিমালয়গৃহে। বললেন, পার্বতী পতিরূপে পাবেন শিবকে। এদিকে শিব এসেছেন হিমালয়ে নিভৃত তপস্যায় মগ্ন হতে। হিমালয় কন্যাকে আদেশ দিলেন শিবসেবার ভার নিতে। এদিকে স্বর্গে দেবতাদের দুর্দশা চরমে উঠেছে তারকাসুরের অত্যাচারে। ব্রহ্মা বললেন পার্বতীর গর্ভজাত শিবের সন্তানই দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুর বধ করবে। তাই হরপার্বতীর মিলন ঘটাবার ভার পড়ল অঘটনঘটনপটু কামদেবের উপরে। অকাল বসন্তের উদয় হল। সমস্ত প্রকৃতিতে শৃঙ্গার-সজ্জা। শিবের পদতলে সেবারতা পার্বতী। শিব চাঞ্চল্য অনুভব করলেন মনে। অদূরে উদ্যতবাণ মদনকে দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর কোপবহ্নিতে ভস্ম হল মদন। রতিবিলাপে মুখর হল প্রকৃতি। এদিকে নিজের রূপকে ধিক্কার দিয়ে শিবকে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যায় রত হলেন পার্বতী। কপটবটু বেশে শিব এসে পরীক্ষা করলেন পার্বতীকে। উত্তীর্ণ হলেন পার্বতী। মিলনের বাধা আর রইল না। বিবাহোৎসবে সপ্তর্ষিরা হলেন

পুরোহিত। ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন করাতে গিয়ে শংকর বললেন, 'ঐ দেখো ধ্রুবনক্ষত্র'। নম্রকণ্ঠে পার্বতী বললেন, 'দেখেছি'। বলেই চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিলেন শিবের মুখকান্তি। নবপরিণীতাকে নিয়ে শিব ভ্রমণে বেরোলেন—মেরু, কৈলাস, মন্দর আর মলয়পর্বতে। দেখালেন আকাশবাহিনী গঙ্গা, দেখালেন নন্দনকানন। গন্ধমাদনপর্বতে দীর্ঘদিন কাটল হরপার্বতীর মিলিত জীবন।

কাহিনীর উৎস মূলত পুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও শিবপুরাণ। স্কন্দপুরাণের 'শিবরহস্য' অংশের সঙ্গে অবশ্য কুমারসম্ভবের সাদৃশ্য খুব বেশি। অবশ্য এমনও হতে পারে স্কন্দপুরাণই 'কুমারসম্ভবে'র কাছে ঋণী। রামায়ণের কাছে ঋণের কথা তো বলাই বাহুল্য। কাব্যটির নামের উৎসও হয়তো রামায়ণের একটি শ্লোক ঃ

এষ তে রামগঙ্গায়াঃ বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥ (১. ৩৭. ৩১)

কালিদাসের নিসর্গচেতনা কুমারসম্ভবেও সমান স্পন্দিত। হিমালয়বর্ণনা, অকাল-বসন্তবর্ণনা, ওষধিবর্ণনা, গন্ধমাদনপর্বতের উপবনবর্ণনা সবত্রই প্রকৃতি মানবমনের সঙ্গী। অষ্টম সর্গে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন পার্বতী, শিব তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন একটির পর একটি দৃশ্যের প্রতি। ছদ্মবেশী শিব আর পার্বতীর জীবন্ত সংলাপে নাট্যগন্ধী হয়ে উঠেছে পঞ্চম সর্গটি। মদনভস্মকে হয়তো কবি রূপক-হিসেবেই ব্যবহার করেছেন রূপ থেকে রূপাতীতে যাবার সংকেত দিতে।

কুমারসম্ভবের সতেরোটি সর্গ পাওয়া গেলেও প্রথম আটটিই কালিদাসের নিজস্ব। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সবাই একমত। কবি অষ্টম সর্গের পর যেন হঠাৎই থেমেছেন ঃ

'যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।'

রঘুবংশ

পার্বতী পরমেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে কবি রঘুবংশের রাজচরিত বর্ণনায় ব্রতী হয়েছেন। নিজের দুর্বলতার কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে কবি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান। রাজবংশের আদি পুরুষ সূর্যপ্রভব মনু। তাঁরই উত্তরসূরী দিলীপ। মনুনির্দিষ্ট পথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত নন তিনি। তবে অপুত্রকতার অসহ্য দুঃখ তাঁকে পেতে হয়েছিল ক্ষণিকের অনবধানতার দোষে। শেষে বশিষ্ঠের আশ্রমধেনু নন্দিনীর সেবা করে শাপমুক্ত হয়ে পুত্রলাভ করলেন তিনি। নবকুমারের নাম হল রঘু। কালক্রমে রঘু দিলীপের যজ্ঞাশ্বরক্ষার দায়িত্ব পেলেন ; ইন্দ্র সেই অশ্বটিকে অপহরণ করলে তাঁর সঙ্গে রঘুর ভীষণ যুদ্ধ হল। তাঁর বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞাশ্বের পরিবর্তে সমতুল্য পুণ্যফল দান করলেন ইন্দ্র। রঘুকে রাজ্যভার দিয়ে প্রব্রজ্যা নিলেন দিলীপ। দিগ্বিজয়ে অজস্র ধনরাশি লাভ করে বিশ্বজিৎযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন তিনি। রিক্ত অবস্থায় বরতন্তু-শিষ্যকে প্রার্থিত ধন দিতে না পেরে কুবেরকে বাধ্য করলেন রত্নবৃষ্টি করতে। ঋষির আশীর্বাদে সন্তান লাভ করলেন রঘু। নাম দিলেন অজ। যুবরাজ অজ ইন্দুমতীকে লাভ করলেন স্বয়ংবরসভায়। পরাজিত রাজাদের মিলিত আক্রমণ রোধ করলেন তিনি।

এই অজ ও ইন্দুমতীর সন্তান দশরথ। একদিন অজ ও ইন্দুমতী উপবনে বিহার করছেন। হঠাৎ একটি স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য ইন্দুমতীর বুকের উপর এসে পড়ায় প্রাণ হারালেন তিনি। অজের বিলাপে আচ্ছন্ন হল বনভূমি। বশিষ্ঠের প্রেরিত শিষ্য এসে জানালেন ইন্দুমতী ছিলেন শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। পুষ্পমাল্যটি তাঁকে শাপমুক্ত করেছে। অজের মৃত্যুর পর রাজা হলেন দশরথ। পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ফলে পুত্রলাভ করলেন তিনি। এর পর রামসীতা-পরিণয়, রামের বনগমন, সীতাহরণ, পুনরুদ্ধার ও পাতাল-প্রবেশাদি বৃত্তান্ত রামায়ণানুগ। রামের পুত্র কুশ। কুশ ও কুমুদ্বতীর পুত্র অতিথি। অতিথির দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ হল। অতিথির পর নিষধ-নলাদি একুশজন রাজার পর সিংহাসনে বসলেন অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণ বিলাসী, সুরাসক্ত এবং নারীসম্ভোগে সদালিপ্ত। অত্যন্ত উচ্ছৃংখলতার দরুন শেষে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করা হল। সুসন্তানের অপেক্ষায় রাজ্যকে সুশাসনে রাখলেন তিনি।

মনে হয় রঘুবংশ কবির পরিণত বয়সের রচনা। রঘুবংশের দেহ বিশাল, তবু তার আত্মাকে ধরতে অসুবিধা হয় না। মনুর বর্ত্ম অর্থাৎ যা সুনীতি, যা কল্যাণধর্ম তাকে মেনে চলাই যে রাজাদর্শ বোধহয় রঘুবংশের প্রাণের কথাটা এই। সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত অগ্নিবর্ণের পীড়া আসলে রাজধর্ম থেকে বিচ্যুতি, সেই গুরুতর পীড়ায় সে আগেই মৃত, যক্ষ্মায় হল তার দ্বিতীয় মৃত্যু। নিছক ইতিহাসধর্মী রাজকাহিনী হলে, রঘুবংশ এত জনপ্রিয় হত না ; মল্লিনাথ ছাড়াও, হেমাদ্রি বল্লভ, দিনকর, কৃষ্ণভট্ট, প্রভাকর প্রমুখ এত টীকাকারও (ত্রিশ-বত্রিশের বেশি) তার থাকত না।

ভাষা ? রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটিতেই এ বিষয়ে কবির আদর্শ ঘোষিত—বাক্ আর অর্থ হরপার্বতীর মতোই মিলিত। আনন্দবর্ধনের ভাষায় কালিদাসের রচনা সত্যিই 'উক্ত্যন্তরাশক্যচারু' অর্থাৎ এমন রমণীয় যে শব্দান্তর ঘটিয়ে তা আনাই যাবে না। মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার (১৪·৫৩) সীতাকে রামের আদেশ ঘোষণা করলেন 'লক্ষ্মণ। 'উজ্জগার', না বলে 'উদ্দধার' বা অন্য কিছু বলেও ছন্দ রক্ষা করা যেত কিন্তু বজ্রপাতের দুঃসহতা ফুটত কি ? আর 'মহীপতিঃ' শব্দটির ব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়—তিনি রাজা—ইচ্ছেমতো আদেশ তো তিনি দিতেই পারেন, তাছাড়া 'মহী' তার কাছে বড়ো, 'মহিষী' নয়—এ ব্যঞ্জনা পাওয়া যেত কি ? এ রকম যত্রতত্র।

উপমা যতক্ষণ অলংকার মাত্র ততক্ষণ তার মূল্য খুব বেশি নয়, যখন তা রসসৃষ্টির সহায়ক তখনই তার মূল্য। কালিদাসের উপমা এই রসসৃষ্টির সহায়ক বলেই তার এত দাম।

সেই পতিংবরা রাত্রে সঞ্চারিণী দীপশিখার মতো যে-যে রাজাকে অতিক্রম করে গেল সেই-সেই রাজা পথের ধারের সৌধের মতো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। (৬·৬৭)

একটি উপমাতে যেমন ইন্দুমতীর দীপ্তি ও কান্তি উদ্ভাসিত হল তেমনি স্বয়ংবর-সভার প্রত্যাখ্যাত রাজাদের হতাশা যেন বাঙ্‌মূর্তি পেল।

কুড়িয়ে পাওয়া নূপুরে যেন সীতার বিচ্ছেদ-দুঃখে বদ্ধমৌন (১৩·২৩)—এমন অসংখ্য উপমা-উৎপ্রেক্ষায় রঘুবংশের বাক্‌প্রতিমা মণ্ডিত।

অভিজ্ঞানশকুন্তল

হরিণ শিকার করতে এসে এক হরিণনয়নাকে দেখলেন রাজা দুষ্যন্ত। সেই সঙ্গে আরও দুজন সমবয়সীকে। গাছে জল দিচ্ছে ওরা। এটি কণ্বমুনির আশ্রম। মুনি অনুপস্থিত। আতিথ্য নিলেন ঐ ঋষিকন্যাদের। শকুন্তলাকে জানলেন, তাঁর সম্বন্ধে শুনলেনও সব, তার সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাছে। মন্মথের শিকার হলেন রাজা। সখীদের সহায়তায় শকুন্তলাকে পেলেন তিনি। রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে। শকুন্তলা দিন গুনতে লাগল—কবে তার প্রিয়তমের কাছে যাবে সে। শকুন্তলা তন্ময়। দুর্বাসা এলেন, টেরই পেল না সে। দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন, স্বামী তাকে চিনতেই পারবে না। শেষে প্রিয়ংবদার অনুনয়ে করুণা করলেন—যদি অভিজ্ঞান দেখাতে পারে কিছু, এ অনর্থ আর ঘটবে না। কণ্বমুনি ফিরে এসে সব শুনলেন। খুশি হলেন—আহুতি ঠিক আগুনেই পড়েছে। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না। শকুন্তলাকে দুই শিষ্যের সঙ্গে রাজবাড়িতে পাঠালেন মুনি। সমস্ত তপোবন বিচ্ছেদে ম্রিয়মাণ হল। কিন্তু রাজা চিনতেই পারলেন না শকুন্তলাকে। দুষ্যন্তের দেওয়া আংটি দেখাতে গিয়ে শকুন্তলা দেখল সেটি হাতে নেই। দুষ্যন্ত মেয়েদের দুষ্প্রকৃতি নিয়ে কটাক্ষ করলেন। প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলাকে তার অপ্সরাজননী এসে শূন্যে নিয়ে গেল। শকুন্তলার আংটি স্নানের সময় নদীতে পড়ে গিয়েছিল। এক জেলে মাছের পেট থেকে সেটি পেল। এই আংটি দেখেই রাজার সব মনে পড়ে গেল। নিদারুণ বিষাদে অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ইতিমধ্যে ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গে গিয়ে ফেরবার পথে মারীচের আশ্রমে ফিরে পেলেন শকুন্তলাকে আর তাঁদেরই সন্তান সর্বদমনকে।

শকুন্তলায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরঙ্গতার যে-ছবি ফুটেছে তা আর কোথায় আছে? তরু শকুন্তলার সহোদর, লতা তার সহোদরা। শকুন্তলার বিচ্ছেদে তরুলতার তাই এত কষ্ট, তাই পশুপাখির আহারে রুচি নেই। তাই সমস্ত প্রকৃতি হরিণশিশু হয়ে আশ্রমদুহিতার আঁচল টেনে বলে 'যেতে নাহি দিব'। শুধু কি শকুন্তলা? শকুন্তলাকে বিদায় দিতে কণ্ব কাদের অনুমতি চাইলেন? তরুদের। বললেন 'সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্'—অর্থাৎ, আমি কে? শকুন্তলা তোমাদেরই। তোমরা তাকে যাত্রার অনুমতি দাও।

দুষ্যন্ত বলেছিলেন, কণ্ব কী নিষ্ঠুর! না হলে শকুন্তলাকে গাছে জল দিতে বলেন, পদ্মপাতা দিয়ে শমীলতা ছেদন করেন? না। অনসূয়ার কথাই ঠিক—সে বলেছিল, 'আমার মনে হয় আশ্রমতরু মহর্ষির কাছে তোর চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় নইলে তোকে আলবালে জলসেচনের কাজ দেবেন কেন?'

শুধু প্রকৃতি তো নয়, মানবমনের অতলে ডুব দিতে জানেন কবি, তাই কণ্বমুনির চোখে জল আনতে পারেন তিনি। পারেন অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে যারা দুপাশে থেকে শকুন্তলাকে শকুন্তলা করে রাখে। তাই অনায়াসে পারেন বল্মীক-গ্রস্ত মরীচির মধ্যে চিরকালের মানুষটিকে চিনে নিতে। আশ্রম-প্রকৃতিতে মানুষ হলেও তাই সর্বদমন-নামে শিশুটি ক্ষুদ্র-তপস্বী না হয়ে শিশুসুলভ দুরন্তপনায় সজীব।

আর জীবনবোধের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় দুর্বাসার অভিশাপের আগুন তিনি এনেছিলেন হঠকারী দম্পতীকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে। যক্ষের কর্তব্যচ্যুতির

শাস্তি বিরহের আগুন, আর পার্বতীকে পুড়তে হয়েছে পঞ্চাগ্নিতপে।

উইলিয়ম জোন্সের প্রথম মহনীয় প্রয়াসের পর পৃথিবীর বহুভাষার আধারে ধরবার চেষ্টা হয়েছে শকুন্তলাকে। বিশেষ করে বলতে ইচ্ছে হয় ফরাসী মনীষী শেজি-র (Antoine Leonard de Chezy) কথা। জোন্সের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মূলের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভে সংস্কৃত শেখবার জন্যে তিনি যে সুকঠোর পরিশ্রম করে-ছিলেন তাকে তপস্যাই বলা চলে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শকুন্তলাকে ফরাসী ভাষায় রূপ দেবার জন্যে লেখনী ধারণ করলেন ঃ

Je ne sais trop quel genie, Rakchasas ou Deva, qui dirigeait ma plume a son gré—আমি নিজেই জানি না কোন্ অদৃশ্য শক্তি (জিন, রাক্ষস বা দেবতা) আমার লেখনী পরিচালিত করে নিয়ে চলল তারই ইচ্ছেমতো।

শেজি-র ভাষাবন্ধনে শকুন্তলা ধরা দিয়েছে অনুরাগিণীর মতো, কবি মধুসূদনের কথায় বলতে ইচ্ছে করে ঃ

'তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্যন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ।

বিক্রমোর্বশীয়

সূর্যবন্দনা করে পৃথিবীতে ফিরে আসছেন পুরূরবা। কানে এল অপ্সরাদের আর্তরব। তাদের সখী উর্বশী কৈলাসে শিবপূজা করে ফিরছিলেন। কেশীদানব মাঝপথে উর্বশীকে এবং সেই সঙ্গে তার সহচরী চিত্রলেখাকে অপহরণ করে পালিয়েছে। পুরূরবা অপ্সরাদের হেমকূট চূড়ায় অপেক্ষা করতে বলে দানবের সন্ধানে ছুটলেন এবং উর্বশীকে সহচরীসহ উদ্ধার করলেন। রথে মূর্ছিতা উর্বশী। তার অনিন্দ্য রূপ দেখে পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন পুরূরবা। চেতনালাভ করে উর্বশী রক্ষকরূপে দেখল মহেন্দ্রকে নয়, মহেন্দ্রকান্তি পুরূরবাকে। উর্বশী এবারে যেন দ্বিতীয়বার মূর্ছিতা হল! বিদায় নিয়ে নগরে ফিরলেন রাজা। তাঁর ভাবান্তর মহারানীর দৃষ্টি এড়াল না। বিদূষককে নিয়ে রাজা বসলেন প্রমোদ-উদ্যানে। উর্বশী জানতে চাইল রাজার হৃদয়বার্তা। উর্বশীর লেখা ভূর্জপাতার পত্র পেয়ে রাজার অনুরাগ বৃদ্ধি পেল। উর্বশী দেখা দিল। তার প্রস্থানের পর মহারানী এলেন উদ্যানে। ভূর্জপত্রটি তাঁর হাতে পড়ল। মহারানীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল রাজার। এদিকে দেবসভায় অভিনয় করবার সময় 'পুরুষোত্তম' বলতে গিয়ে 'পুরূরবা' বলে ফেলল উর্বশী। ফলে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল তাকে। ইন্দ্র আদেশ দিলেন সন্তানের মুখ না দেখা পর্যন্ত পুরূরবার পরিচর্যা করতে। উর্বশী অভিসারিকার বেশে এল মণিহর্ম্যপ্রাসাদে, মহারানী 'প্রিয়ানুপ্রসাদন' ব্রতে যোগ দিতে ডেকে পাঠালেন রাজাকে। ব্রতশেষে সম্মতি দিলেন উর্বশীর সঙ্গে রাজার মিলনে।

উর্বশীর সঙ্গে মিলিত জীবন শুরু হল রাজার। একদিন স্ত্রীলোকের-নিষিদ্ধ বনে প্রবেশ করার ফলে লতায় রূপান্তরিত হল উর্বশী। রাজা উন্মত্তের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগলেন প্রিয়তমাকে। হঠাৎ একটি দুর্লভ মণি পেলেন তিনি। এই মণি-হাতে একটি পুষ্পহীন লতায় প্রিয়ার লাবণ্য অনুভব করে তাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। মণির ছোঁয়ায় উর্বশীতে রূপান্তরিত হল লতা। নগরে ফিরলেন রাজা। কিন্তু আনন্দের মধ্যে

হঠাৎ ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। মাংসখণ্ড মনে করে ঐ মণিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল একটি শকুন। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য একটি বাণ আর ঐ মণি নিয়ে প্রবেশ করলেন কঞ্চুকী।

বাণে-খোদাই-করা লিপি থেকে জানলেন বাণটি উর্বশী আর পুরূরবার পুত্র আয়ুর। রাজা বিস্ময়ে হতবাক। রহস্যের সমাধান হল। এক তাপসী এলেন আয়ুকে নিয়ে। উর্বশীর হাতে সমর্পণ করলেন আয়ুকে। উর্বশী জানালো, পুত্রের মুখ দেখলেই তাকে স্বর্গে চলে যেতে হবে বলে সে পুত্রকে লুকিয়ে রেখেছিল। পুরূরবা আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আদেশ দিয়ে অরণ্যে যাবার সংকল্প করলেন। কিন্তু অরণ্যচারী হতে হল না তাঁকে। নারদ এসে জানালেন দেবরাজের নির্দেশে উর্বশী হবে তাঁর চিরসঙ্গিনী।

পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনীর প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদ (১০.৯৫)। বেদের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, স্বর্গের উর্বশী মর্ত্যের পুরূরবার সঙ্গলাভ করেছে। গর্ভবতী অবস্থায় উর্বশী তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, পুরূরবা অনুনয় বিনয় করছেন, অভিযোগও করছেন,—'স্ত্রীজাতির সখ্য বলে কিছু নেই, নেকড়ের হৃদয় তাদের'। শতপথ ব্রাহ্মণেও (৫.১-২) উর্বশীকাহিনী আছে। তবে সেখানে সে অতটা হৃদয়হীনা নয়, বৎসরের শেষরাতে মিলনের আশ্বাস সে দিয়েছে পুরূরবাকে। তারপর মহাভারত আর পুরাণ এই কাহিনীকে নানা রূপ দিয়েছে। কালিদাসের ঋণ পদ্মপুরাণের কাছেই সম্ভবতঃ বেশি। নানা উপকরণকে নিজের প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়ে কালিদাস এর কাহিনীবিন্যাস করেছেন।

বিক্রমোর্বশীয়কে নাটক না বলে ত্রোটকও বলা হয়। 'ত্রোটক' সংজ্ঞা সম্ভবতঃ চতুর্থাঙ্কের গীতি-ধর্মিতার জন্যেই। উত্তর-ভারতীয় সংস্করণে অপভ্রংশ গানগুলি সংযোজিত। এ ধরণের গান আছে ৩১টি। তার মধ্যে ১১টি রাজার মুখে উচ্চারিত, বাকিগুলি রাজার অবস্থা বর্ণনায় ব্যবহৃত। এই গানগুলি অপভ্রংশ ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন। অনেকে বলেন, এগুলি প্রক্ষিপ্ত, কারণ এগুলি পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট, পুনরুক্তি কালিদাসের রচনাদর্শবিরোধী। কিন্তু Bollensen, Pischel, Monier Williams প্রমুখ পণ্ডিত এবং রঙ্গনাথ, ও কোণেশ্বর প্রমুখ টীকাকারেরা এগুলিকে কালিদাসের রচনা বলেই মনে করেন। এই গানগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৃত্য-নির্দেশনা—চর্চরী, দ্বিপদিকা, কুটিলিকা ইত্যাদি। ভাষা ও সাঙ্গীতিক দিক থেকে তাই এই গানগুলির বিশেষ মূল্য আছে। তবে এই সঙ্গীতপ্রয়োগে এর নাট্যগতি কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।

পরিস্থিতিবর্ণনায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে কালিদাসের নিজস্বতার স্বাক্ষর এতে আছে। 'দুরারোগ্য রোগীকে যেমন বৈদ্য জবাব দেয়, তোমার সম্বন্ধে রানীর মনোভাবও তেমনি', 'বর্ষার নদীর মতো অপ্রসন্না দেবী চলে গেলেন'—গদ্যাংশে এই ধরণের উপমাগর্ভ বাক্য সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ত্বং মে মুখং ভব (আমার হয়ে বলো) ঃ মা ভবানঙ্গানি মুঞ্চতু (নিরাশ হোয়ো না) ইত্যাদি অসংখ্য বিশিষ্টার্থক বাক্য সংলাপকে জীবন্ত করেছে। চরিত্র-চিত্রণেও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রধান চরিত্র ছাড়া বিদূষক চরিত্রটিও যথেষ্ট মনোগ্রাহী। 'ঔশীনরী' চরিত্রটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এ চরিত্রকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র

মহিষী ধারিণীর পরিচারিকা মালবিকার চিত্র দেখে বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র মুগ্ধ হলেন। বিদূষক তাকে রাজার চোখের সামনে আনবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ধারিণীর সঙ্গে সর্বদাই থাকতেন পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকী। বিদূষক তাঁরই শরণ নিলেন। কৌশলে তিনি নাট্যাচার্য গণদাস আর হরদত্তের মধ্যে বিবাদ বাধালেন। পরিব্রাজিকা বললেন, দুজনের পরীক্ষা নেওয়া হোক। এই পরীক্ষার সূত্রেই মালবিকা গণদাসের শিষ্যা হিসাবে নৃত্যকলা প্রদর্শন করল। রাজা দুচোখ ভরে দেখলেন তাকে, অধীর হলেন আসঙ্গ-লিপ্সায়। বিদূষক ধারিণীর পরিচারিকা বকুলাবলিকাকে নিজেদের পক্ষে এনেছেন। তারই সহায়তায় প্রমোদবনে রাজার সঙ্গে মিলিত হবেন মালবিকা। এদিকে রাজার দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী প্রমোদবনে এসেছেন রাজার সঙ্গে দোলারোহণের বাসনা নিয়ে। রাজাকে সংকেত স্থানে না পেয়ে আড়াল থেকে বকুলাবলিকা ও মালবিকা এবং রাজা ও বিদূষককে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মালবিকা ও তার সখীর কথায় স্পষ্ট প্রকাশিত হল মালবিকা রাজার অনুরাগিণী। মালবিকাকে আলিঙ্গনে উদ্যত হতেই ইরাবতী আড়াল থেকে এসে রাজাকে কটূক্তিতে অপদস্থ করলেন এবং কথাটা ধারিণীর কানে তুললেন। ধারিণী বন্দী করলেন মালবিকাকে। বিদূষক অবশ্য কৌশলে তাকে মুক্ত করলেন। এদিকে এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে প্রকাশ পেল মালবিকা আসলে বিদর্ভরাজ মাধবসেনের ভগিনী আর পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকী মাধবসেনের মন্ত্রী আর্যসুমতির ভগিনী। অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে মালবিকাকে ধারিণীর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। মাধবসেনের ভগিনীও একই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে পরিব্রাজিকারূপে বিদিশার রাজভবনে আশ্রয় নেন।

একই সঙ্গে আর একটি আনন্দময় পরিস্থিতি এল। অগ্নিমিত্র ও ধারিণীর পুত্র বসুমিত্র দুরন্ত যবনসেনাদের পরাজিত করে তার পিতামহ পুষ্পমিত্রের যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে এনেছে। এই আনন্দের মুহূর্তে ধারিণী মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপে রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে তুলে দিলেন। বসুমিত্রের বিজয়বার্তায় ইরাবতীও ঈর্ষা ভুলে গেলেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের প্রথম নাট্যকৃতি। এর পশ্চাৎপটে আছে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। অগ্নিমিত্র খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি প্রখ্যাত নাম। তাঁর পিতা ছিলেন পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিত্র)। সেনাপতি পুষ্পমিত্র নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। পুষ্যমিত্র তাঁর প্রভু মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে বধ করে মৌর্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন (খৃঃ পূঃ ১৮৫)। এই রাজ্যই হল শুঙ্গরাজ্য। রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। পিতার রাজত্বকালে অগ্নিমিত্র ছিলেন বিদিশার (বর্তমান ভিলসা) রাজা। গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার সিন্ধুতীর, সৌরাষ্ট্র এবং পাটলিপুত্রে অভিযান চালান। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫৫-১৫৬ সালে এই অভিযান প্রতিরোধ করে জয়ী হন পুষ্যমিত্র। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যবনদের সঙ্গে পুষ্যমিত্রের ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ বসুমিত্রের (অগ্নিমিত্রের পুত্র) তীব্র যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন কালিদাস গুণাঢ্যের রচিত বৃহৎকথায় বন্ধুমতী উপাখ্যানটিকে এ বিষয়ে কাজে লাগিয়েছেন। উদয়নকথার সঙ্গে এই নাটকের কাহিনীগত মিল লক্ষণীয়। বলেন্দ্রনাথ রত্নাবলী নাটকের সঙ্গে এর মিল দেখিয়েছেন বিস্তারিত আলোচনায়।

মালবিকাগ্নিমিত্রকে মঞ্চসফল নাটক বলেই মনে হয়। প্রতিযোগিতা, শঠতা, ঈর্ষা রহস্যগুপ্তি, রহস্য-উদ্ঘাটন ইত্যাদি নাট্য-উৎপাদন এবং ঘটনার দ্রুতগতি সেই ইঙ্গিতই দেয়। চরিত্রগুলির সজীবতা, স্থান-কাল-ঘটনার সমগ্রন্থন, সংলাপের মাধুর্য ইত্যাদি এ নাটকের আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

তিনটি নাটকের মধ্যে শকুন্তলা আর বিক্রমোর্বশীয়তে ঘটনার মঞ্চ স্বর্গ ও মর্ত্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের মঞ্চ একান্তভাবেই মর্ত্য। দুষ্যন্ত, পুরূরবা আর অগ্নিমিত্র—এই তিনজন নায়কের কেউই তরুণ নন, তাদের বরং প্রৌঢ় বলা যেতে পারে, তবে উপস্থাপনার গুণে বয়সের কথাটা তেমন মনেই পড়ে না। নায়িকাদের মধ্যে উর্বশী প্রৌঢ়া, মালবিকা আর শকুন্তলা যুবতী। তবে অপ্সরা তো চিরযৌবনা। পূর্বরাগের ব্যাপারে নায়কেরাই অগ্রবর্তী।

তিনটি নাটকেরই বিভিন্ন স্বাদ, তা তো হবারই কথা—শকুন্তলা সুধীসমাজের নাটক, বিক্রমোর্বশী লোকসভার নাটক আর মালবিকাগ্নিমিত্র রাজসভার নাটক। কালিদাস বিভিন্ন রুচির মানুষকেই তৃপ্ত করতে পেরেছেন এই নাট্যরচনায়।

ঋতুসংহার

'নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম বাহুতে বাহুতে ধরিয়া।'

ঋতুসংহার সেই ছয় ঋতুর বর্ণনা। 'সংহার' মানে এখানে সংগ্রহ বা সংক্ষেপ। শ্রেণীগতভাবে এটি খণ্ডকাব্য। খণ্ডকাব্য হিসেবে মেঘদূতের সঙ্গে তুলনা করলে এটিকে কালিদাসের রচনা বলেই মনে হবে না। কারণ, মেঘদূতের গভীরতা তো এ কাব্যে নেই। অনেকেই মনে করেন এটি কালিদাসের কাব্যচর্চার প্রথম ফসল।

মেঘদূত আর ঋতুসংহার দুটিই আদিরসের কাব্য কিন্তু দুটির আস্বাদ একেবারেই ভিন্নধর্মী। একটি হৃদয়-ভাবনা আর একটি বর্ণনামাত্র। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়: 'ঋতুসংহারে কবি কালিদাস মধুপের মতো ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহলে, জীবন, মরণ, সুখদুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, এই ফুলের উপর বসিয়াই।··· কিন্তু মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া—বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন।'

তবু প্রতি সর্গে 'প্রিয়ে', 'সুন্দরী' ইত্যাদি সম্বোধন সমগ্র কাব্যটিকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাকে একটি মানবিক আবেদন দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো প্রেমিক ঋতুরূপের পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তার দয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দুজনে মিলে দেখার আনন্দ যুক্ত হওয়াতে বর্ণনার বিষয়গুলির চারুতা যেন বেড়েছে—'ত্রিভুবন একখানি অন্তঃপুর বাসরভবন'।

এ-কাব্যে কবি লোকপ্রসিদ্ধিগুলিকেই বেশি ব্যবহার করেছেন, কল্পনার পাখা মেলেন নি। তবু সরল সৌন্দর্যে বেশ কিছু শ্লোক আকর্ষক হয়ে উঠেছে: প্রিয়ে! হিমপাতের শীতলতায় পরিপক্ক প্রিয়ঙ্গুলতা বাতাসে অনবরত কাঁপে এবং প্রিয়তমের বিরহে বিলাসিনীর মতো পাণ্ডুর হয়ে যায়।

এখানে উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতা এবং উপমান বিরহিণী। বাতাসে এ লতার কম্পন

হৃদয়ের কম্পনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এমন প্রকাশভঙ্গীকে কালিদাসের বলে মেনে নিতে কুণ্ঠা হয় না।

শৃঙ্গারকাব্যত্রয়ী

শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক এবং পুষ্পবাণবিলাস এই তিনটি রচনাও যদি আদৌ কালিদাসের হয় তবে তা প্রথম-দিককার রচনা বলেই ধরতে হয়। তিনটিই শৃঙ্গাররসাত্মক 'মুক্তক' কাব্য। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের বামন এঁকে বলেছেন 'অনিবন্ধ কাব্য'। তাঁর মতে কবিদের উচিত অনিবন্ধ কাব্য-কলায় দক্ষতা অর্জন করে তারপর নিবন্ধকাব্য অর্থাৎ খণ্ডকাব্য-মহাকাব্যাদিতে হাত দেওয়া। কালিদাসও হয়তো প্রথমে এই অনিবন্ধ রচনায় হাত পাকিয়ে পরে মহত্তর কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে এসেছেন। অগ্নিপুরাণে 'মুক্তক'-কাব্যকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার চমৎকারিতাও স্বীকৃত হয়েছে। বামনের সমকালীন আলঙ্কারিকও মুক্তককে মূল্য দিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। উদাহরণস্বরূপ তিনি অমরুর মুক্তকের উল্লেখ করেছেন। মুক্তককাব্য হিসেবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সাতবাহন হাল রচিত 'গাহাসত্তসই' অতুলনীয়। অমরু ও হালের প্রভাব হয়তো কালিদাসের উপরে পড়েছে।

নামেই বোঝা যায় শৃঙ্গাররসাষ্টক শৃঙ্গাররসনিঃস্যন্দী আটটি শ্লোকের সংগ্রহ। প্রথম শ্লোকেই আছে বিদ্যুৎ-চমক : রতিরম্য সুন্দরী তরুণীর নীবীমোক্ষই আসল মোক্ষ। অন্যান্য শ্লোকগুলিতেও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আছে। মোট ছাব্বিশটি শ্লোকে শৃঙ্গারতিলক। 'তিলক' মানে মণ্ডন। এখানে দু-একটি শ্লোকে স্থূলতা থাকলেও যখন দেখি রাত্রিশেষে পূর্বদিক সপত্নীর মতো রক্তিম হয়ে উঠছে তখন মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

'পুষ্পবাণ' মদন বা কামদেব। 'পুষ্পবাণবিলাসে' কামদেবের বিচিত্র ক্রিয়াব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রথমেই জারশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে স্মরণ করা হল। এই স্মরণটিতেই আছে কাব্যটির মূল সুর।

এই তিনটি শৃঙ্গারকাব্যের কবি হাল বা অমরুর মতো প্রকাশলাবণ্য সৃষ্টি করতে না পারলেও শৃঙ্গাররসবৈচিত্র্যপ্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলব না।

শ্রুতবোধ

'শ্রুতবোধ'কে কাব্য বলা না গেলেও এটি ছন্দশিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষামূলক রচনা। এর বৈশিষ্ট্য হল প্রেমিক দয়িতাকে ছন্দে দীক্ষা দিচ্ছেন মঞ্জু সম্ভাষণে, সেইখানেই এর কাব্যত্ব। পণ্ডিতেরা স্বভাবতই এটিকে কালিদাসের বলতে কুণ্ঠিত (…no ground for the ascription—Keith)· তবু ভাবতে ভালো লাগে কোনো অলস অবসরে হয়-তো নীরস লক্ষণগুলিকে সুবোধ্য করে তোলার শব্দ-খেলায় মেতেছিলেন কবি। আর সেই খেলায় কবির নখপ্রভায় অনুরঞ্জিত হয়েছে শব্দগুটিকারা। তবে তন্বী, সুবর্ণা, এনাক্ষী, বিনীতা, বিলাসিনী, প্রেমনিধি, অমৃতভাষিণী ইত্যাদি স্নিগ্ধ সম্বোধনে দয়িতারা এতই সম্মোহিত হয়ে পড়বেন, যে দয়িতের ছন্দ-শিক্ষার উদ্যম খুব সফল হবার কথা নয়; কারণ, শাস্ত্রবিদ্‌দের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছন্দলক্ষণে তাদের হৃদয় তখন স্পন্দিত!

নলোদয়

নলোদয় কাব্যটি মহাভারতের নলদময়ন্তী কাহিনী নিয়ে। এই কাহিনীটি কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতই কালিদাসের বলে স্বীকার করেন না। সেখানে আদিরসের কবি হিসেবে একাধিক কালিদাসের কথা শোনা যায়। নবম শতাব্দীর রাজশেখরের একটি শ্লোকে বিষয়টির উল্লেখ আছে–

'একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসেন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ॥

সেদিক থেকে বিচার করলে শৃঙ্গাররসাষ্টকাদি অন্য-কোনো কালিদাসের বলে ধরা যেতে পারে। তবে এ তিনটি মেঘদূতের রচয়িতার হলেও হতে পারে, কিন্তু 'নলোদয়' সম্বন্ধে তা বলা যায় না। কারণ, এর ভাষাভঙ্গীই স্বতন্ত্র। বৈদর্ভীরীতি যাঁর হাতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে তাঁর হাতে অমন যমককণ্টকিত কূট কবিতা বেরুবে কী করে ?

ইতি বিকলোমায়ায়াস্তদুক্ত উচে জনোঽমলো মা যায়াঃ।
শুভশীলোঽমায়ায়াঃ স্থিতো নলোঽস্যা বরোঽনুলোমায়ায়াঃ ॥ (৩৩)

–ত্রাহি মধুসূদন ! এ ধরণের শ্লোকে বহু শ্রমে শব্দজাল ভেদ করে যখন দেখা যায় কোনো প্রাপ্তি নেই তখন স্বভাবতই মনে হয় এ কি সত্যিই কালিদাসের রচনা ?

কিংবদন্তী আছে নবরত্নের অন্যতম ঘটকর্পর তাঁর যমককাব্যটির শেষে বলেছিলেন, যিনি যমক রচনায় তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন তিনি কলসির খাপরায় তার জল বহন করবেন। কালিদাস তাঁকে পরাজিত করবার জন্যেই নাকি 'নলোদয়' লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য এ-কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিকতা নেই।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা আখ্যান-কাব্য। এটি মৌলিক রচনা নয়, বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত শ্লোকমালার মিশ্রণে এটি রচিত। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন আবিষ্কার করেছেন ভোজরাজ। সিংহাসন ধারণ করে আছে বত্রিশটি পুতুল। রাজা সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলেই একেকটি পুতুল বিক্রমাদিত্যের ধৈর্য, হিতৈষিতা, ত্যাগ ইত্যাদি গুণের কাহিনী বিবৃত করে বলছে ঃ যদি বিক্রমাদিত্যের মতো এমন গুণের অধিকারী হও তবে এ সিংহাসনে বসতে পারো। ভোজ পরপর বত্রিশটি গল্প শুনে সিংহাসনে বসবার আশা ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বত্রিশটি পুতুল সমস্বরে ভোজরাজকে জানালো তিনিও গুণে বিক্রমাদিত্যের মতোই। তাঁরা দুজনেই নরনারায়ণের অবতার। এবারে পুতুলেরা আত্মপরিচয় দিয়ে এবং তাদের শাপমুক্তি ঘোষণা করে অদৃশ্য হল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই গ্রন্থ অবলম্বনে বত্রিশ সিংহাসন রচনা করেন।

বলা বাহুল্য দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা কালিদাসের রচনা হতে পারে না। ধারানগরবাসী ভোজের (পরমার) রাজত্বকাল ১০১৮–১০৬০ সাল। গ্রন্থটির রচনাকাল একাদশ শতকের আগে নয়। পরে হওয়াও বিচিত্র নয়, কারণ পরবর্তী কালে রচিত কিছু শ্লোকও এতে দেখা যাচ্ছে। পাঁচটি বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে শুধু একটির সমাপ্তিবাক্যে রচনাটি কালিদাসের বলে উল্লিখিত। বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্তন যে-কাব্যের উপজীব্য তার সঙ্গে

কালিদাসের নামটি যুক্ত করার প্রবণতা থাকিতেই পারে, কিন্তু আভ্যন্তর বহু সাক্ষ্যেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় কালিদাস বলতে যে-কবিকে আমরা বুঝি এটি অন্ততঃ তাঁর রচনা নয়।

কালিদাস বলতে যে-কবির কথা আমাদের মানসপটে চকিতে উদ্ভাসিত হয় তিনি স্থিতধী, তিনি অন্তশ্চেতন ; তিনি শক্তির বিস্ফোরণ ঘটান না, শক্তির দীপ্তি ছড়ান ; তিনি নিঃশব্দে প্লাবন আনেন, সরস করে তোলেন শুষ্ক মনোভূমিকে। তিনি যেমন আকাশের তেমনি এই মাটির, কখনও আকাশকে নামিয়ে আনেন মাটিতে কখনও মাটির আনন্দবেদনাকে আকাশে সঞ্চারিত করেন। তিনি কবিকে নবতর সৃষ্টির প্রেরণা দেন আর সাধারণ রসপিপাসু পাঠককে করে তোলেন কবি।

সেই কাব্যলোকই আনন্দলোক, সত্য ও সুন্দর যেখানে এক সূত্রে বাঁধা।

গীতিকাব্য

মেঘদূত

পূর্বমেঘ

কর্তব্যে অবহেলার জন্যে এক প্রেমিক যক্ষ অভিশপ্ত হয়েছিল—এক বছরের জন্যে তাকে পত্নী বিরহিত জীবন যাপন করতে হবে রামগিরি আশ্রমে। অভিশাপের ফলে যক্ষের সমস্ত মহিমা থেকেই সে বঞ্চিত হল।

অলকা থেকে রামগিরি! এই রামগিরিতেই বনবাসের সময় রামসীতা একসঙ্গে বাস করেছিলেন! এখানকার জল সীতার স্নানে পবিত্র, শ্যামল তরুর ছায়ায় স্নিগ্ধ! এই তীর্থেই শুরু হল যক্ষের নির্বাসিত জীবন।

কয়েক মাস কেটে গেল! বিরহ-দুঃখে শীর্ণ যক্ষের বাহু থেকে স্বর্ণবলয় খসে পড়ল! তারপর এল আষাঢ়ের প্রথম দিন! এই দিন সে দেখল শৈলনিতম্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ একখণ্ড মেঘ! তার কাছে মনে হল, এক প্রমত্ত হস্তী যেন শৃঙ্গের আঘাতে-আঘাতে মত্ত হয়ে উঠেছে তার ভূমিখননের খেলায়! সে এক রমণীয় দৃশ্য!

ঐ মেঘ তার হৃদয়ের কামনা উদ্দীপিত করে দিল—অশ্রুবাষ্প কোনোমতে হৃদয়ের মধ্যেই দমন করে সে মেঘের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইল। মেঘ-দর্শনে সুখী ব্যক্তিরও চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে—কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক যার প্রিয়া দূরবর্তী—তার তো কথাই নেই।

শ্রাবণ মাস আসন্ন। যক্ষ তার বিরহিণী প্রিয়ার প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে মেঘের সাহায্যে নিজের কুশল সংবাদ পাঠাতে আগ্রহী হল। সে তখন কুরচি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকে অভ্যর্থনা জানাল আর প্রসন্ন চিত্তে ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তার কুশল জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু মেঘ তো জড় পদার্থ—ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর সমষ্টি! আর সংবাদ যে বহন করে নিয়ে যাবে তার প্রয়োজন সমর্থ ইন্দ্রিয়। মেঘের তো ঐসব কিছুই নেই—তবে সে যক্ষের দূত হয়ে যাবে কেমন করে? যক্ষ এইসব কিছুই না ভেবে মেঘকে তার প্রার্থনা জানাল। যারা কামার্ত—চেতন-অচেতনে ভেদজ্ঞান তাদের কাছে আশা করা যায় না।

বক্তব্যের সূচনায় মেঘের একটু স্তুতি চাই ! যক্ষ বলল—ওগো মেঘ, আমি জানি তুমি পুষ্কর এবং আবর্তক মেঘের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি ইন্দ্রের প্রধান সহচর, তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী রূপগ্রহণ করতে পারো ! অদৃষ্টবশে আমার প্রিয়া আজ দূরবর্তী, তাই তোমার কাছে আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি ; গুণবান ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় তবে তাও ভালো—অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা সফল হলেও তা বরণীয় হতে পারে না।

যারা সন্তপ্ত তাদের তো তুমিই একমাত্র শরণ ! আমি ধনপতি কুবেরের ক্রোধে প্রিয়ার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমার সংবাদ তুমি প্রিয়ার নিকটে বহন করে নিয়ে যাও। তোমাকে যেতে হবে অলকায় ; অলকা যক্ষরাজগণের বিলাসভূমি—অন্যদিকে তীর্থভূমিও বটে ! নগরের বাইরে উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বর মূর্তি—তার ভালশোভিত চন্দ্রের দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে আছে নগরের সমস্ত অট্টালিকা।

বায়ুপথে তোমাকে উড়ে যেতে দেখলে প্রোষিতভর্তৃকা নারীদের মনে আশার সঞ্চার হবে, এইবার বুঝি মিলনকাল আসন্ন—তারা এলোচুলের প্রান্তভাগ তুলে নিয়ে তোমাকে দেখবে। আমার মতো পরাধীন ব্যক্তি ছাড়া আর কে আছে যে তোমার উদয়ে তার বিরহ-ব্যাকুলা প্রিয়াকে উপেক্ষা করবে ?

অনুকূল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত, গর্বিত চাতক তোমার বামদিকে মধুর কূজনে মত্ত। আকাশে মালার মতো সজ্জিত হয়ে বলাকাদল নয়নমনোহর তোমার সেবা করবে, কেননা তোমার সঙ্গে তাদের ক্ষণপরিচয়, তুমি আড়াল রচনা না করলে বকমিথুন মিলিত হবার অবকাশ পেত না।

বাধাহীন গতিতে এগিয়ে গেলে আমার পতিব্রতা পত্নীকে—তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখতে পাবে। সে মিলনের আশায় এখন দিন গুণছে ; নিশ্চয় সে এখনও জীবিত আছে, কেননা, বৃন্ত যেমন ফুলকে ধরে রাখে, আশাও তেমনি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। এই আশার বন্ধন বিরহকালে নারীর ভঙ্গুর হৃদয়কে ধরে রাখে।

তোমার যে গর্জনে ভূমি ভেদ করে ভূকন্দলী ফুল বেরিয়ে এসে ঘোষণা করে—এইবার পৃথিবী ‘অবন্ধ্যা’ অর্থাৎ শস্যশালিনী হবে, তোমার সেই শ্রবণমধুর গর্জন শুনে মানসযাত্রী রাজহংসের দল মুখে মৃণালখণ্ড বহন করে কৈলাস পর্যন্ত তোমার সঙ্গী হবে।

এইবার তোমার প্রিয়বন্ধু ঐ রামগিরি পর্বতকে আলিঙ্গন করে বিদায় গ্রহণ কর। ঐ পর্বতের মেখলা সব মানবের পূজ্য শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন অংকিত। কালে-কালে তোমার সান্নিধ্যলাভ করেই দীর্ঘবিরহের তাপ উহার সর্বাঙ্গ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে।

তোমার যাবার যোগ্য পথের সন্ধান বলে দিচ্ছি, এরপর শ্রবণমধুর সংবাদটিও তুমি শুনতে পাবে। যেতে-যেতে যখনই তুমি একটু ক্লান্ত হবে তখন শিখরে-শিখরে একটু বিশ্রাম করে যেয়ো ; যখনই মনে হবে জলবর্ষণের ফলে একটু ক্লান্ত হয়েছ তখন একটু হাল্‌কা জল পান করে নিয়ো।

তুমি যখন আকাশপথে যাবে তখন সরলা সিদ্ধাঙ্গনাগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে দেখবে ! দেখবে আর ভাববে—তাইতো ! ঝঞ্ঝার বেগে কোনো পহাড়ের চূড়া উড়ে যাচ্ছে বুঝি ! দিকে-দিকে দিঙ্‌নাগ আছে, তারা হয়তো তোমার পথরোধ করতে আসবে—তুমি তাদের এড়িয়ে যেয়ো। তোমার যাত্রা শুরু হবে এই সরস বেতসকুঞ্জ থেকে আকাশপথে সোজা উত্তর মুখে।

বিভিন্ন বর্ণের রত্ন একসঙ্গে মেশালে যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর ইন্দ্রধনু পর্বতের উপরে স্থিত বল্মীকের স্তূপ থেকে ধীরে-ধীরে উঠবে। তুমি যখন উত্তর দিকে যাত্রা করবে তখন তোমার দেহে লগ্ন হবে সেই ইন্দ্রধনু। তখন তোমার দেহে কত শোভা বাড়বে, বল তো ! কৃষ্ণ যেমন সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ তাঁর মোহন চূড়ায় সাজিয়ে গোপাল বেশে সাজতেন তোমার সজ্জাও হবে ঠিক তেমনি।

কৃষিফল তো তোমারই অধীন—তাই জনপদবধূরা তোমার দিকে প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। এরা সরল, ভ্রূবিলাস বা কটাক্ষ এরা জানে না—সেই দৃষ্টিতে থাকবে গভীর আগ্রহ, তোমার মনে হবে, দৃষ্টিতেই ওরা যেন তোমাকে পান করে ফেলবে ! এইভাবে তুমি হলকর্ষিত উচ্চভূমির উপরে উঠবে—কর্ষণের ফলে সেই ভূমি হবে সৌরভময়, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে ; সেই সৌরভ আঘ্রাণ করতে করতে একটু বেঁকে পশ্চিম দিকে যেয়ো—তারপর আবার উত্তরের যাত্রা চলবে !

একটু বেঁকে পশ্চিমে যেতেই তোমার চোখে পড়বে আম্রকূট পর্বত। এরই অরণ্য সম্পদ দাবানলে দগ্ধ হবার সময় তোমারই বর্ষণে সেই দাবদাহ নির্বাপিত হয়েছিল। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখে কৃতজ্ঞ আম্রকূট বেশ আদর করেই তোমাকে মস্তকে বহন করবে। উপকারের কথা মনে রেখে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বন্ধুকে আশ্রয়দানে বিমুখ হয় না আর এই পর্বত তো উন্নত !

পরিপক্ক আম্রের কাননে শোভিত এই পর্বতের শিখরে স্নিগ্ধ কেশপাশের মতো শ্যামবর্ণ তুমি যখন সেখানে অধিষ্ঠিত হবে তখন আকাশ থেকে দেবদম্পতীরা দেখবেন, ঐ শৃঙ্গ যেন পৃথিবীর স্তনের মতো শোভিত। চারদিকে পাণ্ডুবর্ণ মধ্যে শ্যামবর্ণ—এ-দৃশ্য হবে দেবদম্পতীরও দর্শনীয়।

ঐ আম্রকূটের কুঞ্জবনে বনচরবধূরা বাস করেন। তুমি মুহূর্তকাল সেখানে থেকে কিছু বর্ষণ কোরো—বর্ষণের পর নিশ্চয়ই তোমার গতি লঘু হবে ; তখন তুমি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হোয়ো ; তখন দেখতে পাবে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বিশীর্ণ রেবা নদী প্রবাহিতা। বিন্ধ্যগাত্রে রেবার বিচিত্র ধারা দেখলে মনে হবে যেন হস্তীর দেহে বিচিত্র রেখায় রচিত সজ্জা !

ওগো মেঘ, তুমি তো সেখানে বর্ষণ করবেই ; কিন্তু বর্ষণের পর যখন হালকা হবে তখন গজমদধারায় সুবাসিত রেবার জলধারা পান করে নিয়ো। তুমি সারবান হলে বায়ু আর তোমাকে যেখানে খুশি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যে লঘু সে-ই সর্বাংশে রিক্ত, যে পূর্ণ তার গৌরব সর্বত্র।

পথে যেতে-যেতে তোমার বর্ষণের ফলে কদম্বফুল ফুটে উঠবে—সবুজ ও পাংশুবর্ণের মিলনে তাদের অপূর্ব শোভা ! সেই ফুলের কেশর অর্ধেক উদ্গত ! কোথাও নদীর তীরে-তীরে ভুঁইচাঁপা ফুটে উঠবে ; কোথাও বা বনভূমি দগ্ধ হয়েছিল, তোমার বর্ষণে মাটি থেকে এক মধুর গন্ধ উঠতে থাকবে—সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে-করতে বিচিত্র হরিণ-গুলি তোমার বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে ! তারাই বলে দেবে সবাইকে—কোন্ পথে তুমি গিয়েছ !

বর্ষণের সময় ভূমিতে পড়বার আগেই চাতক জলপান করে—এইসব জলবিন্দু গ্রহণে নিপুণ চাতকদের দেখতে-দেখতে সিদ্ধেরা এক, দুই করে গুণে যাচ্ছেন মানসযাত্রী সারিবদ্ধ বলাকার দল ! এমন সময় হঠাৎ মেঘের গর্জন ! চকিত, ভীত ও কম্পিত সিদ্ধাঙ্গনারা

সিদ্ধাঙ্গনারা সঙ্গে-সঙ্গে দয়িতের বক্ষে আশ্রয় নেবে ! অযাচিত এই আলিঙ্গনে খুশি হয়ে সিদ্ধেরা নিশ্চয়ই তোমাকেই সমাদর করবেন ! তাছাড়া, আলিঙ্গনাবদ্ধ সিদ্ধমিথুনদের দেখে তোমারও আনন্দ হবার কথা !

ওগো বন্ধু, আমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তুমি দ্রুত পথ চলবে আমি জানি, তবু মনে হয়, কুরচিফুলের সুগন্ধে আমোদিত পর্বতে-পর্বতে তোমার কিছু বিলম্ব হতে পারে। কুরচিফুলের সুগন্ধের কথা ছেড়ে দিলেও, আকাশে তোমাকে দেখে সাদা সাদা জলভরা চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে ময়ূরের দল যখন স্বাগত-সম্ভাষণ জানাবে তখন তুমি কষ্ট হলেও একটু তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা কোরো।

এরপর তোমার যাত্রাপথে পড়বে সুন্দর দশার্ণ দেশ। তুমি দশার্ণে উপস্থিত হলে মানসযাত্রী সেই রাজহংসের দলও সেখানে কিছুদিন থেকে যাবে। দশার্ণের চারদিকে শ্যাম জম্বুবন—তাদের ফল পরিপক্ক, বাইরে পাণ্ডুছায়াভরা কেতকীর বেড়াঘেরা উপবন। তুমি সেখানে এলে কেতকীর কুঁড়ি ফুটে উঠবে। গ্রামের মধ্যে পথের পাশে বৃক্ষে-বৃক্ষে গৃহবলিভুক্ পক্ষীরা নীড়নির্মাণে রত !

দশার্ণ দেশেরই বিখ্যাত রাজধানী বিদিশা, সেখানে গেলে তোমার বিলাসী হৃদয়ের কামনা পূর্ণ হবে ! সেখানে বেত্রবতীর স্বাদু জল খানিকটা পান করে নিয়ো—তোমার মনে হবে ঐ নদীরূপিণী নায়িকা ভ্রূভঙ্গে তোমাকে নিষেধ করছে, তার কণ্ঠস্বর ব্যক্ত হবে চঞ্চল ঊর্মির কলধ্বনিতে—ওদিকে শোনা যাবে তীরোপান্তে তোমারও মৃদু গম্ভীর গর্জন !

বিদিশা নগরীর উপকণ্ঠেই এক সুন্দর পাহাড়—নাম নীচৈঃ ; সেই পাহাড়ে বিশ্রাম নেবার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরো। তোমার সংস্পর্শে এলে সেখানে প্রস্ফুটিত কদম্ব পুলকিত হয়ে উঠবে। সেখানে নির্জন গিরিগুহায় যৌবনবিলাসী প্রেমিকের দল বিলাসিনী রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়—তাদের সুবাসিত অঙ্গের পরিমলে গিরিগুহাগুলি সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পাহাড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার তুমি যাত্রা করবে। বননদীর দুই তীরে দেখতে পাবে যূথিকার ঝাড়—সেখানে তুমি তোমার নূতন জলকণা একটু বর্ষণ করে যেয়ো। যে-রমণীরা সেই পুষ্পবনে পুষ্পচয়ন করতে আসে—তারা রৌদ্রে ক্লান্ত ; ঘাম ঝরে পড়ছে—ঘাম মুছতে গিয়ে তাদের কর্ণে পরিহিত পদ্মফুলে লাগছে। তুমি তাদের ছায়া দিয়েছ বলেই তাদের ক্ষণপরিচিত বন্ধু। তাই পুষ্পচয়নকারিণীদের প্রসন্ন এবং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তুমি অভিনন্দিত হবে।

উত্তরে তোমার যাত্রা, কিন্তু সোজা উত্তরে গেলে চলবে না। পথ একটু বাঁকা হলেও তোমাকে উজ্জয়িনী দেখে যেতে হবে। উজ্জয়িনীর বিশাল অট্টালিকার ক্রোড়ে একটু বসে যেয়ো—প্রণয়ে বিমুখ হোয়ো না ! সেখানে উজ্জয়িনীর পুরললনাদের কী সুন্দর অপাঙ্গদৃষ্টি ! বিদ্যুৎ বিকাশের মতো নৃত্যময় সেই দৃষ্টিই যদি ভোগ না করলে তবে তোমার জীবন ব্যর্থ।

পথে নির্বিন্ধ্যা নদী। তরঙ্গে-তরঙ্গে কলকল শব্দে ছুটে যাচ্ছে, সঙ্গে চলছে হংসের শ্রেণী—ওরা যেন নদীর মেখলা ! হংসের কলরব, জলের কলধ্বনি যেন সেই মেখলার মৃদু ঝঙ্কার ! বাধাহীন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে নদীর আবর্ত—ঐ আবর্ত যেন নদীসুন্দরীর নাভিকূপ। তুমি একটু নেমে এসে এর রস আস্বাদন করে যেয়ো। অনেক কথা বলবার শক্তি ওর নেই—ভাবের বিলাসই নারীর প্রণয়ভাষণ।

ওগো সুন্দর! তোমার বিরহে সিন্ধু নদী শুকিয়ে হয়েছে একগাছি বেণীর মতো। তার জলের ধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দুই তীরের তরু থেকে জীর্ণ পাতা খসে পড়েছে বলেই তার জলের ধারা পাণ্ডুবর্ণ! বিরহদশায় তোমার অতীত সৌভাগ্যের কথাই সে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই নদী যাতে তার কৃশতা ত্যাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা তুমিই কোরো। (তুমি বর্ষণ করলেই সে কূলপ্লাবী হয়ে উঠবে)।

এরপর তুমি যাবে অবন্তী দেশে; এখানকার গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন কাহিনীতে সুদক্ষ—সেখানে থেকে যাবে সম্পদে ও সৌন্দর্যে 'বিশালা' (উজ্জয়িনী, অবন্তীর রাজধানী) নগরীতে। তোমার মনে হবে, বহুপুণ্যফলে যাঁরা স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁরা সবটুকু পুণ্য ক্ষয় হবার আগেই ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে এবং আসবার সময় স্বর্গের সৌন্দর্যময় এক অংশ সঙ্গে এনেছেন।

এই বিশালায় প্রভাতে শিপ্রার তরঙ্গবাহী শীতল বায়ু বিকশিত পদ্মের গন্ধে মিশে সৌরভময় হয়ে ওঠে। সেই বায়ুতে ভেসে আসে সারসদলের মদকল মধুর ধ্বনি। রমণীদের স্তুতিনিপুণ প্রিয়তমের মতো সেই শিপ্রাবায়ু রাত্রির রতিশ্রমে ক্লান্ত প্রিয়ার গ্লানি দূর করে দিচ্ছে।

এই উজ্জয়িনীর রমণীরা ধূপ জেলে কেশসংস্কার করে, সেই সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়া জানালার পথে বাহিরে এসে তোমার দেহের পুষ্টিসাধন করবে; সেখানে গৃহে-গৃহে পালিত ময়ূরগুলি বন্ধুপ্রীতিবশত তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য (তাললয়াশ্রিত নৃত্য) করবে। প্রাসাদগুলিতে তুমি দেখতে পাবে সুন্দরী রমণীদের পায়ের আলতার চিহ্ন। এই উজ্জয়িনীর প্রাসাদে-প্রাসাদে তুমি পথের ক্লান্তি দূর করতে পারবে।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে চণ্ডিকাপতি মহেশ্বরের মন্দির—সেই পবিত্র মন্দিরে তুমি যেয়ো। মহেশ্বরের কান্তি নীল—তুমিও নীল, তাই তাঁর অনুচর প্রমথগণ তোমার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করবে। মন্দিরের পাশে এক উদ্যান, নদীর বায়ু এসে সেই উদ্যান কম্পিত করে—সেই বায়ু গন্ধবতীর পদ্মগন্ধে আর জলকেলিরত তরুণীদের দেহগন্ধে সুবাসিত।

ওগো মেঘ, যদি অন্য কোনো সময়ে মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও, তবে যতক্ষণ সূর্য দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে ততক্ষণ অপেক্ষা কোরো। সন্ধ্যায় যখন আরতি হবে তখন তুমি একটু গম্ভীর ধ্বনি কোরো, তোমার সেই গর্জনেই ঢাকের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, আর তুমি দেবসেবার ফল লাভ করবে।

সেই মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করে, মহাকালকে চামর ব্যজন করে; তালে-তালে পাদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে মেখলার ঝঙ্কার ওঠে; তারা ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করে—সেই চামর বিচিত্র রত্নখচিত; ক্রমে তাদের হস্ত ক্লান্ত হয়ে আসে। প্রিয়তমের নখ-ক্ষতযুক্ত অঙ্গবিশেষে তোমার বিন্দুবিন্দু বর্ষণ পেলে তারা তৃপ্ত হয়ে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে—মনে হবে যেন অসংখ্য ভ্রমর তোমার দিকে ছুটে আসছে।

এরপর ত্রিলোচনের দীর্ঘবাহুতুল্য বনরাজি সমন্বিত বনে তোমার মণ্ডলসহ তুমি ব্যাপ্ত হোয়ো। নববিকশিত জবার মতো তুমি সন্ধ্যাকালীন রক্তিমবর্ণ ধারণ কোরো। এইভাবে ত্রিলোচনের নৃত্যারম্ভে তাঁর সিক্ত নাগচর্মের জন্যে আগ্রহ নিবারণ কোরো। (তিনি জল-বিন্দুবর্ষী তোমাকে রক্তবিন্দুবর্ষী নাগচর্ম মনে করে শান্ত চিত্তে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হবেন)। গিরিনন্দিনীর হৃদয় শান্ত হবে—তিনি শান্ত দৃষ্টিতে তোমার শিবভক্তি দেখে তুষ্ট হবেন।

উজ্জয়িনীর রাজপথে সূচিভেদ্য অন্ধকারে অভিসারিকার দল চলেছে দয়িতের কাছে, সেই সময়ে তোমার বিদ্যুৎ যেন একটু বলসে ওঠে—সেই বিদ্যুৎকে মনে হবে কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখার মতো স্নিগ্ধ, সেই আলোকেই ওদের পথ দেখিয়ে দিয়ো। কিন্তু বর্ষণ কোরো না, কিংবা গর্জনও কোরো না। ওরা যে ভীষণ ভীরু।

বারবার বলসিত হতে-হতে নিশ্চয়ই তোমার বিদ্যুৎপ্রিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তাই সেই রাত্রি কোনো প্রাসাদের উপরে চিলেঘরে কাটিয়ে দিও—যেখানে পারাবতের দল ঘুমিয়ে আছে। সূর্যোদয় হলেই আবার তুমি পথ চলতে শুরু কোরো—জানো তো, বন্ধুর প্রয়োজন সাধনের ভার নিয়ে কেউ পথে বিলম্ব করে না।

সেই সময়ে কত প্রণয়ী আসবেন, খণ্ডিতা নায়িকাদের কাছে এসে তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন—তাই তুমি আবার সূর্যের পথ রোধ কোরো না। তিনিও তো নলিনীর অশ্রু মুছিয়ে দিতে ফিরে আসছেন, তুমি পথরোধ করলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।

পথে পড়বে গম্ভীরা নদী, তার স্বচ্ছ হৃদয়ের মতো জলে তুমি ছায়াময় দেহে প্রবেশ করতে পারবে। তোমার সেই ছায়ায় পুঁটিমাছগুলি লাফাতে থাকবে, মনে হবে তোমার দিকে গম্ভীরা যেন শ্বেতকটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করছে—তুমি ধৈর্য-সাগর জানি, তবু তার ঐ কটাক্ষ ব্যর্থ করে দিয়ো না। একটু জল বর্ষণ করে যেয়ো।

গম্ভীরার স্রোতের উপর হেলে পড়েছে নীলবর্ণের বেতস লতাগুলি। জলের টানে ওরা নড়ছে। দুই তীর উন্মুক্ত, তোমার মনে হবে গম্ভীরা যেন তার নিতম্ব থেকে স্খলিত বসন কোনো রকমে দুই হাতে টেনে রেখেছে। তুমি যখন তার উপরে লম্বমান হয়ে থাকবে তখন ওখান থেকে চলে আসা সহজে সম্ভব হবে না। পূর্বে যিনি আস্বাদ পেয়েছেন তেমন ব্যক্তি কি করে এমন 'অনাবৃত জঘনা' নারীকে উপেক্ষা করে যাবেন?

তোমার বর্ষণে উচ্ছ্বসিত ধরণীর বুক থেকে এক মধুর সুগন্ধ চারদিক পূর্ণ করবে। জলধারার ধ্বনিতে বায়ু রমণীয়—বড় বড় হাতি শুঁড়ের সাহায্যে সেই বায়ু গ্রহণ করবে, ডুমুরের বন সেই বায়ুর স্পর্শে ধীরে-ধীরে পেকে উঠবে। গম্ভীরাকে ছেড়ে যখন তুমি দেবগিরির দিকে যেতে উদ্যত হবে তখন সেই শীতল বায়ু তোমার সেবা করবে।

সেই দেবগিরিতে কার্তিকেয় নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। তুমি পুষ্পমেঘের রূপ গ্রহণ করে অজস্র পুষ্পের বর্ষণে তাঁকে স্নান করিয়ো—আকাশগঙ্গার জলে সেই পুষ্প সিক্ত করে নিয়ো। দেবরাজ ইন্দ্রের সেনানী রক্ষার জন্যে বালেন্দুশেখর মহেশ্বর যে তেজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন তাই কার্তিকেয় রূপে আবির্ভূত।

কার্তিকেয়ের সেবার পর তাঁর ময়ূরটিকেও একটু নাচিয়ে যেতে হবে। উমা এই ময়ূরকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন—চন্দ্রক-আঁকা তার পালক আপনিই খসে পড়লে পদ্মফুলের অলঙ্কার ফেলে দিয়ে তিনি কর্ণে পরিধান করেন—মহেশ্বরও তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান, তাঁর ললাটচন্দ্রের দীপ্তিতে ময়ূরের চোখ দুটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তুমি তোমার গম্ভীর গর্জন কোরো, পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে তা দ্বিগুণিত হবে—তাতেই ময়ূর নৃত্য শুরু করবে।

শরবনজাত এই কার্তিকেয়কে আরাধনা করে আবার তুমি যাত্রা করবে। আকাশ পথে সিদ্ধমিথুন বীণা হাতে আসবেন—তারা তোমার জলকণার ভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াবেন। একটু অগ্রসর হলে নিচে চর্মণ্বতী নদী; যেন রাজা রন্তিদেবের কীর্তিই পৃথিবীতে স্রোতোমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। তুমি ওকে সম্মান দেখাতে গিয়ে একটু বিলম্ব কোরো।

তুমিও শ্যামবর্ণ—যেন কৃষ্ণের বর্ণ তুমি অপহরণ করেছ। তুমি যখন জল সংগ্রহ করতে এই নদীর উপরে ঝুঁকে পড়বে—উপর থেকে সিদ্ধগণ তাদের আকাশবিহারী দৃষ্টি নত করে দেখবেন—যেন একছড়া মুক্তার মালা, মধ্যে একটি ইন্দ্রনীল মণি! চর্মন্বতী নদী প্রসারিত হলেও দূর হতে দেখাবে একগাছি সূক্ষ্ম সূত্রের মতো!

সেই চর্মন্বতী নদী পার হয়ে যাও, পথে পড়বে দশপুর নগর! সেই নগরের বধূগণ কৌতূহলবশে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। তাদের সুন্দর চোখের ভ্রূলতাবিন্যাস সবারই পরিচিত। তাদের চোখের দীপ্তিতে কৃষ্ণসার মৃগের শোভা! সেই চোখ তুলে তারা যখন চেয়ে থাকবে তখন মনে হবে শ্বেতবর্ণের কুন্দ-কুসুম ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর অনুগামী হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের পঙক্তি।

এরপর 'ব্রহ্মাবর্ত দেশ'—এই দেশ অতিক্রম করে যখন যাবে তখন তার উপর পড়বে তোমার স্নিগ্ধ ছায়া! ব্রহ্মাবর্তের পর ক্ষত্রিয়যুদ্ধের স্মরণসূচক কুরুক্ষেত্র! তুমি যেমন অজস্র বর্ষণে পদ্মদল ছিন্ন করে দাও, তেমনি গাণ্ডীবধারী অর্জুন এই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজাদের মুখের উপর শত-শত তীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ করেছিলেন।

বন্ধুপ্রীতিবশত যুদ্ধবিমুখ হলধারী বলরাম রেবতীনয়ন-প্রতিবিম্বিত সুরাপাত্র তুচ্ছ করে যে নদীতীরে অবস্থান করেছিলেন—সেই সরস্বতী নদী তোমার পথে পড়বে। সেই সরস্বতীর পবিত্র জল তুমি যদি পান কর তবে তুমি অন্তরে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, শুধু বর্ণেই থাকবে কালো।

সরস্বতী পার হয়ে কনখলের পথে! কনখলের কাছেই হরিদ্বারে গঙ্গা হিমালয়ের দেহে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছেন; তোমার মনে হবে সগর রাজার পুত্রগণ যেন এই সিঁড়ি বেয়েই স্বর্গে উঠেছিলেন! খাদে-খাদে জমানো ফেনা গঙ্গার হাসি, তরঙ্গরূপ বাহু দিয়ে তিনি যেন শিবের জটা আকর্ষণ করেছেন! সতীন গৌরীর ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করেই যেন গঙ্গা কলধ্বনিতে হেসে উঠেছেন।

তুমি যদি দিগ্‌গজের মতো দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে গঙ্গার নির্মল স্ফটিকের মতো শুভ্র জল পান করতে চেষ্টা কর তাহলে তোমার কালো ছায়া গঙ্গার সাদা জলে পড়বে—মনে হবে যেন অন্য কোনো স্থানে (ত্রিবেণী ছাড়া) গঙ্গা-যমুনার মিলন ঘটেছে।

এরপর গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের শিখর! সেই শিখর তুষারে আচ্ছন্ন বলেই শ্বেতবর্ণ। সেখানে কস্তুরী মৃগের দল এসে বসে—তাদের নাভির কস্তুরী গন্ধে পর্বতের শিখা সুরভিত হয়ে ওঠে। পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্য তুমি যখন সেখানে গিয়ে বসবে তখন মনে হবে—ত্রিলোচনের শ্বেত বৃষ কোথাও নরম মাটিতে উৎখাৎ কেলি করে এসেছে, কিছু পংক তার শৃঙ্গে লেগে আছে!

প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে দেবদারুর শাখায়-শাখায় সংঘর্ষ বাধবে—তাতে জ্বলে উঠবে দাবানল—দাবানলের স্ফুলিঙ্গ বাতাসে উড়ে এসে পড়বে চমরী মৃগের পুচ্ছের উপরে—পুচ্ছ পুড়তে থাকবে। তখন তুমি সহস্রধারায় বারিবর্ষণ করে হিমালয়ের পৃষ্ঠ শান্ত কোরো। যারা মহৎ তাদের সম্পদ তো বিপন্নকে রক্ষা করবার জন্যই সঞ্চিত থাকে!

হিমালয়ের শরভ মৃগগুলি বিচরণ করে, ওদের পথ তুমি ছেড়ে দিয়ো। তবু যদি তারা ক্রোধে লাফিয়ে তোমাকে দ্রুত লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করে তাদেরই হাত-পা ভেঙে

চুরমার হয়ে যাবে। তুমি তখন শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়ো। ব্যর্থ কাজে মত্ত হলে কে না লাঞ্ছিত হয় ?

হিমালয়ের প্রস্তরে চন্দ্রশেখরের পদচিহ্ন স্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে. সিদ্ধগণ সকল সময়ে নানা উপাচারে সেই পদচিহ্নের পূজা করে থাকেন। তুমি ভক্তিনম্রচিত্তে সেই চিহ্ন প্রদক্ষিণ করে যেয়ো। যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ চিহ্ন দর্শন করেন তাঁদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়. মৃত্যুর পরে তাঁরা চিরকালের জন্যে প্রমথগণের পদলাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।

হিমালয়ের বাঁশের ছিদ্র বাতাসে পূর্ণ হয়–তাই মধুর শব্দ নির্গত হতে থাকে। কিন্নরীদল মিলিত হয়ে শিবের ত্রিপুরবিজয় কাহিনী ঘোষণা করে। সেখানে যদি তুমি তোমার মন্দ্রধ্বনি কর আর যদি সেই ধ্বনি গুহায়-গুহায় ধ্বনিত হয়ে মৃদঙ্গ ধ্বনির মতো শোনায় তবে ওদের শিবসঙ্গীত সার্থক ও সম্পূর্ণ হবে।

হিমালয়ের পাদদেশে সেইসব বিশেষ-বিশেষ স্থান পার হয়ে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে–পথে পড়বে আর একটি পর্বত। তার নাম হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। পরশুরাম বাণের আঘাতে ঐ রন্ধ্রপথ নির্মাণ করেছিলেন তাই ওটি যেন তার 'যশোবর্ত্ম' ! ঐ পথে তুমি সোজা চলতে পারবে না, একটু বাঁকা হয়ে দেহবিস্তার করে তোমাকে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে হবে। তখন তোমার শোভা হবে বামনরূপে বলিকে ছলনা করতে উদ্যত বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ চরণের মতো !

এইভাবে উপরের দিকে যেতে-যেতে তুমি হবে কৈলাস পর্বতের অতিথি ! ঐ পর্বতের তুষারে ঢাকা শৃঙ্গগুলি এত স্বচ্ছ যেন মনে হয় দর্পণ–সুরসুন্দরীরা ঐ দর্পণেই প্রসাধন করেন ! ঐ পর্বতের সানুদেশ শিথিল হয়ে গেছে রাবণের বাহুর আলোড়নে। আকাশ জুড়ে রয়েছে পর্বতের অজস্র শৃঙ্গ–তুষারে আচ্ছন্ন. তাই কুমুদের মতো শ্বেতবর্ণ ! দেখলে মনে হবে, কৈলাসনাথ শিবের অট্টহাসিই যেন পুঞ্জীভূত শৃঙ্গের আকারে বর্তমান !

কজ্জলের গুটি ভাঙলে তার মধ্যে যে স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ–সেই বর্ণের আভা তোমার ; হস্তীর দন্ত সদ্য খণ্ডিত করলে যে শ্বেতবর্ণ সেই বর্ণের আভা কৈলাসের। সানুদেশে যখন তুমি লগ্ন হবে তখন মনে হবে বলরামের স্কন্ধে যেন একটি শ্যামল উত্তরীয় স্থাপিত হল। সেই সৌন্দর্য সকলে স্তিমিত নয়নে দর্শন করবে।

হরপার্বতীর ক্রীড়াশৈল কৈলাস ! এখানে যদি শম্ভু তাঁর বাহুর সর্পবলয় খুলে রেখে গৌরীর সঙ্গে পাদচারণা করতে থাকেন তবে তুমি সেখানে গিয়ে ভক্তির ভঙ্গীতে মণিময় মঞ্চের তটদেশে সিঁড়ির মতো নিজেকে স্থাপন করে তাদের উপরে উঠতে সাহায্য কোরো। তবে সে সময়ে তোমার জলরাশি নিজের মধ্যে রুদ্ধ করে রাখতে হবে।

সখে, সেখানে অবশ্য সুরসুন্দরীদের হাতের বলয়ের কঠিন আঘাতে তোমার দেহ থেকে জলের ধারা নামবে–মনে হবে যেন ধারাযন্ত্রময় গৃহ থেকে অবিরলধারায় বর্ষণ হচ্ছে ! যদি তাদের হাত থেকে মুক্তি না পাও তবে শ্রুতিকঠোর গর্জন কোরো–তারা ক্রীড়ায় মত্ত, ঐ গর্জনেই তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হবে।

ঐ কৈলাসেই মানস সরোবর–স্বর্ণকমলে ভরা ! এর জল তুমি পান কোরো। ক্ষণকাল তোমার জলভরা দেহের কোমল অংশ ঐরাবতের মুখে বিছিয়ে দিয়ো. তাতে ওর প্রীতি জন্মাবে। তারপর কল্পতরুর কচি পল্লব ক্ষৌমবস্ত্রের মতো বাতাসে কম্পিত কোরো। এইভাবে বিচিত্র ললিতক্রীড়ায় তুমি কৈলাসকে উপভোগ কোরো।

এই কৈলাসের কোলেই অলকা ! তুমি কামচারী, ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যেতে

পারো—অলকা দেখে চিনতে পারবে না এমন নয়। অলকার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে ; তোমার মনে হবে, কোনো নায়িকা তার প্রণয়ীর কোলে শুয়ে আছে, তার সূক্ষ্ম বস্ত্র বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে কৈলাসের প্রাসাদগুলিতে মেঘ জমে—সেই মেঘ থেকে বুদ্বুদসহ বারিধারা ঝরে পড়ে। তোমার মনে হবে যেন কোনো নায়িকার মুক্তাজালখচিত অলকদাম !

॥ পূর্বমেঘ সমাপ্ত ॥

উত্তরমেঘ

অলকার প্রাসাদগুলি কয়েকটি বিশেষ গুণে প্রায় তোমারই সমান ! তোমার মধ্যে বিদ্যুৎ আছে, সেখানেও বিদ্যুতের মতো দীপ্তিময়ী সুন্দরী রমণীরা আছেন ! তোমার মধ্যে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর বিকাশ হয়, প্রাসাদগুলিতেও নানাবর্ণের চিত্র রয়েছে। প্রাসাদগুলি সঙ্গীত উপলক্ষ্যে মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। তোমার মধ্যেও সেই স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ধ্বনি ! প্রাসাদের মণিময় মসৃণভূমি তোমার মতোই জলময় মনে হয়। তোমার মতোই সেই প্রাসাদগুলিও উচ্চ এবং আকাশচুম্বী।

অলকার বধূদের হস্তে লীলাকমল, কেশপাশে কুন্দপুষ্প, লোধ্রপুষ্পের পরাগে মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। তাদের করবীর দুই পাশে নববিকশিত কুরুবক ফুল, দুই কর্ণে সুন্দর দুটি শিরীষ ফুল আর সীমন্তে বর্ষাগমে বিকশিত কদম্ব !

যে অলকার বৃক্ষগুলি কখনও পুষ্পহীন হয় না—মধুলোভী উন্মত্ত ভ্রমরকুল চারিদিক গুঞ্জন করতে থাকে ! সেখানে সরসীতে পদ্মফুল নিত্য বিকশিত হয় ; হংসশ্রেণী তাদের বেষ্টন করে থাকে—মনে হয় যেন সরসী মেখলা পরেছে। যেখানে গৃহময়ূরগুলির পুচ্ছ সর্বদাই দীপ্তিময়—তাদের কেকাধ্বনিতে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে সন্ধ্যা অত্যন্ত সুন্দর—সকল সময় জ্যোৎস্নায় আলোকিত—অন্ধকারের লেশমাত্রও থাকে না।

যেখানে আনন্দ থেকে নয়নে অশ্রু দেখা দেয়—অন্য কোনো কারণে নয় ; যেখানে মদনের পুষ্পশরের আঘাতেই যত দুঃখ, অন্য দুঃখ সেখানে নেই ; সেই দুঃখেরও অবসান ঘটে প্রিয়জন কাছে এলেই। যেখানে প্রণয়-কলহ ছাড়া অন্য কোনো বিচ্ছেদ নেই—যৌবন ছাড়া যক্ষদের অন্য কোনো বয়সও নেই !

যে অলকায় প্রাসাদের শ্বেতমণি নির্মিত ভূমিতে বিচিত্র কুসুম ছড়ানো—মনে হয় যেন আকাশের তারকার ছায়া ভূমিতে লুণ্ঠিত ! সেইখানে উত্তম নারী সংসর্গে যক্ষগণ মধুপান করছেন—মধুপানের সময় তোমার গম্ভীর মন্দ্রের ন্যায় মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনিতে সেই ভোগ-ভূমি মুখরিত হয়ে থাকে।

সেই অলকায় মন্দাকিনীর তীরে যক্ষকন্যাগণ খেলায় মত্ত। স্বর্ণরেণুর মতো বালুকা-মুষ্টি নিক্ষেপ করে মণি লুকিয়ে ফেলতে হবে, তারপর ছুটে গিয়ে সেই মণি খুঁজে বার করতে হবে—এই খেলা। এই যক্ষকন্যাগণ রূপে দেবতাদেরও প্রার্থনীয়। খেলা যখন চলতে থাকে তখন মন্দাকিনীর জলসিক্ত শীতল বাতাস তাদের সেবা করে, তীরস্থিত মন্দারতরুর ছায়ায় তাদের রোদের তাপ নিবারিত হয়।

সেখানে ভোগরতা সুন্দরীগণ যখন আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—তাদের পট্টবসন

সহজেই খসে পড়ে—কটিদেশের বসনগ্রন্থি শিথিল হয়ে আসে—সেই শিথিল গ্রন্থি অনুরাগ-হেতু চঞ্চল হস্তে আকর্ষণ করেন তাদের প্রিয়তমগণ। তখন লজ্জায় বিমূঢ়া সুন্দরীগণ একমুষ্টি চূর্ণ পদার্থ নিয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ শিখা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়! কেননা, এ যে রত্নপ্রদীপ—নেভানো যায় না!

অলকার উচ্চ প্রাসাদগুলির উপরের তলার ঘরগুলিতে সুন্দর-সুন্দর চিত্র সজ্জিত রয়েছে। বাতাসের বেগে মেঘখণ্ডগুলি সেখানে প্রবেশ করে নূতন জলকণায় চিত্রগুলি নষ্ট করে দেয়; তারপর শঙ্কিত হয়ে মেঘের দল জানালার পথে পালিয়ে যায়—যেন উদ্গীর্ণ ধোঁয়া জানালার পথে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অলকার রতিমন্দিরে শয্যার উপরে মণির ঝালর, সেখানে চন্দ্রকান্তমণি ঝোলানো। রাত্রিতে মেঘের অবরোধ থেকে মুক্ত চাঁদের কিরণ এসে পড়ে চন্দ্রকান্ত মণির উপর—তখন তা থেকে বিন্দু-বিন্দু শীতল জলকণা ঝরতে থাকে। শয্যায় প্রিয়তমের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রতিশ্রান্তা রমণী—ঐ জলকণার বর্ষণে তার অঙ্গ জুড়ায়!

অলকার কামী ব্যক্তিদের গৃহে অক্ষয় রত্ন বর্তমান। কুবের-ভবনের বাইরে 'বৈভ্রাজ' নামে যে উপবনটি আছে সেখানে তারা এসে বিচিত্র গল্প বলে সময় কাটান—তাদের সঙ্গে থাকেন অপ্সরা ও কিন্নরের দল। কিন্নরগণ মধুর কণ্ঠে অলকাপতি কুবেরের যশোগাথা গান করেন।

অলকায় রাত্রির অন্ধকারে অভিসারিকার দল যখন যাত্রা করেন তখন দ্রুতগতির ফলে তাদের অলক থেকে মন্দারকুসুম খসে পড়ে; চন্দন প্রভৃতির দ্বারা দেহে অঙ্কিত লতাপাতার ছাপ ঝরে পড়ে; কোথাও কর্ণের স্বর্ণালঙ্কার ধূলায় লুটায়, কোথাও স্তন থেকে মুক্তার মালা, কোথাও আবার স্তনের চাপে হার ছিঁড়ে পথে পড়ে! তাই সূর্যোদয়ে সবাই বুঝতে পারে, কোন্ পথে রমণীগণ তাদের নৈশ অভিসার করেছিলেন।

সেই অলকায় কুবের ভবনের বাইরের উপবনে আছেন চন্দ্রশেখর—তিনি কুবেরের সখা। ভয়ে মদন তার ভ্রমর পঙক্তির পুষ্পধনু নিয়ে সেখানে যান না। সেখানকার চতুরা সুন্দরীগণ কামীজনের প্রতি চঞ্চল সভ্রূভঙ্গ এবং অব্যর্থ কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাতেই মদনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে।

সেই অলকায় রমণীদের সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ একমাত্র কল্পবৃক্ষই যুগিয়ে থাকেন—বিচিত্র বসন ও অলঙ্কার, নয়নে বিভ্রমসৃষ্টির অনুকূল সুরা, পল্লবসহ নববিকশিত পুষ্প, চরণকমলের উপযোগী আলতা!

সেই অলকাতেই কুবেরের গৃহের উত্তরে আমার গৃহ দূর থেকেই দেখা যায়। ইন্দ্রধনুর সুন্দর তোরণে শোভিত সেই গৃহ! কাছেই একটি ছোটো মন্দারতরু—আমার স্ত্রী সেই তরুটিকে পালিত পুত্রের মতোই স্নেহে বর্ধিত করেছে! গাছটি এত নিচু যে হাত দিয়েই তার পল্লবের নাগাল পাওয়া যায়।

আমার গৃহে একটি দীঘি আছে; মরকতশিলায় তার সোপান নির্মিত। স্নিগ্ধ বৈদূর্য মণিময় মৃণালের উপরে স্বর্ণকমল বিকশিত। এই দীঘির জলে বাস করে হংসদল—বর্ষাকালে তোমার দর্শনে ক্লান্তি দূর হয় বলে আর নিকটবর্তী মানস সরোবরে যায় না।

সেই দীঘির তীরে এক ক্রীড়া পর্বত; কোমল ইন্দ্রনীল মণিতে তার শিখর নির্মিত। স্বর্ণের কদলীতরুতে তার চারিদিক বেষ্টিত এবং এই কারণেই দর্শনীয় সেই পর্বতটি

আমার গৃহিণীর অত্যন্ত আদরের ; তোমার নীলদেহের চারিদিকে যখন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হতে থাকে তখন সেই পর্বতের কথাই আমি অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে স্মরণ করি।

এই ক্রীড়াশৈলে কুরুবক গাছের বেড়ায় ঘেরা একটি মাধবী কুঞ্জ আছে ; কুঞ্জের নিকটেই দুইটি তরু—একটি রক্তাশোক, বাতাসের বেগে এর পল্লব কম্পমান। অন্যটি বকুল, দেখতে খুবই সুন্দর। অশোক আমার মতোই তোমার সখীর অর্থাৎ আমার প্রিয়ার বামচরণের আঘাত প্রার্থনা করছে—অন্যটিও আমারই মতো তোমার সখীর মুখের মদিরার প্রার্থনা জানাচ্ছে।

এই তরু দুইটির মধ্যে একটি স্বর্ণনির্মিত দাঁড়—দাঁড়ের মূল অংশ কচি বাঁশের বর্ণের মতো সবুজ মণির দ্বারা বাঁধানো—উপরে স্ফটিকের দাঁড় বসানো। দিনের অবসানে তোমার বন্ধু নীলকণ্ঠ ময়ূর এসে সেই দাঁড়ের উপরে বসে আর আমার প্রিয়া হাততালি দিয়ে তালে-তালে তাকে নাচাতে থাকে—তার অলংকারের মধুর ধ্বনিতে নৃত্যের তাল আরও মধুর হয়ে ওঠে।

এইসব লক্ষণের কথা মনে রেখে আর আমার গৃহদ্বারের দুই পাশে আঁকা একটি শংখ ও একটি পদ্ম দেখে আমার গৃহ তুমি চিনতে পারবে। আমার অভাবে সেই গৃহ আজ নিশ্চয়ই শ্রীহীন—সূর্য অস্তমিত হলে পদ্মের কি আর সেই সৌন্দর্য থাকে ?

দ্রুত নেমে আসার জন্য তোমাকে হস্তিশাবকের মতো ক্ষুদ্র আকারে প্রথমে যে ক্রীড়াশৈলের কথা বলেছি সেই ক্রীড়াশৈলের সুন্দর সানুদেশে এসে বসতে হবে ; তারপর তোমার বিদ্যুতের আলো মৃদুভাবে গৃহের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। জোনাকির শ্রেণী যেমন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে ঠিক সেইরকম মৃদু বিদ্যুতের চোখে তুমি দেখবে।

তুমি যাকে দেখতে পাবে তিনি তন্বী, তিনি শ্যামা, পক্ব দাড়িম্ব বীজের মতো সূক্ষ্ম শিখর যুক্ত তার দাঁত, পক্ব বিম্বফলের তুল্য তার অধর, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, নিতম্বের গুরুভারে শিথিল গতি, স্তনভারে সামান্য আনত—তোমার মনে হবে যুবতী সৃষ্টিতে তিনিই বিধাতার প্রথম আদর্শ।

তাকেই জানবে আমার দ্বিতীয় জীবনরূপ ! আমি তার সহচর, দূরে পড়ে আছি—চক্রবাককে হারিয়ে চক্রবাকীর মতোই সে একা—বেশী কথা বলে না। বালিকা বয়সের এই দিনগুলি তার কেটে যাচ্ছে কঠিন বিরহে, গাঢ় উৎকণ্ঠায়—আমার আশঙ্কা, তুষার পীড়িত কমলের মতোই তার সৌন্দর্য এখন অন্যরূপ হয়ে গেছে।

অবিরল অশ্রুপাতে তার নয়ন স্ফীত ও দীপ্তিহীন, ঘনঘন নিশ্বাসের উষ্ণতায় তার ওষ্ঠাধর মলিন, লম্বিত কেশপাশে মুখ ঢাকা, তাই অপ্রকাশিত—করতলে ন্যস্ত প্রিয়ার মুখ দেখলে তোমার মনে হবে, তুমি ঢেকে রাখলে চাঁদের যে দশা ঘটে, সেই দশাই তার হয়েছে।

আমার প্রিয়াকে হয় তো তুমি দেখবে আমারই কল্যাণে পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত কিংবা আমার বিরহক্লিষ্ট রূপ কল্পনা করে সে তারই ছবি আঁকছে—কিংবা হয় তো সে পিঞ্জরস্থ মধুরবচনা সারিকাকে প্রশ্ন করছে—ওগো রসিকে ! তুমি তো তার প্রিয় ছিলে, তার কথা তোমার মনে পড়ে কি ?

হয় তো দেখবে, মলিনবসনা আমার প্রিয়া কোলের উপর বীণা রেখে গান করছে—সেই গান আমারই নাম ও কুলের পরিচয়ে ভরা। সেই গানের পদ সে নিজেই রচনা করেছিল। কিন্তু তুমি দেখবে গাইতে গিয়ে বীণার তার চোখের জলে সিক্ত হচ্ছে—বারবার মুছে নিয়ে সে চেষ্টা করছে তবু নিজেরই রচিত সুর আর মনে করতে পারছে না।

হয় তো বা দেখবে দরজার সামনেই এক বেদির উপর বিরহের দিন থেকে আরম্ভ করে প্রতিদিন একটি করে ফ‍ুল রাখতে-রাখতে এতদিনে যত ফ‍ুল জমে উঠেছে—তা সে গ‍ুণে দেখছে বিরহ শেষ হতে আর কত মাস বাকী ! হয় তো বা দেখবে ধ্যানে আমাকে কল্পনা করে আমার সঙ্গ সে উপভোগ করছে। প্রিয়ের সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন এইসব উপায়ের সাহায্যেই বিরহিণী নারী চিত্তবিনোদন করে থাকেন।

দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে তাই তখন তোমার সখী বিরহব্যথায় ততটা পীড়িত হয় না। রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের কোনো উপায় নেই তাই আশঙ্কা হয়, সেই সময়ে সে গ‍ুর‍ুতর দ‍ুঃখ ভোগ করে থাকে। আমার সংবাদ দিয়ে তাকে স‍ুখী করবার জন্যে রাত্রিতে সৌধবাতায়নে বসে সেই সাধ্বীকে দেখো, দেখবে সে ভূমিশয্যায় নিদ্রাহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

মানসিক ক্লেশে সে আজ শীর্ণা—বিরহশয্যায় একপাশে সে শ‍ুয়ে আছে। প‍ূর্ব-দিগন্তে যেমন ক্ষীণ চন্দ্রলেখা দেখা যায় তেমনি তার দেহও আজ ক্ষীণ। মিলনের দিনে আমার সঙ্গে সে ইচ্ছেমতো প্রমোদে রাত কাটাত—সে রাত কেটে যেত ম‍ুহ‍ূর্তের মতো ! বিচ্ছেদের দিনে তাকে সেই রাত উষ্ণ অশ্র‍ুজলে কাটাতে হচ্ছে—বিরহের দ‍ুঃখে তা কত দীর্ঘ !

বাতায়ন পথে চাঁদের জ্যোৎস্না ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে ! প‍ূর্বপ্রীতিহেতু সেইদিকে তাকিয়ে আবার তার ব্যথিত দ‍ৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গভীর দ‍ুঃখে জলভরা চোখ সে বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না—তার দ‍ুই চোখ তখন না-বোজা, না-খোলা। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলপদ্ম যেমন না-ফোটা, না-খোলা অবস্থায় থাকে এও ঠিক তেমনি।

তুমি দেখবে তার অধরপল্লব উষ্ণ নিশ্বাসে মলিন—তৈলরহিত স্নানে তার সিঁথির দ‍ুই পাশের কেশপাশ নিশ্চয়ই র‍ুক্ষ হয়ে গিয়েছে। সেই অলক গণ্ড পর্যন্ত ছড়ানো। স্বপ্নেও যদি আমার সঙ্গলাভ ঘটে এই আশায় সে নিদ্রা কামনা করে কিন্তু দ‍ুই চক্ষ‍ু অশ্র‍ুপ‍ূর্ণ থাকে, তাই নিদ্রারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

বিরহের সেই প্রথম দিনে মালা বর্জন করে যে কেশপাশ বাঁধা হয়েছিল, শাপের অবসানে শোক থেকে ম‍ুক্ত হয়ে আমিই তা খ‍ুলে দেব ; সেই কেশপাশের ভারে সে ক্লিষ্ট ; নখ কাটা হয় নি—সে নখেই সে তার র‍ুক্ষ এবং অগোছাল বেণী গণ্ডদেশ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে !

অঙ্গের আভরণ সে খ‍ুলে ফেলেছে—গভীর দ‍ুঃখে বারবার সে তার কোমল দেহলতা শয্যাতলে এগিয়ে দিচ্ছে। তাকে দেখলে তোমারও নিশ্চয়ই নবজলময় অশ্র‍ুবর্ষণ হবে—কেননা, যাঁদের হৃদয় কর‍ুণাসিক্ত তাঁরাই অন্যের দ‍ুঃখে অভিভূত হয়ে থাকেন।

তোমার সখির মন যে আমাতে অন‍ুরক্তা তা জানি বলেই প্রথম বিচ্ছেদে তার এমন অবস্থা হয়েছে বলে আমার ধারণা। পত্নীপ্রেমের সৌভাগ্যে আমি কোনো রকম বাচালতা প্রকাশ করছি না। আমি যা বলছি তা সত্য কিনা তুমি অচিরেই দেখতে পাবে।

তার চ‍ূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে নয়নের কোণে, সেই নয়নে আবার কাজল নেই। মদিরা ছেড়েছে তাই সেই নয়নে কোনো ভ্র‍ুভঙ্গী নেই। তুমি কাছে গেলে তার চোখের উপরের অংশ স্পন্দিত হতে থাকবে ; তোমার মনে হবে যেন জলের নিচে মৎস্যের বিক্ষোভে বিকশিত পদ্মের পাপড়িগ‍ুলি কাঁপছে !

তোমাকে দেখলে সরস কদলী স্তম্ভের মতো তার সেই বাম উর‍ু কেঁপে উঠবে—সেই উর‍ুতে এখন আর আমার নখক্ষতের চিহ্ন পড়ে না। আগে কোমরে যে ম‍ুক্তার ঝালর সে পরত তাও সে ত্যাগ করেছে—সম্ভোগের শেষে সেই ক্লান্ত উর‍ুতে আমি 'সংবাহন' করতাম।

ওগো মেঘ, যদি সেসময়ে দেখ যে সে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে তবে গর্জন না করে পিছনে এসে প্রহরকাল প্রতীক্ষা কোরো। হয় তো স্বপ্নে সে আমাকে দেখছে কিংবা গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এই সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ আমার কণ্ঠ থেকে তার বাহুলতার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে—তা যেন না হয়।

প্রভাতে তোমার জলস্পর্শে শীতল বাতাস বইতে থাকলে যেমন মালতী ফুলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে তেমনি তোমার জলকণার শীতল সমীরণ তার গায়ে লাগলেই তার ঘুম ভাঙবে! তোমার বিদ্যুৎকে তখন আড়ালে রেখো। তুমি যখন বাতায়নে এসে বসবে তখন তোমার দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। তুমি ধীর, গুড়গুড় ধ্বনিতে আমার মানিনী প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে!

তুমি বলবে, অয়ি অবিধবে! আমি তোমার পতির মিত্র অম্বুবাহ! তোমার স্বামীর কতকগুলো সংবাদ হৃদয়ে বহন করে এনেছি। যখন প্রবাসী পতিরা বিরহিণীদের বেণী বন্ধনের জন্যে অধীর হয়ে গৃহের দিকে যাত্রা করে তখন আমিই গম্ভীর ও মধুর ধ্বনি করে চলি, যাতে তারা বিলম্ব না করে।

এই কথা বলা মাত্র 'পবনপুত্র হনুমান রামের সংবাদ নিয়ে অশোকবনে সীতার নিকটে গেলে তিনি যেমন সাগ্রহে তার দিকে চেয়েছিলেন'—আমার প্রিয়াও তেমনি সাগ্রহে এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তোমাকে দেখবে—তোমাকে অভ্যর্থনা করবে—মন দিয়ে তোমার কথা শুনবে। বন্ধুর মুখে প্রিয়তমের সংবাদ লাভ আর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন—এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

হে আয়ুষ্মান্! আমার অনুরোধ এবং নিজের কল্যাণের জন্যে তুমি তাকে এই কথা বোলো—'রামগিরি আশ্রমবাসী তোমার প্রিয়তম সুস্থ আছে। তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন সে তোমার কুশল প্রশ্ন করে আমাকে পাঠিয়েছে।' প্রাণীর বিপদ খুবই সুলভ—তাই আগে কুশল প্রশ্ন করাই সঙ্গত।

'তোমার মতো তার দেহও ক্ষীণ, বিরহতাপে তোমার দেহ তপ্ত তারও ঠিক তাই, তোমার জন্যে তার যেমন উৎকণ্ঠা তেমনি অনন্ত উৎকণ্ঠা তোমার, তোমার যেমন উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস সে-ও উষ্ণশ্বাসের তাপে দগ্ধ। আজ তোমার সহচর দূরবর্তী—প্রতিকূল দৈবের বশে তার পথও বন্ধ! আজ সংকল্পের মধ্য দিয়েই মনে-মনে নিজেকে মেশাতে চায়!'

তাকে বোলো—'সখিদের সামনে যে কথা প্রকাশ্যে বলা চলে সেই কথাও শুধু তোমার মুখস্পর্শের লোভেই কানে-কানে বলবার জন্যে যে উন্মুখ হয়ে উঠত—আজ সে এত দূরে যে সেখানে কথা পৌঁছোয় না, দৃষ্টিও চলে না। আজ সে-ই তার উৎকণ্ঠায় ভরা হৃদয়ের কথা আমার মুখে তোমাকে বলে পাঠিয়েছে।'

প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার দেহশোভা, হরিণীর চকিত চোখে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার মুখশ্রী, ময়ূরের কলাপগুচ্ছে তোমার কেশপাশ আর ক্ষীণকায়া নদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গে তোমার ভ্রূভঙ্গী—সব কিছুতেই তোমার সাদৃশ্য আংশিকভাবে দেখতে পাই ; কিন্তু হায়, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কোনো একটি বস্তুতে খুঁজে পাই না।

আমি পাথরের উপরে লাল গিরিমাটি দিয়ে প্রণয়কলহে কুপিতা তোমার মূর্তি আঁকি আর তার সঙ্গে তোমার চরণে পতিত আমার নিজের চিত্রটিও আঁকতে যাই, কিন্তু পারি না—সঞ্চিত চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ ভাবে চিত্রেও মিলন হয়, নিষ্ঠুর বিধাতা বুঝি তাও সইতে পারে না!

স্বপ্নে তোমার দেখা পেলে গাঢ় আলিঙ্গনের কল্পনায় শূন্যে হাত বাড়িয়ে তোমাকে ধরতে যাই। তখন আমার দশা দেখে বনদেবতাগণ মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্থূল অশ্রুবিন্দু তরুপল্লবে বর্ষণ করেন।

তুষার গিরির সমীরণ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ুপ্রবাহে দেবদারুর ছোট-ছোট কুঁড়ি থেকে নির্গত ক্ষীরের সুগন্ধে যে বায়ু সুরভিত—সেই বায়ু আমি আলিঙ্গন করি, মনে ভাবি, তোমার সকল অঙ্গ হয় তো সেই বায়ু স্পর্শ করে থাকবে।

ত্রিযামা রাত্রি আমার কাছে দীর্ঘযামা—ভাবি কি করলে তা নিমেষের মতো সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ; ভাবি, সকল অবস্থাতেই দিনের তাপ কি করে কমবে ! কিন্তু এ প্রার্থনা তো আমার পূর্ণ হবার নয় ! হে চটুলনয়নে ! তোমার বিরহ-বেদনার প্রখর উত্তাপে আমার হৃদয় নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে !

আমি অনেক ভেবে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিয়েছি। তাই, ওগো কল্যাণী, তুমিও একেবারে কাতর হয়ে পড়ো না। কার ভাগ্যে চিরস্থায়ী সুখ বা চিরস্থায়ী দুঃখ ঘটে—মানুষের অবস্থা চক্রের প্রান্তভাগের মতোই কখনও উপরে কখনও বা নিচে আবর্তিত হতে থাকে।

নারায়ণ যেদিন শেষনাগের শয্যা ত্যাগ করে উঠবেন সেদিনই আমার শাপের অবসান হবে। চোখ বন্ধ করে কোনো রকমে অবশিষ্ট চারটি মাস কাটিয়ে দাও ! সেই পরিণত শরতের জ্যোৎস্নায় ঢাকা রাত্রিতে বিরহকালে যত কামনা পোষণ করেছি সব পূর্ণ করব।

সে আরও বলেছে—'একদিন শয্যায় আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে তুমি ঘুমোচ্ছিলে, হঠাৎ তুমি চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে জেগে উঠলে। আমি যখন বারবার এর কারণ জানতে-চাইলাম তখন তুমি মৃদু হেসে বলেছিলে—'লম্পট ! আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে বিহার করছ !'

ওগো অসিতনয়না, এই সব অভিজ্ঞান তোমাকে দেওয়ার ফলে তুমি বুঝতে পারবে—আমি কুশলেই আছি। আমার নিন্দা শুনলেও তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না ! লোকে বলে, যে কারণেই হোক, বিরহে প্রেমের ক্ষয় হয়। কিন্তু আসলে বিরহ ভোগের অভাবে ইষ্টপাত্রে স্নেহ সঞ্চিত হয়ে অপরিমেয় প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

ওগো মেঘ, প্রথম বিরহে পীড়িতা তোমার সখিকে এইভাবে আশ্বস্ত কোরো। ত্রিলোচনের বৃষের দ্বারা উৎখাত সেই কৈলাস শিখর থেকে শীঘ্র ফিরে এসো ; তবে আসবার সময় তার কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এসো আর তার কুশল সংবাদ দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কোরো। প্রভাতে কুন্দ ফুল যেমন বৃন্ত থেকে শিথিল হয়ে পড়ে—আমারও সেই অবস্থা !

হে সৌম্য, তোমার বন্ধুর এই কাজটি করবে বলে স্বীকার করলে তো ? অবশ্য 'করব'—এই রকম উত্তর না পেয়েও আমি ভাবছি না, কারণ চাতক যখন তোমার কাছে জল প্রার্থনা করে তখন নীরব থেকেই তুমি জলদান কর। মহৎ ব্যক্তিদের ধর্মই এই—তাঁরা ঈপ্সিত কাজ সম্পন্ন করেই উত্তর দিয়ে থাকেন।

ওগো মেঘ, আমি তোমার কাছে অনুচিত প্রার্থনা করেছি। বন্ধুত্বের জন্যই হোক বা এই বিপন্নের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতেই হোক আমার এই সংবাদ বহনের কাজটি তুমি করে দাও। তারপর নববর্ষার শ্রীতে পূর্ণ হয়ে তোমার ঈপ্সিত দেশগুলিতে ভ্রমণ কোরো। আমার মতো তোমার যেন ক্ষণকালের জন্যও বিদ্যুৎপ্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটে।

॥ উত্তরমেঘ সমাপ্ত ॥

মহাকাব্য

কুমারসম্ভব

প্রথম সর্গ

উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতের স্থিতি ; এই হিমালয় দেবতার প্রকৃতিসম্পন্ন। হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড !

এই হিমালয়কে বৎসরূপে কল্পনা করে অন্য সকল পর্বত গো-রূপধারিণী বসুন্ধরাকে দোহন করে প্রচুর উজ্জ্বল রত্ন ও মহৌষধি সংগ্রহ করেছিল। দোহনদক্ষ মেরুপর্বত ছিলেন দোহনকারী—দোহনে উপদেশ দিয়েছিলেন রাজা পৃথু।

অনন্ত রত্নের উৎস হিমালয় ! হিম তার সৌভাগ্য বিলোপ করতে পারে নি। অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ডুবে যায়—চাঁদের কিরণের দীপ্তিতে মুছে যায় তার কলঙ্কচিহ্ন !

বহুবিচিত্র রঙীন ধাতুপদার্থ রয়েছে হিমালয়ে—খণ্ড খণ্ড মেঘে তা প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করে লোহিতবর্ণের আভা ! অপ্সরাদের ভ্রান্তি জন্মে—বুঝি সন্ধ্যা সমাগত। তখন প্রিয়তমের অভ্যর্থনার দ্রুত সাজসজ্জা করতে গিয়ে তারা এক বিভ্রাট বাধিয়ে বসে।

গিরিনিতম্বে সঞ্চরণ করে যে মেঘমালা তাদের ছায়া এসে পড়ে নিম্নে পর্বতের সানুদেশে। সিদ্ধগণ রৌদ্রতপ্ত হয়ে সেই ছায়ায় বিশ্রাম করেন কিন্তু বর্ষণে বিরক্ত হয়েই আবার উঠে আসেন রৌদ্রোজ্জ্বল শিখরদেশে।

এই হিমালয়ে বিগলিত তুষারধারায় রক্তচিহ্ন মুছে যায় তাই কিরাতেরা গজহত্যাকারী সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পায় না—না পেলেও, নখের ফাঁকে খসে-পড়া মুক্তা দেখেই তারা সিংহের গতিপথ ঠিক করে নিতে পারে।

এই হিমালয়ে ভূর্জপত্রে যে ধাতুরসের সাহায্যে যে অক্ষর লেখা হয় তা হস্তিদেহের রক্তবর্ণ বিন্দুর মতো। ঐ ভূর্জপত্র সুন্দরী বিদ্যাধরীদের প্রেমপত্র রচনায় সাহায্য করে।

এই হিমালয়ের গুহামুখ থেকে প্রবল বায়ু বেরিয়ে এসে বাঁশের গায়ে কীটদষ্ট ছিদ্র পূরণ করে দেয়—তাতে বাঁশির মতো সুর বেজে ওঠে ; মনে হয়, হিমালয় যেন কিন্নর-মিথুনদের উচ্চগ্রামের গানের সঙ্গে বাঁশির তান মেলাতে চায়।

এই হিমালয়ে হস্তিগণ কপোলের কণ্ডূয়ন দূর করবার জন্য দেবদারু বৃক্ষে কপোল

ঘর্ষণ করে—তাতে দেবদারু বৃক্ষ থেকে সুগন্ধিরস বেরিয়ে এসে পর্বতের সানুদেশকে সুরভিত করে থাকে।

হিমালয়ের গুহামুখে জন্মে একজাতীয় লতা—তা থেকে উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হয়; কিরাতেরা যখন তাদের বনিতাদের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত থাকে তখন সেই আলো প্রদীপের কাজ করে, তেলের প্রয়োজন হয় না।

হিমালয়ে যেখানে হিম শিলায় পরিণত হয়েছে, সেই পথে চলতে গিয়ে অশ্বমুখী কিন্নরীদের পায়ের আঙুল আর গোড়ালি অসাড় হয়ে পড়ে; তবু গুরু নিতম্ব এবং দুর্বহ স্তনের ভারে দ্রুতগতিতে চলতে পারে না।

অন্ধকার দিনের আলোকে ভীত পেচকের ন্যায়—হিমালয় এই অন্ধকারকে গোপনে গুহার মধ্যে সূর্যের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। শরণাগত সজ্জন ক্ষুদ্র হলেও মহান ব্যক্তির তার প্রতি মমতা থাকে।

জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে চমরী মৃগীরা তাদের লাঙ্গুলগুলি আন্দোলিত করতে করতে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াত—তাদের চামরের মতো লাঙ্গুলের শোভা হিমালয়ে ছড়িয়ে পড়ত—সেই চামর চন্দ্রের কিরণের মতো শ্বেতবর্ণ! মনে হত হিমালয়ের 'রাজা' নাম সার্থক—ছত্র আর চামর তো রাজারই চিহ্ন!

এখানে গুহাগৃহের মধ্যে কিন্নরদল যখন কিন্নরীদের বস্ত্র আকর্ষণ করে তখন কিন্নরীগণ স্বভাবতই লজ্জিত হয়ে পড়ে—ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে জলভরা কালো মেঘ গুহাদ্বারে এসে পর্দার মতো বিলম্বিত হয়, (রমণীরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে)।

কি স্নিগ্ধ সমীরণ হিমালয়ের! এই সমীরণ বয়ে আনে গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণা—তার বেগে দেবদারু গাছগুলি মুহুর্মুহুঃ কেঁপে ওঠে! ময়ূরের পুচ্ছগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে কেমন সুন্দর শোভা পেতে থাকে! এই সমীরণ উপভোগ করে শিকার সন্ধানের শেষে পরিশ্রান্ত কিরাতের দল।

এই হিমালয়ের শিখরস্থিত সরোবরে কত পদ্ম ফোটে—সপ্তর্ষিগণ চয়ন করার পরে যে সব পদ্ম অবশিষ্ট থাকে—নিচে ভ্রমণরত সূর্যদেব উপরে কিরণ প্রসারিত করে সেইগুলি প্রস্ফুটিত করেন। (সৌরমণ্ডলেরও ঊর্ধ্বে সেই সরোবর—হিমালয় কত উচ্চ কে জানে!)

যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তার উৎস হিমালয়! তাছাড়া, পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা-ও আছে এই হিমালয়ের। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা এই সমস্ত বিবেচনা করেই হিমালয়কে পর্বতের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন—(দেবতাদের মতো) যজ্ঞভাগেরও একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন!

এই হিমালয় মেরুপর্বতের সখা, কে কিরূপ মর্যাদার যোগ্য সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তিনি পিতৃগণের মানসীকন্যা মেনাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করলেন। মেনা ছিলেন মুনিগণেরও সম্মানের পাত্রী এবং সর্বাংশে হিমালয়ের যোগ্য সহধর্মিনী।

কালক্রমে তাঁরা রূপানুযায়ী রতিসম্ভোগে লিপ্ত হলেন—এবং পর্বতরাজের পত্নী, মনোরম যৌবনের অধিকারিণী মেনা গর্ভিণী হলেন।

যথাসময়ে তাঁর মৈনাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। রূপবান মৈনাককে সুন্দরী নাগকন্যাগণও এসে পতিত্বে বরণ করল। বন্ধুত্ব হল সমুদ্রের সঙ্গে। ক্রুদ্ধ

দেবরাজের বজ্রাঘাতের বেদনা আর তাঁকে সইতে হল না। (তিনি সমুদ্রের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করলেন)।

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহাদেবের পূর্বপত্নী সতী পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনে অপমানে যোগানলে দেহত্যাগ করেছিলেন; সেই সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করার জন্য হিমালয়গৃহিণী মেনার গর্ভস্থ হলেন।

যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারলে উৎসাহগুণ যেমন নীতির কৌশলে শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে থাকে—সংযত গিরিরাজ হিমালয়ও তেমনি নিয়মবতী মেনার গর্ভে সতীকে লাভ করলেন।

তার সেই জন্মদিন সকলের পক্ষেই পরম সুখকর হয়ে উঠেছিল। দশ দিক আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করল—সর্বত্র ধূলিপ্লুত নির্মল সমীরণে ছেয়ে গেল; দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পূর্ণ হল আকাশ, অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। স্থাবর-জঙ্গম সকলের পক্ষেই সেই দিন ছিল আনন্দদায়ক।

নবমেঘের মন্দ্রধ্বনিতে পর্বতের প্রান্তভূমি থেকে উদ্গত রত্নশলাকার দীপ্তিতে যেমন সেই স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ জ্যোতির্ময়ী নবকুমারীর দেহলাবণ্যেও প্রসূতি মেনকাদেবী অতুল দীপ্তিতে শোভিত হলেন।

চন্দ্রলেখা যেমন দিনের পর দিন অধিকতর জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব নব কলার সংযোগে অধিক সুন্দর দেখায়, সেইরূপ সেই নবকুমারীর দেহ দিন দিন বাড়তে লাগল, তাতে অধিকতর লাবণ্যও বিকশিত হতে লাগল।

পিতৃকুলের প্রিয় সেই কুমারীকে পিতা হিমালয় প্রভৃতি বংশানুসরণ অর্থাৎ 'পার্বতী' (পর্বত-কন্যা) নামে ডাকতেন। পরে (যখন মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য পার্বতী তপস্যায় উদ্যত) উ—ওগো, মা—যেয়ো না, এইভাবে মাতা বার বার তপস্যা থেকে নির্বন্ধ করায় তার নাম হয়েছিল 'উমা'।

পুত্র থাকা সত্ত্বেও পার্বতীর উপরেই হিমালয়ের অধিক স্নেহ—তার দিকে চেয়ে তাঁর যেন তৃপ্তি হত না। বসন্তে অনেক ফুল ফোটে, তবু আম্রমুকুলেই থাকে ভ্রমরের আকর্ষণ।

উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত শিখায় যেমন প্রদীপ অলংকৃত হয়, মন্দাকিনীর স্পর্শে যেমন স্বর্গের পথ পবিত্র হয়, বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা যেমন পণ্ডিত ভূষিত হন—পার্বতীর দ্বারাও তেমনি হিমালয় অলংকৃত, পবিত্র ও বিভূষিত হলেন।

বাল্যে ক্রীড়ারস আস্বাদন করার জন্যই যেন তিনি কখনও মন্দাকিনীর তীরে বালুকার বেদী নির্মাণ করে কখনও কন্দুক (ঘুঁটি) নিয়ে আবার কখনও বা পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলা করতেন।

শরৎকালে হংসমালা যেমন আপনি এসে উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে লতাসমূহে যেমন তাদের নিজের দীপ্তি আপনিই জ্বলে ওঠে, তেমনি মেধাবিনী পার্বতীর শিক্ষাকালে তাঁর পূর্বজন্মের বিদ্যা সংস্কার আপনি এসে তাঁকে আশ্রয় করল।

ক্রমে পার্বতীর যৌবন দেখা দেখা দিল। যৌবন (নরনারীর) অযত্নসিদ্ধ অলংকার, যৌবন মদ্য না হয়েও হৃদয়ের মত্ততাজনক, যৌবন কামদেবের পঞ্চপুষ্পের অতিরিক্ত ষষ্ঠ বাণ—বাল্যকালের পরে এই যৌবনই পার্বতীকে অলংকৃত করল।

নব যৌবনের আবির্ভাবে তাঁর দেহ নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অংকিত চিত্রের ন্যায়,

সূর্যের কিরণে বিকশিত পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্যে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল।

তাঁর প্রতি পদক্ষেপে উত্তোলিত চরণপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি ভূমিতে নিহিত হবার সময়ে যেন নখের দীপ্তি থেকে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠত—মনে হত তিনি যেন এখানে-ওখানে স্থলপদ্ম ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন।

নূপুর পরে তিনি যখন মন্থর পদে চলে যেতেন তখন মনে হত তাঁর ঐ নূপুরের ধ্বনি প্রতিদানরূপে ফিরে পাবার জন্যেই বুঝি রাজহংসীরা তাঁকে ঐ মন্দগমন শিক্ষা দিয়েছে। (তা না হলে ঐ মরালগতি তিনি পেলেন কোথা থেকে ?)

সুবর্তুল, গোপুচ্ছাকার, অনতিদীর্ঘ তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় বিধাতা এতই সুন্দর করে গড়েছিলেন যে মনে হয় তাঁর সৌন্দর্যভাণ্ডারের সবটুকু সৌন্দর্য ঐ জঙ্ঘা নির্মাণেই নিঃশেষিত হয়েছিল ; পার্বতীর অন্যান্য অঙ্গ নির্মাণের সময়ে বিধাতাকে লাবণ্য-সংগ্রহে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

হস্তিশুণ্ডের ত্বক কর্কশ আর কদলীতরু শীতল সুতরাং তারা (সৌন্দর্যে সাধারণ ঊরুর উপমানযোগ্য হলেও) পার্বতীর নাতিশীতোষ্ণ অসাধারণ সুন্দর ঊরুর উপমান হতে পারল না (অর্থাৎ বাইরেই থেকে গেল, ত্রিসীমাতেও আসতে পারল না)।

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতীর কাঞ্চীগুণের স্থান অর্থাৎ নিতম্ব কতদূর অনুপম শোভায় মণ্ডিত ছিল তা শুধু এইটুকু বললেই অনুমান করা যাবে যে পরে পার্বতীর এই নিতম্ব মহেশ্বরের ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েছিল যা অন্য কোনো রমণী স্বপ্নেও কামনা করতে পারে না।

নিম্ননাভি পার্বতীর নাভির চারিদিকে নবোদ্গত অতি সূক্ষ্ম রোমাবলী! সেই রোমাবলী তার নাভিগর্ভে ঈষৎ প্রবিষ্ট হয়ে এমন শোভা সৃষ্টি করেছিল যে মনে হত, বুঝি তারা মেখলার মধ্যস্থিত নীলকান্ত-মণির স্নিগ্ধ আভা নাভির উপরের বসনগ্রন্থি ভেদ করে নাভিগর্তে প্রবেশ করেছে।

পার্বতীর কৃশ কটিদেশ যেন একটি বেদির মতো ; সেই বেদির নিচে তিনটি সুন্দর ত্রিবলীরেখা! দেখে মনে হত যেন নবযৌবন ঐ সিঁড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে—যাতে মদনদেবতা ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে পারেন।

কমলনয়না পার্বতীর পাণ্ডুবর্ণ স্তন দুইটি পরস্পরকে পীড়িত করে এমনি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সেই শ্যাম-মুখ স্তনদ্বয়ের মধ্যে এতটুকু স্থান ছিল না যে মধ্যে এক সূক্ষ্ম মৃণালসূত্র প্রবেশ করতে পারে।

আমার মনে হয়, পার্বতীর বাহু দুইটি শিরীষ কুসুমের চেয়েও অনেক বেশি কোমল ছিল—তা না হলে, পরাজিত হয়েও মদন ত্রিলোচনের কণ্ঠ পার্বতীর বাহুপাশে বাঁধতে পারলেন কি ভাবে ?

পার্বতী যখন তাঁর পীনস্তনোন্নত কণ্ঠে সুগোল মুক্তাহার পরতেন—তখন মুক্তাহারে কণ্ঠের যেমন শোভা হত, মুক্তাহারও সৌন্দর্যময় হয়ে উঠত। তারা হত পরস্পর পরস্পরের ভূষণ।

(সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চঞ্চলা) লক্ষ্মী রাত্রিতে চন্দ্রকে আশ্রয় করে বিকশিত পদ্মের শোভা ভোগ করতে পারতেন না, (আবার দিনে) পদ্মে অধিষ্ঠিত থেকে চন্দ্রশোভা থেকে বঞ্চিত হতেন ; এখন পার্বতীর মুখ আশ্রয় করে চন্দ্র ও পদ্ম—দুইয়েরই প্রীতিলাভ করলেন। (অর্থাৎ পার্বতীর মুখ যুগপৎ চন্দ্র ও পদ্মের তুল্য)।

শ্বেতপুষ্পকে (পুণ্ডরীক প্রভৃতি) যদি নবপল্লবের উপরে স্থাপন করা যায় অথবা মুক্তাবন যদি ঈষৎ রক্তাভ প্রবালের উপরে নিহিত হয়, তাহলে হয়তো তাঁর আরক্ত অধর প্লাবিত করে বিচ্ছুরিত যে স্মিতহাসি—তার সঙ্গে তারা উপমিত হতে পারে।

মধুরভাষিণী পার্বতী যখন অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বরে কথা বলতেন তখন পরপুষ্টা কোকিলার কুহুস্বরও বিষমবণ্ধা (সুরহীনা) বীণার ধ্বনির মতো কর্কশ মনে হত।

বায়ুর বেগে চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায় আয়তনয়না পার্বতীর সেই অধীর দৃষ্টি কি তিনি চঞ্চলনেত্রা মৃগীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন ? না, মৃগীরাই তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল ?

পার্বতীর আকর্ণদীর্ঘ ভ্রূলতা যেন অঞ্জনশলাকার দ্বারা অংকিত! এই ভ্রূলতার সৌন্দর্য দেখেই পুষ্পধনুর (মদন নিজের বাঁকা এবং) ত্রিভুবনজয়ী গর্ব ত্যাগ করেছিলেন।

ইতর প্রাণীদের হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্রও লজ্জা থাকত তাহলে গিরিরাজকন্যার সেই কেশকল্প দেখে নিশ্চয়ই চমরী মৃগ আপন পুচ্ছের মমতা ত্যাগ করত।

বিশ্বদ্রষ্টা বোধ হয় জগতের সমস্ত সৌন্দর্য একটি স্থানে দেখবার ইচ্ছাতেই, বিশ্বের সমস্ত উপমানবস্তু (চাঁদ, চাঁপা, পদ্ম, কোকিল প্রভৃতি) একত্র সংগ্রহ করে—যেখানে যেটি সন্নিবিষ্ট করলে ঠিক মানায় সেইভাবেই সাজিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দরী পার্বতীকে নির্মাণ করেছেন। (তা না হলে এমন নিখুঁত সৌন্দর্য কিরূপে সম্ভব) ?

একদিন ইচ্ছাবিহারী দেবর্ষি নারদ সেই কন্যাকে (পার্বতীকে) পিতার কাছে দেখতে পেয়ে এই ঘোষণা করলেন—ইনি আপন প্রেমের প্রভাবে মহেশ্বরের একপত্নী এবং অর্ধাঙ্গ-ভাগিনী হবেন।

এই জন্যই পিতা হিমালয় কন্যার বিবাহোচিত বয়স হলেও অন্য পাত্রের কোনো অভিলাষ করেন নি। কেননা, মন্ত্রপূত হবি একমাত্র অগ্নি ছাড়া আর কেউ লাভ করার যোগ্য নয়।

মহেশ্বর নিজে প্রার্থনা করেন নি, তাই গিরিরাজ নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলেন না। প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় এই ভয়ে ঈপ্সিত বিষয়েও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উদাসীন হয়ে থাকেন।

সুন্দরী পার্বতী পূর্বজন্মে এসেছিলেন সতীরূপে। পিতা দক্ষের ক্রোধে যেদিন তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন সেইদিন থেকে সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আর ভার্যা গ্রহণ করেন নি।

তপস্যার জন্য হিমালয়েরই কোনো নিভৃত সানুদেশে চর্মপরিহিত সেই পশুপতি শিব বাস করছেন ; সেখানে দেবদারু বন গঙ্গার প্রবাহধারায় অভিষিক্ত, মৃগনাভির সুগন্ধে আমোদিত আর কিন্নরের কণ্ঠসঙ্গীতে মুখরিত।

তাঁর অনুচরগণ শিলাজতু দ্বারা সুরভিত শিলাতলে উপবেশন করে থাকেন—তাঁদের কর্ণে নমেরু পুষ্পের অলংকার, পরিধানে সুখস্পর্শ ভূর্জপত্রের বসন এবং দেহ সুগন্ধি গৈরিকচূর্ণে বিলিপ্ত।

তাঁর বৃষ সদর্পে যখন খুরের অগ্রভাগ দিয়ে তুষারশিখা খনন করতে থাকে তখন গবয়জাতীয় পশুরা সভয়ে তার দিকে কোনো প্রকারে চেয়ে থাকে। বৃষ সিংহধ্বনি সহ্য করতে না পেরেই যেন উচ্চকণ্ঠে গর্জন করতে থাকে।

তপস্যার ফলের যিনি নিজেই বিধাতা সেই অষ্টমূর্তি শিব অরণির সাহায্যে নিজেরই অন্য মূর্তি অগ্নি স্থাপন করে কোনো এক কামনায় তপস্যায় রত।

গিরিরাজ হিমালয় দেবগণের পূজ্য। তিনি পরমপূজ্য শিবকে অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা করবার জন্য তাঁর সংযতা কন্যাকে আদেশ করলেন, তিনি সখীর সঙ্গে গিয়ে তাঁর আরাধনা করবেন।

সমাধির প্রতিকূল হলেও শিব পার্বতীকে শুশ্রূষার অনুমতি দিলেন, কারণ, বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও যাঁদের হৃদয় বিকৃত হয় না তাঁরাই তো প্রকৃত ধীর।

সুকেশী পার্বতী পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতেন, আসনবেদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন, পূজা ও অভিষেকের জন্য ফুল তুলে কুশ সংগ্রহ করে আনতেন। শিবের ললাটস্থ চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে নিজের ক্লান্তি দূর করতেন। এই ভাবেই পার্বতী শিবের সেবা করতে লাগলেন।

॥ 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে 'উমার জন্ম' নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় সর্গ

সেই সময়ে তারকাসুর বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন দেবগণকে; দেবগণ ইন্দ্রকে পুরোভাগে রেখে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হলেন।

ম্লানমুখ দেবগণের সামনে ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন; যে সরোবরে পদ্ম এখনও ফোটে নি সেই সরোবরের সামনে কিরণমালী সূর্যের মতো এই আবির্ভাব!

ব্রহ্মা চতুর্মুখ বাক-পতি এবং সর্বস্রষ্টা। দেবগণ তাঁকে প্রণাম করে সার্থক বাক্যের দ্বারা তাঁর বন্দনায় প্রবৃত্ত হলেন।

সৃষ্টির আগে তুমি কেবল আত্মরূপে বিরাজিত ছিলে; পরে সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিনটি গুণের বিভাগ করে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র) এই তিন মূর্তি ধারণ করলে; হে ত্রিমূর্তিধারী, তোমাকে নমস্কার!

তুমি জন্মরহিত! তোমারই সৃষ্ট কারণসলিলে তুমি যে অব্যর্থ বীজ নিক্ষেপ করেছিলে, সেই বীজ থেকেই হয়েছে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি! সুতরাং তুমিই বিশ্ব-সৃষ্টির মূল বলে কীর্তিত।

একমাত্র তুমি ত্রিবিধ অবস্থায় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে) আপনার মহিমা ব্যক্ত করে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হয়েছ।

সৃষ্টিকামনায় তুমিই তোমাকে স্ত্রী এবং পুরুষরূপে বিভক্ত করেছ; সেই বিভক্ত অংশদ্বয় উৎপন্ন এই সৃষ্টির মাতা ও পিতৃস্থানীয়।

তোমার কালের পরিমাণ অনুযায়ী তুমিই তোমার দিনরাত্রির ভাগ করেছ; সেই ভাগ অনুযায়ী তোমার যখন নিদ্রাবস্থা, জগতে তখন প্রলয়—তোমার যখন জাগরণ তখনই জগৎ ক্রিয়াশীল।

তুমি সৃষ্টির কারণ কিন্তু তোমার কোনো কারণ নেই; তুমি জগতের সংহারকর্তা কিন্তু তোমার সংহারক কেউ নেই; তুমি জগতের আদি কিন্তু তুমি নিজে আদিরহিত; তুমি জগতের প্রভু, কিন্তু তোমার প্রভু কেউ নেই!

তুমি নিজের দ্বারাই তোমার স্বরূপ জানো ; তুমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে থাকো ; আবার প্রলয়কালে নিজের সৃষ্টি নিয়ে নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাও।

তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থ, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) স্থূল বস্তু, (ইন্দ্রিয়াতীত) সূক্ষ্ম বস্তু, লঘু ও গুরু পদার্থ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই তুমি। অসীম তোমার বিভূতি।

যে বাক্যের সূচনায় ওঙ্কার, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরযোগে যে বাক্যের উচ্চারণ করতে হয়, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য কর্মযজ্ঞ এবং ফল স্বর্গ, তুমিই সেই বেদবাক্যের রচয়িতা।

তত্ত্বদর্শিগণ বলে থাকেন, তুমিই পুরুষার্থপ্রবর্তিনী প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ—আবার তুমিই সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা উদাসীন পুরুষ।

তুমি পিতৃগণের পিতা, দেবগণেরও তুমি দেবতা। তুমি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (দক্ষ প্রভৃতি) সৃষ্টিকর্তাদেরও তুমিই স্রষ্টা।

তুমি হবনীয়, তুমিই হবনকর্তা, তুমি ভোজ্য, তুমিই ভোক্তা ; তুমি জ্ঞেয়, তুমিই জ্ঞাতা ; তুমিই একমাত্র ধ্যেয়, আবার ধ্যানকর্তাও তুমিই।

দেবতাদের এই সঙ্গত ও সুন্দর স্তব শুনে প্রসাদাভিমুখী হলেন ব্রহ্মা। তিনি দেবতাদের কাছে বলতে লাগলেন—

আদিকবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় থেকে উচ্চারিত হয়ে বাগ্‌দেবতার চতুর্বিধ অবয়ব ধারণ যেন সার্থক হল।

হে অমিত বলশালী দেবগণ ! তোমরা আপন প্রভাবে স্বাধিকার রক্ষা করছ। আজানুলম্বিত বাহুবলে তোমরা বলীয়ান। তোমরা সকলে আজ একসঙ্গে এখানে উপস্থিত। তোমাদের অভ্যর্থনা জানাই।

হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের মতো তোমাদের মুখগুলির পূর্বের শোভা আর নেই। এর কারণ কি ?

বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের এই বজ্রের দীপ্তি যেন নির্বাপিত, তার শোভা আজ মলিন !

বরুণের শাপ শত্রুগণের পক্ষে দুঃসহ ; মন্ত্রের প্রভাবে শক্তিহীন সর্পের মতো আজ তাঁর দৈন্যদশা।

গদাহীন কুবের-হস্ত ভগ্নশাখ বৃক্ষের মতো ; তাঁর বাহু যেন তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথাই ব্যক্ত করছে।

যমদণ্ডের জ্যোতি অস্তমিত ! যে দণ্ড দিয়ে ভূমিতে রেখাপাত করেন যম সেই অমোঘদণ্ডকে অগ্নিহীন অঙ্গারের ন্যায় ব্যবহার করছেন।

প্রতাপের ক্ষতি হয়েছে তাই দ্বাদশ আদিত্যও আজ শীতল ! তারা যেন চিত্রে অঙ্কিত—সকলের পক্ষেই দর্শনীয়। কিরূপে এমন সম্ভব হল ?

(ঊনপঞ্চাশ) বায়ুর অস্থির সঞ্চালনে মনে হয় কে যেন বায়ুবেগ রুদ্ধ করেছে—যেমন জনস্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হলে বুঝা যায় কোথাও তার গতিরোধ হয়েছে।

(একাদশ) রুদ্রদেবতাগণেরও শিরঃস্থিত জটা বিপর্যস্ত—চন্দ্রলেখা বিলম্বিত, মনে হয় হুঙ্কারের শক্তিও লুপ্ত হয়েছে।

প্রথম থেকেই তোমরা স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে। (শাস্ত্রে) যেমন বিশেষ বিধি সামান্য বিধিকে অধিকারচ্যুত করে, তেমনি অন্য কোনো অধিকতর বলশালী শত্রু কি তোমাদের অধিকারচ্যুত করেছে ?

সেই জন্য, হে বৎসগণ ! বল—এখানে উপস্থিত হয়ে আমার কাছে তোমরা কি প্রার্থনা করতে চাও ? লোকসৃষ্টি আমার কাজ, সৃষ্টিরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের।

তখন ইন্দ্র (উত্তর দানের জন্য) মৃদু সমীরণে কম্পিত পদ্মসরোবরের শোভাসম্পন্ন তাঁর সহস্র নয়নে দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইঙ্গিত করলেন।

ইন্দ্রের সহস্র-নয়ন অপেক্ষাও সুদক্ষ, ইন্দ্রের চক্ষুস্বরূপ দুই চক্ষুবিশিষ্ট বৃহস্পতি যুক্তকরে কমলাসন ব্রহ্মাকে বলতে লাগলেন—

ভগবন্, আপনি যা বলেছেন তা সবই সত্য ! শত্রুকর্তৃক আমাদের অধিকার বিপর্যস্ত হয়েছে। হে প্রভো ! আপনি প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজিত—সুতরাং আপনি জানবেন না কেন ?

তারক নামে এক মহাসুর আপনার বরলাভে উদ্ধত হয়ে উঠেছে। সে ধূমকেতুরূপে আবির্ভূত হয়েছে জগতের উপদ্রবের কারণ রূপে।

কেবলমাত্র যতটুকু কিরণে দীঘির পদ্ম বিকশিত হতে পারে, সূর্য তার পুরীতে ততটকু তাপ বিকিরণ করেন (পাছে তাপ বেশী হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি কম্পিত !)।

তাকে সকল কলায় পূর্ণ হয়ে সেবা করেন চন্দ্রদেব। শুধু শিবের চূড়ায় স্থিত চন্দ্রলেখাটুকু তিনি আর গ্রহণ করেন না।

কুসুম অপহরণের আশংকায় তার উদ্যানে পবনের গতি নেই, তারকের পাশে থেকে তিনি তালবৃন্তের অধিক বায়ু বিতরণ করেন না।

ঋতুগুলি পর্যায়ক্রমে সেবা করার রীতি ত্যাগ করে তারা একই সময়ে নানা ঋতুর পুষ্পোপহার দিয়ে উদ্যানপালকের ন্যায় তার সেবা করে থাকে।

জলাধিপতি সমুদ্র তাকে উপহার দেবার যোগ্য রত্নগুলি জলের মধ্যে পরিস্ফুট হওয়া পর্যন্ত বহু যত্নে প্রতীক্ষা করে থাকেন।

বাসুকি প্রভৃতি সর্পের মস্তকে প্রজ্বলিত মণির শিখা ; তারা নিশ্চল শিখাযুক্ত প্রদীপের ধর্ম গ্রহণ করে তার সেবা করে থাকে।

ইন্দ্রও তার অনুগ্রহপ্রার্থী, তিনি সর্বদাই দূতের হাতে কল্পতরুর ফুলের অলংকার পাঠিয়ে তাকে প্রসন্ন করেন।

এইভাবে আরাধিত হয়েও সে ত্রিভুবনকে পীড়িত করে। প্রতিবাদে অপকার করলেই দুর্জন শান্ত হয়—উপকার করে তাকে শান্ত করা যায় না।

সুরবধূগণ যে সব নন্দনতরুর পল্লব অতি সন্তর্পণে তুলতেন—সেইসব তরু এই অসুরের কাছ থেকেই জেনেছে 'ছেদন' ও 'পাতন' কাকে বলে।

সে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নিঃশ্বাসে যতটুকু বাতাস, ততটুকু বাতাস যাতে হয়, সেইভাবে সুরকামিনীগণ চামরের সাহায্যে তাকে বীজন করে থাকেন ; তারা বন্দিনী, তাদের অশ্রু চামরে সঞ্চিত হয়, বীজনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জলকণা ঝরতে থাকে।

সূর্যাশ্বের খুরের আঘাতে যে মেরুর শৃঙ্গ মহিমান্বিত সে তা বাহুবলে উৎপাটন করে এনে নিজের গৃহে বিহারশৈল নির্মাণ করেছে।

এখন মন্দাকিনীর জল সামান্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। সে জল দিগ্‌গজগণের মদবারিতে কলুষিত। সেখানে যে স্বর্ণপদ্ম ফুটে থাকত তাদের অবস্থান এখন তারই দীঘিতে।

স্বর্গবাসিগণ আর এখন মর্ত্যদর্শনের আনন্দ ভোগ করতে পারেন না, কেননা তাদের আকাশযানের পথ রুদ্ধ, কখন পথে সেই অসুরের আবির্ভাব ঘটে এই আশঙ্কায়।

যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের জন্য হবি সঞ্চিত রেখেছেন—সেই মায়াবী আমাদের দৃষ্টির সামনেই তা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের নিকট রত্নরূপ—এই অশ্ব যেন ইন্দ্রের চিরকালার্জিত যশোরাশির প্রতিমূর্তি। এই অশ্বরাজকে সে অপহরণ করেছে।

সান্নিপাতিক বিকারে যেমন তেজষ্ক্রিয় ঔষধগুলি ব্যর্থ হয়ে যায় তেমনি সেই অসুর সম্পর্কে আমাদের সব ব্যবস্থাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জয়ের আশা ছিল সুদর্শন চক্রে। কিন্তু সেই চক্র তার কণ্ঠে নিক্ষিপ্ত হবার পর যে শিখা উদ্গত হল তা তার কণ্ঠে মণিহারের মতোই শোভিত হল।

তার যে সব হস্তী ইন্দ্রের ঐরাবতকেও পরাজিত করেছে তারা এখন পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি মেঘপুঞ্জে দন্তাঘাত অভ্যাস করছে।

হে বিভো, মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যেমন সংসারের কর্মবন্ধন ছিন্ন করবার জন্য ধর্ম আশ্রয় করেন, আমরাও তেমনই সেই অসুরকে শান্ত করবার জন্য একজন সেনাপতি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করি।

এই সেনাপতি হবেন দেবসৈন্যের রক্ষক, একে সামনে রেখে ইন্দ্র জয়লক্ষ্মীতে বন্দিনী রমণীর ন্যায় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে আনবেন।

তাঁর (বৃহস্পতির) বাক্য শেষ হলে ব্রহ্মা বলতে লাগলেন ; তাঁর সে ভাষণ গর্জনের পর বৃষ্টির মতোই মনোহর—

কিছু সময় প্রতীক্ষা কর—তোমাদের এই কামনা পূর্ণ হবে। এর সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি বিষয়ে আমি নিজে কিছু করব না।

আমার কাছ থেকেই সম্পদ লাভ করেছে যে দৈত্য, আমার হাতেই তার ক্ষয় হতে পারে না। বিষবৃক্ষকেও বর্ধিত করে পরে নিজের হাতে তা ছেদন করা অনুচিত।

পূর্বে সে (তারকাসুর) এই প্রার্থনাই আমার কাছে করেছিল, আমিও তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ত্রিভুবন দহনে সমর্থ তার তপস্যার তেজকে আমি বরদানে প্রশমিত করেছিলাম।

যুদ্ধে উদ্যত সমরকুশল সেই দৈত্যকে একমাত্র মহেশ্বরের নিক্ষিপ্ত বীর্যাংশ ছাড়া আর কে সহ্য করতে পারবে ?

সেই দেবতা তমোগুণের অতীতলোকে পরম জ্যোতিরূপে অবস্থান করছেন। তাঁর প্রভাব ও ঐশ্বর্য আমি বা বিষ্ণু কেউ নির্ণয় করতে পারছি না।

তোমরা শম্ভুর সংযমশান্ত মনকে উমার সৌন্দর্যের দ্বারা আকর্ষণ করতে চেষ্টা কর—অয়স্কান্ত মণির দ্বারা লৌহকে যেমন আকর্ষণ করা যায় ঠিক তেমনি।

মহেশ্বর এবং আমার—এই দুইজনের নিষিক্ত বীর্য যথাক্রমে উমা এবং শিবেরই অন্যতম মূর্তি জল ধারণ করতে সমর্থ।

সেই নীলকণ্ঠের আত্মজ পুত্র তোমাদের সেনাপতিত্ব লাভ করে শক্তি প্রভাবে বন্দিনী সুরাঙ্গনাদের বেণী মোচন করবেন।

জগৎকারণ ব্রহ্মা দেবগণকে এই উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন—দেবগণও মনে মনে কর্তব্য স্থির করে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

মহেশ্বরের হৃদয়াকর্ষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কন্দর্পকেই স্থির করে কার্যসিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ গতিতে তাঁকে স্মরণ করলেন।

তারপর কন্দর্প সখা বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে এসে যুক্তকরে ইন্দ্রের বন্দনা করলেন। রতির বলয়চিহ্নিত কন্দর্পের কণ্ঠে সুন্দর ধনু—এ-ধনু লাবণ্যময়ী রমণীর রমণীয় ভ্রূলতার তুল্য! বসন্তের হাতে আম্রমুকুল—কন্দর্পের অন্যতম অস্ত্র।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার' নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় সর্গ

দেবগণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রের সহস্র নয়ন একই সঙ্গে মদনের উপর নিবন্ধ হল। প্রায়ই প্রয়োজন অনুযায়ী অনুজীবীদের উপর প্রভুদের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'এইখানে উপবেশন কর'—এই কথা বলে ইন্দ্র মদনকে সিংহাসনের নিকটে স্থান ছেড়ে দিলেন। প্রভুর অনুগ্রহকে আনতমস্তকে অভিনন্দিত করে মদন তাঁকে নিভৃতে এই কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

পুরুষদের বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন ; ত্রিভুবনে কোথায় কি আপনার জন্য করণীয় তা আমাকে আদেশ করুন। আপনার স্মরণেই আমার প্রতি যে অনুগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে, আপনার আদেশ পালনের দ্বারা তা গৌরবান্বিত হোক—এই আমার প্রার্থনা।

আপনার পদাকাঙ্ক্ষী কে অত্যন্ত দীর্ঘ তপস্যায় রত হয়ে আপনার ঈর্ষার পাত্র হয়েছে? আমি এক্ষুনি আমার ধনুতে বাণ আরোপ করে তাকে সেই ধনুর আজ্ঞাধীন করব।

আপনার সম্মতির বিরুদ্ধে কোন্ সে ব্যক্তি, যে পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মুক্তির পথ আশ্রয় করেছে? সুন্দরী রমণীর আকুঞ্চিত-ভ্রূ-নিপুণ কটাক্ষে সে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাক।

কে আপনার শত্রু, বলুন—স্বয়ং শুক্রাচার্য তাকে নীতিশাস্ত্রে দীক্ষিত করে থাকলেও আমি অনুরাগরূপ চর পাঠিয়ে তার ধর্ম ও অর্থ নাশ করব—বারিপ্রবাহ যেমন নদীর দুই তীরকেই চূর্ণ করে ঠিক তেমনি।

কোন্ পতিব্রতা নারী তার সৌন্দর্যে আপনার মন মুগ্ধ করেছে? সে লজ্জা ত্যাগ করে বাহুপাশে আপনার কণ্ঠ স্বয়ং আবদ্ধ করুক—এই কি আপনি চান?

হে কামিন, সুরতব্যাপারে ত্রুটিহেতু পদানত হয়েও আপনি গোপনস্বভাবা কোন্ রমণী কর্তৃক অনাদৃত হয়েছেন? গভীর অনুতাপে তার শরীরকে জর্জর করে তাকে পল্লব শয্যায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করব।

হে বীর, প্রসন্ন হোন! আপনার বজ্র বিশ্রাম লাভ করুক। দেবতাদের এমন কোন্ শত্রু আছে যে আমার শরের আঘাতে বাহুবীর্য ব্যর্থ হওয়ায় সুন্দরীদের রোষকম্পিত অধরের দিকে চেয়েও ভীত না হবে?

আমি পুষ্পধনু, তবু একমাত্র বসন্তকে সহচর রূপে লাভ করলে আপনার অনুগ্রহে পিনাকপাণি শিবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারি—অন্য ধনুর্ধর আমার কাছে কিছুই নয়।

তখন ইন্দ্র ঊরু থেকে একটি চরণ নামিয়ে পাদপীঠে রাখলেন, মনে হল পাদপীঠ নূতন গৌরবে ভূষিত হয়েছে। ঈপ্সিত বিষয়ে (হরচিত্তাকর্ষণরূপ ব্যাপারে) মদন নিজের শক্তির কথা বলায় তিনি কামদেবকে এই কথা বললেন—

সখে, তুমি যা বলেছ, তা সব তোমাতেই সম্ভব ; আমার দুইটি অস্ত্র—আমার বজ্র এবং তুমি। তপোবীর্য-মহিমার ক্ষেত্রে বজ্র ব্যর্থ, কিন্তু সর্বত্র তোমার গতিবিধি এবং কার্যসাধনে তুমি সমর্থ !

তোমার সামর্থ্য আমি জানি। সেই জন্য তোমাকে নিজের মতো মনে করে একটি গুরুতর কাজে নিযুক্ত করব। অনন্তনাগ পৃথিবী ধারণ করতে সমর্থ জেনেই বিষ্ণু তাকে দেহ ধারণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

বৃষধ্বজ মহেশ্বরকেও তুমি শরক্ষেপে চঞ্চল করে তুলতে পারো এই উক্তিতেই তুমি আমার কাজের ভার এক রকম স্বীকার করে নিয়েছ। এখন যে যজ্ঞভাগী দেবগণ আজ এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন তাদের এই অভিপ্রায় শ্রবণ কর।

এই দেবগণ শিববীর্য থেকে জাত একজন সেনাপতি কামনা করেন। কিন্তু এখন মন্ত্র জপে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত পরমাত্মায় লীন শিবের পতন তোমার একটি শরনিক্ষেপেই ঘটানো যেতে পারে।

হিমালয়ের সংযতচরিত্রা কন্যাকে যাতে স্থিতধী মহেশ্বরের পছন্দ হয় তার জন্য চেষ্টা কর। ব্রহ্মা বলেছেন রমণীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই (পার্বতী) তাঁর (মহেশ্বরের) নিষিক্ত বীর্য ধারণে সমর্থ।

আমি অপ্সরাদের মুখ থেকে শুনেছি হিমালয়ের নির্দেশে পার্বতী পর্বতের সানুদেশে তপস্যামগ্ন রুদ্রের সেবা করতে গিয়েছেন। তারা আমারই গুপ্তচর।

সুতরাং কার্যসিদ্ধির জন্য যাত্রা কর, দেবকার্য সম্পন্ন কর। এই প্রয়োজন সিদ্ধি অন্য কারণের উপর নির্ভর করছে ! বীজ অঙ্কুরিত হবার আগে যেমন জলের অপেক্ষা করে—তেমনি এখানেও কার্যসিদ্ধির জন্য তোমার মতো উত্তম কারণের প্রয়োজন।

দেবগণের বিজয়লাভের মূলে রয়েছেন মহেশ্বর ; এই মহেশ্বরকে জয় করবার জন্য তোমার অস্ত্রই প্রযুক্ত হবে—তুমিই কৃতী। তবু সামান্য হলেও কোনো অনন্যসাধারণ কর্ম যদি কেউ সম্পন্ন করতে পারে সেটা তার যশের হেতু।

এই দেবগণ তোমার কৃপাপ্রার্থী ; কাজটিও ত্রিলোকের কল্যাণজনক আর সেই কাজ নিষ্পন্ন হবে তোমার পুষ্পধনুর সাহায্যে, তাতে হিংস্রতার কোনো অবকাশ নেই। তোমার এই বীরত্ব সত্যই স্পৃহণীয়।

হে মন্মথ ! ঋতুরাজ বসন্ত তোমার সহচর, না বললেও তিনি তোমার সহায় হবেন। 'আগুনের উৎসাহদাতা হও'—এই কথা বলে বায়ুকে কি কেউ অনুরোধ করে ?

'তাই হোক'—এই বলে দেবরাজের আদেশ আশীর্বাদী মালার মতো মাথায় নিয়ে প্রাণের বিনিময়েও কার্যসিদ্ধি করতে হবে—এই সংকল্প নিয়ে মদন হিমালয়ে মহেশ্বরের আশ্রমে প্রস্থান করলেন। প্রিয় বন্ধু বসন্ত এবং পত্নী রতি শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর অনুগমন করলেন।

বসন্ত কামদেবতার অভিমানস্বরূপ ; সে সেই বনে নিজেকে স্থাপন করে আত্মপ্রকাশ করল—সেই বসন্ত বনের সংযমী মুনিদের তপস্যা ও সমাধির অত্যন্ত প্রতিকূল।

তপোবনে অকাল-বসন্ত

সময় লঙ্ঘন করে সূর্য উত্তর দিকে যেতে প্রবৃত্ত হলেন। (পরিত্যক্ত) দক্ষিণ দিক তার দুঃখময় নিঃশ্বাসের মতো দক্ষিণ-সমীরণ প্রবাহিত করল।

অশোকতরু সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধ থেকে শুরু করে পল্লবসহ কুসুম প্রস্ফুটিত করল—সুন্দরীদের নূপুর মুখর পদাঘাতের জন্য অপেক্ষা করল না।

আম্রতরুতে নূতন উদ্গত পল্লবের সুন্দর পত্র আর কচি আম্রমুকুল! আম্রমুকুল তো মদনের বাণ—বসন্ত তা দেখে সেখানে ভ্রমরপঙক্তি নিবেশিত করল, যেন মদনের নামের অক্ষর।

বর্ণের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল কর্ণিকার কুসুম গন্ধহীন বলে মনকে পীড়িত করতে লাগল। গুণরাজির পূর্ণতা বিধানে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃতি প্রায়ই উদাসীন।

পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় নি বলে অপরিণত চাঁদের মতো রক্তবর্ণ পলাশের কোরকগুলি—দেখে মনে হল যেন বসন্তের সঙ্গে সমাগতা বনস্থলীর অঙ্গে সদ্যঃকৃত নখক্ষত! (বসন্ত নায়ক, বনস্থলী নায়িকা)

বসন্তের সৌন্দর্য লক্ষ্মী ভ্রমররূপ কাজল পরেছিলেন তাঁর চোখে, পুষ্পিত তিলক ফুল মুখে পত্রলেখা রচনা করেছেন, নবোদিত সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগের দ্বারা ওষ্ঠকে অলংকৃত করেছেন—সেই ওষ্ঠ আবার চূতমুকুলের মতো।

পিয়ালী মঞ্জরীর পরাগ এসে পড়ল মদমত্ত হরিণগুলির চোখে, তাতে তাদের দৃষ্টি বিঘ্নিত হল; তারা শুকনো পাতার মর্মরমুখর সেই বনে বায়ুর প্রতিকূলে ছুটোছুটি করতে লাগল।

বসন্তের আম্রমুকুলের আস্বাদনে মধুর-কণ্ঠ পুরুষ-কোকিল যে মধুর-কূজন করছিল তা মানিনী রমনীদের মানভঙ্গে সক্ষম যেন কামদেবতারই বচন!

শীতের অবসানে কিন্নর কামিনীদের শুভ্র ওষ্ঠযুক্ত ঈষৎ রক্তপীত বর্ণের মুখের পত্রলেখায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীগণ সেই অকাল বসন্তের আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন। তাঁরা বিশেষ চেষ্টায় হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া দমন করে মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করলেন।

ধনুতে পুষ্পবাণ আরোপিত করে রতিকে সঙ্গে নিয়ে মদন সেখানে উপস্থিত হলেন; তখন জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রী পুরুষ উৎকর্ষপ্রাপ্ত প্রণয়ভাব বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্ত করতে লাগল।

আপনার প্রিয়াকে অনুসরণ করে ভ্রমর একই পুষ্পপাত্রে মধু পান করতে লাগল; কৃষ্ণসার মৃগও শৃঙ্গের দ্বারা মৃগীকে কণ্ডূয়ন করতে লাগল। স্পর্শে মৃগীর চক্ষু আবেশে নিমীলিত হয়ে এল।

হস্তিনী প্রেমবশে পদ্মরাগে সুবাসিত জল গণ্ডূষ পরিমাণে হস্তীকে দিল; চক্রবাক অর্ধভুক্ত পদ্মের মৃণাল চক্রবাকীকে দিয়ে তাকে আদর করল।

গীতের শ্রমে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল কিন্নর কামিনীর মুখে, ফলে মুখের পত্রলেখা পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! পুষ্পরসের মদ্যপানে তাদের নয়ন ঈষৎ আবর্তিত হতে লাগল—একটি গীতের পর আর একটি গীতের মধ্যে কিন্নর তার প্রিয়ামুখ চুম্বন করল।

লতাগুলি প্রভূত পুষ্পস্তবকের ভারে আনত—নবোদ্গত পল্লব তাদের আরক্ত ও কম্পিত অধর! এই লতারূপিণী বন্ধুদের নিকট থেকে তরুগণ আনত শাখার বাহুবন্ধন লাভ করল।

এই সময়ে অপ্সরাদের গীতি শুনেও মহেশ্বর আত্মসন্ধানে মগ্ন রইলেন। কারণ,

যাঁরা নিজেই নিজের প্রভু, কোনো বিঘ্ন তাঁদের সমাধিভঙ্গ করতে পারে না।

এদিকে লতাগৃহের দ্বারে নন্দী বাম হস্তের মণিবন্ধ একটি স্বর্ণবেত্রের উপরে রেখে তর্জনী ওষ্ঠে লগ্ন করে জানালেন—'কোনো রূপ চপলতা কোরো না।'

তখন তরুরাজি নিষ্কম্প, ভ্রমরপঙক্তি নীরব, পক্ষিকুল মূক, পশুদের বিচরণ সংযমিত। তাঁর শাসনে সমস্ত বনভূমি অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে রইল।

কামদেব তার সখা বসন্তের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ঠিক যেমন লোকে যাত্রাকালে শুক্রাধিষ্ঠিত স্থান ত্যাগ করে তেমনি ভাবে মদন মহাদেবের ধ্যানস্থলে উপস্থিত হল—সেই স্থান ঘননিবন্ধ নমেরুশাখায় বেষ্টিত।

আসন্নমৃত্যু মদন দেবদারুতরুর নিচে বেদির উপরে ব্যাঘ্রচর্মে আসীন সংযমী ত্রিলোচনকে দেখতে পেল।

মদন দেখল—তিনি বীরাসনে উপবিষ্ট, তাঁর দেহের উত্তরভাগ নিশ্চল; সরল আয়ত এবং উন্নত তাঁর স্কন্ধদ্বয়; হস্তদ্বয় ক্রোড়ে ঊর্ধ্বমুখী থাকায় মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটি শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

তাঁর জটাপুঞ্জ ভূজঙ্গের দ্বারা উন্নত করে আবদ্ধ দুই কর্ণে দ্বিগুণীকৃত রুদ্রাক্ষমালা অলংকার রূপে শোভিত, গ্রন্থিযুক্ত যে কৃষ্ণ মৃগচর্ম তিনি পরিধান করে আছেন, তা তাঁর কণ্ঠনীলিমার আভায় গাঢ় নীলবর্ণে লিপ্ত।

তাঁর নয়নের তারা স্তিমিত ও নিশ্চল! অবশ্য তাতেই তাদের তীব্রতা কিছু ব্যক্ত হচ্ছিল; তাঁর ভ্রূতে কোনো বিক্রিয়ার প্রকাশ ছিল না। সেই স্পন্দনহীন স্থির রোমরাজিযুক্ত নেত্রদ্বয় নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকায়—তা থেকে নিম্নদিকে এক কিরণপ্রবাহ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল!

তিনি তখন দেহস্থ বায়ুসমূহকে নিরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বলে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন বৃষ্টিহীন মেঘ কিংবা তরঙ্গহীন সমুদ্র কিংবা বায়ুহীন স্থানে রক্ষিত নিষ্কম্প প্রদীপ!

তাঁর শিরোদেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে জ্যোতির শিখাপুঞ্জ ললাটস্থ নেত্রপথে বাইরে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল! সেই শিখা শিরঃস্থিত, মৃণালসূত্র অপেক্ষাও কোমল তাঁর শিরঃস্থিত চন্দ্রকলাকে যেন ঝলসে দিচ্ছিল।

তিনি (যোগবলে) নিজের মনকে নবদ্বার থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন। সমাধি দ্বারা বশযোগ্য সেই মনকে হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থাপন করে—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ যাকে অবিনাশী ও সনাতন বলে জানেন সেই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করছিলেন।

মনের দ্বারাও অপরাজেয় সেই ত্রিলোচনকে সেই অবস্থায় নিকট থেকে দেখে কন্দর্পের হস্ত ভয়ে অবশ হয়ে পড়ল এবং সেখান থেকে ধনু ও শর খসে পড়ল—তিনি তা লক্ষ্য করতে পারলেন না।

এই সময়ে অনুগামিনী দুই বনদেবীর সঙ্গে গিরিরাজকন্যা পার্বতীকে দেখা গেল; তাঁর দেহসৌন্দর্যে কন্দর্পের নির্বাপিতপ্রায় বীর্যবহ্নি পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

যে অশোক পদ্মরাগমণিকেও পরাজিত করেছিল, যে কর্ণিকার কুসুম স্বর্ণের দীপ্তি আকর্ষণ করেছিল, যে সিন্ধুবার মুক্তামালার স্থান পূর্ণ করেছিল, বসন্তকালীন সেই সকল কুসুমে ভূষিতা ছিলেন পার্বতী।

স্তনদ্বয়ের ভারে তিনি ছিলেন কিঞ্চিৎ আনতা, তরুণ অরুণরাগের ন্যায় আরক্ত বসন পরিধান করেছিলেন তিনি; তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল পর্যাপ্ত পুষ্পের ভারে ঈষৎ নতা পল্লবিনী একটি লতা চলে আসছে।

নিতম্ব থেকে খসে-পড়া বকুলমালার চন্দ্রহারটি তিনি বার বার হাত দিয়ে তুলে ধরছিলেন—ঐ চন্দ্রহার যেন পুষ্পধনুর দ্বিতীয় গুণ—বিন্যাসযোগ্য স্থান নির্বাচনের জ্ঞানে নিপুণ কন্দর্প দেবতা যে ঐ গুণ পার্বতীর কটিদেশে গচ্ছিত রেখেছেন।

তাঁর সুরভিনিঃশ্বাসে তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি ভ্রমর তাঁর বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম অধরের সম্মুখে বিচরণ করছিল; প্রতি মুহূর্তে ভীত ও চঞ্চল দৃষ্টিতে তিনি হস্তস্থিত লীলা-পদ্মের দ্বারা তাকে বারণ করছিলেন।

যাকে দেখলে রতিও (সুন্দরী মদনপত্নী) লজ্জিতা হন—এরূপ সকল অঙ্গে দোষশূন্যা পার্বতী; তাকে বিশেষভাবে দেখে পুষ্পধনু জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বর সম্পর্কে নিজের কার্যসিদ্ধি বিষয়ে আশান্বিত হলেন।

উমা তাঁর ভাবী পতির ধ্যান-ভূমির দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে শম্ভুও হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মসংজ্ঞক শ্রেষ্ঠ জ্যোতি দর্শন করে ধ্যান থেকে বিরত হলেন।

ধ্যানবিরত মহেশ্বর প্রাণায়ামধৃত বায়ু, ধীরে ধীরে ত্যাগ করে বীরাসন শিথিল করে দিলেন; পূর্বের ন্যায় তিনি ভারযুক্ত হলেন—বাসুকি ফণাগ্রভাগে কোনো প্রকারে সেই ভূভাগ ঊর্ধ্বে স্থাপন করলেন।

তখন নন্দী তাঁকে প্রণাম করে জানালেন—হিমালয়-কন্যা সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মহেশ্বর ভ্রূক্ষেপের দ্বারা প্রবেশের অনুমতি দিলেন—পার্বতীও নন্দীর সাহায্যে ধ্যানগৃহে প্রবেশ করলেন।

তাঁর সখী দুজন প্রণাম করে নিজের হাতে তোলা বসন্তের ফুল ও পল্লব মহেশ্বরের পায়ে অঞ্জলি দিলেন।

উমাও মস্তক আনত করে বৃষভধ্বজ মহেশ্বরকে প্রণাম করলেন; তখন তাঁর ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যস্থিত শোভাময় নবীন কর্ণিকার কুসুম শিথিল হয়ে খসে পড়ল এবং তাঁর কর্ণের অলংকারস্বরূপ নবপল্লব ভ্রষ্ট হল।

প্রণতা উমাকে মহেশ্বর বললেন—এমন পতি লাভ কর যিনি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত নন। এই আশীর্বাদ সার্থক হয়েছিল; কেননা, ঈশ্বরের কোনো উক্তি কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

কন্দর্পও শরনিক্ষেপের উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন; পতঙ্গের মতো অগ্নিমুখে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়েই যেন তিনি উমার সম্মুখে মহেশ্বরের দিকে লক্ষ্য ঠিক রেখে ধনুকের গুণ বার বার স্পর্শ করতে লাগলেন।

তারপর পার্বতী সূর্যকিরণে বিশেষভাবে শুকিয়ে নেওয়া মন্দাকিনীর পদ্মবীজের মালা তাঁর রক্তাভ করে তুলে নিয়ে শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন।

ত্রিলোচন ভক্তের প্রতি বাৎসল্যহেতু সে মালা গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। সেই মুহূর্তে পুষ্পধন্বা মদনও ধনুতে বাণ যোজনা করলেন—সে বাণ অব্যর্থ—নাম সম্মোহন।

চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভকালে সমুদ্রের মতো মহেশ্বরের ধৈর্যও ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল! সেই ত্রিলোচন বিম্বফলতুল্য ওষ্ঠ ও অধরযুক্ত উমার মুখে তিনটি নয়নই নিবদ্ধ করলেন।

নববিকশিত বালকদম্ব তুল্য অঙ্গে ভাববিশেষ প্রকাশ করে পার্বতী লজ্জাবিভ্রান্ত সুন্দরতম নয়নে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়; তিনি সবলে চিত্তের এই বিক্ষোভ দমন করলেন, তারপর নিজের চিত্তের এই বিকৃতির কারণ সন্ধানের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

তখন শরনিক্ষেপে উদ্যত অবস্থায় মদনকে তিনি দেখতে পেলেন—দক্ষিণ নেত্রপ্রান্তে

তাঁর দৃষ্টি নিবিষ্ট স্কন্ধদেশ নত হয়ে পড়েছে, বামপদ ঈষৎ কুঞ্চিত, সুন্দর ধনু তাঁর হস্তে চক্রাকারে ধৃত।

তপস্যায় বাধাসৃষ্টির জন্য তাঁর ক্রোধ বর্ধিত হয়েছিল—তাঁর ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছিল অসম্ভব! সেই ত্রিলোচনের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন থেকে সহসা প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নি স্ফুরিত হল।

তখন আকাশে দেবতাদের এই আর্তধ্বনি জেগে উঠল—'হে প্রভো, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন!' কিন্তু তারই মধ্যে সেই রুদ্রনেত্রজাত বহ্নি ভস্মীভূত করে ফেলল মদনকে।

তীব্র দুঃখজাত মূর্ছার ফলে রতি স্বামীর বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলেন না। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধকারী মূর্ছা স্বামীর বিপদ সম্পর্কে জানতে না দিয়ে রতির উপকারই করল।

অকস্মাৎ পতিত, দ্রুতগতি বজ্র যেমন বনস্পতিকে ভগ্ন করে অদৃশ্য হয়, ঠিক তেমনি তপস্বী ভূতপতি রুদ্র তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ মদনকে ধ্বংস করে, নারীসান্নিধ্য ত্যাগে ইচ্ছুক হয়ে প্রমথগণের সঙ্গে অদৃশ্য হলেন।

উন্নতশির পিতার অভিলাষ এবং সেইসঙ্গে নিজের দেহের সুকুমার সৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে গেল—আবার এই ব্যর্থতাও সখীদের সমক্ষে! এইজন্য অধিকতর লজ্জিতা পার্বতী শূন্যহৃদয়ে কোনোপ্রকারে গৃহের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দন্তলগ্ন মৃণালিনীকে নিয়ে দেবহস্তী যেমন ছুটে যায় তেমনি হিমালয় বাহু বাড়িয়ে তুলে নিলেন তাঁর কন্যাকে—তাঁর কন্যা উমা তখন রুদ্ররোষভীতা, নিমীলিত নয়না, অনুকম্পার পাত্রী। তিনি দীর্ঘপদক্ষেপে নিজের পথ অনুসরণ করলেন।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'মদনভস্ম' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ সর্গ

তারপর মোহাচ্ছন্না বিবশা কামপ্রিয়া রতি অচেতন হয়ে পড়লেন; কিন্তু তিনি যাতে নববৈধব্যের অসহ্য যাতনা উপলব্ধি করেন তার জন্যই যেন বিধাতা তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন।

মূর্ছাবসানের পর নয়ন উন্মীলিত করে পতিকে দেখবার জন্য তৎপর হলেন, কিন্তু চিরদিন যাঁকে দেখেও তাঁর নয়ন অতৃপ্ত সেই প্রিয়জনের দর্শন যে চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে তা তিনি জানতে পারলেন না।

ওগো প্রাণেশ্বর! তুমি কি জীবিত আছ?—এই বলে রতি উঠলেন এবং তাঁর সম্মুখে পুরুষের আকার হর-কোপানলজনিত ভস্মের স্তূপ (অর্থাৎ ভস্মময় পুরুষ) দেখতে পেলেন।

তারপর পুনরায় বিহ্বল হয়ে তিনি ভূলুণ্ঠিত হলেন, তাঁর স্তনদ্বয় ধূলিজালে ধূসর হয়ে গেল, কেশপাশ ছড়িয়ে পড়ল। সেই বনস্থলীকে সমদুঃখভাগিনী করেই যেন রতি বিলাপ করতে লাগলেন।

তোমার যে দেহ কমনীয় সৌন্দর্যের জন্য বিলাসীদের উপমান স্থল—সেই দেহ

আজ এই দশায় পরিণত ! আমি দেখেও বিদীর্ণ হচ্ছি না ! স্ত্রীজাতি সত্যি কঠিন।

আমি আমার প্রাণের জন্য তোমার উপর নির্ভরশীল ; জলরাশি যখন সেতুভঙ্গ করে চলে যায় তখন তার মধ্যস্থিতা মৃণালিণীর যে অবস্থা হয়, আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে, দীর্ঘকালের প্রেম মুহূর্তে ত্যাগ করে তুমি কোথায় গেলে ?

তুমি কোনো দিন আমার কোনো অপ্রিয় কাজ কর নি। আমিও কোনো দিন তোমার বিরুদ্ধাচরণ করি নি ! তবে কেন অকারণে বিলাপপরায়ণা রতিকে তুমি দর্শন দিচ্ছ না !

হে কন্দর্প ! অন্যমনা হয়ে তুমি যখন আমার কাছে অন্য কোনো রমণীর নাম উচ্চারণ করে বসতে তখন আমি মেখলার বন্ধনে তোমাকে বেঁধে রাখতাম ! অথবা আমার কর্ণের অলঙ্কার কমলের দ্বারা তোমাকে তাড়না করতাম—কমলের পরাগে তোমার দৃষ্টি পীড়িত হত—এ সব কথা তুমি মনে করতে পারো কি ? (না, মনে আছে বলেই আমাকে ত্যাগ করলে ?)

তুমি আমার হৃদয়ে বাস করছ—এই রকম প্রিয়বাক্য কত শোনাতে তুমি ! আজ বুঝতে পারছি—সে-সব ছলনা ; তা না হলে তোমার দেহ বিনষ্ট হল, রতি অক্ষত রইল কেন ?

আজ তুমি পরলোকের নূতন প্রবাসী—আমিও তোমার অনুগমন করব ! কিন্তু বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করেছেন, কেননা দেহিগণের সুখ নিশ্চয় তোমারই অধীন।

রাত্রির তমসাচ্ছন্না নগরীর পথে পথে অভিসারিকা দলকে সংকেতস্থানে নিয়ে যেতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ ?

তোমার অভাবে রমণীদের বারুণীমদসেবনজনিত রক্তিম নয়নের ঘূর্ণয়ন এবং পদে পদে বাক্যস্খলন বিড়ম্বনা মাত্র ! (কামহীন হৃদয়ের মত্ততা দুঃখজনক)

তোমার প্রিয় বন্ধু চন্দ্র যখন জানবেন তোমার দেহ এখন শুধু কথার বিষয়, বাস্তবে আর নেই বলেই শুধু আলোচনার বিষয় তখন কৃষ্ণপক্ষ চলে গেলেও প্রতিদিন তার ক্ষীণতা অতি দুঃখেই ত্যাগ করবেন।

শ্যাম ও রক্তিম বর্ণে শোভিত, কোমল বৃন্তে মঞ্জরিত, মধুরকণ্ঠ কোকিলের দ্বারা সূচিত নবীন চূতমঞ্জরী এখন আর কার বাণ হবে বল !

বহুবার যে ভ্রমরপঙক্তি তোমার ধনুকের গুণরূপে নিয়োজিত হয়েছে আজ সেই ভ্রমরপঙক্তি তোমার অভাবে শোকাগ্রস্তা আমার সঙ্গে গুণ গুণ স্বরে কাঁদছে।

আবার সুন্দর দেহ নিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও আর কোকিলাকে দূতরূপে তোমার রতির কাছে পাঠিয়ে দাও—সে তো মধুর আলাপে স্বভাবতই নিপুণা।

ওগো কামদেব ! তুমি যে মাথা নত করে প্রণত হয়ে আমার সঙ্কল্প আলিঙ্গন প্রার্থনা করতে (নিভৃত সম্ভোগের) সেই কথা মনে করে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

হে রতিনিপুণ, তুমি নিজেই আমার বিভিন্ন অঙ্গে ঋতুজাত কুসুম দিয়ে যে প্রসাধন রচনা করেছিলে তা আমি ধারণ করে আছি, কিন্তু তোমার সেই সুন্দর দেহ তো দেখতে পাচ্ছি না।

আমার যে চরণের প্রসাধন অসমাপ্ত থাকতেই নিষ্ঠুর দেবগণ তোমাকে স্মরণ করেছিলেন—আমার সেই বামচরণ তুমি অলক্তকে রক্তিম করবে, এসো।

পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি অনুগমন করে তোমার অঙ্গে আশ্রয় নেব—হে প্রিয়, তা না হলে চতুর সুরকন্যাগণ স্বর্গে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

হে প্রিয়, যদিও আমি এখনও তোমার অনুগমন করছি তবু মদন বিহনে রতি যে একমুহূর্তও জীবিত ছিল, আমার এই অপবাদ চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

তুমি পরলোকগত ; তোমার দেহ শেষবারের মতো আমি কিভাবে অলঙ্কৃত করে সাজিয়ে দেব ? অতর্কিতভাবে তোমার দেহ ও প্রাণ একই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে।

তুমি পুষ্পধনু ক্রোড়ে রেখে, শরগুলি ঋজুভাবে স্থাপন করে বসন্তের সঙ্গে স্মিতমুখে যে সব কথা বলতে এবং বঙ্কিম নয়নে যে দৃষ্টিপাত করতে–সে-সব কথাই আজ আমি স্মরণ করছি।

পুষ্প দিয়ে যে তোমার ধনু সাজিয়ে দিত তোমার সেই প্রাণ-প্রিয় সখা বসন্ত কোথায় ? উগ্র ক্রোধসম্পন্ন মহেশ্বর কি বন্ধুর মতো তাকেও ভস্মসাৎ করেছে ?

রতির হাহাকার বিষদিগ্ধ শরের ন্যায় বসন্তকে আঘাত করল। ব্যাকুল রতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বসন্ত তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল।

তাকে দেখে রতি উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। তিনি বক্ষঃস্থলে আঘাত করতে লাগলেন–তাতে স্তনদ্বয় ক্লিষ্ট হল। স্বজনকে সম্মুখে দেখলে দুঃখের দ্বার যেন মুক্ত হয়ে যায়।

শোকার্তা রতি বসন্তকে এই কথা বললেন–বসন্ত ! তোমার বন্ধুর কি দশা হয়েছে দেখ, তার দেহের কপোতের মতো ধূসর ভস্ম বাতাস কণায় কণায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ওগো কন্দর্প, এখন দেখা দাও, এই বসন্ত তোমার জন্য ব্যাকুল ! প্রিয়ার উপর মানুষের প্রেম চঞ্চল হলেও বন্ধুর উপরে সেই প্রেম কখনও চঞ্চল হয় না।

তোমার ধনু মৃণাল সূত্রের গুণবিশিষ্ট এবং কোমল কুসুমের শরযুক্ত, কিন্তু দেবতা ও দানব সমন্বিত এই জগতকে সেই ধনুরই আজ্ঞাহীন করত এই পার্শ্ববর্তী বসন্ত।

বসন্ত, তোমার সেই বন্ধু বায়ুতাড়িত প্রদীপের মতো নিভে গেছে, আর সে ফিরে আসবে না। আমি এই দশাতেই রয়েছি, অসহ্য বিরহধূমে আচ্ছন্ন আমাকে দেখ।

ওগো বসন্ত, মদনবধের ব্যাপারে আমাকে বাদ দিয়ে বিধাতা অর্ধ-বধ করেছেন। হস্তী যদি অচল আশ্রয় ভেঙে দেয় তবে লতা তো আপনিই ভূমিসাৎ হবে।

এরপর তুমি একটি বন্ধুর কাজ কর। জ্বলন্ত অগ্নিতে আমাকে উৎসর্গ করে তুমি আমাকে পতির নিকটে নিয়ে যাও।

জ্যোৎস্না চাঁদের সঙ্গে অস্তমিত হয়, বিদ্যুৎ মেঘের সঙ্গেই অদৃশ্য হয়। নারী যে পতির অনুগামিনী অচেতন বস্তুই তো এই সত্য প্রমাণ করেছে।

ঐ রমণীয় প্রিয় দেহের ভস্ম দিয়েই আমি আমার বক্ষ রঞ্জিত করব, নবপল্লবশয্যার মতো সুখকর অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করব।

ওগো প্রিয়দর্শন, তুমি আমাদের পুষ্পশয্যা রচনায় বহুবার সাহায্য করেছ, আজ যুক্তকরে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্র আমার চিতাশয্যা রচনা করে দাও।

তারপর আমার চিতার আগুন দিয়ে তুমি তোমার মলয় সমীরণ সঞ্চারিত কর। তুমি তো জানোই কন্দর্পদেবতা আমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারবেন না।

এইভাবে সব কাজ শেষ করে তুমি আমাদের দুজনের জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ো–সে জলের অঞ্জলি তোমারই সখা পরলোকে আমার সঙ্গে একত্রে পান করবেন।

পারলৌকিক কাজের সময়ে তুমি কন্দর্পের উদ্দেশ্যে চঞ্চল নব পল্লবযুক্ত আম্রমুকুল উৎসর্গ কোরো–কেননা এই আম্রমুকুল ছিল তোমার সখার প্রিয়।

এইভাবে রতি যখন দেহত্যাগে সংকল্প করলেন তখন আকাশজাত এক অশরীরী বাণী

সদয়ভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করল। এই বাণী ছিল শুষ্ক সরোবরে অসহায় শফরীর (পুঁটিমাছ) কাছে প্রথম বারিবর্ষণের মতো।

হে কন্দর্পপত্নী! তোমার পতি দীর্ঘকালের জন্য তোমার নিকট দুর্লভ থাকবে না। যে কর্মের জন্য মদন হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছেন তা শ্রবণ কর।

একদা কন্দর্প প্রজাপতি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করেছিল—তিনি নিজের কন্যা সরস্বতীর প্রতি অনুরাগ অনুভব করেছিলেন। পরে ইন্দ্রিয়ের বিকার নিগৃহীত করে তিনি মদনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; তাই তাকে এই মারাত্মক কর্মফল ভোগ করতে হয়েছে।

যেদিন পার্বতীর তপস্যায় অনুকূল হয়ে মহেশ্বর তাঁকে বিবাহ করবেন, তখন মিলনের আনন্দ অনুভব করে তিনি মদনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

ধর্মরাজের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে ব্রহ্মা পূর্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে মদনশাপের সীমা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং হে সুন্দরি, তোমার এই দেহ রক্ষা কর, তোমার প্রিয়ের সঙ্গে মিলন অবশ্যই হবে। যে নদীর জল সূর্যতাপে শুকিয়েছে গ্রীষ্মের শেষে আবার সে প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়।

এইভাবে অন্তরালে কি যেন ঘটল যাতে রতির মৃত্যুসঙ্কল্প নিবৃত্ত হল। ঐ বাক্যে বিশ্বাসহেতু বসন্তও নানা বিধ কথা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

এরপর কামপত্নী বিপদের শেষদিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বিরহ দুঃখে তাঁর দেহ শীর্ণ হতে লাগল। দিনের বেলা কিরণের ক্ষয়ে চাঁদের ম্লান রেখা যেমন রাত্রির প্রতীক্ষা করে, তিনিও সেইরূপ পুনর্মিলনের আশায় প্রাণ ধারণ করে রইলেন।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'রতিবিলাপ' নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম সর্গ

পার্বতীর দৃষ্টির সম্মুখেই মদন ভস্মীভূত হলেন পিনাকীর রোষে; ভগ্ন-মনোরথ হয়ে পার্বতী মনে মনে নিজের রূপের নিন্দা করতে লাগলেন—কেননা, প্রিয়তমের অনুগ্রহেই তো রূপ সার্থকতা লাভ করে।

তিনি সমাধি আশ্রয় করে তপস্যার শক্তিতে সৌন্দর্যের সফলতা লাভ করবেন—এই সংকল্প করলেন। তা না হলে দুই-ই কি করে লাভ করা যায়—সেই প্রেম আর সেই পতি?

মহেশ্বরের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে কন্যা তপশ্চরণে উদ্যোগী হয়েছেন শুনে মাতা মেনকা তাঁকে বক্ষে আলিঙ্গন করে মুনিদের পালনীয় এই কঠিন ব্রত থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য বললেন।

বৎসে, বাঞ্ছিত দেবগণ গৃহেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। কঠিন তপস্যা কোথায় আর তোমার এই সুকুমার দেহ-ই বা কোথায়? কোমল শিরীষ ফুল ভ্রমরের পদভার সইতে পারে, কিন্তু কোনো পাখির ভার সইতে পারে না।

এইভাবে উপদেশ দিয়েও মেনকা স্থিরচিত্তা পার্বতীকে তপস্যার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত

করতে পারলেন না। ঈপ্সিত বস্তুতে স্থিরনিশ্চয় মন আর নিম্নাভিমুখী জলের ধারা—এদের কে ফেরাতে পারে?

স্থির-সংকল্পা পার্বতী একদিন সন্নিহিতা সহচরীর মুখে পিতাকে জানালেন—কেননা তিনি পার্বতীর মনোবাসনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তিনি জানালেন—যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয় ততদিন তপস্যার জন্য তিনি বনবাসিনী হবেন।

তারপর কন্যার যোগ্য অভিলাষে প্রসন্ন হয়ে জগৎপূজ্য পিতা তপস্যার অনুমতি দিলেন। পার্বতীও ময়ূরসেবিত পর্বতশিখরে প্রস্থান করলেন—পরে ঐ শিখর তাঁরই নামে 'গৌরীশিখর' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিল।

স্থির-সঙ্কল্পা পার্বতী তাঁর যে চঞ্চল হারলতা বক্ষের চন্দন লুপ্ত করে দিত—সেই হার খুলে ফেললেন—তার পরিবর্তে কণ্ঠে জড়ালেন নবোদিত সূর্যের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বল্কল। স্তনের উপরে আহত হয়ে হয়ে সেই বল্কলের ধারগুলি শীর্ণ হতে লাগল।

পূর্ব-প্রসিদ্ধ কেশপাশে তাঁর মুখ যেমন মধুর দেখাত, জটাজালেও সেইরূপই মধুর মনে হতে লাগল; কেবল ভ্রমরপঙক্তিতেই পদ্ম শোভা পায় না, শৈবালদলে জড়িত থাকলেও তাকে সুন্দর দেখায়।

ব্রতের জন্য তিনি তিন লহর মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করলেন। প্রথম বন্ধনে তাঁর নিতবদেশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করল এবং দেহ প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

যে হাতে তিনি অধর ও ওষ্ঠ বিভিন্ন রাগে রঞ্জিত করতেন এবং ক্রীড়াকালে রাগরঞ্জিত স্তনের উপর পড়ে কন্দুক রক্তিম হলে তিনি তাই নিয়ে খেলা করতেন সেই হাত এখন কুশাঙ্কুর সংগ্রহে ক্ষতবিক্ষত আর সকল সময়েই সেখানে অক্ষমালা বিরাজিত।

মহামূল্য শয্যায় একদিন যিনি শয়ন করতেন, কবরীচ্যুত পুষ্পের আঘাতেও যিনি বেদনা বোধ করতেন, আজ তিনি নিজের বাহুলতায় মস্তক রেখে যজ্ঞভূমিতেই শয়ন করেন কিংবা উপবিষ্ট থাকেন।

তপস্যার নিয়মে থাকার পর ফিরিয়ে নেবেন এই ভেবে তিনি দুজনের কাছে দুটি জিনিস গচ্ছিত রেখেছিলেন; কোমল লতার কাছে তাঁর বিলাসকলা, হরিণীদের কাছে তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি!

তিনি নিজেই অলসভাবে স্তনরূপ ঘটের জলসিঞ্চনে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলির পরিচর্যা করতেন—পরে কুমার কার্তিকেয় পর্যন্ত তাঁর পূর্বজাত এই বৃক্ষগুলির উপর পার্বতীর বাৎসল্য হ্রাস করতে পারেন নি।

অরণ্যজাত ধান্যাদি শষ্যের উপহারে লালিত হয়ে মৃগগুলি তাঁকে এত বিশ্বাস করত যে তিনি কৌতূহলবশতঃ তাদের চক্ষু আকর্ষণ করে সম্মুখস্থিত সখীদের চক্ষুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করতেন।

তিনি যখন স্নানের পর বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করতেন এবং স্তবপাঠ করতেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হতেন। ধর্মাচরণে যিনি প্রবীণ তার বয়স বিচার করা হয় না।

সেখানে পরস্পরবিরোধী প্রাণীগণ হিংসা ত্যাগ করল; তরুগণ বাঞ্ছিত ফলের দ্বারা অতিথিদের সেবা করত, নূতন নির্মিত পর্ণশালায় হোমাগ্নি সঞ্চিত থাকত—এর ফলে সেই তপোবন পবিত্র হয়ে উঠল।

যখন তিনি উপলব্ধি করলেন পূর্বের তপস্যা ও সমাধির দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ

করা যাবে না তখন তিনি নিজের দেহের কমনীয়তা তুচ্ছ করে কঠোরতর তপস্যা শুরু করলেন।

যিনি কন্দুক নিয়ে খেলতে গিয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তিনি মুনিগণের আচরিত সাধনায় মগ্ন হলেন। মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁর দেহ স্বর্ণপদ্মে নির্মিত; প্রকৃতির দিক দিয়ে মৃদু, সারাংশের দিক দিয়ে দৃঢ়।

পবিত্রা, হাস্যমুখী, সুন্দরী পার্বতী গ্রীষ্মকালে চারদিকে চারপ্রকারের অগ্নি জ্বেলে তাদের মধ্যে থেকে চোখঝলসানো জ্যোতিকে উপেক্ষা করে স্থিরদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতেন।

সেইভাবে সূর্যের তাপে অত্যন্ত তপ্ত হয়ে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ পদ্মের শোভা ধারণ করল; কেবল সেই মুখের আয়ত নয়নের প্রান্তে ক্রমে একটি শ্যাম রেখার আবির্ভাব ঘটল।

অযাচিত মেঘবারি এবং চন্দ্রকিরণ—এই ছিল তাঁর ব্রতান্তপারণ; বৃক্ষের মতোই অতিরিক্ত কোনো খাদ্যের উপকরণ পার্বতীরও ছিল না।

আকাশচারী আদিত্যরূপী অগ্নি এবং কাষ্ঠসমিদ্ধ বিবিধ অগ্নির তাপে অত্যন্ত তপ্ত হয়ে তিনি গ্রীষ্মের অবসানে নববর্ষার জলে সিক্ত হবার পর যেন ঊর্ধ্বগামী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—গ্রীষ্মের অবসানে তপ্ত পৃথিবী থেকেও একটি তাপের ভাব উপরের দিকে ওঠে।

বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তাঁর চক্ষুর রোমে কিছুকাল থেকে অধরে পড়ত—তাতে অধর আহত হত। তারপর সেই বিন্দুগুলি তাঁর স্তনের উপরে পড়েই একেবারে চূর্ণ হয়ে যেত—তারপর সেই চূর্ণ বিন্দুগুলি গড়িয়ে পড়ত পার্বতীর উদররেখায়—এইভাবে নাভিরন্ধ্রে পৌঁছুতে বিন্দুগুলির কিছু দেরী হত।

সেই গৌরীশিখরে অবিচ্ছিন্ন শীতল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা! তারই মধ্যে তিনি অনাবৃত শিলার উপরে শয়ন করে থাকতেন। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিত হত, মনে হত যেন তাঁর মহতী তপস্যার সাক্ষীরূপে আছেন যে অন্ধকার রজনী—তিনি তাঁকে বিদ্যুতের নয়নে লক্ষ্য করছেন।

শীতল বাতাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তুষারপাত! তার মধ্যে পৌষমাসের শীতের রাত্রি-গুলিতে তিনি জলে বসে তপস্যা করতেন। কিন্তু কোথায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাক-চক্রবাকী মিলিত হতে না পেরে ক্রন্দন করছে—তাদের জন্য তিনি করুণাবোধ করতেন।

দারুণ শীতে তাঁর পদ্মসুগন্ধি মুখের অধরপত্র কাঁপছে! জলাশয়ের যে পদ্মসম্পদ তুষার-বর্ষণে ক্ষুণ্ন হয়েছে—নিজের মুখের শোভা দিয়ে নিজেই তা পূরণ করে নিচ্ছেন।

স্বয়ংচ্যুত শীর্ণ পত্রের রসপান করে জীবনধারণ—তপস্যার চরম উৎকর্ষ; কিন্তু তাও তিনি ত্যাগ করলেন। এই কারণেই পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই প্রিয়ভাষিণী পার্বতীকে 'অপর্ণা' এই নামে অভিহিত করতেন।

এইরূপ ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের মৃণাল কোমল দেহলতাকে যখন দিনরাত্রি পীড়ন করতে লাগলেন তখন কঠিন সাধনায় তপস্বিগণ যে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তাকেও পার্বতীর তপস্যার কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

তারপর একদিন এক জটাধারী তপস্বী তপোবনে প্রবেশ করলেন—তাঁর পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে পলাশ দণ্ড; তিনি বাক্‌পটু, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত—দেখে মনে হয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মূর্ত বিগ্রহ।

অতিথি সৎকারপরায়ণা পার্বতী প্রভূত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অর্চনা করে অভ্যর্থনা জানালেন। কেননা, সাম্যের মধ্যে অবস্থান করলেও যাঁরা স্থিরচিত্ত তাঁরা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যর্থনা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই করে থাকেন।

উমা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী অতিথির সৎকার করলেন ; ব্রহ্মচারী সেই আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুকাল বিশ্রাম করলেন—তারপর সরলদৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে পূর্বাপর ক্রম অক্ষুণ্ণ রেখে বলতে লাগলেন—

তোমার হোমাদি ক্রিয়ার জন্য সমিৎ ও কুশ এখানে সহজলভ্য তো ? জল কি তোমার স্নানবিধির যোগ্য ? তুমি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তপস্যায় ব্রতী হয়েছ কি ? কেননা, ধর্মচর্যায় প্রথম কথাই হল দেহরক্ষা।

তোমার স্বহস্তের জলসেচনে এই যে লতাগুলিতে নূতন পল্লব উদ্গত হয়েছে তা কি অবিচ্ছিন্নভাবে এই রকমই হয় ? তুমি দীর্ঘকাল অধরে অলক্তক প্রয়োগ কর না, তবু সেই অধর এমন রক্তবর্ণ যে এর সঙ্গে নবোদ্গত পল্লবের উপমা দেওয়া যেতে পারে।

হে কমলনয়নে ! যে সকল হরিণ চঞ্চল নয়নের দ্বারা তোমার নয়নের সাদৃশ্য অনুকরণ করে এবং প্রণয়বশে তোমার হাতের কুশগুচ্ছ কেড়ে নেয়—সেই হরিণগুলির উপরে তোমার মন প্রসন্ন তো ?

হে পার্বতি ! সুন্দর রূপ কখনও পাপানুষ্ঠানে রত হতে পারে না—এ কথা যে বলা হয় তা সত্য। হে আয়তলোচনে ! তোমার এই চরিত্র তপস্বিগণেরও শিক্ষার-স্থল।

গঙ্গার পবিত্রধারা হিমালয়শীর্ষে প্রবাহিত, কুসুমরাশি সেই স্রোতে প্রবহমান—দেখে মনে হয়, স্বর্গ থেকে সপ্তর্ষিগণ মহেশ্বরের উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য দান করেছেন—জলের ধারায় ভেসে-যাওয়া পুষ্প যেন তাঁদের শুভ্র হাস্য। কিন্তু এই পুষ্পরাশির উপহারেও হিমালয় ততটা পবিত্র হন নি—যতটা সবংশে পবিত্র হয়েছেন তোমার চরিত্রে।

হে উদারহৃদয়ে ! ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে একমাত্র ধর্মকেই আমার সার বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু তুমি নিষ্কামহৃদয়ে একমাত্র তাকেই গ্রহণ করে সেবা করছ।

আমার প্রতি বিশেষ আতিথ্য প্রদর্শন করে এখন আর তুমি আমাকে পর বলে ভাবতে পারো না। হে সংকুচিতাঙ্গি ! মনীষিগণ বলেছেন, সাতটি কথাতেই সজ্জনের সঙ্গে প্রণয় জন্মে। (আমাদের মধ্যে সেই সংখ্যক কথা তো হয়েই গেছে)

তাপসি, তুমি ক্ষমাশীলা। এই ব্রাহ্মণকুলজাত চঞ্চল যুবক তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক—যদি গোপনীয় না হয়, দয়া করে উত্তর দাও।

আদি বিধাতা—হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম ; ত্রিলোকের সৌন্দর্য একত্র চয়ন করে তোমার দেহ নির্মিত ; কোনো ঐশ্বর্য সুখই অপ্রাপ্য নয়—সর্বোপরি এই নবীন বয়স ; বল, এর পর তপস্যার ফল আর কি থাকতে পারে ?

অসহনীয় দুঃখ থেকেই মনস্বিনীদের এইরূপ তপস্যায় প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। হে সুমধ্যমে ! আমি মনে মনে অনেক বিচার করে দেখলাম তোমার ক্ষেত্রে তো এইরকম দুঃখের কোনো সম্ভাবনা নেই।

অয়ি শুভ্রে ! তোমার যে আকৃতি তাতে শোকের তাপ লেগেছে বলে মনে হয় না। পিতৃগৃহে মর্যাদাহানি—তা-ই কেমন করে সম্ভব ? তোমার সঙ্গে কোনো দুর্বৃত্তের স্পর্শও সম্ভব নয় ; কেননা, ফণিনীর মণির লোভে কে হাত বাড়াবে ?

কোন্ কারণে তুমি যৌবনে অলংকার ত্যাগ করে বল্কল ধারণ করেছ—যা একমাত্র

বার্ধক্যেই শোভা পায় ? সন্ধ্যায় চন্দ্র-তারকায় শোভিতা রাত্রি যদি প্রভাত-সূর্যের ধ্যান করে তাহলে কি হয় বল !

যদি তুমি স্বর্গ প্রার্থনা করে থাক তাহলে এই পরিশ্রম ব্যর্থ, কেননা তোমার পিতৃ-গৃহই তো দেবভূমি। যদি পতির কামনা থাকে তাহলেও সমাধির কোনো প্রয়োজন নেই। রত্ন নিজে কারও সন্ধান করে না—রত্নকেই লোকে সন্ধান করে নেয়।

তোমার উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসেই সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মন আরও অধিক সংশয়ে ডুবে যাচ্ছে। তোমার প্রার্থনীয় কাকেও দেখা যাচ্ছে না, তুমি যা প্রার্থনা করছ তা কি দুর্লভ হবে ?

তোমার প্রার্থিত সেই যুবার হৃদয় নিশ্চয়ই কঠিন ; দীর্ঘকাল তোমার কানে কোনো পদ্মের অলঙ্কার নেই–সেই অলঙ্কারশূন্য গণ্ডস্থলে শালিধান্যের অগ্রভাগের ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ জটা বিলম্বিত ! এ সব দেখেও সে তোমাকে উপেক্ষা করছে !

মুনিজনের অনুষ্ঠেয় কঠিন ব্রতের পালনে তুমি অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে পড়েছ–তোমার অলঙ্কার ধারণের স্থানগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে। দিনের আলোকে চন্দ্রলেখা যেমন পাণ্ডুর ও কৃশ তুমিও তারই মতো, তোমাকে দেখে কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তির মন ব্যথিত না হবে ?

তোমার সেই প্রিয় ব্যক্তিকে সৌভাগ্যগর্ব থেকে বঞ্চিত বলে মনে করি–যে নিজের মুখখানিকে তোমার মধুর দৃষ্টিসম্পন্ন কুঞ্চিত পক্ষ্মযুক্ত চক্ষুর বিষয়ীভূত করতে পারে নি।

হে গৌরি ! আর কতকাল এইরূপ বৃথা পরিশ্রম করবে ? আমারও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কৃত তপস্যা সঞ্চিত আছে, তারই অর্ধাংশ দিয়ে তুমি তোমার ঈপ্সিত প্রিয়কে লাভ কর। আমি সেই বরের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে জানতে ইচ্ছুক।

এইভাবে ব্রহ্মচারী অন্তরঙ্গভাবে কথা বললেন--তবু তিনি মনের কথা ব্যক্ত করতে পারলেন না ! তখন তিনি পার্শ্ববর্তিনী সখীর দিকে তাঁর অঞ্জনহীন চক্ষুর দৃষ্টি ফেরালেন।

তাঁর সখী তখন সেই ব্রহ্মচারীকে বলল–হে সাধো ! পদ্মের ছত্রে রৌদ্রনিবারণ আর সখীর কোমল দেহে তপস্যার দুঃখবরণ–দুই-ই এক। কিসের জন্য সখী তাঁর দেহকে তপস্যায় নিযুক্ত করেছেন, যদি কৌতূহল থাকে–শুনুন।

চতুর্দিকের অধিপতি, মহেন্দ্র প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্যশালী দেবগণকে তুচ্ছ করে–যিনি মদনকে ভস্মীভূত করে দেখিয়েছেন রূপে তাঁর হৃদয় বিচলিত হয় না–সেই পিনাকপাণি মহেশ্বরকেই তিনি পতিরূপে লাভ করতে চান।

পূর্বে মদন-নিক্ষিপ্ত বাণ মহেশ্বরের এক অসহ্য হুঙ্কারে নির্বাতিত হয়েছিল, লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি–মদনের দেহ ভস্মীভূত হলেও সেই বাণ যেন আরও দীর্ঘ হয়ে সখির হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে ক্ষয় করছে।

সেই দিন থেকে উমা প্রেমে জর্জরিতা হয়ে পিতৃগৃহে বাস করেছিলেন ; তিনি ললাটে যে চন্দনের তিলক পরতেন তাতে তাঁর চূর্ণ কুন্তলগুলিও ধূসর হয়ে যেত। কঠিন শিলাতলে শয়ন করেও তিনি শান্তি পেতেন না।

পিনাকীর চরিতকথা গান করবার সময়ে তাঁর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে অনেকবার সঙ্গীতের পদগুলি স্খলিত হত। বনপ্রান্তে বাসকালে যে সকল কিন্নররাজপুত্রী তাঁর সখীরূপে গণ্য হয়েছিলেন তাঁরাও অশ্রুবিসর্জন করতেন।

রাত্রির অবশিষ্ট তৃতীয় যামে হয় তো তিনি কিছুকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি উঠতেন এই কথা বলে, হে নীলকণ্ঠ, তুমি কোথায় যাও ? এই কথাগুলি কোনো দৃশ্য লক্ষ্যের প্রতি উচ্চারিত হত না ; তিনি তখন তাঁর বাহু দুটিও বাড়িয়ে দিতেন অসত্য কোনো কণ্ঠের উদ্দেশে।

সরলা বালিকা স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রগত চন্দ্রশেখরকে নিভৃতে কত অনুযোগ করে বলতেন—'পণ্ডিতগণ বলেন, তুমি সকলেরই মধ্যে বিরাজিত, তবে আমি যে তোমাতে অনুরক্ত এ কথা তুমি বুঝতে পারো না কেন ?'

যখন তিনি সন্ধান করেও সেই জগৎপতিকে লাভ করবার কোনো উপায় পেলেন না, তখন পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যার জন্য আমাদের সঙ্গে বনে উপস্থিত হয়েছেন।

এই বৃক্ষগুলি সখীর তপস্যার প্রত্যক্ষদর্শী, সখী নিজের হাতেই এইগুলি রোপণ করেছিলেন। এই বৃক্ষগুলিতেও ফল দেখা দিয়েছে ; কিন্তু মহেশ্বরসম্পর্কিত উমার সাধনায় অংকুরমাত্রও দেখা যাচ্ছে না।

বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক ভূমিতে জলবর্ষণ করে ইন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ করেন, সেইরূপ প্রার্থিতদুর্লভ চন্দ্রশেখর কবে যে সখীকে অনুগ্রহ করবেন তা জানি না। আমরা (সখীরা) আর ওঁর দিকে তাকাতে পারি না, চোখের জলে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আসে।

ইঙ্গিতজ্ঞা সখী প্রকৃত অবস্থা অকপটে নিবেদন করলেন ; সেই সুন্দর, নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী হর্ষের কোনো চিহ্ন প্রকাশ করলেন না ; তিনি উমাকে প্রশ্ন করলেন—একি সত্য, না পরিহাস ?

তখন হাতের অগ্রভাগে স্ফটিকের জপমালা তুলে নিলেন পর্বততনয়া, তাঁর হাতে অঙ্গুলি মুকুলের মতো পুটীকৃত। তিনি বাক্য সংযত করে সংক্ষেপে বললেন—

হে বেদবিদ্যাবিৎ আপনি যা জেনেছেন তাই সত্য। আমি উচ্চ স্থান লঙ্ঘন করতে উৎসুক ; আমার এই তপস্যাও তাঁকে লাভ করার জন্যই। কামনার গতি সর্বত্র—সেখানে সম্ভব বা অসম্ভব বলে কিছু নেই।

ব্রহ্মচারী বললেন—মহেশ্বরকে আমি জানি। তুমি (একবার ব্যর্থ হয়ে) পুনরায় তাঁকে প্রার্থনা করছ। নানাপ্রকার কুক্রিয়ায় যাঁর আসক্তি সেই মহেশ্বরের কথা ভেবে তোমার এই অভিলাষ অনুমোদন করতে কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না।

হে তপস্বিনী ! তুমি তুচ্ছ বস্তুতে আগ্রহশীলা। তোমার এই হস্ত যখন বিবাহসূত্রে শোভিত হবে, তখন সর্পবেষ্টিত শম্ভুর হস্ত কিভাবে সর্বপ্রথম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে ?

তুমিই নিজে চিন্তা করে দেখ—তোমার বিবাহের কলহংসচিত্রিত পট্টবস্ত্র আর মহেশের রক্তবিন্দুবর্ষী গজচর্ম—এই দুইয়ের মধ্যে যোগ কোথায় ?

বিবাহের পর পুষ্পাবিকীর্ণ চতুঃস্তম্ভ গৃহে তোমার অলক্তক রঞ্জিত পায়ের চিহ্ন না পড়ে—পড়বে শ্মশানে, যেখানে মৃতদেহের কেশে চারিদিক আচ্ছন্ন—তোমার কোন্ শত্রু এটি অনুমোদন করবে ?

ত্রিলোচনের বক্ষ তোমার কাছে সুলভ হলেও হরিচন্দনের যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে শ্মশানের চিতাভস্ম স্থান পাবে—এর চেয়ে অনুচিত আর কি হতে পারে বল।

তোমার সামনে আর একটি লাঞ্ছনা রয়েছে। তুমি গজরাজের বহনযোগ্যা, বিবাহের পর তোমাকে বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে যেতে দেখে সজ্জনেরা নিশ্চয়ই উপহাসের হাসি হাসবেন।

পিনাকীর সঙ্গে মিলন প্রার্থনায় দুইটির অবস্থা শোচনীয়—চন্দ্রের কমনীয় কলা আর জগতের নয়নানন্দিনী তুমি।

যাঁর অঙ্গে তিনটি নয়ন, জন্মের কোনো স্থিরতা নেই, এদিকে দিগম্বর, তাতে বুঝা যায় ঐশ্বর্যের পরিমাণ কিরূপ! ওগো বালহরিণনয়নে! তুমিই বল, বরের বিষয়ে মানুষ যা যা কামনা করে তাদের একটিও কি পৃথকভাবে ত্রিলোচনে আছে?

এই অসৎ ইচ্ছা থেকে মনকে নিবৃত্ত কর। তাঁর মতো ব্যক্তিই বা কোথায়—তোমার মতো পুণ্যলক্ষণা কন্যাই বা কোথায়? সৎপুরুষ শ্মশানের শূলকে বেদবিহিত পশু-বন্ধনের যূপের মতো অর্চনা করেন না।

সেই ব্রাহ্মণ এইভাবে বিরুদ্ধ ভাষণ করতে লাগলেন। তা শুনে উমার অধর কাঁপতে লাগল—বুঝা গেল তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন; তাঁর নয়নপ্রান্ত রক্তিম হল; তিনি ভ্রূকুটি করে বক্রদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের দিকে তাকালেন।

তিনি তাঁকে বললেন—আপনি শিবের সম্পর্কে প্রকতপক্ষে কিছুই জানেন না, তাই আমাকে এইভাবে বলছেন। যারা অজ্ঞ তারাই অলোকসামান্য মহাত্মাদের অচিন্তনীয় চরিত্রের নিন্দা করে থাকে।

যিনি বিপদ থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল, যিনি সাংসারিক সুখের জন্য উৎসুক, তিনিই মঙ্গলের সন্ধান করেন; যিনি জগতের আশ্রয়; যিনি নিষ্কাম, তিনি এই সব তৃষ্ণা কলুষিত বস্তু দিয়ে কি করবেন?

তিনি দরিদ্র হয়েও সকল সম্পদের উৎস, শ্মশানবাসী হয়েও ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁর রূপ যতই ভীষণ হোক, তিনি 'শিব' রূপেই বর্ণিত। পিনাকপাণিকে যথার্থভাবে জানতে পেরেছেন এমন কেউ নেই।

সেই বিশ্বমূর্তি শিবের দেহ বিশিষ্ট অলংকারে সজ্জিত হোক বা সর্পের মালাই তিনি পরিধান করুন; তাঁর পরিধেয় গজচর্মই হোক বা পট্টবস্ত্রই হোক, হাতে নরকপাল থাক অথবা কপালে চন্দ্রকলা থাক—তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না।

তাঁর অঙ্গস্পর্শে চিতাভস্মও পবিত্র বলে মনে করা হয়। তিনি যখন তাণ্ডব নৃত্য করেন তখন তাঁর অঙ্গচ্যুত ঐ চিতাভস্ম দেবগণও মস্তকে লেপন করে থাকেন।

সম্পদহীন শিব যখন বৃষের স্কন্ধে বিচরণ করেন, তখন মদস্রাবী দিগ্‌গজে বিচরণরত ইন্দ্র নেমে এসে তাঁর চরণে মস্তক রেখে প্রণতি জানান; সেই সময়ে তাঁর মস্তকের বিকশিত মন্দার কুসুমের পরাগে শিবের চরণের অঙ্গুলি রঞ্জিত হয়ে থাকে।

আপনি অসৎ প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও দোষকীর্তন করতে গিয়ে শিবের সম্পর্কে একটি সত্য কথা বলেছেন—যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মারও উদ্ভবের কারণ তাঁর জন্মের বৃত্তান্ত কিভাবে জানা যাবে?

বাদানুবাদে প্রয়োজন নেই। আপনি যেমন তাঁর সম্পর্কে শুনেছেন তিনি সর্বাংশে সেইরূপই হোন—তাঁর অনুরাগে আমার মন স্থির। স্বেচ্ছাব্যবহারী কখনও নিন্দায় বিচলিত হয় না।

সখি, এই ব্রহ্মচারীকে বারণ কর—ওঁর ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে, আবার কি যেন বলতে চাচ্ছেন। মহাপুরুষের যে নিন্দা করে সে-ই কেবল পাপী তা নয়, সে নিন্দা যে শোনে সে-ও তো পাপভাগী।

'অথবা আমিই এখান থেকে চলে যাব'—এই বলে পার্বতী চলতে আরম্ভ করলেন।

ব্যস্ততার জন্য তাঁর স্তনাবরণ স্খলিত হয়ে পড়ল—সেই মুহূর্তে. ব্রহ্মচারীরূপী বৃষধ্বজও স্মিতমুখে তাঁকে দুইহাতে গ্রহণ করলেন।

তাঁকে দেখে উমা কাঁপতে লাগলেন—তাঁর ক্ষীণদেহ ঘর্মজলে সিক্ত হয়ে উঠল। নিক্ষেপ করার জন্য তিনি যে চরণ ঊর্ধ্বে তুলেছিলেন তা ঊর্ধ্বেই রয়ে গেল। জলের ধারা পথের কোনো পর্বতে বাধা পেলে যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে—অগ্রসর হতে পারে না, পিছনেও যেতে পারে না—সেইরূপ পর্বতরাজতনয়া উমাও সামনে যেতে পারলেন না, পিছনেও যেতে পারলেন না—তিনি নিষ্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চন্দ্রশেখর বললেন—'ওগো অবনতাঙ্গি! তুমি তোমার তপস্যার বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করেছ—আমি তোমার দাস।' চন্দ্রশেখরের এই কথা শুনে তপস্বিনী পার্বতী তাঁর তপস্যার সকল ক্লেশ ভুলে গেলেন। ফললাভের পরে ক্লেশও নূতন শক্তি সঞ্চয় করে।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'তপঃফলোদয়' নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ সর্গ

এরপর একদিন গৌরী গোপনে তাঁর এক সখীকে দিয়ে শিবকে বলে পাঠালেন—'গিরিরাজ যে আমার দাতা তা প্রমাণ করুন।'

বসন্তে সহকারলতা কোকিলার কুহুধ্বনিতে ঋতুরাজকে নিবেদন করে আনন্দে বিরাজ করে, সেইরূপ সখীমুখে সব কথা বলে প্রিয়বিষয়ে স্থির হয়ে আনন্দে পূর্ণ হয়ে রইলেন।

মদনদর্পহারী শিব শপথ করলেন—'তাই হবে'; তারপর কোনো রকমে উমাকে বিদায় দিয়ে তিনি জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করলেন।

সেই তপস্বীগণ জ্যোতির্মণ্ডলের দ্বারা আকাশ উদ্ভাসিত করে অরুন্ধতীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনাথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

তীরস্থিত মন্দারের কুসুমরাশি যার ঊর্মিমালায় উৎকীর্ণ এবং দিঙ্‌নাগের মদবারি গন্ধে সুরভিত যে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী, তার প্রবাহে স্নাত হয়ে ঋষিগণ বিশ্বনাথের সম্মুখে এলেন।

তাঁদের যজ্ঞোপবীত মুক্তাময়, পরিধানে স্বর্ণময় বল্কল, হাতে রত্নময় জপমালা। তাঁরা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ধর্ম অবলম্বন করেছেন; তাঁরা কল্পবৃক্ষের ন্যায় দানশীল।

সহস্ররশ্মি সূর্যদেব তাঁর রথের অশ্ব নিম্নদিকে চালনা করতে করতে স্থির করে রেখেছেন এবং রথের পতাকা সম্পূর্ণ অবনমিত করে প্রণামপূর্বক ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে আছেন।

প্রলয়ের সংকটে ধরণী বাহুলতার দ্বারা মহাবরাহের দন্ত আশ্রয় করেন এবং সেই দন্তে উদ্ধৃত হয়ে তাতেই বিশ্রাম করেন—এই ঋষিগণও সেইরূপ এই ধরণীর সঙ্গে দন্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (অর্থাৎ প্রলয়েও তাঁদের বিনাশ নেই)

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টির পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার সমস্তই এই সপ্তর্ষিগণ সৃষ্টি করেছিলেন—এইজন্যে পুরাবিদ্‌গণ এদের 'প্রাচীন ধাতা' এই আখ্যায় কীর্তিত করেছেন।

যাঁদের তপস্যা কামনাযুক্ত, ফললাভের পরেই তাঁরা তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু সপ্তর্ষিগণ জন্মান্তর সঞ্চিত নির্মল তপস্যার ফলভোগ করতে থাকলেও তপস্যাতেই মগ্ন থাকেন।

তাঁদের মধ্যস্থিতা সাধ্বী অরুন্ধতী পতি বশিষ্ঠের চরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন—দেখলে মনে হয় যেন মূর্তিমতী তপস্যার সিদ্ধি অনন্ত শোভায় মণ্ডিতা।

মহেশ্বর অরুন্ধতীকে এবং সপ্তর্ষিকে সমান গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ—এই ভেদ অবিচারপ্রসূত। সজ্জনের চরিত্রই পূজার যোগ্য।

সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে অরুন্ধতীকে দেখে মহেশ্বরের দারপরিগ্রহের জন্য গভীর আগ্রহ হল—কেননা সাধ্বী সহধর্মিণীই ধর্মাচরণের প্রধান সহায়।

ধর্মবোধের দ্বারা মহেশ্বরের হৃদয়ে পার্বতীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বাপরাধ-ভীত কামদেবের হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

এরপর সাঙ্গবেদাধ্যেতা ঋষিগণের দেহ আনন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠল—তাঁরা জগদ্গুরু শিবকে অর্চনা করে এই কথা বললেন—

আমরা নিয়মপূর্বক যে বেদ পাঠ করেছিলাম হোমাগ্নিতে যথাবিধি যে আহুতি দিয়েছিলাম এবং কঠোর তপস্যা করেছিলাম—তার ফল এতদিনে পরিণত হয়েছে—নইলে আপনার দর্শনলাভ হত না।

আপনি ত্রিলোকের প্রভু ; মনোরথের অতীত আপনার মনে যখন আমাদের কথা উদিত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে আমাদের তপস্যার ফল পরিপক্ব হয়েছে।

আপনি যাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হন—সে কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনার হৃদয় বেদের উৎপত্তিস্থল, আপনার এই হৃদয়ে যার চিন্তা জাগে তার কথা আর কি বলব ?

এ কথা সত্য যে আমরা সূর্য কি চন্দ্র উভয়েরই ঊর্ধ্বলোকে বাস করি ; কিন্তু আজ আপনার এই স্মরণের অনুগ্রহে সম্মানের দিক থেকেও তাদের ঊর্ধ্বলোকে স্থাপিত হলাম।

আপনার স্মরণের সম্মাননায় আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি। সাধারণত মহাপুরুষের আদরে নিজের গুণ সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে থাকে।

হে বিরূপাক্ষ ! আপনার এই স্মরণের অনুগ্রহে আমাদের যে আনন্দ তা আপনার কাছে কিভাবে ব্যক্ত করব ? আপনি তো প্রাণীদের অন্তর্যামী পুরুষ—(নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারবেন)।

আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছি, কিন্তু যথার্থভাবে আমরা আপনাকে বুঝতে পারছি না। আপনি প্রসন্ন হোন, আপনার স্বরূপ বিবৃত করুন—আপনি তো বুদ্ধির পথে আপনিও আয়ত্ত নহেন।

এ আপনার কোন্ রূপ ? এই বিশ্ব যে রূপ সৃষ্টি করে থাকেন, এ কি তাই ? অথবা যে রূপে বিশ্ব পালন করেন—কিংবা ইনিই কি বিশ্বের সংহারকর্তা ?

অথবা এই মহতী প্রার্থনা থাক—আপনি স্মরণমাত্রেই আমরা উপস্থিত হয়েছি, এখন আদেশ করুন, কি করব ?

এরপর পরমেশ্বর প্রত্যুত্তর দিলেন—দেওয়ার সময় তাঁর শুভ্রদন্তের প্রভায় ললাটচন্দ্রের ক্ষীণ কান্তি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঋষিগণ ! আপনারা জানেন, আমি নিজের প্রয়োজনে কোনো প্রবৃত্ত নিয়োজিত করি না। আমি যে এরূপ—তার পরিচয় আমার অষ্টমূর্তি—এই অষ্টমূর্তি সমস্তই পরার্থে নিযুক্ত।

তৃষ্ণার চাতক যেমন মেঘের নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করে—শত্রুপীড়িত দেবগণও

শত্রুনাশের জন্য আমার নিকটে সন্তান প্রার্থনা করেছেন।

সুতরাং যজমান যেমন হোমাগ্নি উৎপাদনের জন্য 'অরণি' কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হন, আমি তেমনি পুত্রকামনায় পার্বতীকে লাভ করতে ইচ্ছুক।

আমার এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আপনারা হিমালয়ের নিকটে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করুন। কেননা, সৎপুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত সম্বন্ধ কখনও কুফলপ্রসূ হয় না!

হিমালয় সমুন্নত, প্রতিষ্ঠাবান ও পৃথিবীর ভার বহনকারী। আপনারা জানবেন তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পাদিত হলে আমিও কোনোক্রমে বঞ্চিত হব না।

কন্যার জন্য হিমালয়কে এরূপ বলতে হবে—এ সম্পর্কে আপনাদের কোনো নির্দেশ দিলাম না। আপনাদের রচিত আচার-পদ্ধতিই সাধুজনেরা সাধারণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

সেই বিবাহ ব্যাপারে মাননীয়া অরুন্ধতী দেবীও সাহায্য করতে পারেন; এই জাতীয় কাজে গৃহিণীদের নৈপুণ্য সকলেই জানেন।

কার্য সিদ্ধির জন্য আপনারা হিমালয়ের 'ওষধিপ্রস্থ' নামক নগরে যাত্রা করুন। সেই-খানে মহাকোশী-প্রপাত নামক স্থানে আবার আমাদের দেখা হবে।

সংযমীদের প্রধান সেই মহেশ্বর পরিণয়ের জন্য আগ্রহী হয়েছেন দেখে প্রজাপতি পুত্র সপ্তর্ষি নিজেদের পত্নী সম্পর্কিত সংকোচ ত্যাগ করলেন।

তারপর ঋষিগণ 'আচ্ছা'—এই কথা বলে প্রস্থান করলেন। ভগবান ত্রিলোকনাথও পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ মহাকোশী-প্রপাতে উপস্থিত হলেন।

মনোরথের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন সেই মহর্ষিগণ সুনীল আকাশপথে উত্থিত হয়ে ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হলেন।

রত্ন সম্পদে পূর্ণ অলকানগরীকে যেন তুলে এনে অথবা স্বর্গের অতিরিক্ত অংশ নিয়ে এসে যেন এই উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছে।

চারদিক গঙ্গার প্রবাহে বেষ্টিত, প্রাকার পর্যন্ত জ্যোতির্ময় ওষধিবৃক্ষে শোভিত এবং বৃহৎ মণিশিলার প্রাচীরে সে নগর সুরক্ষিত—অপ্রকাশিত থেকেও সুন্দর!

এখানে হস্তীরা সিংহের ভয় জয় করেছে, সমস্ত অশ্বই গুহাসম্ভূত, যক্ষ ও কিন্নরেরা এখানকার পুরবাসী এবং বনদেবতাগণ এখানকার পুরকামিনী।

এখানে প্রাসাদগুলির শিখরে লগ্ন মেঘের গুরুগর্জন প্রাসাদের মধ্যে ধ্বনিত হওয়ায় মনে হয় তালে তালে মৃদঙ্গ বাজছে।

এখানে কল্পবৃক্ষের শাখায় চঞ্চল পল্লবসমূহ পতাকার মতো উড়তে থাকে; পুর-বাসীদের বিনা প্রয়াসে গৃহস্থিত ধ্বজদণ্ডও পতাকায় শোভিত হয়ে থাকে।

এখানে রাত্রিতে স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে সুরাপানের স্থানগুলিতে তারকার উজ্জ্বল আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে—সেই প্রতিবিম্বগুলি যেন তারকার উপহার বলে মনে হতে থাকে।

এখানে বর্ষাকালে রাত্রিতে ঔষধির দীপ্তি অভিসারিকাদের পথ প্রদর্শন করে—তাই অভিসারিকাগণ অন্ধকার বুঝতে পারেন না।

এখানে যৌবন পর্যন্ত বয়স, পুষ্পধনু ভিন্ন কোনো প্রহারক নেই, রতি-খেদ সমুৎপন্ন নিদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের সংজ্ঞা লোপ নেই।

এখানে কুপিতা মানিনীগণ অপরাধী প্রিয়তমকে ভ্রূ-কুঞ্চনপূর্বক ওষ্ঠ কম্পিত করে

এবং কোমল তর্জনী তুলে শাসন করে মানভঙ্গ পর্যন্ত এই শাসন চলে।

এই নগরের বাইরে 'গন্ধমাদন' নামে সুগন্ধি এক উপবন—সন্তান তরুর ছায়ায় শীতল—পথিক বিদ্যাধরগণ পথ চলতে চলতে সেই ছায়ায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর দিব্য মুনিগণ হিমালয়ের সেই নগর দেখে ভাববেন—স্বর্গকামনায় তাঁরা যে সব পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন সবই ব্যর্থ হয়েছে।

সেই ঋষিগণ যখন হিমালয় গৃহে সবেগে নেমে আসছিলেন, তোরণরক্ষী দৌবারিকগণ তখন ঊর্ধ্বমুখে তাঁদের দেখছিল—তাঁদের জটাভার যেন চিত্রাঙ্কিত অনল শিখার ন্যায় নিশ্চল।

আকাশ থেকে নেমে এলেন মুনিগণ বার্ধক্য অনুযায়ী শ্রেণীবন্ধভাবে—মনে হল তাঁরা যেন জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য! (অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু দাহিকাশক্তি নেই)!

হিমালয় অর্ঘ্য নিয়ে জগৎপূজ্য ঋষিগণকে দূর থেকে অভ্যর্থনা জানালেন; তাঁর দ্রুত নিক্ষিপ্ত পদভারে বসুন্ধরা যেন ঈষৎ কম্পিত হলেন।

অভ্যন্তরস্থ বিচিত্র ধাতু যাঁর তাম্রবর্ণ অধর, দেবদারু তরু যাঁর বিশাল বাহু, স্বভাবতই শিলাময় ছিল যাঁর বক্ষ—সেই হিমালয় হলেন প্রকাশিত।

এরপর তিনি তাঁদের যথাবিধি অর্চনা করলেন এবং সেই পূতচরিত্র ঋষিদের পথ দেখিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করালেন।

অন্তঃপুরে ঋষিগণ বেত্রনির্মিত আসনে উপবেশন করলেন; তারপর নিজে আসন গ্রহণ করে গিরিরাজ হিমালয় সর্বশক্তিমান মুনিদের বলতে লাগলেন—

আপনাদের এই আকস্মিক দর্শনে মনে হচ্ছে যেন বিনামেঘে বারিবর্ষণ হল—ফলের উদ্ভব হল বিনা কুসুমে।

আপনাদের এই অনুগ্রহে আমার মনে হল মূঢ় আমি যেন জ্ঞানে সার্থক হলাম, লৌহের ন্যায় কঠিন আমি, যেন স্বর্ণে রূপান্তরিত হলাম; যেন মর্ত্য থেকে স্বর্গে আরোহণ করলাম।

(সপ্তর্ষিমণ্ডলের পদার্পণে হিমালয় তীর্থভূমি!) আজ থেকে কত প্রাণী পবিত্রতার জন্য এখানে আসবে! সাধু ব্যক্তিগণ যেখানে পদার্পণ করেন তাকেই তো তীর্থ বলা হয়!

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আজ দুটি বিষয়ে আমি নিজেকে পবিত্র বলে মনে করছি—আমার শীর্ষদেশে গঙ্গার পতন এবং আমার বক্ষে এই পদপ্রক্ষালনের বারি।

আমার দুইটি রূপই আপনাদের দ্বিধাবিভক্ত অনুগ্রহে কৃতার্থ; আমার গতিশীল দেহ আপনাদের সেবাকর্মে উৎসুক, আমার স্থিতিশীল দেহ আপনাদের পদার্পণে পবিত্র।

আমার অঙ্গের দ্বারা আমি দিগন্ত ব্যাপ্ত করে আছি, তবু আপনাদের শুভ আবির্ভাবে আমার যে আনন্দের উদয় হচেছ তা আমি ধরে রাখতে পারছি না।

আপনাদের দর্শনে শুধু যে আমার গুহাগত অন্ধকারই দূরীভূত হল তা নয়, আমার রজোরূপ অন্ধকার অপেক্ষাও গাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকার আজ দূরীভূত হল।

আপনাদের তো কোনো প্রয়োজনই দেখতে পাচ্ছি না; যদি প্রয়োজন থাকত তবে কেন তা সিদ্ধ হচ্ছে না? মনে হয়, আমাকে পবিত্র করবার জন্যই আপনারা এখানে এসেছেন।

তবু কোনো একটি বিষয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে আদেশ করুন; ভৃত্যেরা প্রভুদের নিকটে কার্যে নিযুক্ত হলেই প্রসন্ন হয়ে থাকে।

এই আমি, এই আমার পত্নী, এই আমার বংশের প্রাণস্বরূপ কন্যা—এদের মধ্যে আপনাদের কাজে যার প্রয়োজন, বলুন ; বাইরের বস্তু তো তুচ্ছ !

হিমালয় যখন এই কথা বলছিলেন তখন তাঁর সেই উক্তিই গুহামুখে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে মনে হল তিনি যেন একই কথা দুবার উচ্চারণ করলেন।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে ঋষিগণ প্রতিভায় অগ্রগণ্য অঙ্গিরা ঋষিকে উত্তর দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি হিমালয়কে এই বলে উত্তর দিলেন—

এইমাত্র আপনি যা বললেন এ ছাড়াও অনেক কিছু আপনাতেই সম্ভব, কারণ আপনার মনের ও শিখরের সমুন্নতি একই প্রকারের।

আপনাকে যে পুরোবিদগণ বিষ্ণুর স্থিতিশীল স্বরূপ বলে বর্ণনা করেন তা যথার্থ ; কেননা, আপনার কুক্ষি বিষ্ণুর কুক্ষির ন্যায় স্থাবর এবং কিছু জঙ্গম পদার্থের আধার।

শেষনাগ তাঁর মৃণালের ন্যায় কোমল ফণায় ধরণীকে কি করে ধারণ করতেন, যদি আপনি পাতাল মূল থেকে অবলম্বন না করে থাকতেন ?

আপনার অবিচ্ছিন্ন শুভ্র কীর্তিরাশি সমুদ্রের তরঙ্গ ভেদ করে দেশদেশান্তরে প্রসারিত হচ্ছে, আপনার স্রোতস্বিনীগুলিও সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করে তাতে লীন হয়ে যাচ্ছে—এইভাবে আপনার কীর্তি ও স্রোতস্বিনী সমভাবে ত্রিলোককে পুণ্যময় করছে।

বিষ্ণুর চরণ থেকে উদ্ভূত বলে গঙ্গা গৌরবান্বিতা ; উন্নতশীর্ষ আপনিও তাঁর দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থল—এই জন্যেও তিনি গৌরব করে থাকেন।

ত্রিবিক্রমরূপে বিষ্ণু যখন তির্যকভাবে, ঊর্ধ্বে ও নিম্নে পদক্ষেপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখনই লক্ষিত হয়েছিল তাঁর সর্বব্যাপী মহিমা ; কিন্তু আপনার এই ব্যাপক মহিমা স্বভাবতই বর্তমান।

যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের মধ্যে আপনিও পরিগণিত—তাই উচ্চ সুমেরু পর্বতের স্বর্ণময় শৃঙ্গও আপনার গৌরবের নিকটে ব্যর্থ।

যত কিছু কাঠিন্য সবই আপনার শিলাময়, অর্থাৎ স্থাবর দেহে আবদ্ধ রেখেছেন, আবার আপনার এই ভক্তিনত জঙ্গম দেহ সজ্জনদের আরাধনার স্থল।

এখন আমাদের আগমনের কারণ শুনুন। এ কাজ আপনারই, আমরা শুধু শুভ কর্তব্যের উপদেশ দিচ্ছি বলেই এর অংশভাগী !

অণিমা প্রভৃতি যে অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের যিনি অধিকারী—অন্য কোনো পুরুষে সে-সব প্রত্যক্ষ হয় না ; যিনি অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে 'ঈশ্বর' এই শব্দটি ধারণ করে থাকেন ;

পৃথিবী, বায়ু, জল, অনিল প্রভৃতি যাঁর নিজের অষ্টবিধ মূর্তি পরস্পরের সহায়করূপে সর্বদা যুক্ত এবং অশ্বগণ যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যান আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, তেমনি অষ্টবিধ মূর্তি দ্বারা যিনি এই বিশ্বকে বহন করছেন ;

সর্বভূতের অন্তর্যামী পুরুষরূপে যোগিগণ যাঁকে ধ্যানে সন্ধান করেন ; যাঁর আশ্রয়ে সংসারে পুনর্জন্মের ভয় থাকে না বলে মনীষিগণ মনে করেন ;

জগতের সকল কার্যের স্রষ্টা, বরদাতা সেই শম্ভু আমাদের মুখে উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা স্বয়ং আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করছেন।

বাক্য যেমন অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার সংযোগ বিধান করুন ; কেননা সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হলে পিতার আনন্দের কারণ হয়ে থাকে।

স্থাবর ও জঙ্গম—সকল প্রাণীই আপনার এই কন্যাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করুক ; কেননা, শম্ভু জগতের পিতা।

দেবগণ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করে তারপর আপনার কন্যার চরণযুগল মস্তকের কিরীটস্থ মণির প্রভায় রঞ্জিত করুন।

আপনার কন্যা উমা হবেন বধূ, আপনি হবেন সম্প্রদানকর্তা, আমরা প্রার্থী ; আর শম্ভু হবেন বর ; সুতরাং এই শুভকার্য আপনার কুলের কল্যাণজনক।

যাঁকে সকলেই স্তব করে, অথচ তাঁর স্তবযোগ্য কেউ নেই ; যিনি সকলের পূজ্য অথচ তাঁর পূজনীয় কেউ নেই—সেই জগদ্গুরু শংকরকে কন্যা দান করে আপনিও তাঁর গুরুস্থানীয় হোন।

দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন হিমালয়কে এইসব কথা বলছিলেন, পার্বতী তখন নতমুখে ক্রীড়ার জন্য সংগৃহীত পদ্মের পাপড়ি গুণছিলেন।

সার্থককাম হয়েও হিমালয় মেনকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কন্যার বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে গৃহস্থগণ প্রায়ই গৃহিণীদের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়ে থাকেন।

মেনকাও পতির সেই সব ঈপ্সিত কার্য অনুমোদন করলেন, কেননা পতিব্রতা রমণী কখনও পতির ইচ্ছার বিরোধিতা করেন না।

ঋষিদের বাক্যের অবসানে—'এই হবে এদের কথার যথার্থ উত্তর'—এই ভেবে হিমালয় মঙ্গলভূষণে সজ্জিতা কন্যাকে গ্রহণ করলেন।

'এসো বৎসে, বিশ্বরূপ মহেশ্বরের হস্তে তুমি ভিক্ষারূপে পরিকল্পিতা। মুনিগণ প্রার্থী হয়ে এসেছেন ; গৃহাশ্রমীর পরম সার্থকতা আজ আমি লাভ করলাম।'

গিরিরাজ কন্যাকে এই কথা বলে ঋষিদের বললেন—এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করছে।

তাঁদের অভিপ্রায়েরই অনুরূপ গিরিরাজের সেই উদারবাক্য! সেই বাক্যকে তাঁরা অভিনন্দিত করলেন এবং ফলোন্মুখী আশীর্বাদের দ্বারা পার্বতীকে সংবর্ধনা জানালেন।

পার্বতী যখন সাগ্রহে প্রণাম করছিলেন, তখন তাঁর কর্ণের স্বর্ণালংকার খসে পড়ে গেল। লজ্জিতা পার্বতীকে দেবী অরুন্ধতী কোলে তুলে নিলেন।

কন্যাস্নেহে বিহ্বলা পার্বতীর জননীকেও দেবী অরুন্ধতী সেই অনন্যসাধারণ বরের গুণাবলী ব্যাখ্যা করে আশ্বস্ত করলেন।

তখনই শিবের আত্মীয় হিমালয় ঋষিগণকে বিবাহের তিথি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। 'আর তিনদিন পরে'—এই কথা বলে সেই চীরধারী ঋষিগণ প্রস্থান করলেন।

হিমালয়কে অভিনন্দিত করে আবার শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন ; তারপর 'কার্য সফল হয়েছে' এ কথা তাঁকে নিবেদন করে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে যাত্রা করলেন।

হিমালয়-কন্যাকে লাভ করবার জন্য পশুপতির আগ্রহ হল—সেই কয়টি দিন তিনি অতিকষ্টে যাপন করলেন। যদি ঔৎসুক্য প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বরকেও স্পর্শ করে তবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সাধারণ মানুষের মনে তারা বিকার সৃষ্টি করবে না কেন?

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমাপ্রদান' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

তারপর হিমালয় শুক্লপক্ষের 'জামিত্র গুণযুক্ত' তিথিতে গৃহাগত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কন্যার বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন।

উমার প্রতি স্নেহ ছিল বলেই গৃহে গৃহে রমণীগণ বিবাহের মাঙ্গল্য রচনার উৎসবে এতই মেতে উঠলেন যে সেই নগর আর হিমালয়ের অন্তঃপুর যেন একই গৃহ বলে মনে হতে লাগল।

দিব্য সন্তানক তরুর কুসুমে আচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকায় সজ্জিত রাজপথগুলি মাঝে মাঝে স্বর্ণতোরণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল! দেখে মনে হতে লাগল, স্বর্গকেই তুলে এনে এখানে বসানো হয়েছে।

উমার বিবাহ আসন্ন—এই জন্য আরও পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও উমা মাতা-পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হতে লাগল যেন দীর্ঘকাল পরে উমাকে তাঁরা দেখছেন, যেন মৃত্যুর পর আবার তিনি ফিরে এসেছেন।

সবাই তাঁর প্রতি আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি এক ক্রোড় ছেড়ে অন্য ক্রোড়ে যেতে লাগলেন। একটি অলংকার ছেড়ে অন্য অলঙ্কারে সজ্জিত হতে লাগলেন। হিমালয়ের বিশাল বংশের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই স্নেহ যেন একমাত্র উমাকেই আশ্রয় করল—যদিও তাঁদের স্নেহের পাত্রী অনেকেই ছিলেন।

মৈত্র মুহূর্তে (অর্থাৎ সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকে তৃতীয় মুহূর্তে ; মুহূর্ত=৪৮ মিনিট) যখন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হল—সেই শুভলগ্নে পতি পুত্রবতী কুলরমণীগণ উমার দেহ প্রসাধন করতে শুরু করলেন।

শ্বেতসর্ষপযুক্ত নবীন দূর্বাঙ্কুরে তাঁর সিঁথি শোভিত হল, নাভিদেশ আবৃত করে কৌশেয় বস্ত্র পরানো হল—তিনি হাতে নিলেন একটি বাণ। এই সজ্জায় উমা যেন তাঁর অভ্যঙ্গ বেশকেও অলংকৃত করেছিলেন।

দীক্ষাবিধিসম্পর্কিত সেই বাণ হাতে নিয়ে উমার শোভা হল কৃষ্ণপক্ষের অবসানে ক্রমবর্ধমান চন্দ্রলেখার মতো।

রমণীগণ লোধ্রফুলের শ্বেত পরাগে উমার দেহের নিব তৈল মুছে নিলেন, 'কালেয়' নামক গন্ধদ্রব্যে (কালো চন্দনে) তাঁর অঙ্গরাগ সম্পাদন করলেন—তারপর তাঁকে স্নান-কালোচিত একটি শাড়ি পরিয়ে চারি স্তম্ভযুক্ত স্নানঘরে নিয়ে গেলেন।

সেই স্নানগৃহ বৈদূর্য-শিলাময় এবং বিচিত্র মণিমুক্তাখচিত ; এখানে তাঁরা উমাকে স্বর্ণঘটের জল দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। স্নানের সময়ে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠল।

মঙ্গলস্নানের পর নির্মল দেহে উমা যখন পতির সমীপে যাবার উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করলেন তখন তাঁর শোভা হল যেন মেঘবর্ষণের পর প্রফুল্ল কাশফুলে সজ্জিতা পৃথিবীর মতো।

তারপর পুরকামিনীগণ সাগ্রহে উমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটি মণ্ডপের মধ্যবর্তী প্রসাধন-বেদীর উপরে প্রসারিত আসনে ; সেই মণ্ডপ চন্দ্রাতপ-সজ্জিত মণিময় চারিটি স্তম্ভে শোভিত।

সেই আসনে তাঁরা তন্বী উমাকে পূর্বমুখী করে বসালেন। প্রসাধন দ্রব্য হাতের কাছে থাকলেও তাঁরা তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন।

একজন তাঁর কুসুমখচিত কুঞ্চিত কেশপাশ দূর্বাযুক্ত হরিৎ বর্ণের মধূক ফুলের মালায় বেঁধে দিলেন—বাঁধবার আগে তার আর্দ্রভাব দূর করে নিলেন ধূপের ধোঁয়ায়।

তাঁরাও উমার অঙ্গ শ্বেত অগুরু এবং গোরোচনা দ্বারা সাজিয়ে দিলেন ; তাতে মনে হল তিনি যেন চক্রবাকশোভিত, সৈকতশালিনী, ত্রিস্রোতা গঙ্গার সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করেছেন।

তাঁর সেই দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশপাশে মুখখানি এমন অপূর্ব শ্রী ধারণ করল যে তার কাছে ভ্রমরযুক্ত পদ্ম বা কৃষ্ণমেঘচিহ্নিত চন্দ্রও পরাজিত হল—ওদের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য প্রসঙ্গের সম্ভাবনাও দূর হয়ে গেল।

উমার কপোল লোধ্রপরাগের লেপনে ছিল শ্বেতবর্ণ গোরোচনার বিন্যাস, তাতে এল রক্তিমা ! এই শ্বেত-রক্তাভ কপোলে লগ্ন হল তাঁর কর্ণে অর্পিত শ্যামল যবাংকুর—তাতে এমন বর্ণের উৎকর্ষ লাভ হল যে দর্শকদের দৃষ্টিকে বেঁধে রাখল।

অনুপম অঙ্গ উমার ! অধরোষ্ঠ আরও বেশি নির্মল হয়েছে মধু প্রলেপে—মধ্যে একটি রেখা অধর ও ওষ্ঠকে দুইভাগে ভাগ করেছে। তাঁর ওষ্ঠের লাবণ্যকাল আসন্ন ! শিব-সমাগমের আসন্ন সৌভাগ্যে তাঁর অধরোষ্ঠ কাঁপছিল !

উমার চরণ দুটি আলতায় রঞ্জিত করে—'এই চরণে তোমার পতির মস্তকের চন্দ্রকলা স্পর্শ করো'—এই বলে তাঁকে পরিহাসচ্ছলে আশীর্বাদ করল—উমা কোনো কথা না বলে হাতের মালা দিয়ে তাকে প্রহার করলেন।

প্রসাধিকা রমণীর দল তাঁর পূর্ণ প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো সুন্দর দুইটি নয়নের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হবে এই ভেবে অঞ্জন পরালেন না, শুভকার্যের অঙ্গ ভেবেই পরালেন।

তাঁকে যখন অলংকার পরানো হচ্ছিল তখন তিনি কুসুমভারে-নতা লতার ন্যায়, নক্ষত্র-খচিত রাত্রির ন্যায় এবং চক্রবাকশোভিত তটিনীর ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

দর্পণে নিজের দেহ প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চল আয়তলোচনে তিনি শিবসকাশে যাবার জন্য উন্মুখ হলেন—কেননা, প্রিয়তম দেখলেই হয় নারীর সাজসজ্জার সার্থকতা।

তারপর তাঁর মাতা এলেন মঙ্গলদ্রব্য নিয়ে—পীতবর্ণের হরিতাল দ্রব্য আর রক্তবর্ণ মনঃশিলা। তিনি দুই অঙ্গুলিতে তাই নিয়ে নির্মল কুন্দফুলের কর্ণালংকার শোভিত কন্যার মুখখানি একটু তুলে, কোনোরূপে তাঁর কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পরিয়ে দিলেন। উমার স্তনমুকুলের প্রথম উদ্‌গমের সঙ্গে যে মনোরথ তাঁর মনে জেগেছিল এবং সেই মুকুলের বিকাশের সঙ্গে যে মনোরথ পুষ্ট হচ্ছিল—এই তিলকেই তার পূর্ণ সার্থকতা।

মেনকার দৃষ্টি অশ্রুসজল ! উমার হাতে বিবাহসূত্র বন্ধনের স্থানটি তিনি দেখতে না পেয়ে অন্য স্থানে বেঁধে দিতে উদ্যত হলেন—ধাত্রী এসে তাঁর অঙ্গুলির সাহায্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করলেন—মেনকাও তখন উর্ণাময় সেই সূত্র উমার হাতে বেঁধে দিলেন।

উমার অঙ্গে নূতন ক্ষৌমবসন ; তিনি যখন হাতে স্বচ্ছ দর্পণ তুলে ধরলেন, তখন তাঁকে মনে হল ক্ষীরসিন্ধুর যেন পুঞ্জিত বেলাভূমির মতো, কিংবা পূর্ণচন্দ্রশোভিত শারদ রাত্রির মতো !

মাতা মেনকা ছিলেন স্ত্রী-আচারে অভিজ্ঞা ; তিনি কুলের অবলম্বরূপা কন্যাকে গৃহে যথারীতি অর্চিতা গৃহদেবতাদের প্রণাম করালেন, তারপর একে একে সতী রমণীদের পাদবন্দনা করালেন।

প্রণতা উমাকে সেই রমণীগণ—'পতির অখণ্ড প্রেম লাভ করো'—এই বলে আশীর্বাদ করলেন। উমা কিন্তু পতির অর্ধাঙ্গভাগিনী হয়ে স্নিগ্ধজনের সেই আশীর্বাদকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

নম্র কর্মকুশল হিমালয় নিজের ইচ্ছা ও ঐশ্বর্য অনুযায়ী কন্যার বিবাহসম্পর্কিত প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন, তারপর বন্ধু-বান্ধবপূর্ণ সম্প্রদান সভায় চন্দ্রশেখরের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ওদিকে কৈলাস পর্বতেও প্রথম বিবাহোৎসবের মতোই সমারোহ! অনুরূপ সাজসজ্জা ও অলংকার প্রভৃতি এনে মাতৃকামণ্ডলী ত্রিপুরবিজয়ী শংকরের সামনে রাখলেন।

তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যেই শংকর সেই মঙ্গলদ্রব্য ও প্রসাধন একবার স্পর্শ করলেন; কিন্তু পরিণয়োন্মুখ শংকরের অভিলাষ অনুযায়ী যেন তাঁর স্বাভাবিক বেশ-ভূষাই রূপান্তরিত হয়ে অলংকারে পরিণত হল।

তখন তাঁর কাছে ভস্মই হল শ্বেতবর্ণের অঙ্গরাগ, নরকপাল হল অমল শিরোভূষণ; পরিধানে হস্তিচর্ম, কিন্তু রোচনারাগে রঞ্জিত হয়ে তা-ই গ্রহণ করল ক্ষৌম্যবসনের রূপ!

ললাটাস্থির মধ্যে তৃতীয় নয়ন—তাঁর নিশ্চল ও উজ্জ্বল তারা! সেই তৃতীয় নয়ন এমন ধ্রুব ও জ্যোতির্ময় যে তাকেই মনে হল হরিতালরচিত তিলক।

প্রকোষ্ঠে, বাহুতে যেখানে যে সকল জড়িত থাকত তারা সেই সেই স্থানেই রইল—শুধু তাদের দেহ বিশেষ স্থানের বিশেষ অলংকারে পরিণত হল—ফণাস্থিত মণির শোভা সেই রকমই থাকল, কোনো বিকৃতি ঘটল না।

স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রের দ্বারা তাঁর মস্তকশোভিত বালচন্দ্রলেখা বলেই তা কলংকহীন। দিনের বেলাতেও এই চন্দ্রলেখায় তাঁর ললাট নিত্যশোভিত থাকায় অন্য মণিমাণিক্যের কিরীটে কি প্রয়োজন?

নিজের প্রভাবে বিবাহ-কালোচিত অলংকার ও বেশভূষার সৃষ্টি করলেন অমিত প্রভাবশালী মহেশ্বর। এই সব প্রসাধনেই তিনি সজ্জিত হলেন। একটি স্বচ্ছ খড়্গ এনে দিলেন সন্নিহিত প্রমথগণ—মহেশ্বর তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন।

নন্দীর বাহু আশ্রয় করে মহেশ্বর বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন—বৃষপৃষ্ঠ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। মহেশ্বরের প্রতি ভক্তিহেতু বৃষ তার বিশাল দেহ সংকুচিত করল, মনে হল কৈলাস-নাথ তাঁর প্রিয় কৈলাসপর্বতে আরোহণ করলেন। এরপর মহেশ্বর যাত্রা করলেন।

মাতৃকাগণ নিজের নিজের বাহনে তাঁর অনুগমন করলেন, বাহনের আন্দোলনে তাঁদের কর্ণভূষণগুলি কাঁপতে লাগল, মুখের দীপ্তিতে মনে হল তাঁরা মুখে প্রচুর পুষ্পের রেণু লেপন করেছেন। তাঁরা যখন যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ ফুল্ল-শতদল-পূর্ণ সরোবরের শোভা ধারণ করেছে।

তাঁদের পশ্চাতে রইলেন নরকপালভূষণা মহাকালী! যেন শ্বেতবর্ণের বলাকায় শোভিত হয়ে কৃষ্ণা মহাকালী চলেছেন আর তাঁর সামনে স্বর্ণকান্তি বিদ্যুৎ বলসিত হচ্ছে।

এরপর শূলী শম্ভুর অগ্রগামী প্রমথগণের তূরী প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত হল; সেই ধ্বনি দেবরথগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে রথবিহারী দেবগণকে জানিয়ে দিল—(শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে শিবসেবার এই অবসর)!

তখন সূর্য একটি নূতন ছত্র শিবের মস্তকে ধারণ করলেন—সেই ছত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত। সেই ছত্রের সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্র যখন তাঁর মাথার উপরে উড়তে লাগল,

মনে হল যেন গঙ্গার ধারা ঝরে পড়ছে।

মূর্তিমতী রমণীরূপে এলেন গঙ্গা ও যমুনা—তাঁরা চামর বীজন করে শিবের সেবা করতে লাগলেন। তাঁদের সমুদ্রগামিনী মূর্তি, অর্থাৎ নদীমূর্তি না থাকলেও তাঁদের চামরের আন্দোলনে মনে হল যেন গঙ্গা-যমুনায় হংসমালা উড়ে এসে পড়ছে।

ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন অগ্নির মহিমা বর্ধিত হয়, তেমনি 'জয় হোক' এই উক্তির দ্বারা শিবের মহিমা বর্ধিত করতে করতে জগতের আদি বিধাতা ব্রহ্মা এবং শ্রীবৎস চিহ্নিত পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু সাক্ষাতভাবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

একই মূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই তিন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন-এঁদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয়, বড় বা ছোট ভেদ করা চলে না। কখনও শিব বিষ্ণুর পুরোবর্তী, কখনও সেই বিষ্ণুই শিবের পুরোবর্তী; কখনও ব্রহ্মা বিষ্ণুও শিবের পূর্ববর্তী, কখনও শিব বিষ্ণু ব্রহ্মারও পূর্ববর্তীরূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন।

ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপাল দেবগণ মহিমার চিহ্ন ত্যাগ করে বিনীতবেশে শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দৃষ্টি-সঙ্কেতে নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন, নন্দী পরিচয় করিয়ে দেবার পরে তাঁরা যুক্তকরে শিবকে প্রণাম করলেন।

তখন শিব মস্তক কম্পিত করে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা, বিষ্ণুকে স্মিত হাস্যের দ্বারা, ইন্দ্রকে দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং অন্য দেবগণকে প্রাধান্য অনুসারে অভ্যর্থনা জানালেন।

সপ্তর্ষিগণ সামনে এসে জয়াশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন। শিব স্মিত হেসে বললেন—এই আরব্ধ বিবাহযজ্ঞে পূর্বেই আপনাদের অধ্বর্যুপদে বরণ করেছি।

বিশ্বাবসু প্রমুখ দক্ষ, প্রবীণ ও বীণাবাদক গন্ধর্বগণ শিবের ত্রিপুরবিজয় প্রভৃতি কীর্তিকথা গান করতে লাগলেন—তামসান্ধকারের অতীত চন্দ্রশেখর হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন।

অবলীলাক্রমে শিবকে বহন করে বৃষভ শূন্যপথে অগ্রসর হল। তার গলার স্বর্ণঘণ্টা থেকে কিঙ্কিণী শব্দ শোনা গেল, তার শৃঙ্গদ্বয় মেঘে বিদ্ধ হতে লাগল—কিছু শৃঙ্গে লগ্ন হল, মনে হল তটভূমিতে উৎখাতকেলি করেছিল বলেই তাতে কিছু পঙ্ক লেগে আছে। বাহন চলার কালে সেই মেঘখণ্ডশোভিত শৃঙ্গদ্বয় ঘন ঘন কাঁপতে লাগল।

সেই বাহন মুহূর্তের মধ্যে গিরিরাজ কর্তৃক সংরক্ষিত হিমালয়নগরে উপস্থিত হল। এই নগর শত্রুকর্তৃক কখনও আক্রান্ত হয় নি। শিব সেই নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে যাচ্ছিলেন। মনে হল যেন তাঁর দৃষ্টির স্বর্ণচ্ছত্রে দূরের নগরকে আকর্ষণ করে কাছে আনা হয়েছে।

মেঘের মতো নীলকণ্ঠ শিব নিজের বাণচিহ্নিত আকাশ পথে গিয়ে হিমালয় নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করলেন—কৌতূহলবশত পুরবাসিগণ উন্মুখদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

শিবের আগমন সংবাদে হৃষ্ট হয়ে গিরিরাজ হিমালয় এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। সমৃদ্ধিসম্পন্ন আত্মীয়-পরিজনও হস্তিপৃষ্ঠে তাঁর অনুগমন করলেন; মনে হল প্রফুল্ল পুষ্পশোভিত বৃক্ষসহ গিরিমধ্যভাগই অগ্রসর হচ্ছে।

নগরীর তোরণদ্বারের অর্গল উন্মোচিত হল—দেবতা ও পর্বতের দল পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। দুই দলের উচ্চরোল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল, মনে হল দুটি

জলধারা একই সেতু ভেঙে মিলিত হয়েছে।

ত্রিলোকপূজ্য শিব যখন হিমালয়কে প্রণাম করলেন, তখন হিমালয় লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়লেন—শিবের মহিমাপ্রভাবে দূর থেকেই তাঁর মাথা যে প্রথমে আনত হয়েছিল তা তিনি জানতে পারেন নি।

আনন্দে তাঁর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল; জামাতার সামনে যাঁরা আসছিলেন তিনি তাঁদের কাছে এগিয়ে এলেন। নগরের পথে এত ফুল ছড়ানো হয়েছিল যে তাতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। তিনি জামাতাকে এক সুন্দর মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

সেই সময়ে পুরসুন্দরীগণ শিবদর্শনের আগ্রহে অন্য কাজ ফেলে রেখে এইভাবে প্রাসাদশীর্ষে নানারকম কাজে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন।

দর্শনপথে দ্রুত আসতে গিয়ে কোনো রমণীর কবরীবন্ধন মুক্ত হয়ে মালা খসে পড়ল—তিনি কেশপাশ এক হাতে ধরেই ছুটলেন। বাঁধবার আর সময় হল না।

কোনো রমণী প্রসাধনকারিণীর কাছে পায়ে আলতা পরছিলেন—তিনি পা টেনে নিলেন এবং লীলামন্থর গতি ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলেন জানালার কাছে—জানালা পর্যন্ত আলতার রাগে রঞ্জিত হয়ে গেল।

কোনো কামিনী ডানচোখে কাজল পরেছেন, কিন্তু বঞ্চিত করতে হল বাঁ চোখকে; তিনি কাজল পরবার শলাকা হাতে নিয়েই ছুটে এসে দাঁড়ালেন জানালার কাছে।

অন্য কোনো রমণী জানালার দিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন—দ্রুত যাওয়ার জন্য তাঁর নিতম্বের বসন খসে পড়ল, নীবিবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। হাতে বসন ধরে রইলেন তিনি, হাতের অলংকারের দীপ্তিতে তাঁর নাভিগহ্বর উদ্ভাসিত হল।

চন্দ্রহার মেয়েদের কটিভূষণ; কোনো রমণী হয়তো চন্দ্রহার রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অর্ধেক গাঁথা না হতেই তিনিও ছুটলেন! এদিকে গতির স্খলনে তাঁর অর্ধগ্রথিত হার থেকে মণিগুলি ঝরে পড়তে লাগল, তাঁর অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে কেবল সূত্রটিই রয়ে গেল।

গবাক্ষগুলি ভরে গেল পুরসুন্দরীদের মুখের সারিতে—সেই মুখগুলি মদের গন্ধে মধুর! মনে হল জানালাগুলি পদ্মের শ্রেণীতে অলংকৃত হয়েছে, তাঁদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন ভ্রমরের সারি।

এদিকে দিবসেও চন্দ্রশেখরের ললাট-চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্রাসাদের দীপ্তি দ্বিগুণিত করে অসংখ্য পতাকা ও তোরণশোভিত রাজপথে উপস্থিত হলেন।

পুরনারীগণ তাঁকে একমাত্র দর্শনীয় মনে করে তাঁর রূপসুধা একাগ্রদৃষ্টিতে পান করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে তিনি ছাড়া আর কিছু সত্য বলে মনে হল না—মনে হল তাঁদের অন্য সব ইন্দ্রিয় চক্ষুতে প্রবেশ করেছে।

কোমলাঙ্গী অপর্ণা (পার্বতী) যে এর জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যে নারী এঁর দাসীত্ব লাভ করবে তার জীবন সার্থক; আর যে এঁর অংকশয্যায় আশ্রয় পাবে সে যে কৃতার্থ হবে তা কি আর বলতে হয়?

উমার নিকটে মহেশ্বরের এবং মহেশ্বরের নিকটে উমার রূপ স্পৃহণীয়! প্রজাপতি যদি এদের দুজনকে বিবাহসূত্রে যুক্ত না করতেন তবে এদের রূপসৃষ্টিতে তিনি যে যত্ন নিয়েছেন তা ব্যর্থ হয়ে যেত।

ক্রোধের বশে ইনি নিশ্চয়ই মদনের দেহ দগ্ধ করেন নি; মনে হয়, এই দেবতার সৌন্দর্য

দেখে মদন লজ্জায় নিজেই নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

ওগো সখি, পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন বলেই তো হিমালয়ের মস্তক উন্নত; সৌভাগ্যবশত দীর্ঘকালের ঈপ্সিত মহেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে তাঁর সেই মস্তক আরও উন্নত হল।

ওষধিপ্রস্থের বিলাসিনীদের এই রকম শ্রুতিসুখকর আলাপ শুনতে শুনতে ত্রিলোচন হিমালয়ের গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর উপরে লাজবর্ষণ হচ্ছিল আর কেয়ূরের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

সেখানে বিষ্ণুর হাতে ভর দিয়ে ত্রিলোচন তাঁর শ্বেতকায় বৃষ থেকে নেমে এলেন—যেন শরতের শুভ্র মেঘখণ্ড থেকে সূর্যদেব সরে এলেন। কমলাসন ব্রহ্মা পুরোবর্তী হলেন—তাঁর পশ্চাতে ত্রিলোচন হিমালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

শিবের অনুগমন করলেন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং শিবের অনুচরবর্গ। সকলেই হিমালয়ভবনে প্রবেশ করবেন মনে হল, ঈপ্সিত লক্ষ্যের এ এক অনুকূল সূচনা।

সেখানে যথারীতি আসনে উপবিষ্ট হয়ে ত্রিলোচন হিমালয় কর্তৃক আনীত রত্ন সহ অর্ঘোদক, মধুমিশ্রিত মধুপর্কীয় দ্রব্য, দধি, ঘৃত এবং নূতন দুটি ক্ষৌমবসন—সবই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গ্রহণ করলেন।

বিনীত ও নিপুণ অন্তঃপুর রক্ষীগণ ক্ষৌমবসনধারী ত্রিলোচনকে বধূ উমার নিকটে নিয়ে গেল—ফেনোজ্জ্বল সিন্ধু যেন আজ চন্দ্রের কিরণে বেলাভূমির আকর্ষণে চঞ্চল।

শরতের সঙ্গে মিলিত হলে জগৎ যেমন শোভিত হয়, চন্দ্রমুখী কুমারী উমার সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবের নয়ন কুমুদের ন্যায় বিকশিত এবং তাঁর হৃদয় নদীর জলের ন্যায় প্রসন্ন হয়ে উঠল।

দুজনেই পরস্পরের দর্শন কামনায় অধীর! মিলনের মুহূর্তে দুজনের দৃষ্টি যেন কোনোরূপ সংযত হয়ে ফিরে এল! এইভাবেই তখন উমা-মহেশ্বরের নয়ন লজ্জাবশত সঙ্কোচের যন্ত্রণা অনুভব করেছিল।

রক্তাভ অঙ্গুলির শোভাযুক্ত উমার হাত তুলে ধরলেন গিরিরাজ হিমালয়—অষ্টমূর্তি শিব তা গ্রহণ করলেন। উমার হাত দেখে মনে হল, শিবের ভয়ে ভীত মদন এতকাল উমার দেহে প্রচ্ছন্ন ছিল—ঐ হাত যেন সেই প্রচ্ছন্ন মদনের প্রথম অঙ্কুর।

উমার দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল, বৃষকেতু শিবের অঙ্গুলিও স্বেদাক্ত হল। এই পাণিগ্রহণ যেন মদনের প্রভাবকে দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিল।

অন্যান্য সাধারণ বিবাহে উমা-মহেশ্বরের উপস্থিতি থাকলে বধূ ও বর শ্রেষ্ঠ শোভা ধারণ করে—সেই উমা-শঙ্কর স্বয়ং যখন মিলনের জন্য উপস্থিত তখন তাঁদের বিবাহ-সভার মহিমা কি ব্যক্ত করা যায়?

পরস্পর লগ্ন দিনরাত্রি যেমন জ্যোতির্ময় মেরুপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি সেই মিলিত দম্পতি প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন।

সেই দম্পতির নয়ন পরস্পরের স্পর্শে নিমীলিত হল; পুরোহিত দম্পতিকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে উমাকে দিয়ে প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নিতে লাজবর্ষণ করালেন।

পুরোহিতের নির্দেশে উমা সেই সুগন্ধ লাজধূমের অঞ্জলি মুখে নিতে লাগলেন:

ধূমশিখা তাঁর কপোল আচ্ছন্ন করে মুহূর্তকালের জন্য কর্ণের অলংকারস্বরূপ পদ্মের মতো শোভিত হল।

আচার-ধূম মুখে নেওয়ার ফলে বধূর মুখের রূপান্তর ঘটল, তাঁর গণ্ডস্থল নবারুণের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠল, নয়নের কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনরাগ ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হল এবং কর্ণের যবাংকুর নির্মিত অলংকার ম্লান হয়ে এল।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বধূকে বললেন—বৎসে, তোমার এই বিবাহ-কর্মের সাক্ষী রইলেন অগ্নিদেব। কোনো বিচার না করে তুমি তোমার পতি শিবের সঙ্গে ধর্ম পালন করবে।

ভবপত্নী উমা (ভবানী) অপাঙ্গ পর্যন্ত কর্ণ প্রসারিত করে পুরোহিতের বাক্যসুধা পান করলেন—যেন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তপ্ত পৃথিবী ইন্দ্রের বারিবর্ষণের প্রথম ধারা পান করে তৃপ্ত হলেন।

সুদর্শন ধ্রুবপতি যখন বললেন—'ঐ ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন কর।' উমা মুখ তুলে লজ্জা-জড়িতকণ্ঠে কোনোরূপে বললেন—'দেখেছি'।

বিবাহবিধিজ্ঞ পুরোহিতের নির্দেশে এইভাবে তাঁদের পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। জগতের মাতাপিতৃস্বরূপ পার্বতী-পরমেশ্বর কমলাসনে স্থিত পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মা বধূকে আশীর্বাদ করলেন, 'কল্যাণি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও!' কিন্তু নিজে বাচস্পতি হয়েও অষ্টমূর্তি শিবকে কি বলে আশীর্বাদ করবেন তাই ভেবে নিশ্চল হয়ে রইলেন।

তারপর বর-বধূ সুসজ্জিত চতুষ্কোণ বেদীর উপরে স্বর্ণাসনে গিয়ে বসলেন—তাঁদের উপরে সিক্ত আতপ ও দূর্বা প্রভৃতির বর্ষণ শুরু হল ; সেও এক লৌকিক স্পৃহণীয় অনুষ্ঠান! সেই অনুষ্ঠান তাঁরা উপভোগ করলেন।

লক্ষ্মী তাঁদের মস্তকে পদ্মের ছত্র ধারণ করলেন—সেই ছত্র দীর্ঘ নালদণ্ডে নির্মিত, পদ্মদলের প্রান্তে লগ্ন জলবিন্দুগুলি মুক্তাজালের ন্যায় শোভিত।

সরস্বতী সেই দম্পতির স্তব করলেন দ্বিবিধ শব্দ গঠিত ভাষায়—বরেণ্য বর শিবকে সংস্কারপূত সংস্কৃত ভাষায়, উমাকে শ্রুতিমধুর প্রাকৃতে।

তারপর তাঁরা কিছুকাল অপ্সরাগণের দ্বারা প্রযোজিত জগতের আদিতম এক অভিনয় দেখলেন ; সেই অভিনয়ে যেখানে যে রস বা রাগ প্রয়োজন তা রীতি অনুযায়ী পালিত হয়েছিল—পঞ্চসন্ধিস্থলে বিভিন্ন বৃত্তি প্রযুক্ত হয়েছিল, অভিনয়ে অপ্সরাদের সুললিত অঙ্গভঙ্গী উপভোগ্য হয়েছিল।

অভিনয়ের শেষে দেবগণ নিজ নিজ শিরোভূষণে অঞ্জলি যুক্ত করে সবিনয়ে প্রার্থনা জানালেন—শাপাবসানে মদন পূর্বদেহ ধারণ করে দম্পতির সেবা করুন।

ত্রিলোচন এখন ক্রোধহীন—তিনি নিজের প্রতিও সেই পঞ্চশরের শরনিক্ষেপ অনুমোদন করলেন। যাঁরা কর্মরত তাঁরা সুযোগ বুঝে প্রার্থনা করেন বলেই তা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

এরপর চন্দ্রশেখর দেবগণকে বিদায় দিলেন। তিনি গিরিরাজ-কন্যা উমার হাত ধরে বাসরগৃহে গেলেন—সেই গৃহের দ্বারে পূর্ণ স্বর্ণ কুম্ভ, বিচিত্র পুষ্প ও আলপনায় সেই গৃহ শোভিত, ভূমিতলে রচিত হয়েছে বরবধূর শয্যা।

নবপরিণয়ের লজ্জায় উমার মুখ সুন্দর! সেই মুখ তুলে ধরতে গেলেই উমা তা সরিয়ে নেন, শয়ন সহচরীরা প্রশ্ন করলে কোনো রকমে উত্তর দেন—তাও অস্পষ্ট।

তখন ভূতনাথ তাঁর অনুচর ভূতগণকে ইঙ্গিত করতেই তারা এমন বিকৃত মুখভঙ্গী করতে লাগল যে উমা হেসে উঠলেন।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমা-পরিণয়' নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

অষ্টম সর্গ

বিবাহের পর শিবের সম্পর্কে গিরিরাজকন্যা উমার মনে এক ভাবময় ভীতির সঞ্চার হল। তাঁর সেই মনোহর রূপ দেখে শিবের হৃদয়ে নিত্য-নূতন কামনার সঞ্চার হতে লাগল।

শিব কথা বলেন, উমা উত্তর দেন না ; অঞ্চল আকর্ষণ করলে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। শয্যায় উমা পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। তবু এই উমা সম্পর্কেই মহেশ্বরের রতিভাব জেগে ওঠে।

কৌতুকবশত মহেশ্বর কপট নিদ্রার ভান করে শুয়ে থাকলে উমা তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতেন। সেই মুহূর্তেই মৃদু হেসে তিনি তাঁর নয়ন (তিনটি) উন্মীলিত করতেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদাহতার ন্যায় উমা তাঁর নয়ন নিমীলিত করে ফেলতেন।

নাভিদেশে নিহিত শঙ্করের কর উমা কম্পিত দেহে রোধ করতে যান, কিন্তু সেই দুকূলের নীবিবন্ধন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আপনিই মুক্ত হয়ে যায়।

'সখি, সমস্ত ভয় দূর করে শঙ্করকে নির্জনে এইভাবে সেবা কর'—এই বলে সখীরা তাঁকে উপদেশ দেয়। কিন্তু শঙ্কর কাছে এলে ব্যাকুল হয়ে কোনো কথাই মনে রাখতে পারেন না।

উমাকে কথা বলাবার জন্য স্মরজিৎ শঙ্কর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। উমা তখন পতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে শুধু মাথা নেড়ে তার উত্তর দিতেন।

নির্জনে শঙ্কর যখন উমার পরিধেয় বসন হরণ করতেন, তখন তিনি দুই হাতে তাঁর দু' নয়ন চেপে ধরতেন। কিন্তু শিবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন চেয়ে থাকত বলে উমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হত, তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন।

চুম্বনকালে উমার প্রতিদানে অধরদানের অভাব, গাঢ় আলিঙ্গনে হস্তের শিথিলতা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া রতিভাবের জাগরণে সহায়ক না হলেও নববধূর ঐ সকল ভাব শঙ্করের খুব প্রিয় ছিল।

অধর ক্ষত বর্জিত চুম্বন, ক্ষতচিহ্ন নখাদির উৎপীড়ন এবং প্রিয়ের যে সব কামক্রীড়া মৃদুভাবে সম্পন্ন হত সবই উমা সহ্য করতেন, কিন্তু অন্য কিছুই নহে। (অর্থাৎ বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না)।

প্রভাতে রাত্রির ঘটনা জানবার জন্য সখীরা যখন প্রশ্ন করত তখন লজ্জায় তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতেন, কিন্তু বলবার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠত!

পতিদেবতার পরিভোগ চিহ্ন দেখবার জন্য উমা যখন দর্পণের কাছে বসতেন তখন নিজের বিম্বের পশ্চাতে প্রণয়ীর প্রতিবিম্ব দেখে লজ্জায় তিনি কী যে না করতেন!

পতির দ্বারা পরিভুক্তযৌবনা উমাকে দেখে জননী মেনকা আশ্বস্তা হলেন ; কন্যা পতির আদরিণী হতে পারলেই মাতার দুঃখ দূর হয়ে থাকে।

মহেশ্বর উমাকে কয়েক দিনের মধ্যেই বশীভূত করলেন! রতিরসে অভিজ্ঞা উমাও ক্রমে ক্রমে রতিব্যাপারে বিরোধিতা ত্যাগ করলেন।

(তখন) বক্ষঃস্থল পীড়িত হয় এমনভাবেই তিনি প্রিয়াকে আলিঙ্গন করতেন; প্রিয় প্রার্থনা করলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না; মেখলালোভী পতির হস্ত অনেকটা শিথিল-ভাবেই রোধ করতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের পরস্পরের হৃদয়ভাব গভীর অনুরাগে পরিণত হল, কটাক্ষ প্রভৃতি মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে লাগল। দুজনের মধ্যে আর প্রতিকূল ভাব দেখা গেল না, আনন্দজনক আলাপের জন্য দুজনেই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ক্ষণকালের জন্যও একে অন্যের বিচ্ছেদ সইতে পারতেন না।

ঈপ্সিত বরলাভে উমার অনুরাগ যেমন নিবিড় হয়েছিল বর শংকরও সেইভাবেই উমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। জাহ্নবীর গতি সাগরের দিকে অবিচলিত থাকে, সাগরও তার জলোচ্ছ্বাস পানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন।

নির্জন রতিক্রিয়ায় উমার উপদেষ্টা ছিলেন শংকর—শংকরের শিষ্যারূপে উমা অনেক কিছুই শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে তিনি যে 'যুবতি নৈপুণ্য' অর্জন করেছিলেন তাই তিনি শংকরকে দান করেছিলেন গুরুদক্ষিণারূপে।

প্রথমে অধর দংশন, পরে মুক্তি! কিন্তু দংশনের জ্বালা তো আছেই! উমা বেদনাবিধুর হস্তে নিজের 'দষ্ট-মুক্ত' অধর-পল্লব শূলী শম্ভুর ললাটচন্দ্রের শীতল কিরণে মুহূর্তকালের জন্য জুড়িয়ে নিতেন।

চুম্বনকালে পার্বতীর অলকাস্থিত গন্ধচূর্ণে শংকরের ললাটনেত্র দূষিত হত—পার্বতীর পদ্মগন্ধপূর্ণ মুখ-মারুতের দ্বারা শংকর তা শোধন করিয়ে নিতেন।

এইভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগে পরিতৃপ্ত শংকর পূর্বদগ্ধ মদনকে উজ্জীবিত করে—উমার সঙ্গে গিরিরাজ হিমালয়ের ভবনে একমাস বাস করলেন।

কন্যাবিচ্ছেদদুঃখে ব্যাকুল হিমালয়কে সম্মত করিয়ে স্বয়ম্ভু উমাসহ অপ্রতিহত গতি বৃষে আরোহণ করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

পবনতুল্য দ্রুতগামী বাহনে পার্বতীকে সামনে বসিয়ে কৃতী শংকর মেরু পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে স্বর্ণপল্লবে রচিত শয্যায় রতিক্রিয়ায় রাত্রি যাপন করলেন।

পার্বতীর মুখপদ্মের ভ্রমর শংকর মন্দার পর্বতের মধ্যভাগে বাস করলেন; সেই পর্বতনিতম্বের শিলায় তখনও পদ্মনাভ বিষ্ণুর করধৃত বলয়ের চিহ্ন বর্তমান ছিল—নূতন সুধাবিন্দুর স্পর্শে সুশীতল।

এক পিঙ্গল গিরিতে অর্থাৎ কৈলাস পর্বতে যখন উমা-মহেশ্বর বাস করেছিলেন তখন রাবণের হুংকারে ভীত হয়ে তিনি দুই বাহুতে নীলকণ্ঠকে জড়িয়ে ধরেছিলেন; সেই সময়ে জগৎপিতা মহেশ্বর চন্দ্রের জ্যোৎস্না আরও গভীরভাবে উপভোগ করেছিলেন।

উমাকে নিয়ে শংকর যখন মলয় পর্বতে বিহার করেছিলেন তখন চন্দনবন-বিহারী দক্ষিণ সমীরণ লবঙ্গ কেশর তুলে এনে যেন চাটুকারের মতোই তাঁর প্রিয়ার ক্লান্তি দূর করেছিল।

স্বর্ণপদ্ম দিয়ে উমা শংকরকে তাড়না করতেন, শংকর হাতে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিতেন, উমার নয়ন নিমীলিত হয়ে আসত। উমা সুরতরঙ্গিণীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, মৎস্য-পংক্তি লাফিয়ে উঠত—মনে হত যেন তিনি আর একছড়া মেখলা পরেছেন।

নন্দনকাননের পারিজাত পুলোমনন্দিনী শচীর কেশভূষণ ; এই পারিজাত দিয়ে ত্রিলোচন যখন উমার প্রসাধন করে দিতেন তখন সুরবধূগণ দীর্ঘকাল সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকত।

স্ত্রী উমার সঙ্গে মহেশ্বর এইভাবে পার্থিব ও অপার্থিব সুখভোগ করলেন ; তারপর একদিন সূর্যাস্তকালে সূর্য রক্তবর্ণ ধারণ করলে—মহেশ্বর গন্ধমাদন পর্বতের অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

তখন সূর্যের প্রখর তেজ আর নেই, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে চক্ষু পীড়িত হয় না। স্বর্ণশিলাতলে উপবিষ্ট রয়েছেন শংকর, পার্বতীও তাঁর বাম বাহু আশ্রয় করে উপবিষ্টা। শংকর তখন সহধর্মিণীকে বললেন—

তোমার নয়নের তৃতীয়াংশ রক্তবর্ণ, দেখতে পদ্মের মতো। মনে হয়, দিননাথ সূর্য তাঁর পদ্মের সৌন্দর্য তোমার দুটি নয়নে গচ্ছিত রেখে অস্তাচলে যাচ্ছেন—যেন প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সংহরণ করছেন।

সূর্য অস্তমিত, তাই নির্ঝরের জলকণায় আর সূর্যকিরণের স্পর্শ ঘটছে না। সূর্য এখন দূরবর্তী, তাই তোমার পিতার (হিমালয়ের) নির্ঝরগুলির চারিদিকে আর ইন্দ্রধনুর সেই শোভা দেখা যাচ্ছে না।

সরোবরে চক্রবাক ও চক্রবাকী একটি পদ্মেরই কেশর ভক্ষণে মত্ত, এমন সময়ে রাত্রি আগত দেখে কাঁদতে কাঁদতে কেশর ত্যাগ করে তারা দুজনেই বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়েছে—উভয়ের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল রাত্রি সমাগমে তা আরও বর্ধিত হয়েছে।

বন্য হস্তীর দল দিবসে যে স্থানে ছিল সেই স্থান শল্লকীতরুর ভগ্ন শাখার নির্যাসে সুরভিত—সেই স্থান ত্যাগ করে তারা প্রভাতকাল পর্যন্ত তৃষ্ণায় কষ্ট না হয় তার জন্য জল সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় জলের পদ্মকলি নিমীলিত হওয়ার মধ্যস্থিত ভ্রমরগুলি কেমন আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

হে মিতভাষিণি! ঐ দেখ পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে স্থিত সূর্যের প্রতিবিম্ব সরোবরে প্রতিফলিত হয়েছে—সূর্য যেন সবার উপরে স্বর্ণময় সেতুবন্ধ করেছেন।

দংষ্ট্রাযুক্ত বিশাল বন্যবরাহের দল পংকময় গাঢ় সরোবরের বক্ষ আলোড়িত করতে করতে দিনের তাপ নিবারণ করেছে—এখন ওরা উপরে উঠে আসছে। ওদের শাদা ও বাঁকা দাঁত দেখে মনে হচ্ছে যেন শাদা মৃণালের খণ্ড।

ওগো পীনস্তনি সুন্দরি! ঐ গাছের চূড়ায় ময়ূর এসে বসেছে ; অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে ওদের পুচ্ছে, সেখানে যেন তরল সোনার রূপ! দিন-শেষের মধুর তাপ ওরা নীরবে পান করছে।

সমস্ত আকাশটাই যেন সূর্যের তাপে শুষ্ক এক বিশাল সরোবর। পূব দিক অন্ধকারে ঢাকা—যেন পাঁকে ভরা, পশ্চিমে সামান্য আলো—মনে হয় সেখানে সামান্য জল এখনও রয়েছে।

হরিণের দল কুটিরের অঙ্গনে প্রবেশ করছে ; মূলে জল সেচন করা হয়েছে, তাই আশ্রমতরু সরস ; শ্রেষ্ঠ হোমধেনুগুলি ফিরে আসছে, হোমের অগ্নি জ্বলে উঠেছে—সব মিলে আশ্রমগুলির কি অপূর্ব শোভা!

সূর্য অস্তাচলে, তাই পদ্ম মুদিত ; কিন্তু মুদিত হলেও ভ্রমর আশ্রয় নিতে আসবে বলে প্রীতিবশত তার অন্তর দান করবার জন্য হৃদয়-দুয়ার সামান্য উন্মুক্ত রেখেছে।

সূর্য প্রায় অস্তমিত ; যেটুকু কিরণ অবশিষ্ট আছে তাতে পশ্চিমদিক নূতন শোভায় সজ্জিতা—যেন কেশরমালায় শোভিত 'বন্ধুজীব' ফুলের তিলকে মণ্ডিত হয়ে কোনো কন্যা শোভা পাচ্ছে।

অগ্নিতে নিজের তেজ গচ্ছিত রেখে সূর্যদেব এখন অস্তাচলগামী। তাঁর কিরণের উষ্ণধারা পান করে সহস্র সহস্র (বালখিল্য ঋষি) সহচর সামগানে সূর্যের স্তব করছেন—সেই স্তবের সুরে সূর্যরথের অশ্বগুলিও কেমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছে।

সেই সূর্যদেব দিবসকে সমুদ্রবক্ষে নিহিত রেখে অস্তাচলে নেমে যাচ্ছেন। অধোমুখ অশ্বের স্কন্ধস্থ রোমরাজি চক্ষুতে পড়ে দৃষ্টি রোধ করছে এবং রথের দণ্ডে তাদের কেশর জড়িয়ে যাচ্ছে।

সূর্য অস্তমিত হওয়ায় আকাশকে প্রসুপ্ত মনে হচ্ছে। মহতের দীপ্তির এইরূপই পরিণাম হয়ে থাকে—তাঁরা আবির্ভূত হয়ে যে স্থান আলোকিত করেন, তাঁদের তিরোভাবে সে স্থান শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

উদয়শিখরে সূর্যের আরাধ্য দেহ যখন স্থাপিত হল তখন সন্ধ্যাও সেখানে উপস্থিত হলেন। উদয়ে তিনি সন্ধ্যাকে পুরোভাগে রেখেই আবির্ভূত হলেন—অস্তকালে কেন তিনি তার অনুগমন করবেন না ?

হে কুঞ্চিতকেশি ! রক্ত, পীত, কপিশ প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে ঐ মেঘের প্রান্তগুলি কেমন সুন্দর ! তুমি দেখবে বলেই যেন সন্ধ্যা তুলিকা দিয়ে মেঘের প্রান্তগুলি রঞ্জিত রেখেছে।

দেখ, পর্বত নিজেই অস্তকালের সূর্যালোক বিভক্ত করে দিয়েছেন সিংহের জটিল জটায়, নবপল্লবশোভিত বৃক্ষে এবং ধাতুময় শিখরে।

শাস্ত্রবিধিজ্ঞ পূজ্য তপস্বিগণ পাদাগ্রে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র জলে অঞ্জলি দিয়ে শুদ্ধির জন্য নিভৃতে সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করছেন।

যথাবিহিত সন্ধ্যাবন্দনা করবার জন্য মুহূর্তকাল তুমি আমাকে অনুমতি দাও—তোমার মধুরভাষিণী সখীগণ তোমার চিত্ত বিনোদন করবে।

তখন স্বামীর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই যেন ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে গিরিরাজ কন্যা সমীপবর্তিনী সখী বিজয়ার সঙ্গে অহেতুক আলাপ করতে লাগলেন।

মহেশ্বরও মন্ত্র উচ্চারণ করে সন্ধ্যাকৃত্য যথাবিধি শেষ করলেন—ফিরে এসে দেখলেন পার্বতী রোষে বাক্যহীনা ! তখন তিনি স্মিতমুখে বললেন—

ওগো কোপপরায়ণে ! অকারণে কোপ ত্যাগ কর ! আমি সন্ধ্যাকালীন নিত্যকর্মে নিযুক্ত ছিলাম—অন্য কোথাও নয় ! আমি তোমার সহধর্মচারী, চক্রবাকের মতোই আমার যে অন্য সঙ্গী নেই, তা কি তুমি জানো না ?

ওগো সুতনু ! পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃপুরুষগণকে সৃষ্টি করে তাঁরা যে তনু পিতৃগণে ন্যস্ত করেছিলেন সেই তনুই তো সূর্যের উদয়ে ও অস্তকালে পূজিত হয়ে থাকে। ওগো মানিনি, পিতামহের এই সন্ধ্যামূর্তিতে এই কারণেই আমার গৌরব।

দেখ, পূর্বদিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসছে ; যেন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছে তিমিরপীড়িতা সন্ধ্যা। মনে হচ্ছে, যেন গৈরিক ধাতুর ধারা নদীর মতো বয়ে চলেছে—তার এক তীরে তমাল তরুর শ্রেণী।

পশ্চিমদিকে সন্ধ্যার শেষরশ্মি রক্ত রেখার মতো একটু বাঁকাভাবে দেখা যাচ্ছে, মনে

হচ্ছে যেন যুদ্ধভূমি রক্তাক্ত কৃপাণ হাতে নিয়েছে।

ওগো আয়তলোচনে! দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে সন্ধ্যার শেষ আভা সুমেরু পর্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই গভীর অন্ধকার এখন অবাধভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দশদিকে।

উপরে, নিচে, সামনে, পিছনে সকল দিকেই দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত। মনে হয় রাত্রিতে জগৎ অন্ধকারের জরায়ুতে গর্ভবাস করছে।

নির্মল, পঙ্কিল, স্থাবর, জঙ্গম, সরল এবং বক্র—সব কিছুই অন্ধকারে সমান হয়ে গেছে। ভেদ বিনাশকারী অসতের বৃদ্ধিতে ধিক্।

ওগো পদ্মমুখি! রাত্রির অন্ধকার নিষিদ্ধ করবার জন্যই যজমানের প্রিয় চন্দ্র উঠছেন আকাশে; কে যেন কেতকী ফুলের পরাগে আচ্ছন্ন করেছে পূর্বদিগ্‌বধূর মুখ!

তারকাশোভিত রাত্রি আর তার পিছনে মন্দার পর্বতের অন্তরালবর্তী চন্দ্র! মনে হয় তুমি প্রিয় সখীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বিরাজিতা—আমি তোমার কথা শুনবার জন্য তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি।

পূর্বদিগ্‌বধূ নায়িকা—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপ্রকাশিত চন্দ্র যেন নায়িকার রহস্য কথা। নায়িকা এই অপ্রকাশিত রহস্যরূপী চন্দ্রকেই এখন রাত্রিরূপিণী সখি দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

দেখ পার্বতী, নবোদিত চন্দ্র প্রিয়ঙ্গুলতার সুপক্ক ফলের ন্যায় ঈষৎ তাম্রাভ—তারই প্রতিবিম্ব পড়ে আকাশ ও সরোবর বক্ষ—দুই-ই সমান বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে, এই চক্রবাক-যুথের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই আরও দূরবর্তী হচ্ছে।

চন্দ্রের কিরণ নবোদ্গত সুকুমার যবাংকুরের ন্যায় কোমল; এই কিরণ এতই ঘনীভূত যে মনে হচ্ছে নখাগ্রের দ্বারা এর খানিকটা ছিন্ন করে নিয়ে তোমার কর্ণের অলঙ্কার করা চলে!

চন্দ্রের প্রিয়া রজনী—অন্ধকার রজনীর কেশপাশ। চন্দ্র যেন তাঁর অঙ্গুলিতুল্য কিরণজালের দ্বারা সেই কেশপাশ আকর্ষণ করে রজনীর মুখচুম্বন করছে আর রজনীর কমলনয়ন ক্রমেই নিমীলিত হয়ে আসছে।

চেয়ে দেখ পার্বতী, নবোদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আকাশের অন্ধকার অর্ধেক মিলিয়ে গেছে। আকাশের এই অর্ধতিমিরাচ্ছন্ন মূর্তি—এক অংশে গজক্রীড়া দূষিত, অন্য অংশে নির্মল সলিল মানস সরোবরের স্মৃতি মনে এনে দেবে।

চন্দ্র এখন উদয়কালীন রক্তবর্ণ ত্যাগ করে নির্মল আলোকপরিধি দ্বারা বেষ্টিত হয়েছেন। যাঁরা শুদ্ধ প্রকৃতি—কালদোষে তাঁদের কোনো বিকৃতি ঘটলেও তা স্থায়ী হয় না।

উন্নত স্থানের উপর চন্দ্রের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে—আর রাত্রির অন্ধকার নিম্নস্থানে লগ্ন হয়ে আছে। গুণ ও দোষের বিচারেই বিধাতা তাদের যোগ্য পরিণাম নির্দেশ করে দিয়েছেন।

হিমালয়ের সানুদেশে তরুর শাখায় চন্দ্রের কিরণে স্নাত হয়ে ময়ূরের দল ঘুমিয়ে পড়েছে; এদিকে চন্দ্রের কিরণে চন্দ্রকান্ত শিলা থেকে জলধারা ক্ষরিত হচ্ছে—তার ফলে অসময়ে জেগে উঠছে ময়ূরেরা।

সুন্দরি, এই দিকে কল্পতরুগুলির উপর চন্দ্রের কিরণ এসে পড়েছে—মনে হচ্ছে যেন চন্দ্র কল্পতরুগুলির কাছ থেকে কিরণরূপ-কর প্রসারিত করে শ্বেত-মুক্তাহার গুণে নিতে উৎসুক হয়েছেন।

পর্বতের উন্নত ও অবনত স্থানে চন্দ্রের শুভ্র কিরণ কোথাও শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ। মনে হচ্ছে যেন এক মত্তহস্তীর দেহ শ্বেত ও কৃষ্ণ ভস্মরেখায় অলংকৃত হয়েছে!

এই বুমুদ ফুলটি চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ রস এত উচ্ছ্বসিতভাবে পান করেছে যে আর সহ্য করতে পারছে না। মুহূর্তের মধ্যে তার বৃন্ত ছাড়া আর সব অংশই বিকশিত হয়ে উঠেছে। আবাধ ভ্রমর মুক্ত হয়েই কলগুঞ্জন আরম্ভ করেছে।

ওগো চণ্ডি! কল্পবৃক্ষ থেকে এক সূক্ষ্ম বস্তু লম্বিত হয়ে শুভ্র জ্যোৎস্নার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে এর পৃথক রূপ সম্পর্কে সংশয় জাগে, কেবল বাতাস বইলেই বোঝা যায়—এটি বস্ত্র।

তরুমূলে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, মাঝে মাঝে জীর্ণ পত্র। মনে হয় রাশি রাশি কোমল ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঐগুলি সংগ্রহ করে তোমার কেশপাশে সজ্জিত করাও চলে।

ওগো সুমুখি! ঐ দেখ যোগতারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে চন্দ্র—যেন সদ্যোবিবাহিতা কন্যা এসে মিলেছে তার বরের সঙ্গে! তরল জ্যোৎস্নামণ্ডলে বেষ্টিতা যোগতারা, মনে হয় সভয়ে সলজ্জভাবে কাঁপতে কাঁপতে সে পতির কাছে এসেছে।

তুমি চন্দ্রবিম্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছ—পরিণত শরতৃণখণ্ডের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তোমার গণ্ডস্থল-সেখানে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে এক অপূর্ব দীপ্তিলাভ করেছে-মনে হচ্ছে, তোমার গণ্ড থেকেই জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে!

চন্দ্রকান্তমণিময় পাত্রে কল্পবৃক্ষের মধু সংগ্রহ করে গন্ধমাদন বনের দেবতা স্বয়ং এসেছেন তোমার সেবা করতে—কেননা তুমি মর্যাদাবতী।

অবশ্য, তোমার মুখ স্বভাবতই সরস বকুল ফুলের গন্ধে মধুর- তাই মধু যদি তোমার মুখে স্থান পায় তবে সে নূতন গুণবর্ধন করতে পারবে না।

কিন্তু সখীজনের ভক্তিকে সমাদর করা উচিত! (এরা পানীয় হস্তে উপস্থিত) তুমি এই রতি-ভাবোদ্দীপক পানীয় গ্রহণ কর- এই বলে শংকর উমাকে সেই মধু পান করালেন।

অলংঘ্য বিধির বিধানে কোনোরূপ তর্ক চলে না—এই নিয়মে আম্রতরুর সঙ্গে যেমন রসাললতিকা মিলিত হয়—উমা সেইরূপ শংকরের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুরাপানজনিত মত্ততা তখন উমাকে অধিকার করেছে—কিন্তু সেই বিকৃতি শংকরের হৃদয়গ্রাহী।

সেই মুহূর্তে উমা শূলী শম্ভু এবং সুরা—দুইয়েরই বশীভূতা হয়েছিলেন; দুইয়ের প্রভাবেই তাঁর লজ্জা পরিত্যক্ত হল এবং বর্ধিত হল অনুরাগ।

উমার নয়ন তখন ঈষৎ আঘূর্ণিত, কথা জড়িয়ে আসছে, দেহে দেখা দিয়েছে স্বেদবিন্দু, মুখে ফুটে উঠেছে অকারণ মৃদু হাসি। উমার মুখের সেই সৌন্দর্যসুধা শংকর অনেকক্ষণ ধরে নয়ন দিয়েই পান করলেন, মুখ দিয়ে নয়।

শংকর তাঁকে বহন করে নিয়ে এলেন মণিময় প্রস্তরখচিত নির্জন রতিমন্দিরে! উমার নিতম্বস্থ স্বর্ণমেখলা লম্বিত হয়ে পড়েছিল; তাঁর বিপুল জঘনভার শংকরের কাছে দুর্বহ বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর ইচ্ছামাত্রেই সেই রতিমন্দির বিচিত্র ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ হয়েছিল।

চন্দ্র যেমন প্রিয়া রোহিণীর সঙ্গে শরতের মেঘশয্যায় বিশ্রাম করেন সেইরূপ শংকরও উমাকে নিয়ে শয্যায় শয়ন করলেন—সেই শয্যা হংসের ন্যায় শ্বেত আস্তরণে ঢাকা এবং জাহ্নবী পুলিনের ন্যায় সুন্দর।

রতিক্রীড়ায় কেশাকর্ষণ অক্ষুণ্ন রইল, চন্দনচিহ্ন মুছে গেল, অস্থানে আঘাতের সীমা

রইল না। উমার মেখলা ছিন্ন হয়ে গেল। এইভাবে নানারকমে ভোগের পরেও উমার সঙ্গে রতিযুদ্ধে শঙ্করের তৃপ্তি পূর্ণ হল না।

আকাশচারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবনত হল অর্থাৎ রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল ; শুধু প্রিয়তমার প্রতি দয়ালু হয়েই বক্ষঃপ্রসুপ্তা উমাকে নিয়ে নয়ন মুদ্রিত করে নিদ্রিত হলেন।

কিন্নরগণ কৈশিক রাগে উমার মঙ্গলগীতি গাইতে আরম্ভ করল—সেই গীত মূর্ছনায় সমৃদ্ধ! সরোবরে স্বর্ণকমল ফুটতে লাগল—পণ্ডিতগণের স্তবযোগ্য চন্দ্রশেখরও জেগে উঠলেন।

কিছুক্ষণের জন্য আলিঙ্গন শিথিল হল। তখন দম্পতি গন্ধমাদন বনের প্রভাত সমীরণ ভোগ করতে লাগলেন—যে সমীরণ মানস সরোবরের তরঙ্গকেও চঞ্চল করে তোলে।

উমার উরুমূলে নখক্ষত চিহ্ন প্রভৃতির দিকে শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল। উমা তৎক্ষণাৎ শিথিল বস্ত্র সংযত করতে উদ্যত হলেন—শঙ্কর তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন।

রাত্রির জাগরণে উমার দুনয়ন রক্তবর্ণ, তাঁর অধর গভীরভাবে দন্তাঘাতে বিক্ষত, কেশ স্রস্ত এবং তিলক স্থানচ্যুত। প্রিয়ার এই মুখ দেখে অনুরাগে শঙ্করের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল।

রাত্রির অবসানে নির্মল প্রভাত প্রকাশিত হলেও ; শয্যার আবরণ ছিন্ন এবং এলোমেলো—মধ্যস্থলে ছিন্ন মেখলা জড়ীভূত, চরণের আলতায় শয্যা অঙ্কিত—তবু সেই শয্যা তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না।

হৃদয়ের আনন্দ বর্ধনকারী প্রিয়ার মুখামৃত দিনরাত্রি পান করবার জন্য তাঁর এতই পিপাসা যে উমার সখী বিজয়া এসে বললেন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করলেন না।

এইভাবে নিশিদিন উমার সঙ্গে যুক্তভাবে শঙ্করের, দেড়শত ঋতু এক রাত্রির মতো অতিবাহিত হল, তবু তাঁর আসঙ্গতৃষ্ণা মিটল না। সমুদ্রগর্ভে নিহিত বাড়বাগ্নি যেমন জলসংঘাতের ফলে বেড়েই চলে—তাঁর রতিলিপ্সাও তেমনি বাড়তে লাগল।

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমা-শঙ্কর বিহার' নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

রঘুবংশ

প্রথম সর্গ

শব্দ ও অর্থের জ্ঞানলাভের জন্য শব্দ ও অর্থের মতো নিত্যযুক্ত জগতের জনক-জননী পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি।

কোথায় সেই সূর্যজাত বংশ, আর কোথায় (আমার) স্বল্পপরিসর বুদ্ধি। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভেলায় করে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চাইছি।

দীর্ঘাকৃতি পুরুষের লভ্য ফল আহরণের জন্যে যদি খর্বাকৃতি কেউ হাত বাড়ায় তাহলে সে যেমন উপহাসাস্পদ হয়, কবিখ্যাতিলিপ্সু অপটু আমিও তেমনি উপহাসাস্পদ হব।

অথবা মণিবেধন-যন্ত্রে উৎকীর্ণ হলে সেই ছিদ্রপথে সুতো যেমন সহজে প্রবেশ করতে পারে (বাল্মীকি-প্রমুখ) পূর্বসূরীরা এই (সূর্য) বংশের দ্বারা বাঙ্ময় কাব্য দিয়ে উন্মোচন করার ফলে সেই (সূর্য) বংশে আমার প্রবেশও সম্ভব হবে।

যে রঘুবংশজাত পুরুষেরা আজন্মশুদ্ধ, ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যাঁরা কর্মত্যাগ করতেন না, যাঁরা সসাগরা ধরণীর অধিপতি ছিলেন, যাঁদের রথের পথ স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁরা বিধিমতো যাগযজ্ঞ করতেন, যাঁরা অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যথোচিত দণ্ড দিতেন, যথাকালে যাঁরা প্রবোধিত হতেন, দানের জন্যই যাঁরা অর্থ সংগ্রহ করতেন, সত্যের জন্যই (পাছে সত্যের অপলাপ হয় এই ভয়ে) যাঁরা মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্যই যাঁরা বিজয়কামী ছিলেন, সন্তানের জন্যই যাঁরা দারপরিগ্রহ করতেন, শৈশবে বিদ্যার্জন, যৌবনে বিষয়ভোগ এবং বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে যাঁরা পরিণত বয়সে যোগবলে দেহত্যাগ করতেন, আমার বাগ্বিভব অল্প হলেও তাঁদের গুণরাশির কথা শুনে চাপল্য-প্রণোদিত হয়ে সেই আমি রঘুবংশজাত সেই পুরুষদের বংশ (-গৌরব) বর্ণনা করতে চলেছি।

ভালোমন্দ বিচার যাঁদের হাতে সেই সজ্জনেরা তা শুনবেন। সোনার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আগুনেই পরীক্ষিত হয়।

রাজা দিলীপ

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন (সমস্ত মন্ত্রের আদিভূত ও মাননীয়) তেমনি রাজকুলের আদিভূত এবং মনীষীদের মাননীয় সূর্যতনয় মনু নামে এক রাজা ছিলেন।

ক্ষীর-সমুদ্রে যেমন চন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর (মনুর) পবিত্র বংশে দিলীপ নামে এক রাজচন্দ্রের জন্ম হয়।

তাঁর বক্ষঃস্থল ছিল বিপুল, স্কন্ধদেশ ছিল বৃষের (স্কন্ধের) মতো, তাঁকে দেখলে মনে হত বুঝি সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম তার যোগ্য কাজ করবার উপযুক্ত এক দেহ ধারণ করেছে।

সমস্ত শক্তিতে ছাপিয়ে, সমস্ত তেজকে পরাভূত করে, সকলকে উচ্চতায় পরাজিত করে তিনি যেন মেরুপর্বতের মতোই পৃথিবী আক্রমণ করে আছেন।

আকৃতির অনুরূপই তাঁর প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অনুরূপই তাঁর বিদ্যা, বিদ্যার অনুরূপই তাঁর কর্ম, আর কর্মের অনুরূপই তাঁর সিদ্ধি।

(তেজঃপ্রতাপাদিতে) প্রচণ্ড অথচ (দয়াদাক্ষিণ্যাদিতে) রমনীয় নৃপগুণে তিনি আশ্রিতদের কাছে একাধারে অগম্য এবং শরণ্য ছিলেন, হিংস্রজলজন্তুর জন্যে এবং রত্নরাজির জন্যে সমুদ্র যেমন একাধারে দুষ্প্রবেশ্য এবং আশ্রয়ণীয় তেমনি।

(নিপুণ) সারথিচালিত রথচক্র যেমন পূর্ববর্তী রথচক্রের চিহ্ন থেকে বিচ্যুত হয় না, তাঁর প্রজারাও তেমনি তাঁর শাসনে মনুর সময় থেকে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে রেখামাত্রও বিচ্যুত হত না।

প্রজাদের হিতের জন্যেই তিনি তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন। সহস্রগুণ দেবার জন্যেই তো সূর্য পৃথিবী থেকে (বাষ্পরূপে) জল গ্রহণ করেন।

সেনা তার ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদের মতোই ছিল। শাস্ত্রে তাঁর অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং ধনুকে আরোপিত জ্যা এই দুটো জিনিসেই তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ হত।

মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন তিনি, আকার-ইঙ্গিতও ছিল সাধারণের অগোচর। জন্মান্তরের সংস্কারের মতো ফল দেখেই তাঁর কাজ বোঝা যেত।

তিনি আদৌ ভীত না হয়ে আত্মরক্ষা করতেন, আতুর (রুগ্ন) না হয়ে ধর্মাচরণ করতেন, লুব্ধ না হয়ে অর্থগ্রহণ করতেন, আসক্ত না হয়ে সুখভোগ করতেন।

জ্ঞান সত্ত্বেও মৌন, শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা, ত্যাগ সত্ত্বেও দর্পহীনতা—তাঁর মধ্যে এই পরস্পরবিরোধী গুণগুলির সহাবস্থান দেখে মনে হয় এরা যেন সহোদরের মতো!

তিনি ছিলেন বিষয়ে নিস্পৃহ, বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্মপ্রেমিক, (এইসব গুণের জন্যে) জরা না এলেও অর্থাৎ যৌবনেই তিনি বৃদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন।

প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন বলে তিনিই ছিলেন তাঁদের পিতা। প্রকৃত পিতারা ছিলেন জন্মদাতা মাত্র।

সমাজশৃঙ্খলার জন্যেই তিনি অপরাধীদের দণ্ড দিতেন এবং সন্তানের জন্যেই দারপরিগ্রহ করেছিলেন, তাই সেই মনীষীর অর্থ ও সম্ভোগ ছিল ধর্মানুগ।

তিনি যজ্ঞের জন্যে পৃথিবীকে দোহন করতেন, আর ইন্দ্র শস্যের জন্যে স্বর্গ দোহন করতেন, এইভাবে সম্পদ-বিনিময় করে উভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য এই দুই ভুবনের পুষ্টি বিধান করতেন।

রাজ্যরক্ষায় নিপুণ দিলীপের যশের অনুকরণ রাজারা করতে পারত না। কারণ, চৌর্য পরধন থেকে নিবৃত্ত হয়ে শুধু কথাতেই পর্যবসিত হয়েছিল।

সজ্জন হলে, শত্রুও রোগীর কাছে ওষুধের মতো তাঁর প্রিয় হত। আবার প্রিয়জন যদি দোষযুক্ত হত তাঁকে সাপে কাটা আঙুলের মতো ত্যাগ করতেন তিনি।

বিধাতা তাঁকে নিশ্চয় (পঞ্চ) মহাভূতের উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তাঁর সব গুণই একমাত্র পরার্থেই উৎসর্গিত।

অন্য কারো শাসন-নিরপেক্ষ এই পৃথিবীকে তিনি একটিমাত্র রাজপুরীর মতোই শাসন করেন। সমুদ্র যেন সেই পৃথিবী-পুরীর পরিখা এবং সমুদ্রের বেলাভূমি যেন তার প্রাচীর।

যজ্ঞের দক্ষিণার মতো তাঁর মগধবংশসম্ভূতা পত্নী ছিলেন সুদক্ষিণা, যাঁর নামটি দাক্ষিণ্য থেকেই উদ্ভূত।

অন্তঃপুরের পরিসর বড়ো হলেও অর্থাৎ অনেক পত্নী থাকা সত্ত্বেও সেই মনস্বিনী (সুদক্ষিণা) ও রাজলক্ষ্মী এই দুজনকে দিয়েই ভূপতি নিজেকে প্রকৃত কলত্রবান্ বলে মনে করতেন।

আত্মানুরূপা সেই পত্নীতে (পুত্ররূপে) আত্মজন্মে উৎসুক হয়েও তার মনোরথের ফলে বিলম্ব দেখে (কোনমতে) কালযাপন করছিলেন তিনি।

সন্তানকামনায় তিনি পৃথিবীর গুরুভার নিজের হাত থেকে মন্ত্রিমণ্ডলের উপরে অর্পণ করলেন।

বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা

তারপর সেই দম্পতি পুত্রকামনায় প্রযত্নচিত্তে বিধাতার অর্চনা করে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন।

মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত একটি রথে আরোহণ করে তাঁরা দুজন বর্ষাকালীন (মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিময়) মেঘে সমাসীন বিদ্যুৎ ও ঐরাবতের মতো শোভা পেলেন।

পাছে আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হয় এই ভয়ে খুব সামান্য অনুচর তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন, তবু বিশেষ তেজোময়তায় মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন সেনাবৃত হয়ে চলেছিলেন।

শালতরুর পত্রভঙ্গে সুবাসিত, পুষ্পপরাগছড়ানো এবং বনরাজিকে ঈষৎ আন্দোলিত করে প্রবাহিত সুখস্পর্শ বায়ু তাঁদের সেবা করতে লাগল।

তাঁদের রথচক্রের ধ্বনিতে (মেঘরবভ্রমে) উন্মুখ হয়ে ময়ূরেরা দ্বিধাবিভক্ত ষড়জস্বরের মতো মনোরম কেকাধ্বনি করতে লাগল। তাঁরা সেই কেকাধ্বনি শুনতে শুনতে চললেন।

মৃগমিথুনেরা পথ ছেড়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রথের দিকে চেয়ে রইল। তাঁরা তাদের চোখে পরস্পরের চোখের সাদৃশ্য দেখতে থাকলেন।

সারসপঙক্তি সার বেঁধে কলগুঞ্জন করতে করতে উড়ে যাচ্ছিল। তাঁরা কখনো কখনো মুখ তুলে স্তম্ভহীন তোরণমালার মতো সেই সারসদের দেখতে দেখতে চললেন।

অভিলাষসিদ্ধির দ্যোতক বায়ু অনুকূল ছিল বলে ঘোড়ার ক্ষুর-থেকে-ওঠা ধুলো তাঁদের চূর্ণকুন্তল স্পর্শ করছিল।

পদ্মদীঘিগুলির তরঙ্গসংসর্গে শীতল বায়ুর আঘ্রাণ নিতে নিতে তাঁরা চললেন। সেই বায়ু ছিল তাঁদের নিজেদেরই নিঃশ্বাসের অনুরূপ।

নিজেদের দান করা যূপচিহ্নিত গ্রামগুলিতে ঋত্বিকদের অর্ঘ্য এবং তারই সঙ্গে অব্যর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে চললেন তাঁরা।

সদ্য-প্রস্তুত ঘি নিয়ে গোপবধূরা উপস্থিত হতে লাগল। তিনি তাদের পথের-ধারে-গজিয়ে-ওঠা বুনো গাছপালার নাম জিজ্ঞাসা করতে করতে চললেন।

শীতের অবসানে চিত্রানক্ষত্র ও চন্দ্রর মিলনে যে অপূর্ব শোভা হয় শুভ্রবেশে প্রস্থানরত তাঁদের দুজনেরও সেই শোভা হয়েছিল।

সৌম্যকান্তি রাজা যেন স্বয়ং বুধ; পত্নীকে এটা ওটা দেখাতে দেখাতে কতটা পথ এলেন বুঝতেই পারলেন না।

(দীর্ঘপথযাত্রায়) রথের বাহন অর্থাৎ অশ্বদুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুর্লভ যশের অধিকারী রাজা সন্ধ্যায় মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে সংযমী সেই মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হলেন।

বশিষ্ঠের তপোবন

সমিৎকুশ ও ফল আহরণ করে বনান্তর থেকে ফিরে তপস্বীরা আশ্রম পূর্ণ করে তুললেন। আশ্রমের হোমাগ্নি যেন অদৃশ্যভাবে তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করল।

ঋষিপত্নীদের কুটিরের দুয়ার আগলে দাঁড়ানো মৃগেরা আশ্রমকে পূর্ণ করে তুলল। এরা যেন ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো। তাঁদের নীবার ধানের অংশ নিতে এরা অভ্যস্ত।

আলবালে জলপান করতে অভ্যস্ত পাখিদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে আলবালে জল দিয়েই মুনিকন্যারা গাছগুলি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল।

রোদ চলে যাওয়ায় নীবার ধানের গোছাগুলি একসঙ্গে গুছিয়ে রাখা পর্ণশালার আঙিনায় বসে হরিণেরা রোমন্থন করছে।

হোমাগ্নি জ্বালানো হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ধোঁয়া থেকে, হোমের গন্ধবাহী বায়ুচালিত সেই ধোঁয়া আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের পবিত্র করছে।

"বাহনদের বিশ্রাম করাও" সারথিকে এই আদেশ দিয়ে তিনি (দিলীপ) তাঁর পত্নীকে রথ থেকে নামালেন এবং নিজে নামলেন।

নীতিই রাজার (আশ্রমের রক্ষাবিধায়ক) চোখ এবং তিনি পূজাস্পদ; তাঁকে ও তাঁর পত্নীকে পরম জিতেন্দ্রিয় মুনিরা অভ্যর্থনা করলেন।

(তখন) তিনি (হোমাদি) সন্ধ্যাবিধির পর ঋষিকে দেখলেন, তাঁর পিছনে বসেছিলেন অরুন্ধতী। মনে হল তিনি যেন স্বাহাসমন্বিত অগ্নিকেই প্রত্যক্ষ করলেন।

রাজা ও মগধরাজতনয়া রাজমহিষী তাঁদের পাদ-গ্রহণ করলেন, গুরু ও গুরুপত্নীও সস্নেহে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন।

আতিথেয়তায় তাঁদের রথযাত্রাজনিত ক্লান্তি দূর হলে ঋষি রাজ্যরূপ আশ্রমের ঋষিকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তারপর শত্রুপুরবিজয়ী শব্দার্থতত্ত্ববিদ্ বাগ্মিপ্রবর দিলীপ সেই অথর্ববেদবিদ্ ঋষির সম্মুখে বলতে লাগলেন।

যে-আমার দৈবী ও মানুষী আপদ্-রাশি নিবারণ কর্তা স্বয়ং আপনি, সেই আমার সাতটি অঙ্গেই যে মঙ্গল এ তো খুবই স্বাভাবিক।

আমার বাণরাজি যা দেখে তাই ভেদ করতে পারে, কিন্তু মন্ত্রকৃৎ আপনার মন্ত্ররাজিতে দূর থেকেই শত্রুরা প্রতিহত হয়। তাই আমার বাণ আপনার মন্ত্রের কাছে অকেজো।

হে হোতা ! আপনি বিধিসমতভাবে অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেন তা-ই শস্যবিঘ্ননাশী বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়।

আমার প্রজারা যে শতবর্ষ জীবিত থাকে এবং শস্যবিঘ্নরহিত হয়ে নির্ভয়ে থাকে আপনার ব্রহ্মতেজই তার কারণ।

আপনি ব্রহ্মার পুত্র। আপনার মতো গুরু এইভাবে যার মঙ্গলচিন্তা করেন সেই আমার সম্পদ কেন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রইবে না।

কিন্তু আপনার এই বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তানের মুখ না দেখায় দ্বীপবতী ও রত্নপ্রসূ পৃথিবীও আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে না।

আমার পর বংশে পিন্ড দেবার কেউ রইল না দেখে নিশ্চয়ই স্বর্গত পিতৃপুরুষেরা এখান থেকেই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিন্ডাদির কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রহে তৎপর হয়ে আমার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকৃত্যে পর্যাপ্ত আহার করছেন না।

আমার পরে দুর্লভ হবে ভেবে আমার দেওয়া জলটুকু তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পান করেন আর সেই দীর্ঘশ্বাসে সে-জল নিশ্চয়ই ঈষদুষ্ণ হয়ে ওঠে।

সেই আজি যজ্ঞসম্পাদন অন্তরে বিশুদ্ধ হয়েও সন্তানলোপের দরুন নিমীলিত—অর্থাৎ বাহ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমি যেন লোকালোক পর্বতের মতো যার দিঙ্মন্ডল আলো ও অন্ধকারে মন্ডিত।

তপস্যা ও দানে অর্জিত পুণ্য কেবল পরলোকে সুখের কারণ হয়, কিন্তু শুদ্ধবংশে জাত সন্তান পরলোক ও ইহলোক উভয়লোকেই সুখের কারণ।

হে বিধাতা ! আমি যেন আপনার নিজের হাতে জলসেকে বর্ধিত অথচ নিষ্ফল আশ্রমতরুর মতো ; আমাকে সন্তানহীন দেখে আপনার দুঃখ হচ্ছে না কেন ?

ভগবন্ ! অস্নাত গজরাজের বন্ধনস্তম্ভ তার কাছে যেমন মর্মপীড়াদায়ক হয় পিতৃঋণও আমার কাছে তেমনি সুদুঃসহ হয়ে উঠেছে।

হে তাত ! (সেই ঋণ থেকে) যাতে আমি মুক্ত হতে পারি তাই করুন। দুর্লভ হলেও ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সিদ্ধি আপনারই আয়ত্ত।

অপুত্রকতার কারণ

রাজা এইভাবে সব জানালে ঋষি ক্ষণকালের জন্য ধ্যানস্তিমিতনয়নে হ্রদের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন, যে-হ্রদের মাছেরা সব ঘুমন্ত।

তিনি ধ্যানে রাজার সন্তানহীনতার কারণ প্রত্যক্ষ করলেন এবং তারপর তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেম।

অতীতে কোন-একদিন ইন্দ্রকে উপাসনা করে তুমি যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলে তখন পথে কল্পতরুর ছায়ায় বসেছিল কামধেনু সুরভি।

ঋতুস্নাতা এই মহিষীকে ধর্মলোপের ভয়ে স্মরণ করে তুমি প্রদক্ষিণ ক্রিয়ার যোগ্য এই ধেনুর প্রতি যোগ্য আচরণ কর নাই ; (অর্থাৎ একে প্রদক্ষিণ করার কথা বিস্মৃত হয়েছিলে)।

আমাকে অবজ্ঞা করলে, তাই আমার সন্তানের সেবা না করলে তোমারও সন্তান হবে না—তোমাকে সে এই শাপ দিয়েছিল।

হে রাজন্ ! মন্দাকিনীর প্রবাহে উদ্দাম দিগ্গজের চিৎকারে সেই শাপ তুমিও শোন

নি, তোমার সারথিও শোনে নি।

তাকে অবজ্ঞা করার ফলে নিজের মনোরথ অর্গলযুক্ত বলে জানো। কারণ পূজনীয়ের পূজার ব্যতিক্রম মঙ্গল রোধ করে।

সে (সুরভি) এখন বরুণের দীর্ঘকালীন এক যজ্ঞের ঘৃত যোগাবার জন্যে পাতালে বাস করছে। সাপ আগলে আছে সেই পাতালের দ্বার।

সন্তানলাভের উপায় নন্দিনীসেবা

তাঁর কন্যাকে সুরভির প্রতিনিধি করে পবিত্র হয়ে সপত্নীক তার সেবা কর। সন্তুষ্ট হলে সে অভীষ্ট পূরণ করবে।

এ কথা বলতে বলতেই এই হোতার (মুনির) হোমের সাধনরূপিণী নন্দিনীনামে অনিন্দনীয় (সেই) ধেনু বন থেকে ফিরল।

সন্ধ্যা যেমন নবোদিত চন্দ্রকে ধারণ করে পল্লবস্নিগ্ধা ও পাটলবর্ণবিশিষ্টা সেই ধেনুও তেমনি ললাটে ঈষৎ বক্র রোমাবলি ধারণ করে শোভা পাচ্ছিল।

তার পীনস্তন কুণ্ডের মতো। বৎসদর্শনে ক্ষরিত ঈষদুষ্ণ দুধের ধারায় সে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সেই দুধের ধারা ছিল অবভৃত স্নানের চেয়েও পবিত্র।

তার খুরের আঘাতে ওঠা ধুলো কাছ থেকেই রাজার দেহ স্পর্শ করে তাঁকে তীর্থ-স্নানের পবিত্রতায় মণ্ডিত করছিল।

লক্ষণজ্ঞ ঋষি পুণ্যদর্শনা তাকে (নন্দিনীকে) দেখে বুঝলেন রাজার প্রার্থনায় সাফল্য সূচিত হয়েছে, (সেই মর্মে) তিনি যজমানকে (রাজাকে) বললেন।

হে রাজন্! তোমার সিদ্ধি নিকটবর্তী বলে মনে করতে পারো, কারণ এই কল্যাণী নাম করতে করতেই উপস্থিত হয়েছে।

এখন বন্যবৃত্তি অবলম্বন করে (অর্থাৎ বনের ফলমূল আহার করে) অভ্যাসবলে বিদ্যালাভের মতো নিরন্তর অনুসরণ করে একে সন্তুষ্ট কর।

এ চললে তুমি চলবে, এ দাঁড়ালে তুমি দাঁড়াবে, এ বসলে তুমিও বসবে, এ জল পান করলে তুমিও জল পান করবে।

বধূও নন্দিনীর পূজা সেরে ভক্তিমতী হয়ে পূতচিত্তে প্রভাতে তপোবনপ্রান্ত পর্যন্ত এই গাভীর অনুগমন করবে এবং সন্ধ্যায় তাকে প্রত্যুদ্গমন করবে।

যতদিন না এ প্রসন্ন হবে ততদিন এর সেবা করবে। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি তোমার পিতার মতো পুত্রবানদের অগ্রগণ্য হও।

দেশকালজ্ঞ শিষ্য (রাজা) প্রীত হয়ে সপত্নীক আনত হয়ে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন।

গুরুর প্রসন্নতায় রাজার মুখে কান্তি ফিরে এল। প্রদোষে প্রজ্ঞাবান সত্য-প্রিয়ভাষী সেই ব্রহ্মার পুত্র (প্রসন্নতায়) তাঁকে (নৈশ) বিশ্রাম গ্রহণের (নিদ্রার) আদেশ দিলেন।

ব্রতাদিনিয়মে অভিজ্ঞ মুনি তপঃসিদ্ধি সত্ত্বেও (তপস্যাবলে রাজোচিত শয্যানির্মাণে সমর্থ হলেও) নিয়মনিষ্ঠার অনুরোধে (এখন থেকেই এরা ব্রহ্মচর্য পালন করুক এই অভিপ্রায়ে) এই রাজার জন্য অরণ্যোচিত শয্যারই (পর্ণশয্যার) ব্যবস্থা করলেন।

সেই রাজা কুলপতিপ্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশ করে ব্রতচারিণী পত্নীসহ কুশশয্যায়

শয়ন করলেন এবং তাঁর শিষ্যদের অধ্যয়নে (বেদপাঠধ্বনিতে) রাত শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে জাগ্রত হলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'বশিষ্ঠাশ্রমে গমন' নামক প্রথম সর্গ ॥

দ্বিতীয় সর্গ

নন্দিনীর সেবারত দিলীপ

তারপর প্রভাতে যশ-ই যার সম্পদ সেই প্রজাধিপতি দিলীপ পত্নীকে দিয়ে গাভীটিকে ফুল-চন্দনে (গন্ধ ও মাল্যে) সাজালেন ; (তার) বাছুরটিকে দুধ খাওয়ার পর বেঁধে রাখলেন, আর ঋষির ধেনুটিকে 'বনে যাবার' জন্যে ছেড়ে দিলেন।

স্মৃতি যেমন বেদের অনুগমন করে পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা রাজার ধর্মপত্নীও তেমনি (নন্দিনী) ঘুরন্যাসে পবিত্র যার ধূলি সেই পথ অনুসরণ করলেন।

যশঃসুরভি দয়ালু রাজা দয়িতাকে (আশ্রমপ্রান্ত থেকে) ফিরিয়ে দিয়ে সুরভি-কন্যাকে রক্ষা করতে লাগলেন। মনে হল পৃথিবীই যেন ঐ ধেনুরূপ ধারণ করেছে, তার চারটি সমুদ্র যেন (ধেনুর) চারটি স্তন।

ব্রত পালনের জন্যে সেই গাভীর অনুগমনকারী রাজা অবশিষ্ট অনুচরদেরও (আর বেশী দূর যেতে) নিষেধ করলেন। তাঁর দেহরক্ষার জন্যে অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ মনুর সন্তান স্বশক্তিতেই সুরক্ষিত।

কখনো সুস্বাদু তৃণের গ্রাস মুখে তুলে ধরে, কখনো তার পা চুলকিয়ে দিয়ে, কখনো বা মশা তাড়িয়ে এবং তাকে যেখানে খুশি অবাধে যেতে দিয়ে সম্রাট তার সেবায় তৎপর হলেন।

সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়ান, সে চললে তিনিও চলেন, সে বসলে তিনিও স্থির হয়ে বসেন, সে খেলে তবেই তিনি জল খান, এইভাবে রাজা ছায়ার মতো তার অনুগমন করলেন।

(ছত্রচামরাদি) রাজচিহ্ন ত্যাগ করলেও তিনি যে রাজলক্ষ্মী ধারণ করে আছেন তা বোঝা যাচ্ছিল তাঁর তেজের প্রাবল্যে। এই অবস্থায় তাঁকে দেখাচ্ছিল একটি অন্তর্মদ গজরাজের মতো, বাহিরে যার মদরেখার কোনো লক্ষণই নেই।

লতাগুচ্ছ দিয়ে চুল বেঁধে, ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে তিনি বনে বিচরণ করতে লাগলেন, দেখে মনে হল তিনি যেন মুনির হোমধেনুকে রক্ষা করার ছলে বনের দুষ্ট প্রাণীদের শিক্ষা দিতে এসেছেন।

বরুণকল্প রাজা অনুচরদের পরিহার করলেও পাশের গাছগুলি পাখির কলরবে যেন রাজার জয়গান গাইতে লাগল।

রাজা কাছে এলে বায়ুতাড়িত তরুলতাগুলি অগ্নিকল্প বন্দনীয় সেই রাজার উপর ফুল ছিটিয়ে দিল, মনে হল পুরবালারা লাজাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

হাতে ধনুক থাকলেও তাঁর নির্ভয় হৃদয় তাঁর দয়ার্দ্র মনোভাবটিকেই যেন প্রকাশ করছিল। তাঁর শরীর দেখে হরিণেরা চোখের অতি বিস্তারের ফল পেল (অর্থাৎ তাদের টানা টানা চোখের দৃষ্টি সার্থক হল)।

তিনি কুঞ্জে কুঞ্জে বনদেবতাদের উচ্চকণ্ঠে গাওয়া নিজের যশোগান শুনলেন। বাতাস বাঁশের ছিদ্র পূর্ণ করায় যে ধ্বনি উঠল তাইতে (সে গানের সঙ্গে) বাঁশির কাজও সম্পন্ন হল।

ছাতা নেই, রোদে ক্লান্ত; কিন্তু পাহাড়ী ঝরণার হিমকণায় সিক্ত এবং গাছের মৃদু-কাঁপনলাগা ফুলের-গন্ধ-বওয়া বাতাস ব্রত-পূত সেই রাজাকে সেবা করল।

সেই রক্ষক বনে প্রবেশ করাতে বৃষ্টি ছাড়াই দাবানল নিভে গেল, ফল ও ফুলেরও হল বিশেষ প্রাচুর্য; সবল (প্রাণী) কোনো দুর্বলকে পীড়া দিল না।

পল্লবের মতো ঈষৎ তাম্রবর্ণ সূর্যকিরণ এবং ধেনু উভয়েই তাদের সঞ্চরণে দিগন্ত পবিত্র করে দিনান্তে যার যার আবাসে যেতে উদ্যত হল।

মধ্যমলোক অর্থাৎ মর্ত্যলোকের পালক দিলীপ দেবকার্য, পিতৃকার্য এবং অতিথিকার্য সম্পাদনের জন্যে তাঁর (নন্দিনীর) অনুগমন করায় সে (নন্দিনী) সজ্জনসম্মত বিধির সঙ্গে যুক্ত সাক্ষাৎ শ্রদ্ধার মতো শোভা পেয়েছিল।

তিনি বনভূমি দেখতে দেখতে চললেন! বনভূমির পল্লব থেকে বরাহের দল বেরিয়ে আসছিল, ময়ূরেরা আবাস-তরুর দিকে উন্মুখ হয়েছিল, তৃণভূমিতে ময়ূরেরা বসেছিল। এই বনভূমি (সন্ধ্যাসমাগমে) ক্রমশ শ্যামবর্ণ ধারণ করছিল।

স্তনভার বইবার প্রয়াসে সেই (একবৎসা) গাভী এবং দেহের গুরুত্বের জন্যে রাজা উভয়েই মনোজ্ঞ গতিভঙ্গীতে তপোবনে ফেরার পথটিকে অলংকৃত করেছিলেন।

ফিরে এসে

বশিষ্ঠধেনুর অনুগামী সেই রাজাকে ফিরতে দেখে বনপ্রান্ত থেকে তাঁর পত্নী উপোষী দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে যেন পান করলেন। সে-দুটি চোখের পাতা পলক ফেলতেও অলস।

পথে রাজা তাকে সামনে রেখে চলেছেন, রাজার ধর্মপত্নী তাকে প্রত্যুদ্গমন করতে এগিয়ে এসেছেন। এ অবস্থায় দুজনের মাঝখানে সেই ধেনু দিন আর রাত্রির মধ্যে স্থিত সন্ধ্যার মতো শোভা পেল।

সেই পয়স্বিনীকে খই-এর পাত্র হাতে নিয়ে সুদক্ষিণা প্রদক্ষিণ করলেন এবং প্রণাম করে তার দুটি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানটিকে অর্চনা করলেন। সেই স্থানটি যেন অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ।

বৎসটির জন্যে খুবই উৎসুক হলেও সে স্থির হয়ে সে-অর্চনা গ্রহণ করল বলে তাঁরা দুজন আনন্দিত হলেন। ভক্তিভাজনদের প্রতি তার মতো মহৎজনের অনুগ্রহের লক্ষণ সদ্যফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করে এবং সান্ধ্যকৃত্য শেষ করে দোহনান্তে আবার সেই উপবিষ্টা ধেনুর সেবায় মগ্ন হলেন দিলীপ যিনি ভুজবলে সমস্ত শত্রুকে উন্মূলিত করেছেন।

রক্ষকরাজার গৃহিণী তার সামনে নৈবেদ্য ও প্রদীপ রাখলেন এবং সে শয়ন করলে তিনিও শয়ন করলেন, সে জেগে উঠলে তিনিও জেগে উঠলেন।

সন্তানকামনায় এইভাবে মহিষীর সঙ্গে ব্রত পালন করতে করতে দীনদুঃখমোচনে উৎসুক মহনীয়কীর্তি সেই রাজার একুশ দিন কেটে গেল।

মায়াসিংহের আক্রমণ

পরের দিন।

নিজের অনুচরের প্রকৃত মনোভাব জানতে চেয়ে মুনির হোমধেনু গৌরীগুরু হিমালয়ের গুহায় প্রবেশ করল, গঙ্গাপ্রপাতের সম্মুখে যে গুহায় নবতৃণ জন্মেছে।

কোনো হিংস্রপ্রাণী মনে মনেও তাকে আক্রমণ করতে পারে না এই ভেবে রাজা পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে চোখ মেলে দিলেন। এমন সময় রাজা হঠাৎ দেখলেন এক সিংহ এসে তাকে আকর্ষণ করছে—সে যে কীভাবে আক্রমণ করল তা তিনি লক্ষ্যই করতে পারেন নি।

সে আর্তনাদ করে উঠল, গুহায় তা প্রতিধ্বনিত হয়ে দ্বিগুণিত হল। সেই আর্তনাদ রাজার পর্বতলগ্ন দৃষ্টিকে যেন লাগাম ধরে টেনে সেইদিকে ফিরিয়ে আনল।

ধনুর্বাণ হাতে তিনি পাটল রঙের গাভীতে উপবিষ্ট এক সিংহকে দেখলেন। মনে হল যেন পাহাড়ের ধাতুময় উপত্যকায় পুষ্পিত লোধ্রতরু দেখছেন।

তারপর সবলে শত্রুঘাতী আশ্রিতবৎসল মৃগেন্দ্রগতি রাজা পরাভব অনুভব করে নিধনযোগ্য সেই সিংহের নিধনের জন্যে তূণীর থেকে বাণ তুলতে চাইলেন।

প্রহারে উদ্যত তাঁর ডান হাতের আঙুল বাণপুঙ্খে লাগায় নখের প্রভায় কঙ্কপাখির পালকগুলি রঞ্জিত হল কিন্তু ছবির মতো নিশ্চল হয়েই রইল হাতটা। (অর্থাৎ হাত আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাণ আর তুলতেই পারলেন না)।

বাহু স্তম্ভিত হওয়ায় তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেল অথচ অপরাধীকে চোখের সামনে দেখেও স্পর্শ করতে পারছেন না তিনি। এই অবস্থায় মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগে রুদ্ধ-বীর্য সাপের মতো রাজা নিজের তেজে অন্তরে দগ্ধ হতে লাগলেন।

সিংহের মতো প্রচণ্ড যাঁর বল, যিনি মনুবংশের পতাকাস্বরূপ, সজ্জনের যিনি একান্তপ্রিয় সেই রাজা নিজের (এই অসহায়) অবস্থায় বিস্মিত হলেন। তাঁকে আরও বিস্মিত করে মানুষের মতো কথায় সেই ধেনু-আক্রমণকারী সিংহ বলল—

দিলীপ ও মায়াসিংহ

হে রাজন্, আপনার শ্রম নিষ্প্রয়োজন। আপনি আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেও তা বৃথা হবে। বায়ুবেগ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে; কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে তার কোনো বলই খাটে না।

কৈলাস পর্বতের মতো শুভ্রবর্ণ বৃষ-আরোহণে যাঁর অভিলাষ তাঁরই চরণস্পর্শের অনুগ্রহে আমার পিঠ পবিত্র। আমাকে অষ্টমূর্তি শিবের দাস বলে জানবেন, আমার নাম কুম্ভোদর, নিকুম্ভের মিত্র আমি।

ঐ যে সামনে দেবদারু গাছটি দেখছেন, শিব তাকে ছেলের মতো দেখেন, গাছটি কার্তিকের জননী গৌরীর হেমকলসের মতো স্তনের দুধের স্বাদ পেয়েছে।

একদিন এক বুনো হাতি এসে এর কাণ্ডের সঙ্গে গা ঘষায় এর ছাল ছড়ে যায়, তাতে পার্বতী অসুরদের অস্ত্রে আহত কার্তিকের জন্যে যেমন করেছিলেন, এই গাছটির জন্যেও তেমনি শোকপ্রকাশ করেছিলেন।

সেই থেকে বুনো হাতিদের ভয় দেখাবার জন্যে এই পাহাড়ের গুহায় শিব আমাকে নিযুক্ত করেছেন, বিধান দিয়েছেন যে প্রাণী আপনা থেকেই আমার কাছে আসবে সিংহ

হিসাবে তাই হবে আমার বৃত্তি (জীবনধারণের উপায়)।

পরমেশ্বরপ্রেরিত হয়েই নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে বরাদ্দ এই রক্তের-পারণ এসে পড়েছে, ক্ষুধার্ত আমার তৃপ্তির পক্ষে এ যথেষ্ট, রাহুর পক্ষে চাঁদের সুধা যেমন তেমনি।

এ অবস্থায়, আপনি লজ্জা ত্যাগ করে ফিরে যান। গুরুর প্রতি আপনি শিষ্যোচিত ভক্তি তো দেখালেনই। যে রক্ষণীয় জিনিস অস্ত্রবলে রক্ষা করা যায় না তা অস্ত্রধারীর যশ নষ্ট করে না।

রাজা পশুরাজের এই প্রগল্‌ভ বাণী শুনে শিবের প্রভাবে অস্ত্র নিরুদ্ধ হয়েছে বুঝে নিজের উপর অবজ্ঞাকে শিথেল করলেন।

বাণ নিক্ষেপ এই প্রথম প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে শিবের দৃষ্টিতে বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত ইন্দ্রের মতো জড়তাপন্ন হয়ে রাজা তাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—

হে মৃগেন্দ্র! আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমি যে কথা বলতে চাই তা বলা নিতান্তই হাস্যকর। তবু, প্রাণীদের মনের কথা সবই তুমি জান বলেই আমি বলব!

স্থাবর ও জঙ্গমের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু সেই শংকর আমার পূজ্য, আবার আহিতাগ্নি গুরুর এই ধনও চোখের সামনে বিনষ্ট হচ্ছে দেখেও আমি চুপ করে থাকতে পারি না।

সেই তুমি (কাছে-এসে-পড়া প্রাণীতেই যার বৃত্তি) আমার দেহ নিয়েই প্রসন্ন হয়ে দেহবৃত্তি পালন কর। মহর্ষির এই ধেনুটিকে ছেড়ে দাও, তার তরুণ বৎসটি দিনের শেষে (তাকে পাবার জন্যে) উৎসুক হয়ে আছে।

শিবের অনুচর সেই সিংহ একটু হেসে দাঁতের আভায় গিরিগুহার অন্ধকারকে খণ্ড খণ্ড করে আবার রাজাকে বলল।

জগতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব, নবীন বয়স এবং এই রমণীয় দেহ আপনার। অল্পের জন্যে বহু কে ত্যাগ করতে চাইছেন বলে আপনাকে আমার অবিবেকী বলে মনে হচ্ছে।

এ (আপনার প্রস্তাব) যদি জীবে দয়াই হয় তবে বলব আপনার বিনাশে এই একটিমাত্র গাভীরই কল্যাণ হবে। কিন্তু আপনি বেঁচে থেকে সর্বদা পিতার মতো প্রজাদের সবরকম বিঘ্ন থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

আর যদি একটি ধেনুঘটিত অপরাধজনিত ক্রোধের ভয়ে ভীত হন তাও অমূলক; কারণ, ঘটের মতো বিশাল স্তন যাদের এমন কোটি কোটি গাভী দান করে আপনি গুরুর ক্রোধ দূর করতে পারেন।

তাই কল্যাণ পরম্পরার, ভোক্তা বলদীপ্ত নিজের এই দেহ রক্ষা করুন। সমৃদ্ধ রাজ্য বলতে গেলে ইন্দ্রপদই, শুধু তা পৃথিবী ছুঁয়ে আছে এই যা তফাত।

এইটুকু বলে সিংহ বিরত হলে গিরিগুহায় তার প্রতিধ্বনি তুলে পর্বতও যেন রাজাকে সস্নেহে একই কথা বলল।

সিংহ তাকে আক্রমণ করে থাকায় কাতর চোখে নন্দিনী রাজার দিকে চেয়ে আছে; আরও বেশী সদয় হয়ে দেবানুচর সিংহের কথা শুনে রাজা আবারও বললেন—

'ক্ষত থেকে ত্রাণ কর' এই অর্থেই ক্ষত্র শব্দটির খ্যাতি জগৎ-জোড়া। যে এর বিরুদ্ধাচরণ করে তার রাজ্য দিয়ে কী হবে? নিন্দামলিন প্রাণ দিয়েই বা কী হবে?

তাছাড়া অন্য পয়স্বিনী গাভী দানেই বা মহর্ষিকে কী করে প্রসন্ন করা যাবে? একে

(স্বর্গের কামধেনু) সুরভির চেয়ে কম মনে কোরো না। তুমি যে একে আক্রমণ করেছ তা রুদ্রতেজেই সম্ভব হয়েছে।

পূজনীয় এই গাভীটিকে তোমার কাছ থেকে মুক্ত করার জন্যে আমার নিজের দেহ বিনিময় করা উচিত। তাতে তোমার পারণও বজায় থাকবে, মুনির যজ্ঞকর্মও থাকবে অব্যাহত।

তুমি নিজেও পরাধীন বলে এ কথা ভালোই বুঝবে, কারণ দেবদারুটির জন্যে তোমার কী মহান যত্ন! নিজে অক্ষত থেকে রক্ষণীয় বস্তুকে খুইয়ে প্রভুর কাছে দাঁড়ানোই যায় না।

আর, তুমি যদি আমাকে হিংসার অযোগ্য বলে মনে কর, তাহলে বরং আমার যশোরূপ দেহের প্রতি সদয় হও। আমাদের মতো মানুষের একান্ত নশ্বর ভৌতিক দেহে কোনো আস্থা নেই।

আলাপ করলেই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, বনান্তে মিলিত আমাদের দুজনের মধ্যে তা তো গড়েই উঠেছে। তাই হে শিবানুচর, তুমি মিত্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

'তাই হোক' সিংহ এ কথা বললে আড়ষ্টতা থেকে দিলীপের বাহু মুক্ত হল। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে নিজের দেহকে একটা মাংসপিণ্ডের মতো সমর্পণ করলেন।

রাজা যখন নতমুখ হয়ে কখন সিংহ তার উপর সবলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষায় ছিলেন—সেই মুহূর্তে বিদ্যাধরদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি সেই রক্ষকের উপরে ঝরে পড়ল।

নন্দিনীর বরদান

'ওঠো বৎস'! এই অমৃতকল্প কথা শুনে রাজা মুখ তুলে দেখলেন সম্মুখে প্রস্রবিণী গাভীটি নিজের জননীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে, সিংহ নয়।

বিস্মিত রাজাকে ধেনু বললেন, 'হে সজ্জন, আমি মায়া উদ্ভাবন করে তোমাকে পরীক্ষা করলাম। ঋষির প্রভাবে যমও আমাকে ছুঁতে পারবে না। অন্য হিংস্র জন্তু তো কোন ছার।

গুরুতে তোমার ভক্তি এবং আমাতে তোমার করুণা দেখে আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি। হে পুত্র! তুমি বর প্রার্থনা কর। তুমি আমাকে কেবল পয়স্বিনী ধেনু মনে কোরো না, প্রসন্ন হলে আমি যে-কোনো অভীষ্টই পূরণ করতে পারি।

তারপর যিনি প্রার্থীদের মনোরথ পূরণ করেন এবং যিনি তাঁর বাহুবলে বীর এই আখ্যা অর্জন করেছেন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুদক্ষিণার গর্ভে বংশরক্ষক এবং অশেষ-খ্যাতিমান একটি পুত্র প্রার্থনা করলেন।

সন্তানকামী রাজাকে 'তাই হোক' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই পয়স্বিনী তাঁকে আদেশ দিলেন 'হে পুত্র! তুমি আমার দুধ পত্রপুটে দোহন করে পান কর।'

বৎস পান করার পর এবং হোমানুষ্ঠানের প্রয়োজন মিটে যাবার পর যে দুধটুকু অবশিষ্ট থাকবে ঋষির অনুমতি নিয়ে তাই আমি পান করতে চাই, যে পৃথিবী রক্ষা করি তার (উৎপন্ন শস্যাদির) ষষ্ঠভাগ যেমন আমি গ্রহণ করি তেমনিভাবে।

রাজা তাকে এ কথা জানালে সে অধিকতর প্রীত হল এবং তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের গুহা থেকে আদৌ শ্রমকাতর না হয়ে আশ্রমে ফিরে এল।

চাঁদের মতো প্রফুল্ল মুখে রাজশ্রেষ্ঠ দিলীপ ধেনুর অনুগ্রহের কথা প্রথমে গুরুকে নিবেদন করে পরে প্রিয়াকে বললেন, এ যেন পুনরুক্তিই হল কারণ তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি থেকেই তা অনুমান করা যাচ্ছিল।

সেই সজ্জনবৎসল অনিন্দিতচরিত রাজা বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে বৎস পান করবার পর এবং হোম সম্পাদনে ব্যবহারের পর নন্দিনীর দুধের অবশিষ্ট অংশটুকু অতি তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করলেন, তা যেন তাঁরই মূর্ত যশ।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

প্রভাতে যথোপযুক্ত ব্রতপারণ শেষে (সেই গোচারণব্রতের পারণ করিয়ে) যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর সংযমী বশিষ্ঠ সেই দম্পতীকে তাঁদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা প্রথমে হোমাগ্নি ও গুরুকে এবং পরে অরুন্ধতী এবং সবৎসা ধেনুকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করেন। (এইসব) সৎ ও শুভ কাজের ফলে তাঁর প্রভাব প্রচণ্ডতর হল।

ধর্মপত্নীসহ সহিষ্ণু রাজা শ্রুতিমধুরধ্বনিযুক্ত এবং অনাঘাত-রম্য রথে চড়ে পথে চললেন। মনে হল ওটা যেন তাঁদেরই পূর্ণ মনোরথ।

অদর্শনে যিনি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছেন, সন্তানকামনায় ব্রতপালন করে যিনি শরীর কৃশ করেছেন সেই রাজাকে প্রজারা নবোদিত চাঁদের মতোই চোখ দিয়ে পান করল, তবু তাদের তৃপ্তি হল না যেন।

ইন্দ্রকান্তি দিলীপ পতাকামণ্ডিত নগরে প্রবেশ করে এবং পুরবাসীদের অভিনন্দন থেকে আবার তাঁর বাসুকির মতো সবল বাহুতে ভূমির ভার স্থাপন করলেন।

তারপর আকাশ যেমন অত্রির নয়নজাত তেজ (চাঁদ) ধারণ করে, সুরধুনী যেমন অগ্নিনিহিত রৌদ্রতেজ (ষড়ানন) ধারণ করে, তেমনি রাজমহিষী সুদক্ষিণাও রাজকুলের কল্যাণের জন্যে মহৎ লোকপালগণের নিহিত তেজ ধারণ করলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'নন্দিনীর বরদান' নামক দ্বিতীয় সর্গ ॥

তৃতীয় সর্গ

অন্তঃসত্ত্বা সুদক্ষিণা

তারপর যথাকালে সুদক্ষিণা ইক্ষ্বাকুকুলের অবিচ্ছিন্নতার কারণ, স্বামীর আকাঙ্ক্ষিত এবং সখীদের চোখে জ্যোৎস্না-প্রাদুর্ভাবের মতো গর্ভলক্ষণ ধারণ করলেন।

শরীর কৃশ হওয়ায় তিনি (আগের মতো) সব অলংকার পরতে পারলেন না। তাঁর মুখখানা লোধ্র-ফুলের মতো পাণ্ডুবর্ণ হল। এই অবস্থায় তাঁকে দেখাল প্রভাতকল্পা রাত্রির মতো, চাঁদ যেখানে ম্লান আর তারারা যেখানে নেই বললেই হয়।

গোপনে তাঁর মাটির গন্ধমাখা মুখের আঘ্রাণ নিয়ে রাজার আর আশ মিটত না। গ্রীষ্মের অবসানে বৃষ্টিভেজা বনদীঘির ঘ্রাণ নিয়ে গজরাজ যেমন তৃপ্ত হয় না তেমনি।

দেবরাজ যেন স্বর্গভোগ করছেন তাঁর চক্রবর্তী সন্তানও তেমনি ভূমিভোগ করবেন এই জন্যেই যেন অন্য-সব ভোগ্য ত্যাগ করে ভূমিভোগেই (মাটি খাওয়াতেই) তাঁর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ।

'মগধতনয়া (সুদক্ষিণা) কোন্ কোন্ জিনিসে তাঁর অভিলাষ লজ্জায় তা আমাকে

কিছুই বলেন না।' উত্তরকোশলপতি (দিলীপ) সর্বদা সাগ্রহে এ বিষয়ে প্রিয়ার সখীগণদের জিজ্ঞাসা করেন।

গর্ভাবস্থায় অভিলাষজনিত দুঃখবোধের সময়টিতে এসে তিনি যা চাইতেন তা এমনি পেতেন। ধনুর্বাণধারী এই রাজার কাছে স্বর্গেও কিছু অপ্রাপ্য ছিল না।

ক্রমে প্রথম গর্ভসঞ্চারের অবসাদ কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁর দেহ আবার পুষ্ট হলে তিনি শোভা পেলেন, পুরনো পাতা ঝরে গেলে রমণীয়-পল্লবে মণ্ডিত হয়ে লতা যেমন শোভা পায় তেমনি।

কিছুদিন গেলে তাঁর ঈষৎনীল বৃন্তমণ্ডিত সুপুষ্ট স্তন দুটি ভ্রমর-নিবন্ধ দুটি সুঠাম পদ্মমুকুলের শ্রীকে ম্লান করে দিল।

রাজা অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার মতো, অগ্নিগর্ভা শমীর মতো এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মতো মনে করলেন।

ধৈর্যবান সেই রাজা প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ, মনের ঔদার্য, বাহুবলে অর্জিত আদিগন্ত সম্পদ এবং (পুত্রলাভজনিত) সন্তোষের অনুরূপ পুংসবনাদি ক্রিয়া যথাক্রমে সম্পাদনা করলেন।

রাজা অন্তঃপুরে এলে লোকপালদের অংশপূর্ণ গর্ভের গুরুত্বের জন্যে কষ্ট করে আসন থেকে উঠতেন সুদক্ষিণা। অভ্যর্থনার জন্যে অঞ্জলি রচনা করতেও তাঁর হাত অবসন্ন হত। চোখ চঞ্চল হয়ে উঠত। এই অবস্থাতে সুদক্ষিণা রাজার মনে আহ্লাদেরই সঞ্চার করতেন।

এবারে শিশুচিকিৎসায় কুশলবিশিষ্ট বৈদ্যদের দিয়ে গর্ভপুষ্টি সম্পাদনের পর, সময় পূর্ণ হলে, (দশম মাসে) প্রীত হয়ে পতি আসন্নপ্রসবা প্রিয়াকে (গ্রীষ্মাবসানে) মেঘভারানত বর্ষোন্মুখ আকাশের মতো দেখলেন।

তারপর শচীর মতো (গৌরবময়ী) সুদক্ষিণা যথাসময়ে ত্রিসাধনসম্পন্ন রাজশক্তির অক্ষয় অর্থোৎপাদনের মতো একটি পুত্র প্রসব করলেন) তখন পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থানগত এবং অনস্তমিত ছিল বলে পুত্র যে সৌভাগ্যশালী হবে তা সূচিত হয়েছিল।

সেই সময়ে দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হল, বায়ু মনোরমভাবে প্রবাহিত হল, শিখাগুলি দক্ষিণমুখী করে হোমাগ্নি আহুতি গ্রহণ করল—সবকিছুই শুভসূচক হল। এ রকম মানুষের জন্ম যে জগতের মঙ্গলের জন্যেই হয়।

সূতিকাগৃহের শয্যার চারদিকে বিকীর্ণ শুভজন্মা সেই শিশুর নিজের জ্যোতিতে হঠাৎ নিশীথদীপগুলি দীপ্তিহীন হয়ে যেন চিত্রার্পিতের মতো হল (অর্থাৎ ছবির মতোই নিষ্প্রাণ হল)।

অন্তঃপুরচারী যে ভৃত্য অমৃতাক্ষরে কুমারের জন্মের সংবাদ দিল তাকে রাজার তিনটি জিনিসই শুধু অদেয় ছিল—চন্দ্রোজ্জ্বল ছত্র ও দুটি চামর।

নিবাতনিস্পন্দ পদ্মের মতো চোখ দিয়ে রমণীয় পুত্রমুখ পান করে (সতৃষ্ণভাবে দেখে) প্রবল আনন্দ তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে গেল, চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন কূল ছাপিয়ে যায় তেমনি।

তপস্বী পুরোহিত (বশিষ্ঠ) তপোবন থেকে এসে দিলীপতনয়ের সমস্ত জাতকর্মাদি সংস্কার সমাধা করলে সে খনি থেকে তোলা মণি (শাণযন্ত্রে) সংস্কৃত হলে যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে শোভা পায় তেমনি শোভা পেল।

শ্রুতিমধুর মঙ্গলতূর্য বারবণিতাদের প্রমোদনৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাগধী পতি দিলীপের গৃহেই শুধু বাদিত হল না ; দেবতাদের (স্বর্গলোকের) পথেও দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হল।

সুশাসক দিলীপের (রাজ্যে) এমন বন্দী কেউ ছিল না, পুত্রজন্মের আনন্দে যাকে তিনি মুক্ত করে দেবেন। তবে তখন পিতৃঋণরূপ বন্ধন থেকে তিনি কেবল নিজেকেই মুক্ত করলেন।

এই বালক (কালে) যেমন হবে শাস্ত্রপারঙ্গম তেমনি যুদ্ধেও হবে শত্রুপারঙ্গম, (শত্রুদমনে পারদর্শী), এই জন্যে ধাতুর গমনার্থটি নিয়ে অর্থতত্ত্বজ্ঞ দিলীপ পুত্রের নামকরণ করলেন 'রঘু'।

সেই রঘু সব বিভবশালী পিতার প্রযত্নে শুভলক্ষণযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, সূর্যরশ্মির অনুপ্রবেশে বালচন্দ্র যেমন দিনে দিনে বেড়ে ওঠে তেমনি।

পার্বতী ও শিব কার্তিকেয়কে পেয়ে এবং শচী ও ইন্দ্র জয়ন্তকে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন রাজা (দিলীপ) ও মাগধীও (সুদক্ষিণা) তাঁদের মতো পুত্রকে (রঘুকে) পেয়ে তাঁদের মতোই আনন্দ পেয়েছিলেন।

চক্রবাক ও চক্রবাকীর মতো সেই দম্পতির ভাববদ্ধ ও পরস্পরাশ্রয় যে প্রেম তা একটি পুত্রে বিভক্ত হলেও পরস্পরের উপরে বর্ধিতই হল।

সেই শিশু ধাত্রীর প্রথম শেখানো কথাগুলি বলতে শিখল, তার আঙুল ধরে হাঁটতে পারল। প্রণাম কর বললে নত হতে লাগল। এসব করে সে পিতার আনন্দ বর্ধন করল।

অঙ্গস্পর্শজনিত সুখদানে ত্বকে যেন অমৃত বর্ষণ করত শিশুটি। তাকে কোলে নিয়ে নিমীলিত-নয়নে রাজা দীর্ঘসময় ধরে শিশুর স্পর্শসুখ অনুভব করতেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন স্বমূর্তিরই রূপান্তর সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুদ্বারা লোকস্থিতি অব্যাহত থাকবে এমন অনুভব করেছিলেন, স্থিতিরক্ষক দিলীপও তেমনি এই বহুগুণশালী পুত্রদ্বারা তাঁর বংশ স্থিতিলাভ করবে এমন মনে করেছিলেন।

রঘুর সংস্কার ও শিক্ষা

যথাকালে চূড়াকরণ সুসম্পন্ন হলে সেই রঘু চঞ্চল শিখায় শোভিত সমবয়স্ক সচিব পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অক্ষরজ্ঞান ঠিকমতো আয়ত্ত করলেন ; নদীমুখ দিয়ে যেমন (মকরাদি) সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি তিনি (বিশাল) শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ করলেন।

বিধিমতো উপনয়ন হবার পর বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা গুরুভক্ত রঘুকে শিক্ষা দিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হল। শিক্ষা সংপাত্রে প্রযুক্ত হলেই ফলবতী হয়।

দিক্‌পতি সূর্য যেমন বায়ুবেগকেও পরাভূত করে এমন অশ্বদের বেগবলে চারটি সমুদ্রের মতো চারটি দিক ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়, প্রখরবুদ্ধি রঘুও বুদ্ধির সমস্ত গুণগুলির সহায়তায় চারটি সমুদ্রের মতো চারটি বিদ্যাকে ক্রমশ অতিক্রমা করলেন (অর্থাৎ আয়ত্ত করলেন)।

তিনি (রঘু) পবিত্র মৃগচর্ম পরিধান করে পিতার কাছ থেকে সমন্ত্রক শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করলেন। তাঁর গুরু (দিলীপ) জগতে শুধু অদ্বিতীয় রাজাই নয়, অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন।

বৎসতর যেমন ক্রমে বৃহৎ বৃষতে পরিণত হয়, গজশাবক যেমন ক্রমে গজরাজে পরিণত

হয়, সেই রকম রঘুও ক্রমশ শৈশব ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে প্রশান্তসুন্দর দেহ ধারণ করলেন।

তারপর কেশদানবিধি অনুষ্ঠিত হলে পিতা (দিলীপ) তাঁর বিবাহসংস্কার সম্পাদন করলেন। দক্ষকন্যা (রোহিণী আদি) তারা-রা চন্দ্রকে পতিরূপে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, রাজকন্যারাও তেমনি রঘুকে পেয়ে আনন্দিত হলেন।

যৌবনপ্রাপ্ত রঘুর বাহু যুগদণ্ডের মতো দীর্ঘ হল, বক্ষ হল কপাটের মতো, গ্রীবা হল সুপরিণত। বলবান্ রঘু দৈহিক গুরুত্বে পিতাকেও হার মানালেন। তবু বিনয়-নম্রতায় তাঁকে ক্ষুদ্র বলে মনে হত।

অভিষেক

তারপর রাজা দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের যে গুরুভার ধারণ করেছিলেন তা লঘু করবার জন্যে স্বভাবনম্র এবং সংস্কারবিনীত রঘুকে 'যুবরাজ' শব্দভাজন করলেন অর্থাৎ তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রী যেমন পূর্বপ্রস্ফুটিত পদ্মকে ত্যাগ করে সন্নিহিত নববিকশিত পদ্মকে আশ্রয় করে, গুণাভিলাষী রাজলক্ষ্মীও তেমনি মূল আশ্রয় রাজা দিলীপকে ত্যাগ করে 'যুবরাজ'-নামে সেই (নূতন) আশ্রয়কে অংশত অবলম্বন করলেন।

বায়ুর সহায়তায় অগ্নির মতো, শরৎসান্নিধ্যে সূর্যের মতো, মদবারির উদ্ভেদে গজরাজের মতো, রাজাও রঘুর সহায়তায় অত্যন্ত দুঃসহ হলেন।

ইন্দ্র ও রঘু

ইন্দ্রতুল্য দিলীপ রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত ধনুর্ধর রঘুকে হোমাশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করে মাত্র একটি-কম শতটি যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করেছিলেন।

তারপর যজ্ঞকারী দিলীপ (পুনরায়) যজ্ঞের জন্যে উৎসর্গ করলে, স্বচ্ছন্দগতি অশ্বটিকে ধনুর্ধরীদের সামনেই ইন্দ্র অপহরণ করলেন।

সেই কুমারসেনা হঠাৎ বিপদে হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ দিকে বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হল। তার প্রভাবের কথা তো আগেই শোনা গিয়েছে।

সজ্জনবন্দিত দিলীপনন্দন তার (নন্দিনীর) অঙ্গনিসৃত জলে (মূত্রে) চোখ দুটো ধুয়ে নেবার ফলে অতীন্দ্রিয় বিষয়েও দিব্যদৃষ্টি পেলেন।

সেই রাজপুত্র পূর্বদিকে চেয়ে দেখলেন পর্বতপক্ষচ্ছেদী দেবরাজ ইন্দ্র রথের রশিতে বেঁধে যজ্ঞাশ্ব হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন; তার চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যে সারথি তাকে বারবার কশাঘাত করছে।

তাঁর একশটি নিষ্পলক চোখ দেখে,
তাঁর ঘোড়াগুলির রং সবুজ দেখে,
তাঁকে ইন্দ্র বলে চিনতে পেরে,
রঘু গগনস্পর্শী গম্ভীর স্বরে তাঁকে নিবৃত্ত করেই যেন বলতে লাগলেন—

যজ্ঞাংশ যাঁরা ভোগ করেন তাঁদের মধ্যে আপনাকে মনীষীরা সর্বদা প্রথম বলে মনে করেন। আপনি অজস্র ব্রতানুষ্ঠানে পূত আমার পিতার যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন কেন?

আপনি ত্রিভুবনপতি, সবই আপনি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পান। আপনারই তো কাজ সর্বদা যজ্ঞঘাতকদের দমন করা ? সেই আপনিই যদি ধর্মচারীদের ক্রিয়াকর্মে নিজেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান, তাহলে ধর্মকর্ম তো একেবারেই লোপ পাবে !

তাই হে মঘবন্ ! অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ঐ অশ্বটিকে ফিরিয়ে দিন। বেদসম্মত পথের প্রদর্শক মহান পুরুষেরা অসৎপথ অবলম্বন করেন না।

রঘুকথিত এই প্রগল্ভ বচন শুনে সুরপতি সবিস্ময়ে রথ ফিরিয়ে উত্তর দিতে শুরু করলেন—

হে ক্ষত্রিয়কুমার ! যা বললে তা ঠিক। কিন্তু যশই যাঁদের সম্পদ শত্রুর কবল থেকে তাঁদের সে যশ রক্ষা করা উচিত। তোমার পিতা ভুবনবিদিত আমার সেই অশেষ যশ যজ্ঞসম্পাদনে লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছেন।

পুরুষোত্তম বলতে যেমন বিষ্ণুকেই বোঝায়, মহেশ্বর বলতে যেমন শিবকেই বোঝায় আর কাউকেই নয়, তেমনি শতক্রতু বলতে মুনিরা শুধু আমাকেই বোঝেন, এই শব্দটি অন্য কারও উপর প্রযোজ্য হতে পারে না।

তাই কপিলমুনির অনুকরণে তোমার পিতার এই অশ্ব আমি হরণ করেছি। তুমি এ ব্যাপারে আর চেষ্টা কোরো না। সগরসন্তানদের পথে তুমি পা বাড়িও না।

তারপর অশ্বরক্ষক নির্ভীক রঘু হেসে ইন্দ্রকে আবার বললেন, এই যদি আপনার সংকল্প হয় তা হলে অস্ত্র গ্রহণ করুন। রঘুকে জয় না করে আপনি কখনই কৃতকৃত্য হতে পারবেন না।

ইন্দ্রকে এ কথা বলে শরাসনে বাণ যোজনা করতে উর্ধ্বমুখ হয়ে অত্যন্ত রমণীয় 'আলীঢ়' ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অবস্থান করে তিনি পিনাকপাণিকেও যেন পরাজিত করলেন।

বাণযুদ্ধ

রঘুর স্তম্ভাকৃতি এক বাণ ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনিও ধনুকে বাণ যোজনা করলেন, যে ধনুক নবমেঘমালায় ক্ষণিক চিহ্ন হয়ে ফুটে ওঠে।

ভীষণ অসুরের রক্তপানে অভ্যস্ত সেই বাণ দিলীপপুত্রের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করল, যেন অনাস্বাদিতপূর্ব মানুষের রক্ত সকৌতূহলে পান করল।

ঐরাবতকে তাড়না করতে করতে ইন্দ্রের যে হাতের আঙুলগুলি কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং যে হাত শচীদেহের পত্রালঙ্কারে চিহ্নিত, কার্তিকেয়র মতো বলশালী কুমার রঘু সেই হাতে স্বনামচিহ্নিত বাণ বিদ্ধ করলেন।

অন্য একটি ময়ূরপুচ্ছযুক্ত বাণ দিয়ে ইন্দ্রের বজ্রাকৃতি পতাকা ছেদন করলেন। এতে ইন্দ্র তাঁর উপর কুপিত হলেন, যেমন সবলে সুরলক্ষ্মীর কেশচ্ছেদন করছে সে।

পক্ষযুক্ত সাপের মতো ভীষণ আকৃতির উর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ বাণবর্ষণ করে করে তাঁদের দুজনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল ; উভয়েরই পরস্পর জয়াভিলাষী। একদিকে সিদ্ধেরা অন্যদিকে সৈনিকেরা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মেঘ যেমন স্বদেহচ্যুত বজ্রাগ্নিকে বহুবর্ষণেও নির্বাপিত করতে পারে না, ইন্দ্রও তেমনি (স্বদেহের অংশসম্ভূত) দুঃসহ তেজের আধার রঘুকেও নিরন্তর অস্ত্রবর্ষণেও নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

তারপর রঘু ইন্দ্রের হরিচন্দনলিপ্ত মণিবন্ধে সমুদ্রমন্থনের ধ্বনির মতো ধীরগম্ভীর-

শব্দকারী ধনুগুণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণনিক্ষেপে ছিন্ন করলেন।

ইন্দ্রের ক্রোধ বর্ধিত হল। তিনি ধনুকটি ত্যাগ করে প্রবল শত্রুর প্রাণনাশের জন্যে পর্বতের বক্ষভেদে উপযুক্ত দেদীপ্যমান অস্ত্র অর্থাৎ বজ্র গ্রহণ করলেন।

রঘু সেই বজ্রাঘাতে বক্ষস্থলে আহত হয়ে সৈনিকদের অশ্রুসহ ভূমিতে পতিত হলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই রঘু সেই বেদনা ভুলে সৈনিকদের আনন্দধ্বনির সঙ্গেই উত্থিত হলেন।

গুণ সর্বত্রই স্থান করে নেয়

এর পরেও রঘু অস্ত্রপ্রয়োগে নিষ্ঠুর শত্রুতার ভাব দীর্ঘসময় ধরে অক্ষুণ্ণ রাখায় তাঁর অসামান্য বীরত্বে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হলেন। গুণ সর্বত্রই নিজের স্থান করে নেয়।

ইন্দ্র স্পষ্টভাবে বললেন—

সারবত্তায় পর্বতেও অপ্রতিবন্ধ আমার এই অস্ত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারে নি। আমাকে তোমার প্রতি প্রসন্ন বলেই জানবে। এই অশ্বটি ছাড়া আর কী চাও বল ?

তারপর তূণীর থেকে অর্ধেক তোলা বাণটি আর না তুলে সুভাষী রাজপুত্র ইন্দ্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ঐ অবস্থায় সেই বাণের সুবর্ণপঙ্খের প্রভায় তাঁর আঙুলগুলি রঞ্জিত হল।

হে প্রভু ! যদি এই অশ্বটি একান্তই অপরিত্যাজ্য বলে মনে করেন তাহলে বিধিমতো ক্রিয়া শেষ হলে অজস্র-যজ্ঞপূত আমার পিতা যাতে যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল পান তাই করবেন।

যজ্ঞমণ্ডপে উপবিষ্ট রাজা (দিলীপ) এখন অন্যের অগম্য, কারণ তিনি এখন ত্রিলোচনের অন্যতম মূর্তিস্বরূপ। তাই যাতে এই বৃত্তান্ত তিনি আপনারই কোনো বার্তাবাহকের মুখ থেকে শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

'তাই হোক' রঘুর ইচ্ছামতো তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাতলি-সারথি ইন্দ্র যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন। সুদক্ষিণাতনয় রঘুও রাজার যজ্ঞশালায় ফিরে গেলেন। তবুও (বিজয়লাভ হলেও অশ্বটি ফেরাতে পারলেন না বলে) খুব যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি তা নয়।

ইন্দ্রের বার্তাবাহকের মুখ থেকে আগেই সব জানতে পেরে রাজা আনন্দে আড়ষ্ট হাতে বজ্রাঘাতচিহ্নিত তাঁর (রঘুর) শরীর স্পর্শ করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

এইভাবে,

যাঁর রাজ্যশাসন অভিনন্দনীয় সেই দিলীপ আয়ু শেষ হলে স্বর্গারোহণের বাসনায় নিরানব্বইটি মহাযজ্ঞকে যেন পর পর সিঁড়ির মতো গেঁথে রাখলেন।

তারপর তিনি বিষয়বিমুখ হয়ে বিধিমতো যুবক পুত্রকে রাজচিহ্ন শ্বেতছত্র দান করে মহিষীকে নিয়ে তপোবনতরুর ছায়াকে আশ্রয় করলেন। বার্ধক্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের এই তো কুলব্রত।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'রঘুর রাজ্যাভিষেক' নামক তৃতীয় সর্গ ॥

চতুর্থ সর্গ

রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ

তিনি পিতৃদত্ত রাজ্য লাভ করে সন্ধ্যায় সূর্যচিহ্নিত তেজে সমৃদ্ধ অগ্নির মতো আরও বেশী দীপ্যমান হলেন।

দিলীপের পর তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শুনে রাজাদের হৃদয়ে আগে যে আগুন প্রধূমিত ছিল তা এখন প্রজ্জ্বলিত হল।

ইন্দ্রের পতাকার মতো তাঁর নব অভ্যুদয় দেখে উঁচুতে চোখ তুলে প্রজারা সন্তানদের সঙ্গে আনন্দিত হল।

তিনি গজগমনে পৈতৃক সিংহাসন এবং সমস্ত শত্রুরাজ্য একই সঙ্গে অধিকার করলেন।

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত রঘুকে লক্ষ্মী স্বয়ং যেন অদৃশ্য থেকে রঘুর কান্তি পদ্মরূপ ছত্র ধারণ করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন, সে ছত্র (চোখে না দেখা গেলেও) তাঁর কান্তিপুঞ্জ থেকেই অনুমেয়।

বাগ্‌দেবী যথাকালে স্তুতিপাঠকদের মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে স্তবনীয় রঘুকে স্তুতিগানে সেবা করতে লাগলেন।

মনু প্রমুখ মাননীয় নৃপতিবৃন্দের উপভুক্তা হয়েও বসুন্ধরা তাঁর প্রতি যেন অনন্য-পূর্বা বধূর মতো অনুরাগিণী হলেন।

তিনি যথোচিত দণ্ডদানে নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণবায়ুর মতো সকলের মন হরণ করলেন।

রঘুর মধ্যে গুণের আধিক্য থাকায় প্রজারা তাঁর পিতার অভাব তেমন বোধ করত না; আম ফললে মুকুলের অভাবটা যেমন লোকে মনে রাখে না তেমনি।

নীতিবিদেরা সেই নব-নৃপতির কাছে সদসৎ দুই পক্ষই উপস্থিত করতেন; তিনি পূর্বপক্ষটিই (সৎপক্ষকেই) গ্রহণ করতেন, পরেরটি নয়।

(ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি) পঞ্চভূতের গুণরাশি উৎকর্ষ লাভ করল; তিনি নতুন রাজা হলে সবই যেন নতুন হল।

আনন্দ দেয় বলেই তার নাম 'চন্দ্র', প্রকৃষ্ট তাপ দেয় বলেই তার নাম তপন, সেই রকম প্রজারঞ্জন করেন বলেই তাঁর 'রাজা' নাম সার্থক হয়েছিল।

কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত দুটো চোখ তাঁর ছিল এ কথা সত্যি, কিন্তু তাঁর আসল চোখ ছিল সূক্ষ্মকর্তব্যনির্দেশক শাস্ত্র।

এসেছে শরৎ

রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পর তিনি একটু সুস্থির হলে তাঁর কাছে দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর মতো এল পদ্মলক্ষণা শরৎ।

নিঃশেষবর্ষণে লঘু মেঘ পথ মুক্ত করে দেওয়ায় রঘুর এবং সূর্যের দুঃসহ প্রতাপ একই সঙ্গে দশদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র বর্ষাকালীন ধনু ত্যাগ করলেন। রঘু ধারণ করলেন বিজয় ধনু। তাঁরা দুজনেই প্রজাদের মঙ্গলসাধনের জন্য পর্যায়ক্রমে ধনুকধারণ করতেন।

শ্বেতপদ্মের ছত্রে এবং বিকশিত কাশফুলের চামরে বিরাজিত হয়ে (শরৎ) ঋতু তাঁর

অনুকরণ করল বটে, কিন্তু তাঁর লাবণ্য লাভ করতে পারল না।

তখন প্রসন্নমুখ রঘু আর শুভ্রকান্তি চাঁদ এ দুটিতেই চক্ষুষ্মানদের প্রীতি ছিল সমতুল্য।

হংসমালায় তারাদলে এবং কুমুদশোভিত জলাশয়গুলিতে যেন তাঁর যশোরাশির শুভ্র মহিমা বিচ্ছুরিত হল।

ইক্ষুচ্ছায়ায় বসে শস্যপালিকারা পালক রঘুর যশোগান করত। সে গানের উৎস ছিল তাঁর গুণরাশি; শৈব থেকে শুরু করে তাঁর জীবনকথাই ছিল তার বিষয়বস্তু।

অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়ে জল প্রসন্ন হল, কিন্তু মহাতেজা রঘুর কাছে পরাজয়ের আশঙ্কায় শত্রুদের মন হল বিষণ্ণ।

বিশাল ককুদযুক্ত মদোদ্ধত বৃষদল নদীকূল বিদীর্ণ করে রঘুর বিলাসভঙ্গিম বিক্রমের অনুকরণ করতে লাগল।

মদগন্ধি সপ্তপর্ণ ফুলের গন্ধে অভিভূত হয়ে তাঁর হাতিগুলি (হিংসে করেই) অসূয়াপরবশ হয়েই যেন সপ্তধারায় মদবারি বর্ষণ করতে লাগল।

নদীগুলিকে সুনাব্য করে এবং কাদা শুকিয়ে পথগুলিকে সুগম করে শরৎ তাঁকে (স্বতঃস্ফূর্ত) উৎসাহশক্তির আগেই যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করল।

অশ্ব-আরতির অনুষ্ঠানে বিধিমতো প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণমুখী শিখার ছলে যেন হাত বাড়িয়েই জয় দান করলেন।

রাজধানী ও রাজ্যপ্রান্ত সুরক্ষিত করে এবং পৃষ্ঠদেশ শুদ্ধ (অর্থাৎ শত্রুমুক্ত বা সুরক্ষিত) করে তিনি অনুকূল দৈববলের সহায়তায় ছয় রকম সৈনা নিয়ে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন।

মন্দার পর্বতের আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু বর্ষণে ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন চারিদিক থেকে বিষ্ণুর শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল, বয়োবৃদ্ধ পুরনারীরাও তেমনি চারিদিক থেকে তাঁর উপরে লাজবর্ষণ করলেন।

যাত্রা হল শুরু

ইন্দ্রতুল্য রঘু বায়ুকম্পিত পতাকাশ্রেণীতে শত্রুকুলকে তর্জন করতে করতে, রথোৎক্ষিপ্ত ধুলোয় আকাশকে ভূতলের মতো এবং মেঘোপম গজরাজিতে ভূতলকে আকাশের মতো (শোভামান) করতে করতে প্রথমে পূব দিকে অভিযান করলেন।

আগে প্রতাপ, পরে কোলাহল, তার পরে ধুলো, তার পিছনে রথাদি এইভাবে যেন চারটি অঙ্গে বিভক্ত হয়ে সেই সৈন্য এগিয়ে যেতে লাগল।

তিনি শক্তিপ্রভাবে মরুতলগুলিকে সজল করলেন, নাব্য নদীগুলিকে পারাপারের যোগ্য করলেন এবং বনগুলিকে পরিষ্কৃত করলেন।

হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গাকে আকর্ষণ করে ভগীরথ যেমন শোভা পেয়েছিলেন পূর্বসাগর-গামিনী বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আকর্ষণ (পরিচালনা) করে রঘুও তেমনি শোভা পেলেন।

হাতিরা যেমন গাছগুলিকে ফলবিহীন, উন্মুলিত এবং ছিন্নভিন্ন করে পথ পরিষ্কার করে নেয়, তিনিও তেমনি তাঁর পথটি যানহীন, উৎখাত এবং বহুবিভক্ত রাজাদের দিয়ে মুক্ত করিয়ে নিলেন।

এইভাবে পূর্বদিকের সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করে বিজয়ী রঘু তালবনে-শ্যামবর্ণ মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হলেন।

সুব্রহ্মদেশীয় রাজারা বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে অবিনীতদের উচ্ছেদকারী নদীস্রোতের মতো রঘুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

অধিনায়ক রঘু রণতরীসহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের রাজাদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন।

উৎখাত শত্রুরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলে তাঁরা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন, আগে উপড়ে নিয়ে পরে বোনা ফলভারে নত কলমধানের চারার মতো তাঁরা তখন রঘুকে ফলদানে (উপঢৌকন) সংবর্ধিত করলেন।

তিনি সৈন্যদের দিয়ে গজসেতু তৈরি করিয়ে কপিশা নদী পার হলেন এবং তাদের সঙ্গে উৎকলবাসী রাজাদের নির্দেশিত পথে কলিঙ্গ দেশের দিকে চললেন।

মাহুত যেমন অপর হাতির মাথায় সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রোথিত করে, তিনিও তেমনি মহেন্দ্র পর্বতের মাথায় তাঁর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করলেন।

পর্বত যেমন তার পক্ষচ্ছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে শিলাবর্ষণ করে আক্রমণ করেছিল, গজসাধন (গজারোহী সৈন্যবলে বলীয়ান) কলিঙ্গরাজও তেমনি স্বপক্ষবিনাশে উদ্যত রঘুকে অস্ত্রবর্ষণে আক্রমণ করেছিলেন।

ককুৎস্থবংশের রঘু সেখানে শত্রুদের অস্ত্রবর্ষণ সহ্য করে, যেন বিধিমতো মঙ্গলস্নান করে, জয়শ্রী লাভ করলেন।

সেখানে যোদ্ধারা পানের যোগ্য জায়গা সাজিয়ে পানপাতায় তৈরি পানপাত্রে নারিকেলজাত মদ এবং তারই সঙ্গে শত্রুপক্ষের যশও পান করল।

ধর্মবিজয়ী সেই রাজা মহেন্দ্ররাজকে আগে বন্দী করে এবং পরে মুক্ত করে তাঁর রাজশ্রীই হরণ করলেন, রাজ্য নয়।

দক্ষিণে

ফলন্ত সুপারি গাছের সারিতে শোভিত সমুদ্রতীর দিয়ে জয়ে-নিস্পৃহ রঘু যেদিকে অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হয় সেই দক্ষিণ দিকেই গেলেন।

সৈন্যদের উপভোগে (জলকেলিতে) এবং গজমদে সুবাসিত কাবেরী নদীকে তিনি যেন সরিৎপতি সমুদ্রের কাছে সন্দেহের পাত্র করে তুলেছিলেন।

জয়েচ্ছু রঘুর সৈন্যেরা পথ অতিক্রম করে মরীচবনে বিচরণশীল হারীতপক্ষিপরিবৃত মলয়পর্বতের উপত্যকাগুলিতে আশ্রয় নিল।

অশ্বখুরে বিচলিত এলাচতলায় ফুলরেণু (উড়ে এসে) তাদেরই মতো গন্ধযুক্ত হাতিদের কটিদেশে সংলগ্ন হল।

চন্দন গাছে সাপের বেষ্টনীতে যে খাঁজগুলি তৈরি হয়েছে তাতে গলার শিকল আটকে যাওয়ায় পায়ের শিকল খুলতে পারলেও, হাতিরা তা (গলার শিকল) খসাতে পারে নি।

দক্ষিণদিকে সূর্যের তেজ কমে যায়; কিন্তু সেই দক্ষিণদিকেই পাণ্ড্যদেশীয় রাজারা রঘুর প্রতাপ সহ্য করতে পারল না।

তারা (পাণ্ড্যেরা) নত হয়ে তাম্রপর্ণী নদী ও মহাসমুদ্রের সঙ্গমস্থল থেকে সঞ্চিত কীর্তিরাজির মতো মুক্তারাজি তাঁকে দান করল।

সানুদেশে চন্দনসমন্বিত মলয় ও দর্দুর পর্বত দক্ষিণ দিগ্‌বধূর চন্দনচর্চিত স্তন দুটির মতো প্রতীয়মান হল। এই দুটিতে অসহ্য-বিক্রম রঘু যথেচ্ছভাবে বিহার করলেন তারপর সমুদ্র দূরে সরে যাওয়ায় মেদিনীর গলিত-বসন নিতম্বের মতো দৃশ্যমান সহ্য পর্বত লঙ্ঘন করলেন।

পশ্চিমে

অপরান্ত অর্থাৎ পশ্চিমদেশ জয়ে উদ্যত তাঁর সৈন্যদল (সহ্যপর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী) তটভূমি আচ্ছন্ন করে চললে মনে হল যেন পরশুরামের অস্ত্রচালনায় অপসারিত সমুদ্র সহ্যপর্বতে সংলগ্ন হয়ে আছে।

তাঁর ভয়ে কেরলের স্ত্রীলোকেরা অলংকার ত্যাগ করল এবং তাদের কুন্তলরাজিতে সৈন্যদের পদাঘাতে ধুলো উঠে প্রসাধনচূর্ণের প্রতিনিধিত্ব করল।

মুরলানদীর উপরে প্রবাহিত বায়ুতে বিকীর্ণ কেয়াফুলের রেণু তাঁর সেনাদের বর্মে লেপে গিয়ে অযত্নে-পাওয়া বস্ত্রসুগন্ধির কাজ করল।

ছুটন্ত ঘোড়াগুলির গায়ে বাঁধা বর্মগুলির ধ্বনি হাওয়ায়-ওঠা বিশাল তালবনের ধ্বনিকে ছাপিয়ে গেল।

হাতির দল খেজুরগাছের কাণ্ডে জড়ো হয়েছিল। ভ্রমরেরা নাগকেশরের ফুল ত্যাগ করে তাদের মদস্রাবে সুবাসিত গণ্ডদেশে এসে পড়ছিল।

শোনা যায়, পরশুরামের অনুরোধে সমুদ্র তাঁকে স্থান দিয়েছিল। এখন সেই সমুদ্র (অনুরুদ্ধ না হয়েও) পশ্চিমাঞ্চলের রাজাদের রূপ ধরে রঘুকে কবর দিল।

সেখানে তিনি মত্ত হাতিদের দন্তাঘাতে উৎকীর্ণ এবং পরাক্রমচিহ্নের প্রকাশক ত্রিকূট পর্বতকেই উন্নত জয়স্তম্ভে পরিণত করলেন।

তারপর সংযমী পুরুষ যেমন ইন্দ্রিয়নামক রিপুদের জয় করার জন্যে তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিচরণ করেন, তিনিও তেমনি পারসীকদের জয় করার জন্যে স্থলপথে প্রস্থান করলেন।

অকাল-মেঘের উদয় যেমন পদ্মের-উপর-পড়া প্রভাত সূর্যের প্রভা নষ্ট করে, তিনিও তেমনি যবনীদের মুখপদ্মের মদ্যপানজনিত রক্তিম আভা দূর করলেন।

অশ্বারোহী পশ্চিমদেশীয় সেনার সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হল। এমন ধুলো উড়ছিল যে প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাদের উপস্থিতি শুধু ধনুকের শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল।

ভল্লের আঘাতে তাদের যে-সব মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল তাই দিয়ে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করলেন। মনে হল যেন মৌমাছিভরা মধুর চাকে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করেছেন।

যারা বেঁচে ছিল তারা শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে রঘুর শরণ নিল। কারণ মহানুভবদের ক্রোধের উপশম শুধু প্রণিপাতেই সম্ভব।

দ্রাক্ষাবেষ্টিত ভূমিতে মূল্যবান মৃগচর্মে বসে মদ্যপান করে তাঁর সৈন্যেরা ক্লান্তি দূর করল।

উত্তরে

তারপর সূর্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করে (পৃথিবীর) রস শোষণ করার জন্যে উত্তরায়ণে যান, রঘুও তেমনি শরজাল নিক্ষেপে উত্তরদেশীয়দের উৎখাত করে উত্তরদিকে গেলেন।

তাঁর ঘোড়াগুলি সিন্ধুতীরে গড়াগড়ি দিয়ে পথশ্রম দূর করল এবং কুংকুমলাগা কেশরে মণ্ডিত ঘাড়গুলি কাঁপাতে লাগল।

সেখানে স্বামীদের প্রতি রঘুর শক্তিসূচক আচরণ হূণ রমণীদের কপোল রক্তিমার কারণ হল।

কম্বোজদেশের রাজারা যুদ্ধে তাঁর প্রভাব সহ্য করতে না পেরে হাতিবাঁধায় ক্ষতবিক্ষত আখরোট গাছের সঙ্গে নুয়ে পড়েছিল।

তাদের প্রচুর ভালো ভালো ঘোড়া এবং পর্যাপ্ত রত্নরাশি উপহার-হিসেবে অনবরত রঘুর কাছে আসতে লাগল কিন্তু তাতে কোনো গর্ববোধ তাঁকে আশ্রয় করে নি।

তারপর তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে উৎক্ষিপ্ত ধাতুরেণুতে শৃঙ্গগুলিকে আরও বর্ধিত করেই যেন হিমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন।

সৈন্যদের কলরব থাকলেও গুহাশায়ী সমবল সিংহেরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে তাদের নির্ভীকতাই প্রকাশ করল।

পথে ভূর্জতরুতে মর্মরধ্বনি তুলে কীচকবাঁশে শব্দ জাগিয়ে গঙ্গার জলকণা বয়ে বায়ু তাঁর সেবা করল।

সৈন্যেরা নমেরুগাছের ছায়ায় কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধে সুবাসিত প্রস্তরফলকে বসে বিশ্রাম করল।

দেবদারু গাছে বাঁধা হাতিদের গলার শিকলে আলো এসে পড়ছিল, তাই ওষধিরা রাতে অধিনায়কের (রঘুর) তৈলহীন প্রদীপের কাজ করল।

তিনি সেনানিবাস তুলে নিলেন; হাতিদের গলায় বাঁধা দড়ির দাগ লাগা দেবদারু গাছগুলি কিরাতদের তাঁর হাতিদের দেহের উচ্চতা জানিয়ে দিল।

সেখানে পার্বত্যজাতির সঙ্গে রঘুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, তাতে নারাচ, ভিন্দিপাল ও প্রস্তরের পরস্পর ঘর্ষণে আগুন ঠিকরাতে লাগল।

তিনি শরনিক্ষেপে উৎসবসংকেত নামে পার্বত্য জাতিদের নিরুৎসব করে কিন্নরদের দিয়ে নিজের বাহুযুগলের বিজয়গান গাইয়ে নিলেন।

তারা উপহার হাতে নিয়ে এলে রাজা হিমালয়ের সম্পদ এবং হিমালয় রাজার পরাক্রম জানতে পারলেন।

তিনি সেখানে অম্লান যশোরাশি স্থাপন করে রাবণ-উত্তোলিত কৈলাসপর্বতের লজ্জা উৎপাদন করেই যেন অবতরণ করলেন।

তিনি লৌহিত্যনদ পার হলে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা রঘুর হাতিদের বন্ধনস্তম্ভ রূপে গৃহীত কৃষ্ণাগুরু গাছগুলির মতো তাদের সঙ্গে একইভাবে কম্পিত হতে লাগলেন।

রঘুর রথমার্গের ধুলো ধারাবর্ষণহীন দুর্দিনের মতো সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা সেই ধুলোই সহ্য করতে পারলেন না, রঘুর সেনাদের প্রতাপ সহ্য করা তো দূরের কথা।

কামরূপের রাজা পরাক্রমে ইন্দ্রকে জয় করলেও রঘুকে ভজনা করলেন মদবর্ষী হাতিদের দান করে। সেইসব হাতিদের দিয়ে তিনি অন্য রাজাদের গতিরোধ করতেন।

কামরূপের রাজা রঘুর স্বর্ণপীঠে-রাখা পদযুগলের ছায়ারূপ দেবতাকে রত্নরূপ পুষ্প-উপহারে অর্চনা করলেন।

বিজয়ী রঘু এইভাবে চারদিকে জয় করে তাঁর রথোত্থিত ধুলোয় রাজাদের ছত্রহীন মুকুট স্থাপন করে রাজধানীতে ফিরলেন।

সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় এমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ তিনি সম্পাদন করলেন। মেঘেদের মতোই সজ্জনেরা যা গ্রহণ করেন তা দান করার জন্যে।

বন্দীমুক্তি

অপত্যদের সঙ্গে ককুৎস্থবংশজ রঘু রাজাদের বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করে তাঁদের পরাজয়ের দুঃখ দূর করলেন ; তাঁদের পত্নীরা দীর্ঘকাল তাঁদের বিরহে উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলে সেই রাজাদের তিনি নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন।

প্রস্থানকালে তাঁরা ধ্বজ, বজ্র ও ছত্ররেখায় চিহ্নিতচরণে প্রণত হলেন, সে চরণ রাজার অনুগ্রহেই লাভ করা সম্ভব। প্রণাম করবার সময় তাঁদের মুকুটমালা থেকে ঝরে-পড়া পরাগরেণু দিয়ে তাঁরা রঘুর আঙুলগুলিকে শুভ্রবর্ণ করে তুললেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'রঘুর দিগ্বিজয়' নামক চতুর্থ সর্গ ॥

পঞ্চম সর্গ

মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞে সমস্ত ধনরাশি নিঃশেষে দান করেছেন। এমন সময়ে বেদাধ্যয়নশেষে বরতন্তুশিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্যে (প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রার্থনায়) তাঁর কাছে এলেন।

অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী যশোভাস্বর অতিথিবৎসল রঘু স্বর্ণপাত্র না থাকায় মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করলেন।

রঘু ও কৌৎস

সম্মানই যাঁদের সম্পদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নিয়মনিষ্ঠ ও কার্যজ্ঞ রাজা তপস্বীকে আসনে বসিয়ে যথানিয়মে অর্চনা করে যুক্তকরে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—

হে কুশাগ্রধী! মন্ত্রকৃৎ ঋষিদের অগ্রণী আপনার গুরু। সূর্যের কাছ থেকে জগৎ যেমন চৈতন্য লাভ করে আপনিও তেমনি তাঁর কাছ থেকে অশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন। আপনার সেই গুরুর কুশল তো ?

তিনি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রেরও আশঙ্কাজনক যে তপস্যা সঞ্চয় করে চলেছেন, কোনো বাধাবিঘ্নে তাঁর সেই ত্রিবিধ তপস্যার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো ?

আলবাল-বন্ধন এবং অন্যান্য নানারকম যত্নে আপনারা অপত্য-নির্বিশেষে যে সব তপোবনতরুগুলিকে সংবর্ধিত করেছেন প্রবল বায়ু বা অন্যান্য উৎপাতে আপনাদের সেই শ্রান্তিনাশক তরুগুলির কোনো ক্ষতি হয় নি তো ?

যজ্ঞের কাজের জন্যে তোলা কুশতৃণাদিতে মুখ দিলেও স্নেহবশে আপনারা যাদের বাধা দেন না, আপনাদের কোলেই যাদের নাভিসংলগ্ন নাড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়ে, সেই মৃগশিশুরা নিরাপদে আছে তো ?

যে সব তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন, যাদের বালুকাময় তটদেশ সংগৃহীত শস্যের ষষ্ঠাংশভাগে চিহ্নিত আপনাদের সেই তীর্থজলের মঙ্গল তো ?

যথাকালে সমাগত অতিথিদের জন্যে আপনারা যে বনজ নীবারধানের ভাগ রক্ষা করেন, শরীররক্ষার জন্যে যে ধান আপনাদের প্রধান অবলম্বন, গ্রাম থেকে তৃষপ্রিয় পশুরা এসে তা নষ্ট করে না তো ?

(আপনার গুরু) মহর্ষি কি যথোচিত শিক্ষাদানের পর প্রসন্নচিত্তে আপনাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন ? কারণ (আপনার বয়স বিবেচনায়) সমস্ত হিতসাধনে সমর্থ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের এই তো উপযুক্ত সময়।

পূজনীয় আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছেন সত্য কিন্তু এই আগমনেই আমার মন পরিতৃপ্ত হয় নি। আপনার কোনো আদেশ পালনে আমার মন উৎসুক হয়েছে। আপনি কি গুরুর আদেশে, না নিজেই আমাকে কৃতার্থ করতে তপোবন থেকে এখানে এসেছেন ?

রঘুর এইরকম উদার বাক্য শুনেও, অর্ঘ্যপাত্রটি দেখে তাঁর নির্ধনতা অনুমান করে এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা খুবই ক্ষীণ তা বুঝে বরতন্তুশিষ্য তাঁকে বললেন—

হে রাজন্, সর্বত্রই আমাদের কুশল জানবেন। হে নাথ, আপনি যাঁদের রক্ষাকর্তা সেই প্রজাদের অমঙ্গল হবে কী করে ? সূর্য যখন কিরণ দেয় তখন অন্ধকার কেমন করে লোকের দৃষ্টি আড়াল করবে ?

হে মহাভাগ, পূজনীয়দের প্রতি আপনার ভক্তি কুলোচিত হলেও আপনি তাতে পূর্বপুরুষদের অতিক্রম করেছেন। কিন্তু আমি অসময়ে আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি—এটাই আমার দুঃখের কারণ।

হে নরেন্দ্র ! সৎপাত্রে সর্বস্ব দান করে আপনি কেবল শরীর ধারণ করে আছেন। অরণ্যচারীরা শস্য চয়ন করে নিয়ে গেলে নীবারের শুধু স্তম্ভই অবশিষ্ট থাকে, আপনাকে দেখতে এখন সেই নীবারের মতো।

আপনি একচ্ছত্র সম্রাট হয়েও যে এই যজ্ঞজনিত নিঃস্বতা প্রকাশ করেছেন তা ঠিকই হয়েছে। কারণ (কৃষ্ণপক্ষ) দেবতারা পর্যায়ক্রমে পান করার ফলে চাঁদের যে কলাক্ষয় হয় তা বৃদ্ধির চেয়েও গৌরবজনক।

আমি বরং অন্য কারও কাছ থেকে গুরুদক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। আপনার মঙ্গল হোক। চাতকও শরতের জলহীন মেঘের কাছে জলের প্রার্থনা করে না।

এই বলে মহর্ষির শিষ্য ফিরে যেতে উদ্যত হলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধীমান্ ! গুরুকে কী দিতে হবে, তার পরিমাণই বা কত ?'

তারপর বিচক্ষণ সেই ব্রহ্মচারী যথাবিধি যজ্ঞসম্পাদক গর্বলেশহীন বর্ণাশ্রমের সেই রক্ষককে প্রকৃত বিষয় বলতে লাগলেন—

বিদ্যা সমাপ্ত হলে কী গুরুদক্ষিণা দেব তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরুভক্তিকেই বড় বলে মনে করলেন।

আমি বারবার অনুরোধ করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আমার অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা চিন্তা না করেই বললেন (অর্জিত) বিদ্যার সংখ্যা অনুসারে তুমি আমাকে চৌদ্দকোটি সুবর্ণমুদ্রা দাও।

এই অবস্থায় পড়লেও অভ্যর্থনা-পাত্র থেকেই আপনি যে এখন নামেমাত্র রাজা তা বুঝে গুরুদক্ষিণার এই আধিক্য দেখে আপনাকে আর অনুরোধ করতে উৎসাহ বোধ করছি না।

বেদজ্ঞ শিরোমণি ব্রাহ্মণ তাঁকে এভাবে সব কথা জানালে সেই শশাঙ্ককান্তি জিতেন্দ্রিয় সম্রাট তাঁকে আবার বললেন—

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করে ব্যর্থকাম হয়ে রঘুর কাছ থেকে অন্য দাতার কাছে গিয়েছে—আমার এ রকম প্রথম নিন্দা যেন না হয়।

হে বরেণ্য! আপনি আমার পূজনীয় ও প্রশস্ত অগ্নিগৃহে চতুর্থ অগ্নির মতো দু-তিনদিন মাত্র অপেক্ষা করুন। এই সময়ের মধ্যে আমি আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করব।

ব্রাহ্মণ প্রীত হয়ে তাঁর অমোঘ প্রতিজ্ঞায় 'তাই হোক' বলে সম্মত হলেন। রঘুও (এর আগে দিগ্‌বিজয়ের ফলে) পৃথিবীকে ধনশূন্য বিবেচনা করে কুবেরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন।

বশিষ্ঠের মন্ত্রপূত জলক্ষেপের প্রভাবে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো তাঁর রথের গতি সমুদ্রে আকাশে ও পর্বতে অপ্রতিহত।

কৈলাসনাথকে (কুবেরকে) সামন্ত রাজমাত্র মনে করে বাহুবলে তাকে জয় করতে চেয়ে প্রশান্তচিত্ত রঘু সন্ধ্যায় অস্ত্রসজ্জায় রথে শয়ন করলেন।

দিব্যধনলাভ

প্রভাতে তিনি যুদ্ধযাত্রায় রওনা হবেন এমন সময় কোষগৃহে নিযুক্ত কর্মীরা সবিস্ময়ে এসে জানাল আকাশ থেকে কোষগৃহে স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছে।

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে যাবেন সেই কুবেরের কাছ থেকে পাওয়া উজ্জ্বল স্বর্ণরাশি তিনি নিঃশেষে কৌৎসকে দিয়েছিলেন। সেই (বিপুল) স্বর্ণরাশি বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণ সুমেরুসানুর সঙ্গেই তুলনীয়।

প্রার্থী (কৌৎস) গুরুকে যা দিতে হবে তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশী নিতে অনিচ্ছুক, এদিকে রাজাও প্রার্থী যা চেয়েছেন তার চেয়ে বেশী দিতে চান। এ অবস্থায় (অর্থী ও দাতা) দুজনের মহত্ত্বকেই সাকেতনিবাসী জনগণ অভিনন্দন জানাল।

তারপর রাজা শত শত উট ও ঘোড়া দিয়ে সেই অর্থ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রসন্নচিত্ত মহর্ষি কৌৎস প্রস্থানকালে দেহের পূর্বাংশ অবনত করে সম্মুখে দাঁড়ান রাজাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন—

যে রাজা যথাযথ (চতুর্বিধ) রাজবৃত্ত পালন করেন ধরিত্রী যদি তাঁর অভীষ্ট প্রসব করেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনার প্রভাব সত্যিই অচিন্তনীয় কারণ আপনি স্বর্গ থেকেও আপনার অভীষ্ট দোহন করে আনলেন।

সমস্ত মঙ্গলই আপনার করতলগত, তাই যে-কোনো আশীর্বাদই আপনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তির মতো। তবু আপনার পিতা যেমন বরেণ্য-আপনাকে পেয়েছেন তেমনি আপনিও নিজের গুণের অনুরূপ পুত্র লাভ করুন এই কামনা করি।

ব্রাহ্মণ এইভাবে রাজাকে আশীর্বাদ দিয়ে গুরুর কাছে রওনা হলেন। রাজাও সূর্য

থেকে যেমন আলোক জন্মলাভ করে তেমনি তাঁর আশীর্বাদ থেকে (অর্থাৎ আশীর্বাদের ফলে) অল্পদিনের মধ্যে একটি পুত্রলাভ করলেন।

রঘুর পুত্র অজ

সেই রাজার মহিষী ব্রাহ্মমুহূর্তে কার্তিকের মতো একটি পুত্র প্রসব করলেন। তাই (ব্রাহ্মমুহূর্তে জাত বলে) ব্রহ্মার নাম অনুসারেই পিতা সেই পুত্রের নাম রাখলেন 'অজ'।

সেই তেজোময় রূপ, সেই বীর্য, সেই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য। এক প্রদীপ থেকে জ্বালানো অন্য প্রদীপের মতো নিজের জন্মকারণ পিতার থেকে তার কোনো পার্থক্যই ছিল না।

রাজকুমার

গুরুদের কাছ থেকে বিধিমতো বিদ্যা অর্জন করে যৌবনসমাগমে বিশেষ কান্তিমণ্ডিত হলেন। মনে হল রাজলক্ষ্মী তাঁর (অজের) প্রতি অনুরাগিণী হলেও স্থিরবুদ্ধি কন্যা (বিবাহ বিষয়ে) যেমন পিতারই অনুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করেন সেই রকম রঘুর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিদর্ভরাজ্যের রাজা ভোজ তাঁর ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় কুমারকে (অজকে) আনবার জন্যে উৎসুক হয়ে বিশ্বস্ত একজন দূতকে রঘুর কাছে পাঠালেন।

তিনি (রঘু) ভোজের সঙ্গে (বৈবাহিক) সম্বন্ধ প্রশংসনীয় এবং পুত্রও বিবাহযোগ্য এ কথা বিচার করে এঁকে (অজকে) সসৈন্যে বিদর্ভরাজের সমৃদ্ধ রাজধানীতে পাঠালেন।

সেই রাজপুত্রের যাত্রাপথে তৈরি (অস্থায়ী) নগরোচিত আবাসগুলি প্রমোদকাননের মতো হয়ে উঠেছিল। এই আবাসগুলির পটমণ্ডপগুলিতে শয্যাদি সাজানো হয়েছিল, গ্রামবাসীরা নানারকম উপহার বয়ে আনছিল।

পথ পাড়ি দিয়ে অজ ক্রমে নর্মদাতীরে এসে পড়লেন। তার তীরে করঞ্জক গাছগুলি জলকণায় আর্দ্র বাতাসে দুলছিল। ক্লান্ত সৈনিকদের তিনি এখানেই শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলেন। তাদের পতাকাগুলি ধূলিধূসর হয়ে পড়েছিল।

বন্যগজের আক্রমণ

তারপর এক বন্যগজ নদী থেকে উঠে এল। তার গণ্ডদেশ থেকে মদবারি নিঃশেষে ধুয়ে গিয়েছিল। উপরে উড়ন্ত ভ্রমর দেখে সে যে জলে প্রবেশ করেছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।

পাথরের আঘাতে তার দাঁতদুটো একটু ভেঙে গিয়েছিল। জলে ধুয়ে যাওয়ায় গৈরিক ধাতুর চিহ্ন না থাকলেও তাতে নীলরঙের উর্ধ্বরেখা দেখা যাচ্ছে বলে সে যে ঋক্ষ-বান পর্বতের তটে বপ্রক্রীড়া করেছে তা বোঝা যাচ্ছে।

দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণশীল শুঁড় দিয়ে সে বড় বড় ঢেউগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে চিৎকার করতে করতে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। মনে হল সে যেন বন্ধন-স্তম্ভ ভেঙে ফেলতে চাইছে।

পর্বতপ্রমাণ সেই গজরাজের তাড়নায় জলপ্রবাহ তীরভূমি প্লাবিত করল। পরে বুক দিয়ে শৈবালদাম বয়ে নিয়ে সে স্বয়ং তীরে উঠে এল।

(অজের শিবিরে বাঁধা) পালিত হাতিদের দেখে সেই যূথপতির গণ্ডদেশে যে মদবর্ষণের শোভা জলকাদায় ক্ষণকালের জন্যে স্তিমিত ছিল তা আবার উদ্দীপিত হল।

ছাতিম গাছের উগ্রগন্ধি দুধের মতো তার অসহ্য মদবারির গন্ধ পেয়ে (তাঁর) সেনাবিভাগের হাতিরা মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। মাহুতেরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের নিবারণ করতে পারল না।

সেই বুনো হাতি মুহূর্তের মধ্যে সেনানিবেশ তোলপাড় করে তুলল। ঘোড়াগুলি লাগাম ছিঁড়ে পালাতে থাকায় জাঙাল ভেঙে রথগুলি বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রইল। অবলাদের রক্ষার জন্যে যোদ্ধারা ছুটোছুটি করতে লাগল।

বুনো হাতি রাজাদের মারতে নেই, এ কথা কুমার জানতেন বলে ছুটে আসা হাতিকে কোনোমতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে ধনুক সামান্য একটু আকর্ষণ করে তার কপালে বাণ দিয়ে আঘাত করলেন।

গন্ধর্বের আবির্ভাব

বাণ গিয়ে তার দেহে বেঁধামাত্রই সে গজদেহ পরিত্যাগ করে উজ্জ্বল প্রভামণ্ডলের মধ্যবর্তী হয়ে মনোহর আকাশচরের (গন্ধর্বের) দেহ ধারণ করল। সৈন্যেরা অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল।

তারপর সেই বাগ্মী নিজের প্রভাববলে সংগৃহীত কল্পতরুর পুষ্পরাশি অজের উপরে বর্ষণ করে দন্তরাজির কিরণে তাঁর বুকের মুক্তাহারের কান্তিকে বর্ধিত করে বললেন—

আমি প্রিয়দর্শন নামে গন্ধর্বপতির পুত্র প্রিয়ংবদ। অহংকারের ফলে আমি মতঙ্গমুনির শাপে মাতঙ্গরূপে পরিণত হয়েছিলুম।

পরে আমি বিনীতভাবে অনুনয়-বিনয় করাতে তিনি কোমল হলেন। অগ্নি এবং উত্তাপের যোগেই জল উষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি।

সেই তপোনিধি আমাকে বললেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশজাত অজ যেদিন লৌহমুখ বাণে তোমার কুম্ভ বিদ্ধ করবেন সেদিন তুমি তোমার নিজের দেহমহিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি দীর্ঘকাল আপনার পথ চেয়েছিলাম, (আজ) মহাপ্রাণ আপনি আমাকে শাপমুক্ত করলেন। আপনার যদি কোনো প্রত্যুপকার না করি তাহলে আমার এই নিজের দেহ ফিরে পাওয়া ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হে সখা! 'সম্মোহন' নামে এই গন্ধর্ব অস্ত্র গ্রহণ করুন, এর প্রয়োগ এবং প্রতিসংহারের মন্ত্র পৃথক পৃথক। এই অস্ত্রে শত্রুনিধন হবে না, অথচ জয় হবে করতলগত।

(আঘাত করেছেন বলে) আমাকে আপনি লজ্জা করবেন না। কারণ প্রহার করার সময়ও আপনি মুহূর্তের জন্যে সদয় হয়েছিলেন। তাই আমি যখন প্রার্থনা করছি তখন আমার প্রতি প্রত্যাখ্যানের রুক্ষতা প্রয়োগ করবেন না।

নৃপচন্দ্র সেই অজ 'তাই হোক' এ কথা বলে চন্দ্রোদ্ভবা নদী নর্মদার জল স্পর্শ করে উত্তরমুখ হয়ে শাপমুক্ত সেই গন্ধর্বের কাছ থেকে অস্ত্রমন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এইভাবে দৈবযোগে পথে তাদের দুজনের মধ্যে সখ্য হল যার কারণ অচিন্ত্যনীয়। এবারে তাদের একজন চৈত্ররথ প্রদেশে (কুবেরের মনোহর উদ্যানে) আর একজন সুশাসনরম্য বিদর্ভরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

বিদর্ভরাজ্যে এসে

তিনি নগরের উপকণ্ঠে পৌঁচেছেন জেনে তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিদর্ভ-রাজ, উদ্বেলিত-তরঙ্গ সমুদ্র যেমন চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে তেমনি করে, অজকে অভ্যর্থনা করলেন।

বিদর্ভরাজ আগে আগে গিয়ে এঁকে নগরে প্রবেশ করিয়ে প্রসন্নচিত্তে এমন আদরযত্ন করতে লাগলেন যে মিলিত পুরবাসী বিদর্ভরাজকে আগন্তুক এবং অজকেই গৃহপতি ভাবতে লাগল।

বিনম্র অনুচরেরা, রঘুসদৃশ অজকে রমণীয় নবনির্মিত পটমণ্ডপ দেখিয়ে দিলে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। তার দ্বারদেশে নির্মিত বেদীতে পূর্ণকুম্ভ রাখা হয়েছিল, মনে হল মূর্তিমান মদনদেব যেন বাল্যের পর (সুরম্য) যৌবনদশায় উপনীত হলেন।

সেখানে যে কমনীয় কন্যারত্ন স্বয়ংবর সভায় রাজসমাজকে সম্মিলিত করেছিলেন তাঁকে পাবার ইচ্ছায় রাত্রে অজের নিদ্রা অনেকক্ষণ পরে তাঁর নয়নবর্তিনী হল, পতির অভিপ্রায়বোধে অসমর্থা প্রণয়িনী যেমন হয় তেমনি।

যাঁর কুন্তল স্থূল অংশদেশকে পীড়ন করেছিল, শয্যার আস্তরণ বিমর্দনে যার অঙ্গরাগ ম্লান হয়ে পড়েছিল, প্রখ্যাতধী সেই অজকে প্রভাতে জাগ্রত করলেন তারই সমবয়সী প্রগল্ভবাক্ চারণপুত্রেরা।

জাগরণী

হে সুধীশ্রেষ্ঠ! ভোর হল, শয্যা ত্যাগ কর। বিধাতা পৃথিবীর ভার দুভাগে ভাগ করেছেন। তার একদিক বিনিদ্রভাবে ধারণ করে আছেন তোমার পিতা, তার আর দিক অবলম্বন করে আছ তুমি।

তুমি নিদ্রাদেবীর বশীভূত হওয়ায় রাতে উপেক্ষ্যমানা সৌন্দর্যদেবী খণ্ডিতা নায়িকার মতো যার দিকে তাকিয়ে ঔৎসুক্য দূর করছিলেন সেই চাঁদও দিগন্তে অস্ত যেতে যেতে তোমার মুখের লাবণ্য পরিত্যাগ করছে।

তাই অবিলম্বে মনোজ্ঞ উন্মীলনে দুটি জিনিস যুগপৎ পারস্পরিক সাদৃশ্য লাভ করুক। একটি তোমার চোখ, অপরটি পদ্ম। উন্মীলনের সময় তোমার নয়নের কোমল তারা দুটি স্পন্দিত হবে, পদ্মের (অবরুদ্ধ) ভ্রমরও (বাহিরে আসবার জন্যে) অস্থির হয়ে পড়বে।

প্রভাতবায়ু তোমার স্বাভাবিক মুখমারুতের সুবাস পরগুণে (অন্য সংক্রান্ত গন্ধে) লাভ করতে চেয়ে শিথিল তরুকুসুমকে বৃন্ত থেকে হরণ করছে, এবং তার সঙ্গে সূর্যের স্পর্শে উন্মোচিত পদ্মের সঙ্গ নিচ্ছে।

তাম্রগর্ভ তরুপল্লবে পতিত হওয়ায় মুক্তাফলের মতো শুভ্র শিশির (সৌন্দর্যে) আরও উৎকর্ষ লাভ করায় তোমার (আরক্ত) অধরোষ্ঠে শুভ্র দন্তচ্ছটামণ্ডিত কৌতুকহাস্যের মতোই শোভা পাচ্ছে।

প্রতাপনিধি সূর্য ওঠার আগেই অরুণ দ্রুত অন্ধকার বিনাশ করে। হে বীর! বীরদের অগ্রগণ্য তুমি থাকতেও কি তোমার পিতা নিজে শত্রু দমন করবেন?

তোমার গজরাজেরা এপাশ-ওপাশ করে ঘুম থেকে উঠছে, এতে শৃঙ্খল আকর্ষণের ধ্বনি উঠছে। এইভাবে তারা শয্যা তাগ করছে। তাদের দন্তরাজিতে তরুণ অরুণ রাগ

সঞ্চারিত হওয়ায় মনে হচ্ছে তারা ধাতুময় সানুতে বপ্রক্রীড়া করে ফিরছে।

হে কমলাক্ষ! দীর্ঘ পটমণ্ডপে-বাঁধা বনায়ুদেশীয় ঐ ঘোড়াগুলি নিদ্রা ত্যাগ করে তাদের সম্মুখে রাখা লেহনযোগ্য সৈন্ধবশিখার খণ্ডগুলি মুখের বাষ্পে মলিন করে তুলছে।

ম্লান পুষ্পোপহার শিথিলগ্রন্থি হয়ে পড়ছে। প্রদীপগুলি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া খাঁচায় বন্ধ তোমার এই মধুরবাক শুক পাখিটি তোমাকে জাগাতে গিয়ে আমরা যে সব কথা বলছি তার অনুকরণ করছে।

রাজহংসদের কলধ্বনিতে জেগে উঠে সুপ্রতীক নামে দিগ্‌গজ যেমন গঙ্গার সৈকতভূমি পরিত্যাগ করে তেমনি বৈতালিকপুত্রদের বিরচিতবচনে বিনিদ্র হয়ে কুমার শয্যাত্যাগ করলেন।

তারপর ললিতনেত্র অজ বিধিমতো প্রাতঃকর্তব্য সমাপন করলেন এবং প্রসাধন-দক্ষরা তাঁকে উপযুক্ত বেশে সজ্জিত করলে তিনি স্বয়ংবর সভায় সমাসীন রাজসমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অজের স্বয়ংবর যাত্রা' নামক পঞ্চম সর্গ ॥

ষষ্ঠ সর্গ

সেখানে তিনি (কুমার অজ) দেখলেন, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত পৃথিবীর রাজারা বিমানচারী দেবগণের শোভা নিয়ে, রাজোচিতভাবে অলংকৃত সিংহাসনে (সারে সারে) বসে আছেন।

পত্নী রতির প্রার্থনায় তুষ্ট মহাদেব বুঝি মদনকে আবার তার শরীরটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ককুৎস্থকে দেখে তাই মনে করে উপস্থিত রাজাদের মন ইন্দুমতীর আশা হারাল!

বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে কুমার (অজ) সাজানো সোপান-পথে মঞ্চে আরোহণ করলেন; যেমন ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পা-রেখে সিংহশিশু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে।

উজ্জ্বলতম রঙের আস্তরণ-দেওয়া রত্নময় আসনে তিনি বসলেন—রূপে যেন একেবারে ময়ূরের পিঠে-চড়া কার্তিক।

সৌন্দর্যের আসল রূপটি (যেন) সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে হাজার ভাগে ভাগ হয়ে অদ্ভুত তেজে চোখ ধাঁধিয়ে দিল—মেঘের রাশির গায়ে গায়ে যেমন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে।

সেই উজ্জ্বল-বেশবাসযুক্ত ও মহার্ঘ আসনে সমাসীন রাজাদের মধ্যে নিজের তেজে দীপ্তিমান রঘুপুত্রকে কল্পবৃক্ষের মধ্যে পারিজাতের মতো মনে হল।

অন্য সব রাজাকে ছেড়ে পুরবাসীদের চোখ তার উপরে গিয়ে পড়ল, ফুলগাছ ছেড়ে দিয়ে ভোমরারা যেন উড়ে বসল মদস্রাবী বন্য গন্ধহাতির উপরে।

ইন্দুমতীর প্রবেশ—রাজাদের প্রতিক্রিয়া

তারপর—সকলের বংশমর্যাদা জেনে-শুনে সূর্যবংশের আর চন্দ্রবংশের সব রাজাদের স্তুতি গাওয়া হয়ে গেলে, অগুরুধূপের ধোঁয়া বাতাসে উড়ে পতাকাগুলিকে ছাড়িয়ে গেলে,

দিগ্‌দিগন্তে গভীর-গম্ভীর মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি উঠলে, তাই শুনে নগরের উপকণ্ঠে উপবনের ময়ূরেরা (মেঘের গর্জন ভেবে) নেচে উঠলে—

মানুষে-বয়ে-আনা চতুর্দোলায় চড়ে, চারদিকে পরিজনসহ দু-সারি মঞ্চের মধ্যেকার রাজপথে প্রবেশ করলেন—

বধূবেশে স্বয়ংবরা কন্যা (ইন্দুমতী)।

বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, শত-শত চোখের একমাত্র লক্ষ্য ঐ কন্যার উপরে সমস্ত মন নিয়ে রাজারা পড়লেন—আসনে পড়ে থাকল শুধু দেহগুলি।

তার প্রতি মনোগত অভিলাষ নিয়ে রাজকুল প্রেমনিবেদনের অগ্রদূতের মতো বিভিন্ন প্রণয়চেষ্টা প্রকাশ করলেন যেমন গাছেরা পল্লবশোভা বিস্তার করে।

কেউ হাতের লীলাকমলের মৃণালটিকে দুহাতে চেপে ধরে ঘোরাতে থাকলেন, চঞ্চল পাপড়িগুলির আঘাতে (ফুলে বসে থাকা) ভোমরা উড়ে গেল, রেণুগুলি উড়ে একটা মণ্ডল তৈরি করল।

কোনো বিলাসী কাঁধ থেকে খসে-পড়া রত্নখচিত কেয়ূরে আটকে যাওয়া মালাটি টেনে ঠিক জায়গায় বসাতে গিয়ে সুন্দর মুখটি একটু বাঁকিয়ে নিলেন।

অন্যজনে আবার চোখের দৃষ্টি একটু নামিয়ে আঙুলের আগাটি বাঁকিয়ে, নখের আঁকা-বাঁকা আলো ছড়িয়ে, সোনার পাদপীঠে কী যেন লিখলেন।

একজন বাঁ-হাতটি আসনে ভর দিয়ে এবং তার ফলে (বাঁ)-কাঁধটি একটু বেশী উঁচু করে বন্ধুর সঙ্গে ভীষণ আলাপ শুরু করলেন—তার গলার হার ঘুরে গিয়ে মেরুদণ্ড স্পর্শ করল। (অর্থাৎ বাঁ-দিক ঘেঁষে সে বেশ একটু ঘুরে বসেছিল)।

এক যুবক প্রিয়তমার নিতম্বদেশে আঘাতে পটু নখ নিয়ে প্রেয়সীর মনভোলানো দন্তপত্র কেতকীফুলের প্রায়-সাদা পাপড়িগুলি ছিঁড়তে লাগলেন।

কারো বা লালপদ্মের মতো রাঙা হাতের তেলোয় অনেক রেখা ও ধ্বজ-চিহ্ন ছিল; তিনি জড়োয়া আংটির জেল্লা ছড়িয়ে লীলাভরে পাশার দান দিলেন।

কেউ ঠিক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও, একটু যেন নড়ে উঠেছে এমনভাবে মুকুটে হাত ছোঁয়ালেন—মুকুটে বসানো বজ্রমাণিকের ছটায় আঙুলগুলি ভরে গেল।

রাজাদের পরিচয়

মগধদেশের রাজা

তখন দ্বারপালিকা সুনন্দা যে সব রাজার বংশ এবং কীর্তির কথা জানত, রাজকুমারীকে প্রথমেই মগধদেশের রাজার কাছে নিয়ে পুরুষের মতো বাক্‌পটু ভঙ্গীতে বলল—

ইনি মগধদেশের রাজা, ইনি শরণাগতদের একমাত্র আশ্রয়, এঁর স্বভাব গম্ভীর, প্রজাদের মনোরঞ্জন করেই তাঁর নাম 'রাজা', এঁর পরন্তপ নাম সার্থক হয়েছে।

অন্য রাজা যতই থাকুক হাজারে হাজারে, এঁকে দেখিয়েই সকলে পৃথিবীকে সুশাসিত বলে। গ্রহ-তারা নক্ষত্র অনেক থাকলেও চাঁদই রাত্রিকে আলোকময়ী করে।

ইনি অনবরত নানা যাগ-যজ্ঞ করেন, সেখানে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র উপস্থিত থাকেন—ফলে শচীদেবীর পাণ্ডুর কপোলে এসে-পড়া অলকাবলীতে দীর্ঘদিন হল মন্দারফুল শোভা পায় না।

যদি চাও যে ইনি তোমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহলে (নগরীতে) প্রবেশ করার সময়ে

রাজপ্রাসাদের জানালায় জানালায় দাঁড়ানো পাটলিপুত্রের পুরসুন্দরীদের (তোমাকে) চোখে দেখার আনন্দ দাও।

সে এইরকম বললে সুন্দরী তার দিকে চেয়ে, দূর্বাঘাস আর মৌ-ফুলের মালাটি একটু দুলিয়ে, একটিও কথা না বলে একটি শুষ্ক নমস্কারে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

বেত্রধারিণী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য রাজার সামনে নিয়ে গেল—হাওয়ায় দুলে ওঠা ঢেউ যেমন মানস সরোবরের রাজহংসীকে (এক পদ্ম থেকে) অন্য পদ্মফুলে নিয়ে যায়।

অঙ্গদেশের রাজা

(সুনন্দা) তাঁকে বলল—ইনি অঙ্গদেশের রাজা, এঁর যৌবনলালিত্য সুরসুন্দরীদেরও কামনার বিষয়, সূত্রকারেরা স্বয়ং এঁর গজসমূহকে শিক্ষাদান করেছেন, পৃথিবীতে বাস করেও ইনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

বড় বড় মুক্তাফলের মতো অশ্রুবিন্দুতে শত্রুনারীদের স্তনদেশ ভরিয়ে দিয়ে ইনি যেন ছিনিয়ে-নেওয়া হারগুলিতে বিনা-সুতোয় গেঁথে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও এঁর মধ্যে দুটিই স্থান পেয়েছে—ওগো কল্যাণি, রূপে এবং মধুর বচনে তুমিই ওদের (দুজনের) তৃতীয়া সপত্নী হবার উপযুক্ত।

তখন কুমারী অঙ্গরাজের থেকে চোখ নামিয়ে ধাত্রীকে বললেন—'চলো'। তিনি (অঙ্গরাজ) সুদর্শন ছিলেন না তা নয়, ইন্দুমতী বিচার করতে জানতেন না তা-ও নয়, মানুষ-ভেদে রুচির তফাৎ হয়।

অবন্তিদেশের রাজা

তারপরে দ্বারপালিকা শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ (অথচ) সদ্য-ওঠা চাঁদের মতো সুন্দর এক রাজাকে ইন্দুমতীর চোখে আনল।

ইনি অবন্তিদেশের রাজা, আজানুলম্বিতবাহু, বিশাল বক্ষদেশ, মাঝখানটা (কটিদেশ) ক্ষীণ ও গোলাকার—ত্বষ্টার ধারাচক্রে বসিয়ে শাণিত সূর্যের মতোই ইনি দীপ্তিমান।

এই রাজা যখন তিনশক্তি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন এগিয়ে যাওয়া ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো-ঝড়ে সামন্ত-রাজাদের মুকুটের মণির ছটা অঙ্কুরসুদ্ধ ঢাকা পড়ে যায়।

চন্দ্রশেখর-মহাদেবের মহাকালে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কাছেই এঁর বাস, কৃষ্ণপক্ষেও ইনি প্রেয়সীদের সঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করেন।

ওগো রম্ভোরু, এই তরুণ-রাজার সঙ্গে শিপ্রা নদীর ঢেউয়ে ভাসা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা উদ্যানসমূহে বিহার করতে মন চাইছে কি?

কুমুদিনী যেমন বন্ধু-পদ্মফুলকে ফুটিয়ে-তোলা এবং শত্রু-পঙ্করাশিকে তেজে শুকিয়ে দেওয়া সূর্যকে চায় না, তেমন চমৎকার লাবণ্যময়ী (ইন্দুমতী) বন্ধুবৎসল এবং শত্রুনাশক তাঁর প্রতি অনুরাগ অনুভব করলেন না।

অনূপদেশের রাজা

সুনন্দা লালপদ্মের মতো তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বগুণসম্পন্না, বিধাতার মাধুরীমাখা সৃষ্টি সেই সুন্দরীকে অনূপ-রাজার সামনে এনে আবারও বলল—

পুরাকালে এক যোগী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম কার্তবীর্য; যুদ্ধের সময়ে তাঁর এক

হাজার বাহু দেখা দিত, আঠারোটি দ্বীপে তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর 'রাজা'-নামটি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

কেউ দুষ্কর্মের চিন্তা করা-মাত্রই শিক্ষক হয়ে তিনি ধনুক-হাতে সেখানে উপস্থিত হতেন; প্রজাদের মনোগত অপরাধকেও তিনি নিবৃত্ত করতেন।

তিনি ইন্দ্রবিজয়ী লঙ্কেশ্বরকেও ধনুকের গুণে বেঁধেছিলেন, দশমুখে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকলেও নিজে প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।

তাঁরই বংশে এই রাজা জন্মেছেন, এঁর নাম প্রতীপ, ইনি জ্ঞানবৃদ্ধদের অনুরাগী। আশ্রয়ের দোষে উৎপন্ন লক্ষ্মীর 'চঞ্চলা' এই অপবাদ ইনিই দূর করেছেন।

যুদ্ধের সময়ে স্বয়ং অগ্নিদেবকে সহায় পেয়ে ইনি ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রিস্বরূপ পরশুরামের কুঠারের শাণিত ধারকেও পদ্ম-পাপড়ির মতো (নিতান্তই কোমল) মনে করেন।

যদি মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীর-নিতম্বের মেখলার মতো, জলস্রোতে উচ্ছলসুন্দর রেবানদীকে প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখতে ইচ্ছা থাকে তবে এই আজানুলম্বিতবাহুর অঙ্কশায়িনী হও।

যথেষ্ট রূপবান হওয়া সত্ত্বেও সেই রাজাকে তাঁর মনে ধরল না। শরৎকালের নির্মেঘ আকাশের পূর্ণচাঁদকে যেমন পদ্মিনীর মনে ধরে না।

শূরসেনের রাজা

অন্তঃপুরপালিকা তখন শূরসেনের রাজা সুষেণ সম্পর্কে কুমারীকে বলল, তাঁর কীর্তি লোক-লোকান্তরে প্রচারিত, সদাচারে তিনি (মাতৃকুল-পিতৃকুল) উভয়কুলের প্রদীপ-স্বরূপ।

এই যাজ্ঞিক রাজা নীপবংশে জন্মেছেন, এঁর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণরাশি স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেছে, শান্ত সিদ্ধাশ্রমে এসে প্রাণিকুল যেমন প্রকৃতিগত পরস্পর বিরোধও ভুলে যায়।

এঁর নিজের প্রাসাদে চাঁদের আলোর মতো নয়নাভিরাম শোভা, শত্রুদের নগরে এঁর তেজ দুঃসহ, সেখানে অট্টালিকার মাথায় ঘাস গজিয়েছে।

ইনি যখন জল-বিহার করেন তখন অন্তঃপুরসুন্দরীদের বুকের চন্দন জলে ধুয়ে যায়, ফলে মথুরায় বয়ে যাওয়া কালিন্দী-যমুনাকেও গঙ্গাজলের ঢেউ-ভরা মনে হয়।

গরুড়ের ভয়ে পালিয়ে কালিয়-নাগ যমুনাতীরে যে মণিটি ফেলে গিয়েছিল বুক-জুড়ে তার প্রভা ছড়িয়ে (অর্থাৎ তাকে গলার হারে বুকে দুলিয়ে) ইনি যেন কৌস্তুভধারী শ্রীকৃষ্ণকেও লজ্জা দেন।

ওগো সুন্দরি, এই তরুণকে পতিত্বে বরণ করে, চৈত্ররথের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এমন বৃন্দাবনে কোমল পল্লবের উপরে পাতা কুসুম-শয়নে তোমার যৌবনশ্রীকে উপভোগ কর।

বর্ষাকালে গিরি-গোবর্ধনের রমণীয় গুহায় গুহায় জলে-ভেজা শিলাজতুর গন্ধে-ভরা শিলাতলে বসে ময়ূরের নাচ দেখো।

সে-রাজাকে ছাড়িয়ে নদীর-ঘূর্ণির মতো সুন্দর নাভি নিয়ে অন্যের বধূ হতে তিনি চলে গেলেন, সাগর-পানে চলা স্রোতস্বিনী নদী যেমন পথে-পড়া পাহাড়কে এড়িয়ে যায়।

কলিঙ্গরাজ

হেমাঙ্গদ-নামে কলিঙ্গরাজের হাতে কেয়ূর বাঁধা ছিল, তিনি শত্রুপক্ষকে বিনাশ করেছিলেন, তাঁর সামনে এসে পড়লে পূর্ণচন্দ্রমুখী রাজকন্যাকে বলল—

ইনি মহেন্দ্রপর্বতের মতো শক্তিসম্পন্ন, মহেন্দ্রপর্বত এবং বিশাল সমুদ্রের ইনি অধিপতি, যুদ্ধে অভিযানের সময়ে মদধারাবর্ষী সেনা-হাতির রূপ ধরে মহেন্দ্রপর্বতই যেন এঁর সামনে সামনে যায়।

ইনি ধনুর্ধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ; এঁর দুটি বিশাল বাহুতে দুটি চাপ-রেখা—যেন ইনি শত্রুরাজাদের বন্দিনী রাজলক্ষ্মীর কাজল-আঁকা দুই চোখের (দুটি) জলধারাকে বহন করছেন।

নিজের কক্ষে সুপ্ত থাকলে প্রহরশেষের তূর্যধ্বনিকে ছাপিয়ে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষই এঁকে জাগিয়ে দেয়—সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন থেকেই দেখা যায়।

তাল-বনের মর্মরধ্বনিতে মুখরিত সমুদ্রের তীরে তীরে তুমি এঁর সঙ্গে বিহার কর, দ্বীপান্তর থেকে লবঙ্গ-ফুল উড়িয়ে এনে বাতাস তোমার (ক্লান্তির) ঘর্মবিন্দু মুছিয়ে দেবে।

সে এভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেও বিদর্ভরাজের রূপসী বোন তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেলেন—মানুষ পুরুষকারের সাহায্যে অনেক দূর টেনে আনলেও প্রতিকূল ভাগ্যের বশে লক্ষ্মী যেমন ফিরে যান।

নাগপুরের রাজা

তারপর দ্বারপালিকা উরগপুরের (উরগ=নাগ > নাগ সুতরাং উরগপুর=নাগপুর) দেবদর্শন রাজার সামনে এসে আগের মতোই ভোজকন্যাকে বলল—ওগো চকোরনয়নে, এইদিকে দেখ।

এঁর নাম পাণ্ড্য, কাঁধ থেকে লম্বা হয়ে দুলছে হারটি, হরিচন্দন এঁর অঙ্গরাগ হয়েছে —উদয়-সূর্যের রোদে রাঙা, নির্ঝরিণীর উচ্ছলসযুক্ত পর্বতের মতোই এঁর শোভা।

যে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্য পাহাড়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, বিশাল সমুদ্রকে এক নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ পান করে আবারও তা উগরে দিয়েছেন—ইনি অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে অবভৃথ-স্নান করে এলে—সেই অগস্ত্যই এঁকে প্রীতিভরে জিগ্যেস করেন, ঠিকমতো স্নান হয়েছে কি না।

ইনি মহাদেবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করেছেন। পুরাকালে জনস্থাননগরের বিনাশের আশংকায় উদ্ধত লংকাধিপতিও এঁর সংগে আগে সন্ধিস্থাপন করে তারপর ইন্দ্রলোক জয় করতে যেতেন।

এই উচ্চবংশের রাজা শাস্ত্রমতে তোমার পাণিগ্রহণ করলে বিপুলা পৃথ্বীর মতো তুমিও রত্নাকর সমুদ্র যার মেখলা সেই দক্ষিণ দিগ্বধূর সপত্নী হবে।

মলয়স্থলীতে সুপুরীগাছগুলিকে বেয়ে পানলতা উঠেছে, চন্দনগাছকে জড়িয়ে আছে এলাচলতা, তমাল গাছের পাতার আস্তরণ মাটিতে পাতা—সেখানে বারে বারে বিহার করতে ইচ্ছে হোক তোমার।

এই রাজা নীলোৎপলের মতো শ্যামবর্ণ, তোমার শরীরটি গোরোচনার মতো

গৌরবর্ণ ; মেঘ আর বিদ্যুতের যোগের মতো তোমাদের মিলন পরস্পরের শোভা বর্ধন করুক।

তার এই উপদেশ বিদর্ভের রাজকন্যার মনে স্থান পেল না ; সূর্যাস্তের পর পাপড়ি গুটিয়ে নিলে চাঁদের কিরণ যেমন পদ্মের মধ্যে ঠাঁই করতে পারে না।

রাতের রাজপথে সঞ্চারিণী দীপশিখা সামনে এগিয়ে গেলে পিছনের অট্টালিকাগুলি যে অবস্থা হয়, সেই স্বয়ংবরা (ইন্দুমতী) যাকে যাকে পেরিয়ে গেলেন সেই রাজাদের মুখও অমনি অন্ধকার (বিবর্ণ) হয়ে গেল।

কুমার অজ

তিনি সামনে এসে দাঁড়ালে 'আমাকে বরণ করবেন কি ?' এই ভেবে (রঘুর পুত্র) অজের মন আকুল হল ; তাঁর দক্ষিণবাহুতে বাঁধা কেয়ূরের ঘন-ঘন স্পন্দন সব সংশয়কে দূর করে দিল।

অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি তাঁর কাছে এসে রাজকুমারী আর অন্যের দিকে গেলেন না ; ভোমরার দল মুকুলিত সহকারকে পেয়ে আর অন্য গাছে যেতে চায় না।

চাঁদের-পারা ইন্দুমতীর মন তাঁর মধ্যে ডুবেছে দেখে বচনপটীয়সী সুনন্দা সবিস্তারে কথা বলতে শুরু করল—

ইক্ষ্বাকুবংশে ককুৎস্থ নামে এক মহাগুণী সবার সেরা রাজা ছিলেন। সেই নাম নিয়েই উত্তরকোসলের বড় বড় রাজারা গর্ব করে নিজেদের 'ককুৎস্থ' বলে পরিচয় দেন।

যুদ্ধে ইন্দ্র বৃষ-রূপ ধারণ করলে তিনি (ককুৎস্থ) তার ঝুঁটিতে (ককুদে) বসে মহাদেবের ভঙ্গীতে অজস্র বাণবর্ষণ করেন, ফলে অসুররমণীদের চোখের জলে মুখের পত্রলেখা ধুয়ে গিয়েছিল।

ঐরাবতের লাফালাফিতে ইন্দ্রের কেয়ূর আলগা হয়ে পড়লে তিনি নিজের কেয়ূরের ঘষায় তাকে ঠিক করে দিতেন, ইন্দ্র নিজের শ্রেষ্ঠ মূর্তিতে থাকলেও (অর্থাৎ দেবরাজের আসনেও) তিনি (ককুৎস্থ) তাঁর আসনের অর্ধাংশে বসতেন।

তাঁরই বংশে, বংশের প্রদীপস্বরূপ, কীর্তিমান রাজা দিলীপের জন্ম ; নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও ইন্দ্রের ঈর্ষা-নিবৃত্তির জন্যেই তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন।

তিনি যখন পৃথিবী শাসন করতেন তখন মত্তকামিনীরা অভিসারে যাওয়ার সময়ে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়লে কেইবা তাদের চুরি করতে হাত বাড়াবে ; বাতাসেও তাদের আঁচল টানত না।

তাঁরই পুত্র রঘু এখন রাজ্য-শাসন করছেন, তিনি বিশ্বজিৎ-নামে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন ; চারিদিক থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত ঐশ্বর্যকে দান করে দিয়ে তিনি মাটির পাত্রটুকু সার করেছেন।

তাঁর অবিচ্ছিন্ন যশ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁচেছে, সাগর পেরিয়েছে, নাগলোকের পাতালে গিয়েছে, দ্যুলোকে পর্যন্ত উঠেছে—তাকে পরিমাপ করব, এমন আমার সাধ্যি নেই !

দেবলোকের রাজা ইন্দ্রের যেমন জয়ন্ত, তেমনই তাঁর পুত্র এই কুমার অজ ; ইনি দক্ষ পিতার মতো করেই পৃথিবীর গুরুভার বহন করছেন—যেমন ছোট এঁড়েটাও বড় ষাঁড়ের মতোই জোয়াল টানে।

বংশমর্যাদায়, রূপে, তারুণ্যে, বিনয় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত গুণে ইনি তোমার সমকক্ষ, এঁকে তুমি বরণ কর—মণিকাঞ্চনে যোগ হোক।

তখন—সুনন্দার কথা শেষ হলে, রাজকুমারী লজ্জা কাটিয়ে আনন্দের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারকে বরণ করলেন—সেটাই বুঝি তার বরণমালা।

কুঞ্চিতকেশা সুন্দরী তরুণের প্রতি নিজের মনের ভাব মুখে বলতে পারলেন না, শালীনতায় বাধে ; তা যেন তাঁর শরীর ফুঁড়ে রোমাঞ্চ হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সখীকে অমন দেখে বেত্রধারিণী পরিহাস করে বলল—আর্যে, চল আমরা অন্যদিকে যাই। তখন বধূ রোষকুটিল চোখে তার দিকে তাকালেন।

মাল্যদান

সেই করভোরু (ইন্দুমতী) মঙ্গলচূর্ণ-মাখানো, মূর্ত-মনুরাগের মতো ফুলের মালাটি ধাত্রীর হাত থেকে নিয়ে রঘুনন্দনের গলায় ঠিকমতো পরিয়ে দিলেন।

বরেণ্য রাজা (অজ) মঙ্গলপুষ্পে-গাঁথা মালাটিকে প্রশস্ত বক্ষদেশে দুলতে দেখে মনে মনে ভাবলেন বিদর্ভের রাজকন্যাই বুঝি তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করে আছেন।

'চাঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্না মিলেছে', 'জাহ্নবী তার যোগ্য সমুদ্রে পড়েছে'—সমান গুণের মিলনে আনন্দিত পুরবাসীরা সকলেই এই এক কথাই বললেন যা (প্রত্যাখ্যাত) রাজাদের কানে বাজল।

একদিকে আনন্দ-উচ্ছ্বসিত বরপক্ষ, অন্যদিকে শূন্যমনা (হতাশ) রাজমণ্ডল—যেন ভোরবেলার সরোবরে প্রফুল্ল পদ্ম আর ঘুমে ঢলে পড়া (নিষ্প্রভ) কুমুদবন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'স্বয়ংবর বর্ণনা' নামক ষষ্ঠ সর্গ ॥

সপ্তম সর্গ

তারপর কার্তিকের সঙ্গে মিলিত দেবসেনার মতো যোগ্য-বরে-পড়া বোনকে নিয়ে বিদর্ভের রাজা অন্তঃপুরের দিকে গেলেন।

আর অন্য রাজারা ভোজ-ভগিনীতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিজেদের রূপ এবং সাজ-সজ্জাকে ধিক্কার দিতে দিতে, সকালবেলার চাঁদ-তারাদের মতো ম্লান-মুখে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন।

সেখানে স্বয়ং শচীদেবী উপস্থিত ছিলেন, তাই স্বয়ংবর-সভায় কোনো ব্যাঘাত হল না ; ককুৎস্থের প্রতি ঈর্ষায় কাতর হলেও, রাজারা নিজেদের শান্ত রাখলেন।

নববধূকে নিয়ে বর রাজপথে এলেন—সে পথ অভিনব উপকরণে (লতায় ফুলে-মালায়) সাজানো হয়েছিল, তোরণগুলি ঝলমল করছিল রামধনুর মতো, পতাকাগুলির ছায়াতেই রোদ আটকাচ্ছিল।

তাই দেখার আগ্রহে পুরসুন্দরীরা অন্য সব কাজ ফেলে প্রাসাদে প্রাসাদে সোনার গবাক্ষে এইভাবে হুড়োহুড়ি করতে লাগল—

গবাক্ষপথে হঠাৎ উঠে যেতে কারও চুলের বাঁধন খুলে মালা খসে পড়ল—বাঁধা আর হল না, খোলা চুল হাতে ধরেই সে চলল।

কেউ প্রসাধিকার কাছে পায়ের পাতাটি তুলে দিয়েছিল আলতা পরাতে—না শুকোতেই সে পা-টি টেনে নিয়ে দৌড়ে জানলা পর্যন্ত আলতা-পায়ের চিহ্ন এঁকে দিল।

আর একজন ডান চোখে কাজল দিয়ে বাঁ-চোখে পরার আগেই কাজলকাটি নিয়ে বাতায়নের কাছে গেল।

অন্যজন জানলার দিকে চেয়ে ছুটতে গিয়ে ঘাঘরার গিঁট খুলে গেলেও তাকে বেঁধে নিল না, কাপড়টি হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে রইল; অলংকারের প্রভা তার নাভিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

কারও মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছিল; তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়াতে, রত্নগুলি একে একে খসে পড়ে তার বুড়ো-আঙুলে শুধু সুতোটা ধরা রইল।

তাদের আসবগন্ধে-ভরা দারুণ কৌতূহলী মুখগুলি চঞ্চল ভোমরা-চোখ নিয়ে বাতায়নগুলিকে ভরে দিলে মনে হল সেগুলি যেন (অসংখ্য) সহস্রদলে (পদ্মফুলে) অলংকৃত হয়েছে।

সেই রমণীরা রঘুপুত্রকে দৃষ্টি দিয়ে নিঃশেষে পান করতে করতে অন্য কাজের কথা ভুলে গেল। কারণ, তাদের অন্য সব ইন্দ্রিয়গুলি যেন চোখে জড়ো হয়েছিল।

পুরাঙ্গনাদের মন্তব্য

না-দেখা অনেক রাজাই মনে মনে তাকে চাইলেও ইন্দুমতী (ভোজ কন্যা) স্বয়ংবরের কথা ভেবে ঠিকই করেছে। নয়তো, এ কেমন করে লক্ষ্মীর অনুরূপ নারায়ণের মতো নিজের উপযুক্ত বর পেত ?

যদি প্রজাপতি কমনীয়-কান্তি এই যুগলকে মিলিত না করতেন তবে তাঁর এদের দুজনকে এত সুন্দর করে গড়ার প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যেত।

এরা নিশ্চয়ই রতি ও মদন ছিল (পূর্বজন্মে); তাই এই কন্যা হাজার রাজার মধ্যে থেকে নিজের সমান একে বেছে নিয়েছে। কারণ মন জন্মান্তরের সম্পর্ক বুঝতে পারে।

পুরাঙ্গনাদের মুখের এই রকম শ্রবণমধুর কথা শুনতে শুনতে রাজকুমার মঙ্গলসজ্জায় উদ্ভাসিত সম্বন্ধীয় প্রাসাদে উপস্থিত হলেন।

তারপর, তিনি করেণুকা থেকে অবতরণ করলেন কামরূপের রাজার হাতটি ধরে; বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে, চত্বরের মধ্যে, যেন নারীকুলের হৃদয়ে, প্রবেশ করলেন।

বিবাহ-অনুষ্ঠান

মহার্ঘ সিংহাসনে বসে তিনি রাজা ভোজের দেওয়া রত্ন (-অঙ্গুরীয়), মধুপর্ক এবং রেশমী জোড়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন—সঙ্গে ছিল সুন্দরী অন্তঃপুরিকাদের কটাক্ষ।

ক্ষৌমবস্ত্র পরে নিলে তাঁকে বিনীত অন্তঃপুররক্ষীরা বধূর কাছে নিয়ে এল,—নবোদিত চাঁদের কিরণরাশি যেমন ফেনিল সমুদ্রকে বেলাভূমিতে পৌঁছে দেয়।

সেখানে ভোজরাজের পুজো নিয়ে অগ্নিতুল্য পুরোহিত অগ্নিদেবকে আজ্য-ইত্যাদি আহুতি দিয়ে তাঁকেই বিবাহের সাক্ষী স্থির করে (অর্থাৎ অগ্নিসাক্ষী করে) বধূ এবং বরের মিলন ঘটালেন।

নববধূর হাত ধরে রাজপুত্রকে আরও উজ্জ্বল দেখাল, কাছের অশোকলতার পল্লবকে সহকারতরু যেন নিজের পল্লবে জড়িয়ে নিল।

বরের মণিবন্ধ রোমাঞ্চিত হল, কনের হাতের আঙুল ঘেমে উঠল—পরস্পরের পাণিস্পর্শের মধ্য দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁদের (মনোগত) অনুরাগ যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল।

শুভদৃষ্টি-পর্বের প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত (টান টান করে দেখা) পরস্পরের প্রতি সতৃষ্ণ চোখে চমৎকার লাজুক সংকোচ দেখা দিল।

জ্বলন্ত-অগ্নি-প্রদক্ষিণের সময়ে পরস্পরসংযুক্ত ঐ দম্পতি মেরু-প্রদক্ষিণরত ও রাত্রির মতো শোভা পেলেন।

বিধাতাপ্রতিম গুরুর (পুরোহিতের) নির্দেশ পেয়ে লজ্জাবতী নিতম্বিনী নববধূ (প্রেম-) মত্ত চকোরপাখির মতো চোখ নিয়ে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিলেন।

সেই অগ্নি থেকে হোমের শমীপল্লব ও খইয়ের গন্ধমাখা পবিত্র ধোঁয়া উঠল। সে ধোঁয়া তাঁর (বধূর) মুখে (গালে) ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্যে কর্ণোৎপলের স্থান নিল।

আচার-ধূম গ্রহণ করার সময়ে বধূর চোখ কাজলমেশা জলে ভরে গেল, বীজাঙ্কুরের কর্ণভূষণ মলিন হল, গাল দুটো রাঙিয়ে উঠল।

সোনার আসনে বর-কনেকে বসিয়ে স্নাতকেরা, বন্ধুবান্ধবসহ রাজা (ভোজ) এবং স্বামীপুত্রবতী রমণীরা একে একে তাদের উপরে জলে-ভেজা আতপ চাল ছড়ালেন।

বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ রাজা ভোজ এইভাবে ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন করে নিমন্ত্রিত রাজাদের পৃথক পৃথক সমাদরের জন্যে অনুচরদের আদেশ দিলেন।

হিংস্র প্রাণীকে লুকিয়ে রেখে উপরে নির্মল সরোবরের মতো (বাইরে) আনন্দের ভাব দেখিয়ে রাজারা সমস্ত ক্ষোভ গোপন রাখলেন; বিদর্ভের রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর দেওয়া উপহার যৌতুকচ্ছলে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

তারপর অন্য রাজারা

সে রাজার দল কাজ-হাসিল করার জন্যে আগেই (পরস্পরকে) সংকেত দিয়ে ঠিক সময়ে ঐ কন্যা-ভোগকে ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অজের যাবার পথে অবরোধ করে রইল।

ইতিমধ্যে বিদর্ভের রাজা কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন করে আপন প্রতিষ্ঠার অনুরূপ সম্পদের যৌতুক-সহ রঘুপুত্রকে বিদায় দিয়ে নিজেও তাঁর অনুগমন করলেন।

ত্রিভুবনখ্যাত অজের সঙ্গে মাঝপথে তিন দিন বাস করে কুণ্ডিন নগরের অধিপতি (অর্থাৎ ভোজ) তাঁর কাছ থেকে—অমাবস্যাশেষে সূর্যের কাছ থেকে চাঁদের মতো বিদায় নিলেন।

কোশলাধিপতির (রঘুর) প্রতি তাদের সর্বস্ব অপহরণ করার কারণে আগে থেকেই (দিগ্বিজয়ের সময় থেকেই) সকলে রুষ্ট ছিল; সুতরাং তাঁরই পুত্রের এই স্ত্রীরত্নলাভ উপস্থিত রাজারা সহ্য করল না।

সেই দৃপ্ত রাজন্যবর্গ ভোজকন্যাকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁকে (অজকে) পথে অবরুদ্ধ করল—বলিরাজের দেওয়া ধন নিয়ে যাবার সময়ে প্রহ্লাদ যেমন বিষ্ণুকে করেছিল।

কুমার অজ তাঁকে (ইন্দুমতীকে) রক্ষা করার জন্যে বহু সেনাসহ পিতৃ-সচিবকে আদেশ দিয়ে—ভাগীরথীতে উত্তাল-তরঙ্গ শোণনদের মতো—সেই রাজবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সমানে সমানে তুমুল যুদ্ধ বাধল—পদাতি পদাতির উপরে, রথারোহী রথীর উপরে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর উপরে এবং গজারোহী গজারোহীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘোর তূর্যধ্বনিতে ধনুর্ধারীরা কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না, তারা নিজেদের বংশপরিচয় বলতে পারছিল না, তাদের বাণের লেখা থেকেই পরস্পরের বিখ্যাত নাম বলা হল।

যুদ্ধে ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়ল, রথের চাকার মণ্ডলে তা ঘন হল, আর হাতির কানের ঝটপটানিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে তা চাঁদোয়ার মতো হয়ে সূর্যকে ঢেকে দিল।

মাছ-আঁকা পতাকাগুলির মুখ হাওয়ায় ছিঁড়ে সেনাবাহিনীর রাশি রাশি ধুলোয় ভরে গিয়ে, তারা বর্ষার কলুষ জল পানরত সত্যি মাছেদের মতো দেখাল।

সেই ঘন ধুলোয় রথের চাকার ধ্বনিতেই শুধু রথ চেনা গেল, চঞ্চল ঘণ্টাধ্বনিতেই হাতিকে বোঝা গেল, শুধুমাত্র স্বীয় প্রভুর নাম উচ্চারণ শুনেই আত্মপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ নির্ণীত হল।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিরোধকারী দিগন্তব্যাপী ধুলোর অন্ধকারে ঘোড়া-হাতি এবং বীর যোদ্ধাদের অস্ত্রাঘাত থেকে ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তপ্রবাহকে বালসূর্য মনে হল।

রক্তে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওয়াতে ভাসছিল ধুলো (-র রাশি) ; মনে হচ্ছিল ছাই হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ নিভে যাওয়া) আগুনের প্রথম ওড়া ধোঁয়া।

প্রহারজনিত মূর্ছার ঘোর কেটে গেলে রথারোহীরা রথ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখে সারথিদের তিরস্কার করল, তারপর পতাকা চিনে চিনে যারা আঘাত করেছিল সক্রোধে তাদেরই আক্রমণ করল।

মাঝপথে শত্রুপক্ষের বাণে কেটে দুখানা হয়ে গেলেও পাকাহাতের ধনুর্ধরের সে বাণগুলি নিজের বেগে অর্ধেক ফলা নিয়েই লক্ষ্য বিদ্ধ করল।

হস্তিযুদ্ধে ক্ষুরের ফলার মতো ধারাল চক্রে গজারোহীদের মাথা কেটে উড়ে গেল ; কিন্তু বাজপাখির নখের আগায় তাদের চুলগুলি আটকা পড়াতে সেগুলি মাটিতে পড়ল অনেক দেরিতে।

অশ্বারোহী যোদ্ধা এক আঘাতে (শত্রুকে) ঘায়েল করল, প্রতিপক্ষ যখন ঘোড়ার পিঠে (কাঁধে) লুটিয়ে পড়ে ফিরে আঘাত করতে অক্ষম তখন তাকে আর আঘাত করল না—মনে মনে চাইল তার জ্ঞান ফিরে আসুক।

শরীরের (প্রাণের) মায়া না করে বর্মধারী সৈন্যরা খাপ-খোলা তলোয়ার ঘোরাতে থাকলে, হাতির বড় বড় দাঁতে ঘা পড়ে পড়ে আগুন ছুটল ; ভয়ে পেয়ে তাদেরই শুঁড়ের জলে হাতিরা সে আগুন নিভিয়ে দিতে থাকল।

সে যুদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর পানভূমি মনে হল—তীরের ফলায় কাটা নরমুণ্ড তার ফল, মাথা থেকে খসে পড়া শিরস্ত্রাণগুলি তার পানপাত্র, রক্তস্রোত তার মদ্যপ্রবাহ।

কোনো মৃতদেহের একধার থেকে চিল-শকুনে ছিঁড়তে আরম্ভ করল, গলিত মাংসের লোভে এক (খেঁক) শেয়ালী কাটা হাতখানা টেনে নিয়েও কেয়ূরের কোণায় হাত কেটে যাওয়াতে সেখানা ফেলে পালাল।

শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয়ে একজন সদ্য সদ্য স্বর্গে পেঁছিল, সুরললনাকে বামাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সে (নীচের) যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরই কবন্ধ-মূর্তিকে নাচতে দেখল।

দুজনের সারথি নিহত হলে তারা নিজেরাই একজন রথী একজন সারথি হল, আবার

(রথের) ঘোড়া দুটো নিহত হলে তারা বহুক্ষণ গদাযুদ্ধ করল, শেষে গদাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলে তারা বাহুযুদ্ধ করতে থাকল।

কোথাও দুজনে পরস্পরকে আঘাত করে করে একই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করল, দেবত্ব পেল, তার পরেও (যুদ্ধ শেষ হল না) ; একজন অপ্সরাকেই দুজনেই চাই—তাই নিয়ে বিবাদ বাধল।

অনুকূল এবং প্রতিকূল বাতাসে ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসা এবং পিছিয়ে যাওয়া মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো উভয়পক্ষেরই বিপুল সৈন্যব্যূহের অপরপক্ষের কাছে অনিয়মিতভাবে জয় এবং পরাজয় হচ্ছিল।

অজের আক্রমণ

শত্রুপক্ষের কাছে নিজের সেনাদল পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মহাশক্তিধর অজ নিজেই শত্রু-সেনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ; হাওয়াতে ধোঁয়া উড়ে যায় হয়তো, কিন্তু ঘাসটুকু পেলে আগুন তাতেই জ্বলে ওঠে।

কল্পান্তে (প্রলয়কালে) মহাবরাহ (রূপে বিষ্ণু) যেমন উদ্বেল মহাসাগরকে রুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সেই দৃপ্ত বীর (অজ) রথারোহণ করে, তূণীর নিয়ে, বর্ম পরে, ধনুক-হাতে একা একাই সেই রাজন্যবর্গকে প্রতিরোধ করলেন।

মনে হল, যুদ্ধে তিনি বুঝি ডান হাতটি সুন্দরভাবে (অথবা সুন্দর ডান হাতটিকে) তূণীরের মুখেই ধরে রেখেছেন আর যোদ্ধার একবার আকর্ণ টেনে ধরা ধনুকের গুণেই বুঝি শত্রু-নিধনের বাণগুলি উৎপন্ন হচ্ছে।

তিনি ভল্ল দিয়ে গলা কেটে শত্রুর ছিন্ন মস্তকে মাটি ঢেকে ফেললেন—প্রচণ্ড রাগে চেপে ধরায় তাদের (মুখের) ঠোঁটগুলি আরও লাল হয়ে উঠেছিল, (কপালে) উপর-মুখো ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়েছিল এবং (মুণ্ডগুলি তখনও) প্রচণ্ড হুংকারে গমগম করছিল।

(তখন) সব রাজা একসঙ্গে মিলে, গজসেনা বেশী রেখে গোটা চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে বর্মভেদী থেকে শুরু করে সব অস্ত্র নিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধে তাঁর উপরে আঘাত হানল।

শত্রুসমূহের অজস্র অস্ত্রবর্ষণে তাঁর (অজের) রথ ঢাকা পড়ে গেল, শুধু তাঁর রথের ধ্বজাটুকু দেখা গেল ;—যেন কুয়াশায় ঢাকা (শীতের) সকাল, সূর্যের আলো সামান্য উঁকি দিচ্ছে।

মহারাজ (রঘুর)—পুত্র, কন্দর্পকান্তি কুমার (অজ) ঘুমের ঘোর কাটিয়ে (অর্থাৎ সচেতনভাবে, বুঝে-শুনে) প্রিয়ংবদের কাছ থেকে পাওয়া 'প্রস্বাপন' নামে (ঘুম-পাড়ানি) গান্ধর্ব অস্ত্রটি রাজাদের উপর নিক্ষেপ করলেন।

তার ফলে রাজাদের সৈন্যেরা হাতের ধনুক ছেড়ে দিল, তাদের শিরস্ত্রাণ এক কাঁধে হেলে পড়ল, রথের ধ্বজার খুঁটিতে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ হেলান দিয়ে) তারা ঘুমে ঢলে পড়ল।

তারপর কুমার (অজ) প্রেয়সী যার রসগ্রহণ করেছে (অর্থাৎ ইন্দুমতীর চুম্বনে ধন্য) সেই অধরোষ্ঠে শঙ্খধ্বনি করলেন—তাতে মনে হল, অদ্বিতীয় বীর বুঝি আপন বাহু-বলে অর্জিত মূর্ত যশই পান করছেন।

পরিচিত শঙ্খধ্বনি শুনে তাঁর নিজের যোদ্ধারা ফিরে এসে ঘুমন্ত শত্রুকুলের মাঝে

তাঁকে দেখল—যেন একরাশ মুকুলিত পদ্মের মধ্যে জ্বলজ্বলে চাঁদের প্রতিবিম্ব।

তিনি রাজাদের পতাকায় পতাকায় রক্তমাখা তীরের ফলা দিয়ে লিখলেন—'এবারে রঘুকুমার তোমাদের যশ হরণ করেছেন কিন্তু দয়া করে প্রাণনাশ করলেন না'!

অজ ও ইন্দুমতী

তিনি ধনুকের প্রান্তে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, শিরস্ত্রাণ খুলে যাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো, কপালে জমে উঠেছে পরিশ্রমের স্বেদবিন্দু—ভীতা প্রিয়ার কাছে এসে কথা বললেন।

"বিদর্ভের রাজনন্দিনী, আমি বলছি, (অনুমতি দিচ্ছি) একবার শত্রুদের চেয়ে দেখ, একটি শিশুও ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে; এইরকম বীরত্ব (রণনৈপুণ্য) নিয়ে এরা কিনা আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে এসেছিল!"

শত্রুদের ভয়ে যে বিষাদ এসেছিল, তা মুহূর্তে দূর হল, তাঁর (ইন্দুমতীর) প্রসন্ন মুখটি নিঃশ্বাস-বাষ্পমুক্ত নির্মল দর্পণের মতো শোভা পেল।

অত্যন্ত খুশি হয়েও লজ্জায় তিনি নিজে প্রিয়তমকে প্রশংসা করলেন না, সখীদের কথায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন—নবীন মেঘের বর্ষণে সিক্ত ভূমি যেমন ময়ূরের কেকা-রবে মেঘবৃন্দকে তার উল্লাস জানায়।

নির্দোষ অজ রাজাদের মাথায় বাঁ-পাটি তুলে দিয়ে নিষ্কলঙ্ক তাঁকে (ইন্দুমতীকে) নিজের করে পেলেন। তাঁর রথের চাকায় এবং ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ইন্দুমতীর অলকের প্রান্তভাগ রুক্ষ-ধূসর, তিনিই বুঝি যুদ্ধের মূর্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী।

এই সংবাদ রঘু আগেই (দূতমুখে) জেনেছিলেন, গৌরবময়ী-পত্নীসহ ফিরে এলে তিনি বিজয়ী পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন। তারই হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তিনি শান্তিমার্গ অবলম্বন করতে আগ্রহী হলেন। বংশের ভারগ্রহণে যোগ্য (সন্তান) থাকতে সূর্যবংশীয়েরা আর গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন না।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অজপাণিগ্রহণ' নামক সপ্তম সর্গ ॥

অষ্টম সর্গ

অজের হাতে রাজ্যভার অর্পণ

তারপর—

বিয়ের মঙ্গলসূত্র তখনো অজের হাতে বাঁধা, রাজা রঘু দ্বিতীয় ইন্দুমতীর মতোই বসুন্ধরাকেও তাঁর (অজের) করতলগত করে দিলেন।

নানা দুষ্কর্ম করেও রাজার ছেলেরা যা আত্মসাৎ করতে চায়, তাকেই অজ পেলেন আপনা থেকে—গ্রহণ করলেন পিতার আজ্ঞারূপে, ভোগলালসায় নয়।

বশিষ্ঠের আনা পুণ্য-সলিল-সেচনে তাঁর (অজের) সঙ্গে অভিষিক্ত হয়ে ধরণী যেন নির্মল বাষ্পোচ্ছ্বাসে জানালেন 'আমি ধন্য'।

অথর্ববেদে অধিজ্ঞ গুরুদেব বশিষ্ঠ সংস্কার সাধন করলে তিনি শত্রুদের পক্ষে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন; কারণ ক্ষাত্র বীর্যের সঙ্গে ব্রহ্মতেজের এই মিলন বাতাস এবং অগ্নির যোগ।

নতুন রাজাকে দেখে প্রজারা ভাবল, রঘুই বুঝি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছেন। কারণ, তিনি (অজ) শুধু সম্পদ নয়, পিতার সকল গুণেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন।

অজ পৈতৃক সম্পদ-প্রতিষ্ঠাতে অধিষ্ঠিত, তাঁর নবীন যৌবন বিনয়ে অলংকৃত—দুটিই দুই কল্যাণময় জোড়ে মিলে আরও শোভন হল।

হঠকারিতা যেন তাঁর কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি না করে, সেভাবেই মহাবাহু অজ নবোঢ়া বধূর মতো সদ্যপ্রাপ্ত পৃথিবীকে ধৈর্যের সঙ্গে উপভোগ করছিলেন।

প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাবতো, "রাজা আমাকেই পছন্দ করেন" ; শত শত নদী এসে পড়লেও সমুদ্র যেমন ফেরায় না, তিনিও কাউকে উপেক্ষা করতেন না।

তিনি অতিরিক্ত তীক্ষ্ন বা অতিরিক্ত মৃদু-স্বভাব ছিলেন না ; মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তিনি (অন্য) রাজাদের উৎখাত না করেও বশীভূত করলেন—বাতাস যেমন গাছগুলিকে উপড়ে না ফেলে শুধু আনত করে।

তখন—প্রজাদের মধ্যে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখে রঘু আপন আত্মজ্ঞানের প্রেরণায় নশ্বর বিষয়সমূহে এমন কি স্বর্গসুখেও নিস্পৃহ হলেন।

দিলীপ-বংশীয়েরা সকলে পরিণত বয়সে গুণবান পুত্রের হাতে সম্পদশ্রীকে ন্যস্ত করে সংযমের সঙ্গে বল্কলধারী সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করতেন।

তাঁকে বনবাসে উন্মুখ দেখে পুত্র (অজ) উষ্ণীষে মনোহর মাথাটি নুইয়ে পিতার চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন—'আমাকে ছেড়ে যাবেন না'।

পুত্রবৎসল রঘু তাঁর সজল নয়নের ঐ প্রার্থনাটি পূরণ করলেন, কিন্তু সাপের খোলসের মতো পরিত্যক্ত রাজ্য-শ্রীকে আর গ্রহণ করলেন না।

তিনি শেষ আশ্রম গ্রহণ করে, সব ইন্দ্রিয়কে সংযত রেখে নগরের উপকণ্ঠে বাসা (কুটীর) বাঁধলেন—পুত্রবধূর মতো পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মীর সেবা পেলেন।

রঘু এবং অজ

রাজবংশে পুরাতন রাজা প্রশান্তিতে মগ্ন, নতুন রাজা অভ্যুদয়ে দীপ্তিমান—তার তুলনা ছিল অস্তমিত-প্রায় চাঁদ আর উদয়-সূর্যকে (একই সঙ্গে) ধরে রাখা আকাশ।

সন্ন্যাসী এবং রাজার বেশে রঘু এবং রঘুপুত্রকে সমস্ত লোকে দেখল যেন নিঃশ্রেয়স্ এবং অভ্যুদয়, এই দুই ধর্মের অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

অলব্ধ-লাভের উদ্দেশ্যে অজ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন, অক্ষয় মুক্তিজ্ঞানের জন্যে রঘু তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তরুণ রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিচারাসন গ্রহণ করলেন—প্রবীণ রাজা নির্জনে পবিত্র কুশাসনটি টেনে নিয়ে ধ্যানে বসলেন।

প্রভুশক্তির বলে একজন আশেপাশের রাজাদের বশে আনলেন, অন্যজন যোগাভ্যাস করে শরীরস্থ পাঁচটি বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করলেন।

নবীন রাজা পৃথিবীতে শত্রুদের সব উদ্যোগকে গুঁড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন, অন্যজন জ্ঞানাগ্নিতে নিজের সব কর্মফল পুড়িয়ে ফেলতে সক্রিয় হলেন।

পরিণাম বুঝে-শুনে অজ সন্ধি থেকে আরম্ভ করে ছটি গুণ প্রয়োগ করলেন ; আর রঘু (শাণে-সোনায় এক করে) 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' মেনে তিনটি গুণকে প্রকৃতিস্থ রেখে জয় করলেন।

কর্মিষ্ঠ নবীন রাজা কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠানে বিরত হলেন না, প্রবীণ স্থিতধী পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পেয়ে যোগাসন ত্যাগ করলেন না।

এইভাবে তাঁরা শত্রুর প্রসার দমনে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ-সংযমে সচেতন রইলেন! অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সে আগ্রহী হয়ে তাঁরা দুজনে (দ্বিবিধ) অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করলেন।

সর্বভূতে সমদর্শী রঘু অজের মুখ চেয়ে (এভাবে) কয়েকটা বছর কাটালেন, তারপরে যোগসমাধিতে (মোহ) অন্ধকারের অতীত অবিনাশী পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলেন।

পিতার দেহত্যাগের কথা শুনে রঘুপুত্র দীর্ঘসময় অশ্রুপাত করলেন, আহিতাগ্নি (অজ) সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর অগ্নিসংস্কারশূন্য অন্ত্যেষ্টিআচার সম্পন্ন করলেন!

বাবাকে ভালোবেসেই তিনি পিতৃকার্যের বিধান মেনে তাঁর পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেছিলেন; কারণ, ঐভাবে যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁরা পুত্রের পিণ্ডদানের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

যে পিতা পরম মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁর উদ্দেশে শোক করা উচিত নয় বুঝে তিনি তত্ত্ববিদদের উপদেশ শুনে মনোব্যথা দূর করলেন। অন্যদিকে ধনুকে শরাসন সর্বদা প্রস্তুত রেখে তিনি জগতে প্রতিপক্ষের শাসন নির্মূল করলেন (অর্থাৎ একাধিপত্য স্থাপন করলেন)।

অনন্য পৌরুষদীপ্ত তাঁকে পতিরূপে পেয়ে পৃথিবী বহুরত্ন প্রসব করল এবং কান্তা ইন্দুমতী একটি বীর পুত্রের জন্ম দিলেন।

হাজার আলোর রোশনাইয়ের মতো উজ্জ্বল সে, তার নাম-যশ দশদিকে ছড়িয়ে যাবে, সে দশানন রাবণের ঘাতকের (অর্থাৎ রামচন্দ্রের) জনক—তাই পণ্ডিতেরা তার নাম রাখলেন 'দশরথ'।

বিদ্যাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ এবং পুত্রজন্মের মধ্যে দিয়ে রাজা (অজ) ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এবং পিতৃ-ঋণ শোধ করলেন। পরিবেশমুক্ত প্রখর সূর্যের মতোই তাঁর দীপ্তি ছিল।

তাঁর শক্তি ছিল বিপন্ন মানুষের ভয় দূর করতে, অগাধ বিদ্যা ছিল বিদ্বজ্জনেদের সম্বর্ধনা করতে—শুধু ধনসম্পদ নয়, তাঁর গুণাবলীও ছিল অন্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত!

ইন্দুমতীর অকালমৃত্যু

একদিন।

প্রজাপালন চলছে ঠিকমতো; পুত্রটি হয়েছে সুকুমার। নন্দনকাননে শচীদেবীর সঙ্গে ইন্দ্রের মতো রানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নগরের উপবনে বিহার করছিলেন।

তখন—

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে গোকর্ণস্থিত মন্দিরে মহাদেবকে বীণায় সুর শোনাতে নারদমুনি যাচ্ছিলেন আকাশপথে (অথবা, সূর্যের দক্ষিণায়নের পথ ধরে)।

তাঁর বীণার মাথায় বাঁধা ছিল দিব্য-পুষ্পে-গাঁথা একখানি মালা। তার সৌরভে আকৃষ্ট হয়েই যেন ঝোড়ো হাওয়া সেটিকে উড়িয়ে নিল।

ফুলের গন্ধে মুনির বীণাটিকে ঘিরে থাকা ভ্রমরের দল—যেন সে বাতাসের এই অপমানে কাজলে-মেশা চোখের জল ফেলছে।

সে দিব্য মালাটি মকরন্দের গন্ধভরে (মর্তের) তরুলতাদের বসন্তশোভাকেও হার

মানিয়ে—উড়তে উড়তে—রাজার প্রেয়সীর স্তনাগ্রভাগে এসে থামল।

ভরা বুকের মাঝখানটিতে মুহূর্তের জন্যে সখীর মতো (ঝাঁপিয়ে পড়া) মালাটিকে দেখে রাজবধূ রাহুগ্রস্ত চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো অবশ মূর্ছায় চোখ বুজলেন।

হতচেতন দেহটিকে নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ার সময়ে তিনি স্বামীকেও টেনে নিয়েছিলেন—প্রদীপের শিখাটি যখন মাটিতে পড়ে কিছু তৈলবিন্দুও তার সঙ্গে থাকে।

তাঁদের দুজনকে ঘিরে যে অনুচরেরা ছিল তাদের তুমুল আর্তনাদে ত্রাসিত হয়ে পদ্মঝিলের পাখিরা পর্যন্ত সমব্যথীর মতো কেঁদে উঠল।

জলবাতাসে রাজার মূর্ছা দূর হল, রানী কিন্তু তেমনিই পড়ে রইলেন। কারণ, আয়ুর অবশেষ থাকলে তবেই চিকিৎসার ফল পাওয়া যায়।

অজের বিলাপ

তখন—

প্রিয়াবল্লভ রাজা সুন্দরীর নিষ্প্রাণ শরীরটিকে ছিন্নতন্ত্রী বীণার মতো করে জড়িয়ে ধরে পরিচিত (ভঙ্গীতে !) কোলে তুলে নিলেন।

তাঁর নিশ্চেতন বিবর্ণ শরীরটিকে কোলে নিয়ে স্বামী (অজ)—যেন মলিন মৃগাঙ্ক-আঁকা ভোরের (নিষ্প্রভ) চাঁদ।

তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে থাকলেন—স্বাভাবিক ধৈর্য পর্যন্ত হারিয়ে গেল; অতিরিক্ত দহনে লোহাও গলে যায়, মানুষের তো কথাই নেই।

হায়! (কিছুই না!) শরীরে ফুলের ছোঁয়াতেও যদি প্রাণ যায়, তবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতের আর কী-ই বা উপকরণ বাকি থাকে?

অথবা, যমরাজ কোমল বস্তুকে কোমল অস্ত্র দিয়েই সংহার করতে উদ্যত হন, এ বিষয়ে তুষারপাতে পদ্মিনীর বিনাশই মনে হয় প্রথম দৃষ্টান্ত।

ফুলের মালা, এ যদি প্রাণনাশিনী হয়, তবে আমার বুকে রাখলে তা আমাকে মারছে না কেন, ঈশ্বরের ইচ্ছে-মতোই বিষও কখনও অমৃত হয়ে ওঠে আবার অমৃতও কখনও বিষে পরিণত হয়।

অথবা,

আমারই ভাগ্য-বিপর্যয়, তাই বিধির এই (বিনামেঘে) বজ্রাঘাত। তাই সে (এই অদ্ভুত বজ্র) গাছ উপড়ে ফেলে নি, তাকে জড়িয়ে থাকা লতাটিকে মুড়িয়ে শেষ করেছে।

তুমি যে অপরাধ করলেও কখনও মুখ ফিরিয়ে নাও নি (আমাকে অনাদর কর নি)! সেই তুমি আজ বিনা দোষে আমাকে ডেকে একটা কথাও কি বলবে না?

শুচিস্মিতে, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি শঠ, কপট-প্রেমিক ভেবেছ! তাই কি আমাকে কিছু না বলে, চিরকালের মতো এখান থেকে পরলোকে (অন্য কোথা অন্য কোনখানে!) চলে গেলে!

আমার এ পোড়া প্রাণ তো প্রেয়সীর সঙ্গ নিয়েছিলই! তবে আবার তাকে ছেড়ে ফিরে এলে কেন? এখন সে নিজের কর্মফলের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করুক।

তোমার মুখে রতিশ্রমে জমে ওঠা ফোঁটা ফোঁটা ঘাম এখনও শুকোয় নি, অথচ তুমি আর নেই! মানুষের জীবনের এই শূন্যতাকে ধিক্!

আমি তো মনে মনে কখনও তোমার অপ্রিয় কিছু করি নি, তবুও আমাকে ত্যাগ

করছ কেন ? সত্যি বলছি, আমি শুধু নামেই মহীপতি, আমার সত্যিকারের ভালোবাসা সে তো তোমাতেই !

করভোরু, বাতাসে উড়ছে তোমার ফুলজড়ানো ঢেউখেলানো ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলী, আমার মনে হচ্ছে তুমি বুঝি ফিরে এলে ।

তাই (সত্যি সত্যি) জেগে উঠে আমার সব দুঃখ দূর করে দাও প্রিয়ে। রাত্রিতে ওষধিরা জ্বলজ্বল করে হিমালয়ের গুহার অন্ধকারকে যেমন সরিয়ে দেয় ।

তোমার চুল এলোমেলো, মুখে একটাও কথা নেই—রাতের ভ্রমরগুঞ্জনশূন্য নুয়ে পড়া একক পদ্মফুলের মতো এ মুখ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

রজনী আবারও চাঁদের কাছে আসবে, প্রেমিকা চক্রবাকী তার জোড়া চক্রবাকের কাছে আবারও আসবে,—তাই তারা বিরহের বিচ্ছেদ সইতে পারে, কিন্তু তুমি চিরকালের মতো চলে গিয়ে আমাকে কি দগ্ধে মারছ না ?

কচি-পাতার আস্তরণে শুয়েই যে তোমার ননীর শরীরে কষ্ট হত ; বামোরু, তাহলে বল, এখন তুমি চিতায় ওঠা কেমন করে সইবে ?

তোমার নির্জন আসঙ্গের প্রথম সহচরী এই মেখলা তোমার চলার বিলাস স্তব্ধ হওয়াতে নীরব ; শোকে ও চিরঘুমে-ঘুমিয়ে-থাকা তোমাকেই অনুসরণ করছে।

তোমার কণ্ঠস্বর কোকিলবধূর কলকাকলিতে, মদালসা গতি কলহংসীদের চলায়, তোমার প্রাণচঞ্চল দৃষ্টি হরিণীদের চাউনিতে, তোমার বিলাস বাতাসে কম্পিত লতায় লতায়—স্বর্গসুখের আগ্রহ সত্ত্বেও তুমি ঐ গুণগুলিকে আমার কথা ভেবে রেখে গিয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমার বিরহে ব্যথাতুর আমার হৃদয়কে কিছুই ধরে রাখতে পারছে না।

তুমি এই সহকারতরু আর প্রিয়ঙ্গুলতার জোড় বেঁধে দিয়েছ, তাদের বিয়ের পালা না চুকিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে যাচ্ছ, এ তো ঠিক নয়।

তোমার (পদাঘাতের) দোহদপূরণেই অশোকতরু ফুলে ভরে উঠেছে, তোমার অলকাভরণের সেই ফুল আমি কেমন করে চিতার মালায় নেব ?

ননীর পুতুলি আমার ! তোমার মুখরিত-রুনু-ঝুনু-নূপুর-বাঁধা দুর্লভ পদাঘাত স্মরণ করেই বুঝি তোমার শোকে ঐ অশোকতরু কুসুমাশ্রু বর্ষণ করছে।

কিন্নরকণ্ঠি ! ঘুমিয়ে পড়লে কেন ? আমার সঙ্গে বসে তোমার নিঃশ্বাসের মতো সুরভি-মাখা বকুল ফুলের সৌখিন মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছে, এখনও শেষ হয় নি।

সখীরা তোমার সুখে-দুঃখে সমব্যথী, প্রতিপদের চাঁদের মতো তোমার পুত্র, আমি একমাত্র তোমাতে অনুরক্ত—তবুও তোমার এই উদ্যোগ সত্যি বড় নিষ্ঠুর !

আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, প্রেম-সম্ভোগ ঘুচেছে, গান থেমেছে, বসন্ত উৎসবশূন্য, অলংকারের প্রয়োজন মিটেছে, আমার শয্যা যে একেবারে শূন্য !

তুমি আমার ঘরণী, পরামর্শের সচিব, প্রেমের বঁধু, ললিতকলায় আদরের শিষ্যা— নিষ্করুণ বিধি তোমাকে কেড়ে নিয়ে আমার কী না নিয়ে গেল বল ?

মদিরাক্ষি ! তুমি আমার মুখের ছোঁয়া সুরভি-মদিরা পান করেছ, আজ পরলোকে আমার অশ্রুমলিন জলাঞ্জলি কি করে পান করবে ?

(হাজার) ঐশ্বর্য থাক। তোমাকে হারিয়ে অজের সব সুখ এখানেই শেষ ! কোনো লোভনীয় বিষয় আমাকে টানতে পারে না, আমার সব আনন্দ তোমাকে ঘিরেই ছিল।

কোসলাধিপতি প্রিয়াকে নিয়ে এইরকম করুণ বিলাপ করে করে তরুলতাদেরও

দ্রবীভূত রসের অশ্রুবর্ষণ করালেন।

তারপর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর কোল থেকে কোনোমতে সুন্দরীকে সরিয়ে নিয়ে, শেষ সাজে সাজিয়ে, অগুরু-চন্দন-কাঠের আগুনে তাঁকে (ইন্দুমতীকে) বিসর্জন দিলেন।

রাজা (অজ) বিদ্বান, স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে গেছেন এই অপবাদের আশংকায় তিনি অগ্নিতে দেহ উৎসর্গ করলেন না, প্রাণের মায়ায় নয় !

দশদিন পরে শাস্ত্র মেনে তিনি নগরের উপবনেই গুণবতী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠান করলেন।

তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, ইন্দুমতী নেই, যেন শেষ রাতের (নিষ্প্রভ) চাঁদ ; তাঁরই শোকের প্রবাহ দেখতে পেলেন পুরবধূদের মুখের অশ্রুধারায়।

বশিষ্ঠের সান্ত্বনা

ইতিমধ্যে কুলগুরু (বশিষ্ঠ) আশ্রমে যজ্ঞের জন্যে দীক্ষা নিয়ে ধ্যানযোগে জানতে পারলেন, তিনি শোকে বিমূঢ় ; এক শিষ্যের মুখে বলে পাঠালেন—

গুরুদেবের যজ্ঞ শেষ হয় নি, তাই আপনার শোক-সন্তাপের কথা জেনেও নিজে আপনার কাছে এসে বিচলিত আপনাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

হে সদাচার, তাঁর সংক্ষিপ্ত উপদেশবাণী নিয়ে আমি এসেছি। আপনার ধৈর্য ভুবনবিদিত, আপনি সে কথাটি শুনুন, তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন।

অনাদি পুরুষের সকল পাদবিক্ষেপের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রিতয়কে সেই মুনিঠাকুর অপ্রতিহত জ্ঞাননেত্রে দেখতে পান।

বহুদিন আগে, তৃণবিন্দু নামে এক ঋষি অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করতে থাকলে, তপোভঙ্গ করবার জন্যে ইন্দ্র হরিণী-নামে এক সুরসুন্দরীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

প্রশান্তি-নাশক প্রলয়ংকরী (লাস্য-) তরঙ্গে তপোভঙ্গ হলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁরই সামনে রমণীয় বিলাসে-চঞ্চল তাকে দেখে অভিশাপ দিলেন—'মর্ত্যের মানুষী হও !'

'প্রভু, আমি পরাধীন, আমার অন্যায়-আচরণ ক্ষমা করুন', এই বলে অনুনয় করলে তিনি যতদিন না সে দিব্য-পুষ্প দেখে ততদিনের জন্যে তাকে মর্ত্য-জন্ম দিলেন।

বিদর্ভের রাজপুত্রী হয়ে জন্মেছিল সে, বহুদিন তোমার মহিষীরূপে ছিল ; শাপমুক্তির উপকরণ স্বর্গচ্যুত ফুলমালাটি দেখেই সে চোখ বুজেছে।

সুতরাং তার মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করবেন না ; মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; এই বসুন্ধরাকে আপনি পালন করুন, বসুমতীই রাজাদের প্রকৃত পত্নী।

অভ্যুদয়ের সময়ে গর্বশূন্যতা দেখিয়ে আপনি আত্মবিশ্বাস ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, আজ মানসিক সন্তাপের মধ্যেও আপনি আবার আত্মবীর্য প্রকাশ করুন।

কান্নাকাটি করে বা সহমরণে গিয়ে তাকে কোথাও পাবেন কি ? কারণ, নিজের কর্মফল অনুসারে লোকান্তরস্থ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয়।

শোক কাটিয়ে উঠে পিণ্ড-জল দান করে পত্নীকে তর্পণ করুন। বলা হয়, প্রিয়জনের অবিচ্ছিন্ন অশ্রুপাত প্রেতকে কষ্ট দেয়।

জ্ঞানীরা বলেছেন—মানুষের মৃত্যুই স্বাভাবিক, জীবনটাই মায়া, প্রাণী যে একমুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে তাই তার যথেষ্ট।

যারা মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন তারাই প্রিয়জনের মৃত্যুকে বুকে-বেঁধা শেল মনে করে, কিন্তু

কল্যাণের পথ হিসেবে আত্মস্থ ব্যক্তি তাকে শল্যোদ্ধারই মনে করেন।

নিজের দেহ এবং আত্মারও সংযোগ বিভাগের কথা তো শ্রুতিতে বলা হয়েছে; তাহলে বলুন, বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি শোক করবেন কেন?

আপনি সংযমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আপনার উচিত নয়, সাধারণ মানুষের মতো শোকের বশবর্তী হওয়া। বৃক্ষ এবং পর্বতের মধ্যে কী তফাৎ থাকল, যদি দুজনেই ঝড়ে পড়ে যায়?

অজের অবশিষ্ট জীবন

তিনি 'আচ্ছা' বলে উদারমতি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করে মুনিকে বিদায় জানালেন। কিন্তু সে উপদেশ তাঁর শোকাতুর হৃদয়ে স্থান পেল না, বুঝি আবার গুরুর কাছেই ফিরে গেল।

সত্যপ্রিয় এবং প্রিয়ভাষী (অজ) নাবালক পুত্রের মুখ চেয়ে প্রিয়ার প্রতিকৃতি অথবা অনুকৃতি দেখে দেখে এবং স্বপ্নে ক্ষণিক মিলনের আনন্দ নিয়েই কোনোমতে আটটি বছর কাটিয়ে দিলেন।

অশ্বত্থের অংকুর যেমন প্রাসাদপৃষ্ঠে ফাটল ধরায়, তেমন সেই শোকশল্য সবলে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল; মৃত্যুর কারণ জেনেও, প্রেয়সীকে ত্বরায় অনুগমনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি চিকিৎসকের অসাধ্য এই রোগব্যথাকে পরম লাভ মনে করলেন।

সুশিক্ষিত, কবচধারী পুত্রকে প্রজাপালনের জন্যে যথাবিধ নিযুক্ত করে রোগক্লিষ্ট দুঃখমথিত শরীরটি থেকে মুক্তিকামনায় রাজা আমৃত্যু অনশনের ব্রত নিলেন।

জাহ্নবী এবং সরযূর স্রোতোধারার সঙ্গমতীর্থে দেহত্যাগ করে তিনি গণনামতো দেবত্ব লাভ করলেন। পূর্বের চেয়েও অনেক বেশী কমনীয় শরীর নিয়ে তিনি প্রিয়ার সঙ্গে নন্দনকাননের কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করতে থাকলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অজ বিলাপ' নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

নবম সর্গ

দশরথের রাজ্য-শাসন

পিতার মৃত্যুর পরে সংযমিগণের এবং রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য মহারথ দশরথ উত্তরকোসল রাজ্য অধিকার করে নিপুণভাবে শাসন করছিলেন।

কুলক্রমাগত নগরজনসহ প্রজাপুঞ্জকে যথানিয়মে পালন করাতে তাঁর গুণবত্তা কার্তিকেয়র বীর্যবত্তাকে ছাড়িয়ে গেল।

মনীষীরা বলতেন, বলনিহন্তা ইন্দ্র এবং মনুর রাজবংশে জাত অর্থপতি (দশরথ) যথাকালে (জল এবং ধনের) বর্ষণদানে কর্মনিষ্ঠ মানুষের শ্রম অপনয়ন করেন।

শান্তিপ্রিয়, দিব্য-তেজঃ-সম্পন্ন রাজার শাসনে দেশে ব্যাধির আক্রমণ ছিল না, শত্রুর কাছে পরাজয়ই বা কোথায়? পৃথিবী হয়ে উঠেছিল ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা।

দশদিগন্ত জয় করে রঘুর আমলে যেমন, তাঁর পরে অজের শাসনে পৃথিবীর যে শ্রী হয়েছিল, বীর্যে তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এমন রাজাকে পেয়ে পৃথিবীর শোভা তেমনই রইল।

সকলের প্রতি সমদৃষ্টি নিয়ে, ধনবৃষ্টি দান করে এবং দুষ্টের শাসন করে রাজা যম, কুবের এবং বরুণকে অনুকরণ করেছিলেন এবং তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন অরুণসারথি সূর্যের মতো।

মৃগয়ার আকর্ষণ, পাশাখেলা, চাঁদনীরাতে মদিরাপান, নবযৌবনা অঙ্গনা—কিছুই তাঁর উদ্যোগের যত্নকে ব্যাহত করতে পারত না।

প্রভাবশালী বাসবের উপস্থিতিতেও তিনি কোনো দীন বাক্য উচ্চারণ করতেন না, হাস্য-পরিহাসের সময়েও মিথ্যে বলতেন না, রোষশূন্য তিনি শত্রুদেরও কখনও নিষ্ঠুর কথা বলতেন না।

রঘুবংশীয় নায়কের হাতে পৃথিবীর রাজারা সমৃদ্ধি এবং বিনাশ লাভ করলেন—কারণ, তাঁর নির্দেশ যাঁরা অমান্য করতেন না, তাঁদের ছিলেন তিনি বন্ধু আর প্রতিস্পর্ধী-দের পক্ষে ছিলেন ইস্পাত-হৃদয়।

একক রথযোদ্ধা হয়েই তিনি শরসংযোগে সমুদ্রমেখলা ধরণীকে জয় করেছিলেন; তাঁর গজবাহিনী এবং অতি বেগশালী অশ্ববাহিনীযুক্ত সেনাবল শুধু বিজয়-ঘোষণাই করত।

বরূথযুক্ত একটিমাত্র রথে ধনুর্ধারণ করে তিনি পৃথিবী জয় করলেন, সমুদ্রেরা গম্ভীর নির্ঘোষে তাঁর বিজয়ঘোষণার দুন্দুভি হয়েছিল, তাঁর ঐশ্বর্য ছিল কুবেরতুল্য।

ইন্দ্র শতমুখী বজ্র দিয়ে পর্বসমূহের পক্ষচ্ছেদ করেছিলেন, প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখ দিয়ে তিনি সশব্দ ধনুরাকর্ষণে (প্রচণ্ড) শরবর্ষণ করে শত্রুপক্ষের শক্তিকে নাশ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন অপ্রতিহত পৌরুষে দীপ্ত।

মুকুটের মণিরত্নের প্রভায় তাঁর পায়ের নখে রঙ ছড়িয়ে শত শত রাজারা তাঁকে প্রণাম করতেন; যেমন ইন্দ্রকে করতেন সব দেবতারা।

যারা অমাত্যদের সঙ্গে তাদের শিশুপুত্রদের অঞ্জলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছিল, অলকে অলঙ্করণশূন্য সেই শত্রুপত্নীদের অনুকম্পা করে তিনি মহাসমুদ্রের বেলাভূমি থেকে অলকাসদৃশ অযোধ্যা নগরীতে ফিরে এলেন।

(একাধারে) অগ্নি এবং সোমের মতো দীপ্তিমান হয়ে তিনি রাজমণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেও লক্ষ্মীকে নিমেষচঞ্চলা বুঝে সদা-জাগরূক রইলেন।

তিনি মুকুট খুলে রেখে যাগযজ্ঞ করেছিলেন সকল দিক থেকে বাহুবলে আহৃত রত্নভারে। তমোগুণমুক্ত হয়ে তিনি সোনার যূপকাষ্ঠ স্থাপন করে তমসা ও সরযূনদীর তীরগুলিকে শোভাময় করে তুলেছিলেন।

অজিন, দণ্ড, কুশের মৌঞ্জী এবং মৃগশৃঙ্গ ধারণ করে মৌনব্রত নিয়ে তিনি যখন যজ্ঞের দীক্ষা নিতেন মনে হত স্বয়ং মহাদেবই তাঁর শরীরে অতুল প্রভায় দীপ্তি পাচ্ছেন।

যজ্ঞের অবভৃথ-স্নান শেষে জিতেন্দ্রিয় তিনি দেবসভাতেও প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র জলবর্ষী নমুচিসূদনের (ইন্দ্রের) কাছেই তিনি উন্নত শির আনত করে প্রণাম করতেন।

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী প্রার্থীদের প্রতি উদার ও ককুৎস্থকুলের বংশধরকে (দশরথকে) এবং স্বয়ম্ভু পরমপুরুষকে (বিষ্ণুকে) ছেড়ে অন্য কোনো নৃপতিকে আশ্রয় করেন নি।

(অসুরযুদ্ধে) মহারথ রণাঙ্গনে ইন্দ্রের সহায়তা লাভ করে শরবর্ষণে সুরবধূদের ভয় দূর করেছিলেন এবং তাঁদের মুখে তাঁর নিজের বাহুবলের যশোগান করিয়েছিলেন।

তিনি বারবার ইন্দ্রের সামনে থেকে ধনুর্যোজনা করতেন, মহা পরাক্রমে অদ্বিতীয় রথীরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন; সূর্যমণ্ডল ঢেকে ফেলা যুদ্ধের ধুলোর ঘূর্ণিকে অসুররক্তে নিবারিত করতেন।

মগধ, কোসল এবং কেকয় দেশের রাজার পতিব্রতা কন্যারা শত্রুর পথে শরযোজনাকারী তাঁকে পতিরূপে বরণ করলেন—যেন পার্বত্য নদীরা এসে সাগরে মিলিত হল।

শত্রুনিধনে নিপুণ রাজা তিন প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শোভা পেলেন—যেন দেবরাজ ইন্দ্র, তিন শক্তি নিয়ে ভুবনে এসেছেন প্রজাবর্গের শিক্ষা দান করতে।

বসন্ত সমাগম

তারপর এল বসন্ত।

বনকুসুমসম্ভারে মনে হল, সে বুঝি যম-কুবের-বরুণ-ইন্দ্রের সমকক্ষ পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় নৃপতি দশরথকে সেবা করতেই এসেছে।

সূর্য সারথিকে দিয়ে বাহনের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরায়ণে যেতে চাইলেন, হিমনির্মোক সরিয়ে প্রভাতবেলাকে উজ্জ্বল করতে করতে তিনি মলয় পর্বত ত্যাগ করলেন।

ফুল ফুটল, কচি পাতায় গাছ ভরে গেল, তারপর ভ্রমর এবং কোকিলের কল-কূজন—এইভাবে পাদপসমাকীর্ণ বনস্থলীতে যথানিয়মে অবতরণ করে বসন্তের অবির্ভাব ঘটল।

হিমমুক্ত বসন্তশ্রী কিংশুকের কোরক থরে থরে সাজালেন, যেন মদাবেশে মুক্তলজ্জা প্রণয়িনী কামিনীর শরীরে নখক্ষতের অলংকরণ।

শীতে কামিনীদের অধরোষ্ঠে (প্রেমিকের) দন্তাঘাত বেদনাদায়ক, (স্পর্শ শীতল বলে) তারা নিতম্বের মেখলা খুলে ফেলেছিল—সূর্য হিমের এই প্রকোপ একেবারে নির্মূল করতে পারলেন না, অনেকটা কমিয়ে দিলেন মাত্র।

মলয়সমীরে পল্লব কাঁপিয়ে কোরকশোভিতা সহকারলতা যেন নৃত্যাভিনয় অভ্যাস করছে—এমনিভাবে (দুলে দুলে) সে রাগদ্বেষশূন্য (নিরাসক্ত) মানুষেরও মন মাতিয়ে তুলল।

রাজার নীতিযুক্ত ও সজ্জন মানুষের উপকারে উৎসর্গীকৃত সম্পদের দিকে যেমন প্রার্থীরা তেমনি সরোবরে বসন্তে প্রফুল্ল পদ্মিনীতে ভ্রমর এবং জলচর পাখিরা এসে জড়ো হল।

বসন্তে অশোকতরুর নবকুসুমবিকাশই যে রতি-উদ্দীপক হল তা নয়, প্রেয়সীদের কানে-পরা পল্লবদলও বিলাসীদের (প্রেমে-) মাতোয়ারা করল।

কুরুবক ফুলের রাশি—বসন্ত যেন উপবনলক্ষ্মীর অভিনব পত্রভঙ্গ রচনা করে দিয়েছে—মধুতে ভরা, তাই পান করে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।

সুন্দরীদের মুখের মদিরাসিঞ্চনে তারই গন্ধে-ভরা বকুল ফুল ফুটল, মধুলোভী মধুকরদের ঝাঁকে ঝাঁকে টেনে এনে বকুলবীথী আকুল হল।

সুরভিমাখা কুসুমিত বনমালাতে কোকিলবধূর প্রথম অনুচ্চ কূজন শোনা যাচ্ছিল যেন মুগ্ধা নববধূর অস্ফুট আলাপ।

উপবনের লতায় লতায় ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জনগীতি, কুসুমের কোমল দন্তরুচি, বাতাসে পল্লবের কাঁপন; তারা (লতারা) যেন হাতের (ললিত) মুদ্রা সহ নৃত্যাভিনয়-রতা নর্তকী।

প্রেমিকের সঙ্গে অখণ্ড অনুরাগে বিভোর হয়ে কামিনীরা ললিত বিলাসের সহযোগী মদিরা পান করল—তা ছিল রতি-উদ্দীপক এবং বকুলগন্ধকেও হার মানায় এমনই সুগন্ধি।

প্রফুল্ল পদ্ম আর বিহঙ্গকুলের মত্ত কোলাহলে পূর্ণ গৃহদীর্ঘিকাগুলি শোভা ধরেছে—যেন সুন্দরী রমণী—মুখে মধুর হাসি, সঙ্গে আছে আলগা মেখলার রুনুঝুনু শিঞ্জিনী।

বসন্তের চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুর মুখশ্রী নিয়ে (প্রদোষ নিয়ে) রাত্রিবধূ প্রিয় সমাগমসুখে বঞ্চিতা নায়িকার মতো ক্ষীণ হতে থাকল।

হিমেল আবরণ সরে গিয়েছে, চাঁদের নির্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণ (প্রেমিকদের) রতিশ্রম দূর করল, (সেই আবার) মীনকেতনের পুষ্পধনুকেও আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। (অর্থাৎ মানুষের কামতৃষ্ণা উজ্জীবিত হল)।

জ্বলজ্বলে আগুন-রঙের (কর্ণিকার) ফুল বনলক্ষ্মীর কনক-আভরণ, (প্রেমিকের) দেওয়া পরাগ মাখা কোমল পাপড়ির সেই ফুলগুলিকে যুবতীরা তাদের চূর্ণকুন্তলে পরে নিল।

কাজলের টিপের মতো সুন্দর ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে উড়ে বসাতে তিলকতরু সুন্দরীর তিলকভূষণের মতোই বনস্থলীর শোভা বর্ধন করছিল।

গাছে জড়িয়ে দুলতে থাকা নবমল্লিকা তার মদির গন্ধে এবং কচি কিশলয়-অধরে ফুলের হাসিতে মন মাতিয়ে দিচ্ছিল। (অর্থাৎ সে যেন এক নায়িকা যে নিজের মুখের আসবগন্ধে এবং স্মিতহাসিতে নায়কের মন ভুলিয়ে দেয়)।

বালসূর্যের রাঙিমাকে হার-মানানো রাঙা পোশাকে, কানের যবাংকুরের ভূষণে, কোকিলবধূর কলকূজনে—কামসেনাদের প্রভাবে বিলাসী ব্যক্তিরা একমাত্র ললনারসে বিভোর হলেন।

শ্বেতপরাগে ভরপুর তিলকমঞ্জরী, তাতে ঘন হয়ে বসেছে ভ্রমরপঙক্তি ; যেন নারীর অলকে মুক্তাজালের শোভা।

উপবনের বাতাসে পুষ্পধনু মদনের ধ্বজার মতো এবং বসন্তলক্ষ্মীর প্রসাধনের মুখচূর্ণের মতো উড়ছিল ফুলের পরাগরেণু ; ভ্রমরশ্রেণী তাকে অনুসরণ করছিল।

দোলারোহণে পটু হলেও বসন্তোসবে অভিনব দোলায় দুলবার সময়ে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করতে আকাঙ্ক্ষা, তাই আসনরজ্জু গ্রহণকালে কামিনীদের বাহুলতা যেন গলে জল হয়ে গেল।

মানিনি ! মান রাখ, আর ঝগড়া নয় ; নবযৌবন একবার গেলে আর ফিরে আসে না—কোকিলবধূরা যেন কামদেবের এই উপদেশই কূজনে কূজনে নিবেদন করল। তাইতে নববধূরাও (নতুন করে !) প্রেমের খেলায় মাতল।

দশরথের মৃগয়া

মধুরিপু, মধুমাস এবং মন্মথের মতো বিলাসিনীপ্রিয় রাজা এইভাবে যথাসুখে বসন্তোৎসব উপভোগ করে মৃগয়াবিহারের অভিলাষ করলেন।

মৃগয়া চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করার অভ্যাস এনে দেয়, ভীত বা ক্রুদ্ধ পশুর হাবভাব শিখিয়ে দেয়, পরিশ্রমের মাধ্যমে শরীরকে সুঠাম রাখে—সুতরাং অমাত্যদের অনুমোদন

নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন।

মৃগয়াবনের উপযুক্ত বেশ ধারণ করে, চওড়া কাঁধে শরাসন স্থাপন করে, সূর্যতেজা রাজা ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকাশ যেন ঢেকে ফেললন।

তাঁর মাথায় বনমালা, গাছের পাতার রঙের বর্মে শরীর ঢাকা, ঘোড়ার দ্রুত বেগে কানের কুণ্ডল চঞ্চল—তিনি রুরুমৃগের বিচরণভূমিতে নজর দিলেন।

কোমল লতাসমূহের শরীর নিয়ে, ভ্রমরশ্রেণীর চোখ দিয়ে বনদেবতারা পথে দেখলেন তাঁকে—তাঁর চোখজোড়া সুন্দর, তিনি কোসলবাসীকে ন্যায়ধর্মে স্বস্তি দিয়েছিলেন।

তিনি বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে কুকুর-সেনা এবং জাল নিয়ে শিকারীরা আগেই উপস্থিত হয়েছিল ; সেখানে দাবানল নেই, ডাকাতের ভয়ও নেই, সেখানে ঘোড়া বাঁধার শক্ত মাটি, জলে ভরা পুকুর আর বনভরা হরিণ, পাখি এবং নীল গাই।

তারপর—

ভাদ্র মাস যেমন সোনার মতো লালচে বিদ্যুতের গুণ-দেওয়া ইন্দ্রধনু ধারণ করে, নরশ্রেষ্ঠ তেমনি করে ভয়-ভাবনা ছেড়ে ধনুকে শরাসন করলেন—ধনুকের টংকারে সিংহ ক্রোধে গর্জন করে উঠল।

তাঁর সামনে দেখা দিল একদল হরিণ, স্তন্যপায়ী মৃগশিশুরা তাদের মা-হরিণীদের যাতায়াতে বাধা দিচ্ছিল, তাদের মুখে তখনও কুশঘাসের ডেলা, তাদের সামনে সামনে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় আসছিল একটি কৃষ্ণসার।

জোড়কদম ঘোড়ায় চড়ে রাজা তূণীরের মুখ থেকে বাণ নিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, তারা দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। তারা ভয়ার্ত সজল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল, যেন নীলপদ্মের রাশি বাতাসে কেঁপে কেঁপে, বনে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল।

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম নিয়ে তিনি একটি হরিণকে লক্ষ্যস্থির করা মাত্র তার সহচরী এসে নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তাই দেখে, ধনুর্ধর আকর্ণ গুণ টেনেও প্রণয়প্রবণতায়, কৃপাকোমল মনে বাণ প্রতিসংহার করলেন।

অন্য হরিণের সার—শরবর্ষণ করার জন্যে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি আকর্ণ প্রসারিত হয়েও আপনিই শিথিল হয়ে গেল—তাদের টানা টানা ত্রাসচঞ্চল চাউনিতে তাঁর মনে পড়ছিল প্রেয়সীদের কটাক্ষ-বিলাস।

পুকুরের পাঁক থেকে ঝটপট উঠে মুখ থেকে খসে পড়া মুস্তা-ঘাসের গ্রাস পথে ছড়াতে ছড়াতে ছুটে গিয়েছে শুয়োরের পাল—ভিজে পায়ের টানা দাগগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—তিনি সেই পথ ধরলেন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে (বাহন থেকে) শরীরটিকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে তিনি তাদের বাণবিদ্ধ করলেন—তারাও কেশর ঝাঁকিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে এগোল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল না—মুহূর্তের মধ্যেই পেটের কাছে তীর লেগে তারা গাছের সঙ্গে বিঁধে গেল।

একটা বুনো মোষ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, তিনি তার চোখের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটা তার শরীর বিঁধিয়ে দিল, তাতে একটুও রক্ত লাগল না, মোষটা প্রথমে ধরাশায়ী হল, তারপরে তীরটা মাটিতে পড়ল।

রাজা ধারালো খুরপি দিয়ে খড়্গ-নামে গণ্ডক মৃগদের শৃঙ্গচ্ছেদ করে তাদের মাথা হাল্কা করে দিলেন। তাঁর ব্রত ছিল দুষ্টের দমন, তাই তিনি শত্রুর বাড়-বাড়ন্ত সহ্য

করতেন না, (এ ছাড়া) তাদের জীবনের প্রতি তাঁর কোনো হিংসা ছিল না।

নির্ভীক রাজা সুদক্ষ শিক্ষায় পাওয়া নিপুণ হাতে নিমেষের মধ্যেই তাদের মুখের হাঁ-গুলিকে তীরে তীরে ভরে দিয়ে সেগুলিকে (যেন) তূণে পরিণত করলেন—গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল (বিচিত্র) বাঘের দল, যেন বাতাসে ভেঙে পড়ল অসন গাছের বিকশিত পল্লবদল।

কুঞ্জে লীন সিংহদের বধ করতে চেয়ে রাজা ধনুকের গুণে প্রচণ্ড টঙ্কার দিলেন। নিশ্চয়ই তাদের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পরিচায়ক পশুরাজ-নামেই বুঝি তাঁর অসূয়া জন্মেছিল।

ককুৎস্থ শরবর্ষণ করে করে তাদের হত্যা করলেন—যারা যুদ্ধের পক্ষে বহু উপকারী হস্তিযূথের সঙ্গে চিরশত্রুতায় বদ্ধ এবং যাদের কুটিল নখাগ্রে গজমুক্তা আটকে যায়—মনে ভাবলেন (এভাবে যুদ্ধের হাতিদের প্রত্যুপকার করে) নিজের ঋণ মুক্ত করলেন।

কোথাও নীলগাইদের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন; কান পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে ভল্ল নিক্ষেপ করে তাদের সাদা চামর খসিয়ে দিয়ে—যেন শত্রু-রাজাদের ছত্র কেড়ে নিয়ে—শান্ত হলেন।

চন্দ্রক কলাপ মেলে ময়ূরেরা তাঁর রথের সামনে এসে লাফিয়ে পড়লেও তিনি তাদের লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন নি—হঠাৎ তাঁর মনে ভেসে উঠল নানা রঙের ফুলমালায় অলংকৃত তাঁর প্রেয়সীদের কেশকলাপ যা প্রেমের খেলায় তিনি খুলে দিতেন।

কঠোর মৃগয়াবিহারের ক্লান্তিতে তাঁর মুখ স্বেদজলকণায় ভরে গেল, তুষারকণাবাহী বনসমীর পাতার রাশির মধ্যে দিয়ে দিয়ে বয়ে এসে তা মুছিয়ে দিল।

এইভাবে অন্য সব কাজ ভুলে গিয়ে সচিবদের উপরে (রাজ্যের) সব ভার দিয়ে পৃথিবীপতি অনবরত মৃগয়া অনুশীলন করতেই থাকলেন; তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি দেখা দিল; লীলাময়ী কামিনীর মতো মৃগয়ার আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসল।

তিনি কোনো পরিজন রাখেন নি, কোমলপল্লবের শয্যাতে রাজা একাই রাত্রিযাপন করতেন; বনের জ্বলজ্বলে মহৌষধিরাই প্রদীপের স্থান নিত।

ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙত হস্তিযূথের কানের ঝটপটানির তীক্ষ্ন পটহধ্বনিতে, তারপরে চারণদের বন্দনাগানের মতো পাখির মধুর কলকূজন শুনে তিনি আনন্দ পেতেন।

একদিন—

বনে একটা রুরুমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে (যেতে যেতে) অন্যদের অলক্ষ্যে তিনি পেঁাছলেন তপস্বিজনসেবিত তমসানদীর তীরে—প্রচণ্ড পরিশ্রমে তাঁর ঘোড়াটির মুখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরছিল।

সেই (তমসা) নদীর জলে কুম্ভপূরণের মধুর গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল। তিনি মনে ভাবলেন হাতির ডাক—নিক্ষেপ করলেন শব্দভেদী বাণ।

রাজার সে-কাজ করা উচিত নয়, তবুও দশরথ শাস্ত্র লঙ্ঘন করে তা করলেন—রজোগুণে মোহিত হয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অপথে পদার্পণ করেন।

অন্ধমুনি-পুত্রবধ

[হঠাৎ]—

'হা তাত'—এই কান্না শুনে তাঁর হৃদয় বিষাদে ভরে গেল, তিনি বেতসবনে উৎস খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন—কলসী ভরতে এসে এক মুনিপুত্র তীরবিদ্ধ হয়েছে।

রাজার হৃদয়েও তখন অনুশোচনার শেল বিঁধেছে যেন।

তিনি জন্মেছেন নামী বংশে, ঘোড়া থেকে নেমে এসে তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ; জলের কলসীর গায়ে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে, স্খলিত কণ্ঠে, জড়ানো উচ্চারণে সে তাঁকে জানাল, সে বৈশ্য তাপসের পুত্র।

তার আদেশমতো রাজা তাকে তীরবিদ্ধ অবস্থাতেই তার দৃষ্টিশক্তিহীন বাবা-মার কাছে নিয়ে এলেন ; তাঁদের একটিমাত্র পুত্রের প্রতি তিনি ভুল করে যে আচরণ করেছেন তাও বললেন।

ঐ দম্পতি বহুক্ষণ বিলাপ করে তাঁদের শিশুকে যে আঘাত করেছে তাকে দিয়েই বুকে-বাঁধা তীর টেনে তুললেন—তার জীবন শেষ হল। তখন বৃদ্ধ পিতা চোখের জলে আঁজলা ভরে রাজাকে অভিশাপ দিলেন—

'শেষ বয়সে আপনিও আমারই মতো পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন।' তিনি এই কথা বললে—আহত সর্প যেন বিষ উগরে দিলে—এই প্রথম অপরাধে অপরাধী কোসলাধিপতি তাঁকে বললেন—

'আমি আজও পুত্রের কমলসুন্দর মুখ দেখি নি, আমার প্রতি ঠাকুরের এ তো শাপে বর ! ইন্ধনে জ্বলে ওঠা আগুন কৃষিক্ষেত্রকে পুড়িয়ে দিয়েও তাকে বীজাঙ্কুর ধারণের উর্বরতাই দেয়।'

এরপরে রাজা বললেন—বধযোগ্য এবং নিষ্ঠুরহৃদয় এই মানুষটা (এখন) কি করবে ? মুনি (চিতার) জ্বলন্ত কাঠ সাজাতে বললেন—তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মৃত পুত্রকে অনুসরণ করতে চান।

অবিলম্বে রাজা অনুচরদের সহায়তায় মহাপাতকের চিন্তায় উৎসাহহীনভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করলেন। নিজের মৃত্যুবাণ-অভিশাপ বুকে নিয়ে, বাড়বাগ্নিকে ভেতরে রেখে সমুদ্রের মতো তিনি বন থেকে ফিরে এলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'মৃগয়াবর্ণনা' নামক নবম সর্গ ॥

দশম সর্গ

দেবতাদের বিষ্ণুদর্শন

অনন্ত সম্পদ নিয়ে ইন্দ্রের সমান তেজে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে করতে তাঁর প্রায় দশ হাজার বছর কেটে গেল।

কিন্তু, যা পূর্বপুরুষের ঋণ মুক্তির উপায়, যা সব শোকের অন্ধকার দূর করে দেয় সেই পুত্ররূপ জ্যোতির দেখা পেলেন না।

সেই রাজা সন্তান-জন্মের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে রইলেন—যেন মন্থনের পূর্বেকার রত্নসম্ভাবনাময় সমুদ্র।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋত্বিকেরা তাঁকে সন্তানাকাঙ্ক্ষী এবং জিতেন্দ্রিয় জেনে তাঁর জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করলেন।

সেই সময়ে দেবতারা রাবণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে শ্রীহরির কাছে গেলেন ; রৌদ্রক্লান্ত পথিকেরা বুঝি ছায়াবৃক্ষের আশ্রয় নিল।

তাঁরা উপস্থিত হলেন সমুদ্রে, সনাতন পুরুষও (যোগনিদ্রা থেকে) জেগে উঠলেন, এই তৎপরতা ভাবী কার্যসিদ্ধিরই লক্ষণ।

দেবতারা শ্রীহরিকে দেখলেন। অনন্তনাগের ফণার উপরে বসে আছেন তিনি, তার ফণামণ্ডল থেকে ছড়িয়ে পড়া মণিপ্রভায় তাঁর শরীরটি দীপ্তিময়।

পা দুটি রেখেছেন পদ্মাসনা কমলার কোলের উপরে রাখা দুটি করপল্লবে, রেশমী আবরণে তাঁর (কমলার) মেখলাটি ঢাকা।

প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষের পরনে রয়েছে বালসূর্যের মতো (রাঙা) বসন, যেন শরৎকালের সকাল, দেখেই আনন্দ হয়।

সমুদ্রের সেরা রত্ন কৌস্তুভমণি তাঁর প্রশস্ত বুকে দুলছে, সে যেন লক্ষ্মীর সাধের আয়না, বুঝি আলোর ছটায় (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীবৎসচিহ্নকে ঢেকে ফেলছে।

তাঁর বাহুগুলি বিটপের মতো, অলংকৃত রয়েছে নানা দিব্যভূষণে, যেন সমুদ্রে আবির্ভূত হয়েছে দ্বিতীয় একটি পারিজাত বৃক্ষ।

তাঁর চেতনাযুক্ত অস্ত্রগুলি উচ্চকণ্ঠে তাঁর জয়গান করছে, এরাই দৈত্যদের (পরাজিত করে তাদের স্ত্রীদের) কপোলের মদলেখা মুছে দিয়েছিল।

কাছেই রয়েছে বিনীত, কৃতাঞ্জলি গরুড়, বাসুকির সঙ্গে ঝগড়া নেই আর, বজ্রের আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে।

যোগনিদ্রার শেষে পবিত্র দৃষ্টিতে তিনি অনুগৃহীত করছেন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিকে— তাঁরা এসেছেন তাঁর (যোগ) শয়নের কুশল জানতে।

দেবতাদের নারায়ণস্তুতি

তখন দেবতারা অসুরবিনাশী অবাঙমনসগোচর স্তুতির যোগ্য তাঁকে প্রণাম করলেন এবং স্তব করলেন।

তোমার তিনস্বরূপে অবস্থান, তোমাকে প্রণাম। প্রথমে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছ, তারপর তাকে পালন কর এবং শেষে তাকে সংহার কর।

দিব্য জলবর্ষণ একটিমাত্র রসাস্বাদী হলেও দেশভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদন ঘটায় ; তেমনি অধিকারীর গুণভেদে (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে) তোমারও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

তোমাকে পরিমাপ করা যায় না, তুমিই লোকসমূহকে পরিমাপ করছ, তোমার (নিজের কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি অন্যের প্রার্থনা পূরণ করছ ; তোমাকে জয় করা যায় না, তুমিই সকলকে জয় করেছ, তুমি অতিসূক্ষ্ম (ইন্দ্রিয়াতীত) অথচ তুমিই স্থূল (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) জগতের কারণস্বরূপ।

(ঋষিরা) বলেন, তুমি সকলের (অন্তর) হৃদয়ে তবু তুমিই দূরে (অপ্রত্যক্ষ), তুমি নিষ্কাম, তপস্বী, দয়ালু, অপাপবিদ্ধ, সনাতন অক্ষয়।

তুমি দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তুমি সর্বজ্ঞ, সব-সৃষ্টির উৎস, তুমি স্বয়ম্ভূ, সবার প্রভু, তোমার উপরে কেউ নেই ; তুমিই অনন্তরূপে প্রকাশিত।

সকলে বলেন, সপ্তাঙ্গ সামগান তোমারই স্তুতি, সপ্তসমুদ্রে তুমিই শয়ন কর, সপ্তজিহ্ব অগ্নি তোমারই মুখস্বরূপ, সপ্তলোকের আশ্রয় একমাত্র তুমিই !

চতুর্বর্গফলযুক্ত জ্ঞান, কালের পরিমাপ চারটি যুগ, এবং পৃথিবীর চতুর্বর্ণ—সবই

তোমার চতুর্মুখের সৃষ্টিবিলাস।

যোগীরা মুক্তির জন্যে অভ্যাসবলে মনকে সংযত করে হৃদয়স্থ জ্যোতির্ময় তোমাকে ধ্যানে উপলব্ধি করেন।

তুমি অনাদি (জন্মরহিত) হয়েও জন্মগ্রহণ কর, নিস্পৃহ হয়েও শত্রুনিধন কর, নিত্য জাগ্রত (চেতন) হয়েও যোগনিদ্রায় মগ্ন হও—তোমার মহিমা কেইবা বুঝতে পারে?

শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব বিষয়ের ভোগ করার জন্যে, কঠিন তপশ্চরণের জন্যে এবং প্রজা পালন করতে তুমি সচেষ্ট আবার তুমিই (সবচেয়ে) উদাসীন।

বেদশাস্ত্র সিদ্ধির উপায়রূপে বহু ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখিয়েছে, তারা সকলেই তোমার উদ্দেশ্যে সমর্পিত, জাহ্নবীর জলরাশি যেমন নানা পথে প্রবাহিত হলেও এক সমুদ্রেই মেশে।

নিরাসক্ত ব্যক্তিরা, যাঁদের চিত্ত একমাত্র তোমাতে সমর্পিত, যাঁদের সমস্ত কর্ম তোমাতে উৎসর্গীকৃত, তাঁদের পুনর্জন্ম নিরোধের একমাত্র উপায় তুমি।

প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার পঞ্চভূতের মহিমা অপরিমেয়; ঋষিবাক্য এবং অনুমানবাক্যে জ্ঞানযোগ্য তোমার বিষয়ে কী বলার আছে?

স্মরণমাত্রেই তুমি পুরুষকে পবিত্র করে দাও, এতেই তোমার প্রতি উৎসর্গিত অন্য (ইন্দ্রিয়) বৃত্তিগুলির ফলও (সহজেই) অনুধাবনযোগ্য।

সমুদ্রের রত্ন গুণে শেষ করা যায় না, সূর্যের তেজোরাশি পরিমাপ করা যায় না, তোমার অবাঙ্‌মনসগোচর স্বরূপ স্তবমহিমাকে ছাপিয়ে যায়।

তুমি পূর্ণস্বরূপ, তোমার না-পাওয়া কিছুই নেই; শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যেই তুমি জন্মগ্রহণ কর এবং কর্মানুষ্ঠান কর।

তোমার মহিমা কীর্তন করে ভাষা যখন স্তব্ধ হয় সে শুধু পরিশ্রমে অথবা অক্ষমতায়, গুণ (-বর্ণনা) শেষ হয়েছে বলে নয়।

এইভাবে দেবতারা ইন্দ্রিয়াতীত তাঁকে প্রসন্ন করলেন। এ শুধু তাঁর স্বরূপকীর্তন, পরমপুরুষের (নিছক) প্রশংসাগীতি নয়।

তিনি কুশলপ্রশ্ন করে প্রীতি প্রকাশ করলে দেবতারা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, প্রলয়কাল না হলেও ঐরকমই উদ্বেল রাক্ষসরূপ মহার্ণবের ভয়ংকর (অত্যাচারের) কথা।

বিষ্ণুর আশীর্বাদ

তারপর—

সাগরের (তরঙ্গ-) ধ্বনিকে হার মানিয়ে, বেলাভূমির পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনি তুলে, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভগবান বললেন—

সরস্বতী যেন সনাতন কবির উচ্চারণস্থান থেকে শুদ্ধ-সংস্কৃত ভাবে উচ্চারিত হয়ে সার্থক হলেন।

পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী তাঁর দন্তরুচিকৌমুদীতে শোভা পেল,—যেন তাঁরই চরণনিঃসৃতা ঊর্ধ্বস্রোতা গঙ্গা।

আমি জানতে পেরেছি রাক্ষসের আক্রমণে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম অভিভূত হয়েছে যেমন তমোগুণে মানুষের সত্ত্ব ও রজোগুণ আচ্ছন্ন হয়।

আমি এও জেনেছি, অনিচ্ছাকৃত পাপকর্ম যেমন সাধুজনের হৃদয়কে দগ্ধ করে তেমনি

সে তিন ভুবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করছে।

আমরা একই কাজের সঙ্গী, তাই ইন্দ্রের (নতুন করে) আমাকে প্রার্থনা জানাবার কিছু নেই, বাতাস তো নিজেই এগিয়ে এসে অগ্নির সহায়তা করে।

নিজের অসিধারার ছেদনমুক্ত দশম মস্তকটি সে আমারই লভ্যাংশরূপে রেখেছে, আমার (সুদর্শন) চক্রের লক্ষ্য সে।

চন্দনগাছের মাথায়ও তো সাপ উঠে বসে থাকে! তেমনি স্রষ্টার বরপ্রভাবেই ঐ দুরাত্মা শত্রুর এই বাড়াবাড়ি (মাথায় চড়ে বসা!) আমি সহ্য করেছি।

তপস্যায় বিধাতাকে সন্তুষ্ট করে সেই রাক্ষস বর চেয়েছিল—মর্ত্যের মানুষ তো ছার, দেবতারাও তাকে বধ করতে পারবে না।

আমি তাই দশরথের পুত্র হয়ে তীক্ষ্ণ বাণে তার মস্তক ছিন্ন করব, পদ্মমালার মতো তার মুণ্ডমালাকে যুদ্ধভূমির পূজার্ঘ্য করব আমি।

বেশী দেরি নেই, যাজ্ঞিকদের উৎসর্গ করা বিধিমতো যজ্ঞভাগ তোমরা আবার পাবে, রাক্ষসেরা আর তা ছুঁতে পারবে না।

পুণ্যবান ব্যক্তিরা আকাশে বিমানযোগে ভ্রমণ করবার সময়ে (রাবণের) পুষ্পকরথ দেখে মেঘের আড়ালে লুকোনোর সংকোচ ত্যাগ করতে পারেন।

শাপবলে রাবণের বলাৎকারের হস্তস্পর্শে স্বর্গের বন্দিনীদের কেশকলাপ দূষিত হয় নি, তোমরা সেই বেণীর বাঁধন খুলে দেবে।

সেই কৃষ্ণমেঘকান্তি (বিষ্ণু) রাবণের উৎপীড়নে ক্লান্ত দেবতাদের, যেন রৌদ্রশুষ্ক শস্যরাজিকে, বাক্যামৃতরসবর্ষণে সিক্ত করে অন্তর্ধান করলেন।

গাছেরা যেমন ফুলে ফুলে বায়ুকে অনুসরণ করে তেমনি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা নিজ নিজ অংশ নিয়ে দেবকার্যে উদ্যত বিষ্ণুকে অনুগমন করলেন।

দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ

এদিকে রাজার ঈপ্সিত কর্মের শেষে ঋত্বিকদের পর্যন্ত বিস্মিত করে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক (দিব্য) পুরুষ আবির্ভূত হলেন।

তিনি দুহাতে ধরে আছেন স্বর্ণপাত্রে ভরা চরু-পায়েস, আদিপুরুষের অনুপ্রবেশের ফলে তাঁর পক্ষেও তা (যেন) দুর্বহ মনে হচ্ছিল।

সাগর ছেঁচে পাওয়া অমৃতকে যেমন ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রাজা (দশরথ) প্রজাপতির দেওয়া এই চরু গ্রহণ করলেন।

ত্রিলোকের উৎপত্তির কারণ বিষ্ণুও তাঁর পুত্র হতে চেয়েছিলেন, এতেই রাজার দুর্লভ গুণগ্রামের কথা বলা হয়ে যায়।

গ্রহপতি সূর্য যেমন দ্যুলোকে আর ভূলোকে তাঁর আলো ছড়িয়ে দেন, তেমনি রাজা চরু-আকারে (পাওয়া) বিষ্ণুর তেজকে দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

কৌশল্যা তাঁর পাটরানী, কৈকেয়ী তাঁর বড় প্রিয়; রাজা চাইলেন তাঁরা সুমিত্রাকেও ভাগ করে দিয়ে খুশি করবেন।

সর্বজ্ঞ স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁরা দুজনেই চরুর অর্ধেক অংশ সুমিত্রাকে দিলেন।

মাতাল হাতির দুগাল বেয়ে যখন মদধারা ঝরতে থাকে তখন ভ্রমরী যেমন দুটি

ধারাতেই আসক্ত হয় তেমনি সুমিত্রা দুই সপত্নীকেই সমান ভালোবাসতেন।

সূর্যের অমৃতনামে কিরণজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে, তাঁরাও তেমনি সন্তান-প্রসবের জন্যে দেবতার অংশজাত গর্ভ ধারণ করলেন।

আপন্নসত্ত্বা হয়ে তাঁরা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলেন, দেখে মনে হল ফলোন্মুখী শস্য-সম্পদের শোভা।

মহিষীদের স্বপ্নদর্শন

তাঁরা সকলে স্বপ্ন দেখলেন শঙ্খ, অসি, গদা, চক্র ধারণ করে বামনমূর্তিরা তাঁদের রক্ষা করছেন।

(দেখলেন)

গরুড় তার গতিবেগে মেঘগুলিকেও টান দিচ্ছে আর তার সোনার পাখার কিরণের জাল আকাশে ছড়িয়ে তাঁদের (পিঠে করে) বহন করছে।

(দেখলেন)

বুকের মাঝখানে কৌস্তুভমণিটিকে দুলিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁদেরকে পদ্মপাখার বাতাস দিয়ে সেবা করছেন।

(দেখলেন)

স্বর্গের মন্দাকিনীতে স্নান করে এসে সাতজন ব্রহ্মর্ষি পুণ্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের উপাসনা করছেন।

তাঁদের মুখে এইরকম স্বপ্নের কথা শুনে রাজা আনন্দ পেলেন, জগৎপিতার জনক ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

নির্মল জলে যেমন একই চাঁদের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে তেমনই এক ঈশ্বর তাঁদের গর্ভে (চার ভাগে) বিভক্ত হয়ে বাস করলেন।

রামের জন্ম

তারপর

প্রসবের সময়ে এলে রাজার পাটরানী সতী (কৌশল্যা) ঘর-আলো-করা ছেলে পেলেন, বনৌষধি যেন রাত্রিতে (আঁধার-ভাঙা) জ্যোতি দেখাল।

পুত্রের অভিরাম আকৃতিতে মুগ্ধ পিতা তার নাম রাখলেন জগতের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলসূচক শব্দ 'রাম'।

রঘুবংশের প্রদীপ সে, তার অলোকসামান্য তেজে সূতিকাগৃহের প্রদীপপ্রভা যেন ম্লান হয়ে গেল।

শয্যায় শুয়ে (শিশু) রাম; কৃশোদরী মাতাকে দেখাচ্ছিল যেন শরতের ক্ষীণ গঙ্গাধারা, তীরে বেলাভূমিতে সাজানো রয়েছে কমল-অর্ঘ্য।

কৈকেয়ীর কোলে জন্ম নিল সুশীল পুত্র ভরত। জননীর অলংকার সে, যেন সম্পৎশ্রীর বিনয়ভূষণ।

সুমিত্রা জন্ম দিলেন দুটি যমজ-পুত্র লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নকে, সুশিক্ষিতা বিদ্যা যেমন তত্ত্বজ্ঞান ও সংযম দান করে।

সমস্ত জগতের সব দুঃখ দূর হল, সুখের বাণ ডাকল, মনে হল পুরুষোত্তমের পিছনে

পিছনে স্বর্গই নেমে এল পৃথিবীতে।

চতুর্মূর্তিতে তাঁর আবির্ভাবে রাবণের ভয়ে সংকুচিত দিগ্‌বধূরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, চতুর্দিকে নির্মল বাতাসের দোলা দেখা দিল।

আগুন জ্বলল কিন্তু ধোঁয়া লাগল না, সূর্য প্রসন্ন ; রাক্ষসের অত্যাচারে পীড়িত এঁরা এখন বিষাদ ভুলে গেলেন।

দশানন রাবণের মাথার মুকুট থেকে মণিগুলি একে একে খসে পড়ল, যেন তাঁর রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিন্দু অশ্রু মাটিতে ঝরে পড়ল।

পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তূর্যধ্বনির মধ্যে স্বর্গেই প্রথম দেবদুন্দুভি বেজে উঠল।

রাজার প্রাসাদে পারিজাতের পুষ্পবৃষ্টি হল। এই বৃষ্টিই সমস্ত মাঙ্গলিক কর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।

রাজকুমারদের একে একে সংস্কার সাধন হল, ধাত্রীর স্তন্যে তারা পুষ্ট হয়ে উঠল, পিতার প্রথমজাত আনন্দ বৃদ্ধি করতে করতে তারা বড় হতে লাগল।

তাদের স্বাভাবিক বিনয়গুণ সুশিক্ষার সংস্কারে আরও সমৃদ্ধ হল ; ঘি যেমন আগুনের স্বাভাবিক তেজকে উজ্জ্বলতর করে তেমনি।

ঋতুরঙ্গ যেমন স্বর্গের (নন্দন) কাননকে সুন্দরতর করে তোলে, তেমনি তাদের পরস্পর অনুরাগ অকলংক রঘুকুলকে আরও অনেক উজ্জ্বল করে তুলল।

তাদের সৌভ্রাতৃত্ব একই রকম ছিল, তবুও রাম-লক্ষ্মণে এবং ভরত-শত্রুঘ্নে প্রীতির টানের জোড় গড়ে উঠল।

বাতাস আর আগুনের মতো, চাঁদ আর সমুদ্রের মতো তাদের এই জোড়ায় জোড়ায় একতা কখনো ভাঙত না।

এই কুমারেরা গ্রীষ্মশেষের কালো মেঘে-ঢাকা দিনের মতো তেজস্বিতায় এবং স্নেহ-শীতলতায় প্রজাদের মন কেড়ে নিলেন।

রাজার চতুর্ধা বিভক্ত সত্তা এই পুত্রচতুষ্টয় শোভা পেল, মনে হল এরা যেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সশরীর অবতার।

চতুর্দিকের অধিপতি রাজাকে চার সমুদ্র যেমন রত্নরাশি দিয়ে সেবা করত, তেমনি পিতৃবৎসল চারপুত্র তাদের গুণাবলীতে পিতাকে তৃপ্ত করত।

চার পুত্র নিয়ে রাজাধিরাজ শোভা পেলেন। মনে হল যেন স্বর্গের ঐরাবত, চারটি দাঁত দিয়ে যে দৈত্যদের তলোয়ারের ধার নষ্ট করে দেয় ; যেন রাজনীতি ফল দেখে যার চারটে উপায় (সাম-দান-ভেদ-দণ্ড) নির্ণয় করা যায়, যেন স্বয়ং বিষ্ণু যূপকাষ্ঠের মতো দীর্ঘ যাঁর চারটি বাহু।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'রামাবতার' নামক দশম সর্গ ।

একাদশ সর্গ

রাজসভায় বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র রাজার (দশরথের) কাছে এসে যজ্ঞবিঘ্ন দূর করার জন্যে বালকোচিতশিখাধারী রামকে প্রার্থনা করলেন, কারণ তেজস্বীদের বয়স কত তা দেখার প্রয়োজন হয় না।

বিচক্ষণ রাজা বহু কষ্টে-পাওয়া রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে মুনির হাতে সমর্পণ করলেন। প্রাণপ্রার্থীদের প্রার্থনাও রঘুবংশে প্রত্যাখ্যাত হয় না।

রাজা তাঁদের প্রস্থানের জন্যে যেই নগরীর পথ সংস্কার করার আদেশ দিলেন, অমনি বায়ুকে সঙ্গে নিয়ে জল ও পুষ্পবর্ষী মেঘ অবিলম্বে তা সম্পাদন করল।

(পিতার) আদেশপালনে উদ্যত ঐ দুই ধনুর্ধারী পিতার চরণে পতিত হলেন। রাজার অশ্রুবিন্দুও প্রবাসগমনে প্রস্তুত বিনীত ঐ দুজনের উপরে বর্ষিত হল।

পিতার নয়নজলে ঐ ধনুর্ধর দুজনের শিখা ঈষৎ সিক্ত হল। তাঁরা সেই ঋষির অনুগমন করলেন। পুরবাসীরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় তাদের নয়নপঙক্তিতে যেন তাঁদের রাজপথের তোরণদ্বার রচিত হল।

ঋষি কেবল লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকেই নিতে চাওয়ায় রাজা আর সৈন্যসামন্ত কিছু দিলেন না, কারণ শুধু তাঁর আশীর্বাদই তাঁদের দুজনের রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট।

তাঁরা দুজন জননীদের চরণস্পর্শ করে তেজস্বী মুনির অনুগমন করলেন। চৈত্র ও বৈশাখ মাস (মেষাদি রাশির সংক্রমণকালে) সূর্যের অনুগমন করলে যেমন যেমন শোভান্বিত হয় তাঁরা দুজনও সেইরকম শোভা পেলেন।

বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও ভিদ্য নদের নামানুসারে তাদের ক্রিয়া (জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদ) যেমন শোভা পায়, শৈশবহেতু চঞ্চল হলেও তাদের তরঙ্গের মতো আন্দোলিত বাহু দুটি তেমনি শোভা পেল।

বনপথে রাম-লক্ষ্মণ

মণিবন্ধ ভূমিতে বিচরণযোগ্য তাঁরা দুজন ঋষিপ্রদত্ত ‘বলা’ ও ‘অতিবলা’ এই দুটি বিদ্যার প্রভাবে পথে কোনো ক্লান্তি বোধ করলেন না, বরং তাঁদের মনে হল তাঁরা যেন মায়ের পাশেই রয়েছেন।

যানারোহণের যোগ্য সানুজ রামচন্দ্র পুরাবিদ পিতৃবন্ধুর কাছ থেকে সেকালের গল্প শুনতে শুনতে (এতই অনন্যমনা হয়েছিলেন যে) তাঁরা যে পায়ে হেঁটে চলছেন তাই বুঝতে পারলেন না।

সরোবরেরা রসাল জল দিয়ে, পাখিরা শ্রুতিমধুর কুজন দিয়ে, বায়ুরা সুরভি ফুলের রেণু দিয়ে এবং মেঘেরা ছায়া দিয়ে তাদের দুজনকে সেবা করতে লাগল।

প্রিয়দর্শন সেই দুজনকে দেখে তপস্বীরা যে রকম আনন্দ পেলেন, পদ্মশোভামণ্ডিত জল কিংবা ক্লান্তিহরা তরুরাজি দেখেও সেরকম আনন্দ পান নি।

সেই ধনুর্ধর রাম হরকোপানলে দগ্ধ মদনদেবের তপোবনে এসে শুধু সুন্দর মূর্তিতেই তাঁর প্রতিনিধি হলেন, মর্মে নয়।

তাড়কাবধ

অভিশাপহেতু (রাক্ষসবেশধারিণী) সুকেতুসুতা তাড়কা পথ আগলে আছে, বিশ্বামিত্রের কাছে তা জানতে পেরে (রামচন্দ্র) মাটিতে ধনুর প্রান্তভাগ রেখে অনায়াসে তাতে জ্যা-রোপন করলেন।

তারপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতো কৃষ্ণবর্ণা তাড়কা তাঁদের দুজনের ধনুকের টংকার শুনে সম্মুখে আবির্ভূত হল, তার কর্ণলম্বিত নরমুণ্ড আন্দোলিত, সে যেন বলাকাশোভিত নিবিড়কৃষ্ণ মেঘরাশির মতো।

(তখন) ছিন্ন প্রেত-বাস-পরা বিকটনাদিনী তাড়কা তীব্রগতিবেগে পথতরু কম্পিত

করে শ্মশানোত্থিত বাত্যার মতো রামচন্দ্রকে অভিভূত করল।

একটি বাহুরূপ যষ্টি তুলে কটিদেশে পুরুষের অন্ত্ররূপ মেখলা ধারণ করে সে ছুটে আসছিল। তাকে দেখে রাম বাণ ও স্ত্রীলোকবধে ঘৃণা একই সঙ্গে ত্যাগ করলেন।

রামের সেই বাণ শিলার মতো কঠিন তাড়কার বুকে যে ছিদ্র করল, এতদিন যমরাজ যে রাক্ষসদেহে প্রবেশ করতে পারেন নি, সেই ছিদ্র (যেন) তারই প্রবেশদ্বার হল।

রামের শর তাড়কার হৃদয় বিদীর্ণ করল। এ অবস্থায় মাটিতে পড়বার সময় কেবল যে তার বনভূমি কম্পিত হল তা নয়, ত্রিভুবন জয় করায় রাবণের অচঞ্চলা জয়লক্ষ্মীও বিচলিত হলেন।

রাক্ষসী তাড়কা দুঃসহ রামরূপ মদনবাণে বক্ষঃস্থলে তাড়িতা হয়ে অঙ্গে রক্তরূপ সুবাসিত চন্দন লেপন করে যমালয়ে প্রস্থান করল।

তারপর সূর্যকান্তমণি যেমন সূর্য থেকে ইন্ধনদাহক তেজ লাভ করে, তাড়কাঘাতী রামও তেমনি তাঁর বিক্রমে প্রীত মহর্ষির কাছ থেকে রাক্ষসবধের মন্ত্রযুক্ত অস্ত্র লাভ করলেন।

তারপর রাম বামনাশ্রমে এলেন। ঋষির কাছে থেকে এ আশ্রমের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এখানে প্রথম জন্মের লীলা ঠিক মনে না পড়লেও উন্মনা হয়ে পড়লেন।

সেখানে থেকে মুনি নিজের তপোবনে এলেন। শিষ্যেরা আগেই অর্ঘ্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আশ্রমতরুরা পল্লবপুটরূপ অঞ্জলি রচনা করে দাঁড়িয়ে ছিল, মৃগীরা উন্মুখ হয়ে ছিল তাঁদের দেখবার জন্যে।

যথাক্রমে উদিত সূর্য ও চন্দ্র যেমন রশ্মিজালে অন্ধকার থেকে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, দশরথের দুই পুত্রও তেমনি শরজালে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিদের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করলেন।

মারীচ ও সুবাহুর আক্রমণ

তখন বন্ধুকফুলের মতো স্থূল রক্তবিন্দুতে যজ্ঞ দূষিত হচ্ছে দেখে ঋত্বিকেরা যজ্ঞের কাজ পরিত্যাগ করলেন এবং ভয়ে তাঁদের হাত থেকে বিকংকতে তৈরি স্রুগ্রাদি পাত্র স্খলিত হল।

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তৎক্ষণাৎ তূণীর থেকে বাণ নিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে রাক্ষস-সেনাদের দেখতে গেলেন। শকুনদের পাখার হাওয়ায় তাদের পতাকাগুলি কাঁপছিল।

তিনি ঐ সৈন্যদলে যজ্ঞবিদ্বেষীদের প্রধান দুজনের (মারীচ ও সুবাহুর) উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করলেন, কারণ যে গরুড় মহাভুজঙ্গবধের শক্তি ধরেন, তিনি কি কখনও ঢোড়া সাপের উপর বিক্রম প্রকাশ করেন ?

অস্ত্রবিদ রাম তখন উগ্রবেগ এক বায়ব্য অস্ত্র ধনুকে সন্ধান করে পর্বতের মতো সারবান তাড়কাপুত্রকে (মারীচকে) জীর্ণ পত্রের মতো ভূপাতিত করলেন।

সুবাহু-নামে যে আর একটি রাক্ষস সেখানে মায়া বিস্তার করে বিচরণ করছিল, রাম 'ক্ষুরপ্র'-বাণে তাকে খণ্ড খণ্ড করে আশ্রমের বাইরে পাখিদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

এইভাবে যজ্ঞবিঘ্ননাশী রামলক্ষ্মণের সামরিক বিক্রমকে অভিনন্দিত করে ঋত্বিকেরা সংযতবাক মহর্ষির ক্রিয়া যথাক্রমে সম্পাদন করলেন।

রাক্ষসবধের আনন্দে মুনির আশীর্বাদ

মুনির যজ্ঞীয় স্নানের পর দুভাই তাঁকে প্রণাম করলে তাঁর শিখাবন্ধ দুলে উঠল। তিনি আশীর্বাদ করেই কুশক্ষত হাতে তাদের স্পর্শ করলেন।

মিথিলাপতি জনক আরব্ধ যজ্ঞে তাঁকে (বিশ্বামিত্রকে) নিমন্ত্রণ করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই ধনুর্ভঙ্গ-ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন। তাই তিনি তাঁদের দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

তাঁরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় গৌতমমুনির রম্য আশ্রম-তরুতলে অবস্থান করলেন, ঐ আশ্রমে গৌতমপত্নী অহল্যা ক্ষণকালের জন্যে ইন্দ্রের পত্নীত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শিলাময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা দীর্ঘকাল পরে আবার যে নিজের মনোজ্ঞ দেহ ফিরে পেয়েছিলেন সে কেবল পাপহারী রামের চরণধূলির অনুগ্রহ।

রাজা জনকের সভায় রাম-লক্ষ্মণ

রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে রাজা জনক অর্ঘ্য নিয়ে অর্থ ও কামযুক্ত মূর্তিমান ধর্মের মতো সেই মুনির প্রত্যুদ্গমন করলেন।

বিদেহনগরীর অধিবাসীরা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে পুনর্বসু নক্ষত্র দুটির মতো তাঁদের দুজনকে সতৃষ্ণনয়নে দেখতে লাগল। তখন তারা চোখের পলক ফেলাকেও বিড়ম্বনা বলে মনে করল।

(জনকের) যূপচিহ্নিত যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হলে কুশিক-কুলতিলক বিশ্বামিত্র অবসর বুঝে মিথিলাপতি জনককে বললেন যে রাম সেই ধনুকটি দেখতে উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা প্রখ্যাতবংশে জাত সেই বালকের লাবণ্যময় দেহ দেখে এবং অনমনীয় ধনুকের কথা ভেবে, কেন যে কন্যা এই কঠিন পণ করলেন তা চিন্তা করে ব্যথিত হয়ে বললেন, বিশাল গজরাজের পক্ষেও যে কাজ দুষ্কর সেই কাজে সামান্য গজশাবকের ব্যর্থ চেষ্টা অনুমোদন করতে আমি উৎসাহবোধ করছি না।

হে তাত! এই ধনুক বহু ধনুর্ধর রাজাকে লজ্জা দিয়েছে। নিজেদের যে বাহুর ত্বক নিয়ত ধনুর্গুণের আকর্ষণে কঠিন হয়েছে তাঁরা সেই বাহুকে ধিক্কার দিয়ে ফিরে গেছেন।

মুনি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন, এঁর শক্তিমত্তার কথা শুনুন। অযথা কথায় আজ নেই। পর্বতে যেমন বজ্রের শক্তি পরীক্ষিত হয় তেমনি আপনার (বজ্রোপম) এই ধনুকটিতেই এঁর সারবত্তা প্রকাশিত হোক।

তিনি (জনক) এই বিশ্বস্ত মুনির কথা শুনে ইন্দ্রগোপকীটের মতো, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাহিকাশক্তির মতো, বালক রামেরও পরাক্রম সম্ভব তা বিশ্বাস করলেন।

রামের হরধনুভঙ্গ

তারপর ইন্দ্র যেমন তাঁর তেজোময় ধনুর প্রকাশের জন্যে মেঘরাশিকে আদেশ করেন তেমনি জনকও অনুচরদের সেই ধনুকটি আনার জন্যে আদেশ করলেন।

যজ্ঞ যখন মৃগরূপ ধরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যে-ধনুকে শিব তাঁর প্রতি বাণ

নিক্ষেপ করেছিলেন নিদ্রিত বাসুকির মতো ভীষণ সেই ধনুক দেখে রাম তা গ্রহণ করলেন।

কামদেব যেমন পুষ্পধনুতে অনায়াসে গুণারোপণ করেন রামও তেমনি পর্বতের মতো কঠিন সেই ধনুতে অনায়াসে গুণারোপণ করলেন, তখন সভার সকলে বিস্ময়-স্তিমিত নয়নে তা দেখতে লাগলেন।

রামের প্রবল আকর্ষণে বজ্রের মতো কঠোর শব্দ তুলে ভগ্ন হয়ে সেই ধনুক যেন ভৃগুনন্দনকে জানিয়ে দিল—ক্ষত্রিয় আবার জেগেছে।

মিথিলাপতি হরধনুভঙ্গে রামের পরাক্রম দেখলেন। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ-পণকে অভিনন্দিত করে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী অযোনিসম্ভূতা কন্যাকে রামের হাতে সমর্পণ করলেন।

রাম-সীতার পরিণয়

সত্যপ্রতিজ্ঞ জনক তেজোনিধি মহর্ষির সমক্ষে যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকে সাক্ষী করেই অযোনিজা কন্যাকে অবিলম্বে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলেন।

মহাদ্যুতি জনক 'কন্যাকে (পুত্রবধূরূপে) গ্রহণ করে এই নিমিকুলকে ভৃত্য বলে মনে করুন' এই বার্তা দিয়ে মাননীয় পুরোহিতকে কোশলরাজ দশরথের কাছে পাঠালেন।

তিনি (দশরথ) যোগ্য পুত্রবধূর অনুসন্ধান করছিলেন ; ঠিক এই সময়ে (তাঁর বাসনার) অনুকূল প্রস্তাব নিয়ে এঁর কাছে এলেন পুরোহিত। কারণ কল্পতরুর ফলের মতো পুণ্যবানদের বাসনা সদ্য সদ্যই পরিপক্ব হয়।

বাসব-বন্ধু জিতেন্দ্রিয় দশরথ সেই ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানে সম্মানিত করে, তাঁর কাছে সব কথা শুনে, সৈন্যদের পায়ে পায়ে ওঠা ধুলোয় সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে মিথিলায় রওনা হলেন।

রাজা সৈন্যদের দিয়ে মিথিলা বেষ্টন করিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে সৈন্যরা উপবনতরু বিদলিত করতে লাগল। যুবতী যেমন গাঢ় প্রিয়সম্ভোগ সহ্য করে মিথিলাপুরীও তেমনি এই প্রণয়াবরোধ সহ্য করল।

তারপর বরুণ ও ইন্দ্রতুল্য আচারনিষ্ঠ সেই দুই রাজা পরস্পর মিলিত হয়ে যার যার বিভব অনুসারে পুত্র ও কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করলেন।

তারপর রাম পৃথিবীকন্যা সীতাকে, লক্ষ্মণ তাঁর কনিষ্ঠা ঊর্মিলাকে এবং তাঁদের তেজস্বী অনুজ-দুজন (ভরত ও শত্রুঘ্ন) কুশধ্বজের ক্ষীণ-কটি দুই কন্যাকে (মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে) বিবাহ করলেন।

তখন চার পুত্র নববধূ গ্রহণ করে রাজা দশরথের সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারটি উপায়ের মতো শোভা পেলেন।

সেই রাজকন্যারা রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর চরিতার্থতা লাভ করলেন। সেই বরবধূর মিলন যেন প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগের মতো হল।

এইভাবে পুত্রবৎসল দশরথ সেই চার পুত্রকে সেখানে বিবাহ দিয়ে নিজের পুরীতে প্রস্থান করলেন। জনক তিনদিনের পথ পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলে তিনি তাঁকে বিদায় দিলেন।

পরশুরামের আবির্ভাব

নদীবেগ যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে (দূরবর্তী) স্থলীকেও নিপীড়িত করে, তেমনি

পথে একদিন প্রতিকূল বায়ু ধ্বজদণ্ডরূপ তরু উন্মূলিত করে তাঁর সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করতে লাগল।

তারপর সূর্য ভয়ংকর পরিবেশমণ্ডলে পরিবৃত হলেন। গরুড়নাশিত কালভুজঙ্গ তার শিরোভ্রষ্ট মণিকে দেহ দিয়ে বেষ্টন করে রাখলে যেমন ভয়ংকর দেখায় সূর্যকেও তেমনি ভয়ংকর দেখাল।

দিগাঙ্গনারা শ্যেনপাখির পক্ষরূপ ধূসর অলকরাশি ধারণ করে এবং সান্ধ্যমেঘরূপ রক্তিমবসনে আবৃত হয়ে রজঃস্বলা রমণীর মতো দর্শনের অযোগ্য হল।

ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণকারী পরশুরামের আগমনবার্তা ঘোষণা করতেই যেন শৃগালেরা সূর্যদেব যেদিকে ছিলেন সেইদিকে চেয়ে চেয়েই ভয়ংকর রব করতে লাগল।

কার্যজ্ঞ রাজা প্রতিকূল পবনাদি দুর্লক্ষণ দেখে শান্তিবিধানের জন্যে কুলগুরুকে (বশিষ্ঠকে) বললেন। তিনি 'মঙ্গল হবে' একথা বলে রাজার সেই উদ্বেগ দূর করলেন।

তখন সৈন্যদের সম্মুখে হঠাৎ এক তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হল। তারা নয়নমার্জনা করে দেখল সেই তেজোরাশি এক দর্শনীয় পুরুষাকৃতিতে রূপ নিল।

কণ্ঠে পিতার অংশস্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং হাতে মায়ের অংশস্বরূপ দুর্জয় ধনু ধারণ করে তিনি চন্দ্রযুক্ত সূর্য এবং সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর মতো প্রতিভাত হলেন। পিতা ক্রোধে নিষ্ঠুর হলেও এবং ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করলেও তিনি তাঁর আদেশ পালন করে কম্পমানা জননীর শিরশ্ছেদন করে প্রথমে ঘৃণাকে এবং পরে পৃথিবীকে জয় করেছিলেন, তিনি ডান-কানে-জড়ানো রুদ্রাক্ষমালার ছলে একুশবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের গণনাকে বহন করেই যেন শোভা পেলেন।

সন্তানেরা বালক বলে নিজের (অসহায়) অবস্থা এবং পিতৃবধজনিত ক্রোধে রাজবংশ নিধনে উদ্যত (পরশুরামকে) দেখে রাজা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

নিজের পুত্রে এবং দারুণ শত্রুতে সমভাবে বর্তমান 'রাম' নামটি তাঁর কাছে কণ্ঠহারের মণি এবং সাপের মাথার মণির মতো (যথাক্রমে) প্রীতিকর এবং ভয়ংকর হল।

দশরথ (সসম্ভ্রমে) 'অর্ঘ্য' 'অর্ঘ্য' বলতে থাকলেও সেদিকে না তাকিয়ে তিনি (পরশুরাম) যেখানে ভরতাগ্রজ রাম ছিলেন সেই দিকেই ক্ষত্রিয় কোপানলের শিখার মতো চোখ রাখলেন, যে চোখের তারাগুলি উগ্রতায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রামের প্রতি পরশুরাম

সংগ্রামে ইচ্ছুক পরশুরাম একটি মুষ্টিতে ধনুক ধরে এবং আর এক মুষ্টিতে আঙুলের ফাঁকে তীর রাখতে নির্ভীক রামকে বলতে লাগলেন—

অপকার করে ক্ষত্রিয়কুল আমার শত্রু হয়েছে, আমি বহুবার তাদের নিধন করে (এখন) শান্ত হয়েছি। তবু তোমার পরাক্রমের কথা শুনে দণ্ডতাড়িত সুপ্তনাগের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছি।

অন্য রাজারা জনকের যে-ধনুক নোয়াতেই পারে নি তুমি নাকি সেই ধনুক ভেঙেছ। তাই শুনে মনে হল আমার শক্তির চূড়াই যেন ভেঙেছে।

আগে জগতে 'রাম' শব্দটি উচ্চারিত হলে আমাকেই বোঝাত। এখন উদীয়মান তোমাতে ঐ নামটি বিভক্ত হওয়ায় আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে।

(ক্রৌঞ্চ) পর্বতেও (পর্বত বিদারণেও) যার কুঠার অভগ্ন সেই আমি দুজনকে

সমদোষী শত্রু বলে মনে করছি। ধেনুবৎস হরণ করায় হৈহয়বংশীয় কার্তবীর্য এবং আমার কীর্তিহরণে উদ্যত তুমি (আমার সেই দুই শত্রু)।

তাই, তুমি পরাজিত না হলে আমার ক্ষত্রিয়বিনাশী পরাক্রম আমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। আগুন যে শুষ্ক তৃণের মতো সমুদ্রেও জ্বলে তাতেই তার মহিমা।

তুমি যে হরধনু ভেঙেছ, বিষ্ণুতেজে তার সার অপহৃত হয়েছিল। নদীর বেগে মূল নড়ে গেলে সামান্য বাতাসও তটতরুকে ভূপাতিত করে।

তুমি আমার এই ধনুকে গুণ পরিয়ে তীর লাগিয়ে আকর্ষণ কর দেখি। যুদ্ধ থাক। এতেই আমি মনে করব তুল্যবল তুমি আমাকে পরাজিত করেছ।

আর যদি অগ্নিবর্ষী আমার এই পরশুধারার তর্জনে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে বৃথা ধনুর্গুণের আঘাতে যে আঙুলগুলি কঠিন হয়েছে অভয়-প্রার্থনায় তা দিয়ে অঞ্জলি রচনা কর।

রামের প্রত্যুত্তর

ভীমদর্শন পরশুরাম একথা বললে রামের অধর স্মিতহাস্যে কম্পিত হল, তিনি সেই ধনুক গ্রহণ করেই উপযুক্ত উত্তর দিলেন।

পূর্বজন্মে যে ধনু ধারণ করেছিলেন সেই ধনু (এ জন্মে) ধারণ করে রাম অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হলেন। নবীন মেঘ তো এমনিতেই সুন্দর, ইন্দ্রধনুযুক্ত হলে তা যে আরও সুন্দর হবে এ আর বিচিত্র কী ?

শক্তিমান রাম ধনুকের প্রান্ত মাটিতে রেখে তাতে গুণযোজনা করলেন, অমনি রাজশত্রু পরশুরাম ধূমাবশিষ্ট অগ্নির মতো নিষ্প্রভ হলেন।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজনের তেজ দীপ্যমান আর একজনের তেজ নিষ্প্রভ, এ অবস্থায় জনতা দুজনকে পর্বদিনে (পূর্ণিমার দিনে) সন্ধ্যায় (উদয়োন্মুখ) চন্দ্র ও অস্তগামী সূর্যের মতো দেখল।

কার্তিকেয়কল্প রাম পরশুরামকে হীনবল এবং নিজের সংযোজিত বাণকে অব্যর্থ দেখে করুণাকোমল হয়ে বললেন—

আপনিই প্রথম যুদ্ধের আস্ফালন করলেও আপনি ব্রাহ্মণ বলে আমি নির্দয়ভাবে আপনাকে আঘাত করতে পারছি না। এখন বলুন এই বাণ নিক্ষেপ করে আমি আপনার (স্বৈর-) গতি রুদ্ধ করব, না আপনার যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোকের পথ রুদ্ধ করব ?

পরশুরামের প্রত্যুত্তর

ঋষি (পরশুরাম) প্রত্যুত্তরে বললেন—স্বরূপতঃ তোমাকে পুরাণপুরুষ (নারায়ণ) বলে জানি না তা নয়, কিন্তু ধরায় অবতীর্ণ তোমার বৈষ্ণব তেজ দেখতে চেয়েছিলাম বলেই তোমার ক্রোধ উৎপাদন করেছিলাম।

আমি পিতৃশত্রুদের ভস্মসাৎ করেছি এবং সসাগরা বসুন্ধরাকে যথাযোগ্য পাত্রে দান করেছি। এখন পরমপুরুষ তোমার কাছে আমার এই পরাভব আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।

হে সুধীশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যতীর্থযাত্রায় আমার অভীষ্ট গতি অব্যাহত রাখ। আমি ভোগলিপ্সু নই, তাই স্বর্গের পথরোধ আমাকে পীড়া দেবে না।

রাম 'তাই হোক' বলে অঙ্গীকার করলেন এবং পূর্বদিকে মুখ করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ পুণ্যবান হলেও পরশুরামের দুরতিক্রম্য স্বর্গপথ অবরুদ্ধ করল।

রামও 'ক্ষমা করুন' বলে সেই তপস্বীর চরণস্পর্শ করলেন। শক্তিতে পরাজিত শত্রুর কাছে প্রণত হওয়া বীরদের কীর্তিরই কারণ হয়।

পরশুরামের অন্তর্ধান

পরশুরাম বললেন—তুমি আমার মাতৃসম্বন্ধীয় রজোগুণ দূর করে আমাকে যে পৈতৃক শমগুণ অবলম্বন করিয়েছ, তাতে আমার এই শুভাবহ নিগ্রহও অনুগ্রহের মতোই হয়েছে।

'তুমি দেবকার্যসাধনে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ, তোমার মঙ্গল হোক। আমি চললাম'—ঋষি সুলক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে একথা বলে অন্তর্হিত হলেন।

তিনি চলে গেলে পিতা বিজয়ী রামকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে মনে করলেন রামের যেন পুনর্জন্ম হল। ক্ষণিক পরিতাপের পর তাঁর এই পরিতোষ লাভ যেন দাবানলে আক্রান্ত তরুতে বৃষ্টিপাতের মতো হল।

তারপর শিবতুল্য রাজা (দশরথ) পথে সুনির্মিত পটমণ্ডপে কয়েক রাত কাটিয়ে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন সীতাদর্শনে উৎসুক পুরনারীরা বাতায়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় মনে হল সেখানে যেন পদ্ম ফুটে আছে।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'ভার্গববিজয়' নামক একাদশ সর্গ ॥

দ্বাদশ সর্গ

রামের অভিষেক

সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করা হলে, তিনি (দশরথ) জীবনের শেষ দশায় উপস্থিত হলেন, ভোরের প্রদীপশিখার মতো তাঁর জীবনদীপও প্রায় নিভে এল।

জরা পলিতকেশের বেশে তাঁর কানের কাছে এল, কৈকেয়ীর ভয়ে যেন কানে কানে বলল, 'রামের হাতে রাজ্যশ্রীকে অর্পণ কর'।

প্রিয় রামের অভিষেকবার্তা পুরবাসী সকলকে আনন্দে ভাসিয়ে দিল—উদ্যানের জলস্রোত যেন তরুরাজিকে ভিজিয়ে দিল।

কুটিলমতি কৈকেয়ী তাঁর অভিষেকের সমস্ত আয়োজনকে রাজার শোকোষ্ণ অশ্রুপাতে দূষিত করে দিলেন।

সে রণচণ্ডী, (দশরথের) অনেক আশ্বাসে-তোষামোদে তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত দুটি বরের কথা বলে বসল—বর্ষার জলে ভেজা মাটি যেন গর্তে-লুকানো দুটো সাপ উগরে দিল।

তার একটাতে রামকে চোদ্দ বছরের জন্যে বনে পাঠাল, অন্যটাতে নিজের ছেলের জন্যে রাজ্যশ্রী চাইল—তার ফল তারই নিজের বৈধব্য।

রামচন্দ্র প্রথমে পিতৃদত্ত রাজ্যকে চোখের জলে গ্রহণ করেছিলেন, তারপর তাঁরই কাছ থেকে "বনে যাও" এই আদেশ তিনি খুশিমনে গ্রহণ করলেন।

লোকে অবাক হয়ে দেখল—পবিত্র রেশমী-জোড় পরেও তাঁর মুখে যে ভাব,

বল্কলজোড় পরেও সেই একই রূপ (একটুও পরিবর্তন হল না)।

তিনি (রামচন্দ্র) সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে, পিতাকে সত্যভ্রষ্ট না করে, দণ্ড-কারণ্যে প্রবেশ করলেন, মন ভরে দিলেন সব সজ্জনদেরও।

তাঁর বিচ্ছেদের যন্ত্রণায়, নিজের কর্মফল সেই অভিশাপের কথা মনে মনে ভেবে, রাজারও তখন মনে হল দেহত্যাগ করেই বুঝি (পাপের) প্রায়শ্চিত্ত হবে।

রাজপুত্রেরা বাইরে, রাজার মৃত্যু হয়েছে; ছিদ্রান্বেষী শত্রুরা মনে ভাবল (সুবর্ণসুযোগ!) রাজ্য কেড়ে নিলেই হয়!

নিরুপায় অমাত্যরা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে মামা-বাড়ি থেকে ভরতকে নিয়ে এলেন, তারা সারাক্ষণ শোকাশ্রু গোপন রেখেছিল।

ভরতের পাদুকাগ্রহণ

পিতার ঐভাবে মৃত্যুর কথা শুনে কৈকেয়ীর পুত্র শুধু নিজের মায়ের প্রতি বিরূপ হলেন তা নয়, রাজ্যশ্রীর প্রতিও তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।

সৈন্য সামন্ত নিয়ে রামের সন্ধানে বেরোলেন—(বনের) আশ্রমবাসীরা তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন, তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্রাম নেওয়ার গাছগুলিকে দেখে দেখে এগিয়ে গেলেন।

চিত্রকূটবনে এসে তাঁকে (রামকে) পিতার মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করলেন (ভরত), রাজসম্পদ কেউ স্পর্শ করে নি; রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন তিনি।

জ্যেষ্ঠজন রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করলেন না, আর তিনি (সেই) রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন—এতে তো বড় ভাইকে অবিবাহিত রেখে ছোট ভাইয়ের পত্নীগ্রহণের অপরাধ হয়।

স্বর্গত পিতার আদেশ থেকে তিনি (রামচন্দ্র) যখন কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না, তখন (ভরত) তাঁর কাছে পাদুকা-জোড়া চেয়ে নিলেন, তাদেরই তিনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করবেন।

ভাই (রামচন্দ্র) 'তথাস্তু' বলে তাঁকে বিদায় জানালেন, তিনি আর (অযোধ্যা) নগরীতে ফিরলেন না; নন্দিগ্রামে থেকে গচ্ছিতধনের মতো করে রাজ্যপালন করলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অসীম ভক্তি, তাই রাজ্যভোগে ভরতের একটুও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি যেন (এইভাবে) মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ চিত্রকূটবনে

অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈদেহীকে নিয়ে শান্ত রামচন্দ্র, বন্য-আহারে জীবনধারণ করছেন; যুবা বয়সেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত নিয়েছেন যেন।

একদিন—

তিনি (রামচন্দ্র) নিজের প্রভাবে এক বিশাল গাছের ছায়াকে স্থির করে রেখে তারই নিচে সীতার কোলে মাথা রেখে ক্লান্ত শরীরে একটু শুয়েছেন।

হঠাৎ—

একটা কাক এসে তাঁর (সীতার) স্তনযুগলে নখের আঁচড় কেটে দিল। স্বামীর উপভোগের চিহ্নে সে যেন দোষ দেখতে পেয়েছিল।

প্রিয়ার ডাকে জেগে উঠে রামচন্দ্র তার দিকে একটা কাশের তীর নিক্ষেপ করলেন।

কাকও ঘুরতে ঘুরতে একটা চোখ ফেলে দিয়ে মুক্তি পেল।

কাছাকাছি জায়গা, ভরত আবার আসতে পারেন এই আশংকা করে রামচন্দ্র ব্যাকুল-হরিণে-ভরা চিত্রকূট বনস্থলীকে ছেড়ে গেলেন।

অতিথিবৎসল ঋষিদের আশ্রমে বাস করে তিনি দক্ষিণদিকে গেলেন, যেমন বর্ষাকালের নক্ষত্রগুলিতে অবস্থান করতে করতে সূর্য দক্ষিণায়নে যায়।

তাঁর সঙ্গে চলেছেন বিদেহদেশের রাজনন্দিনী, শোভা পাচ্ছেন যেন কৈকেয়ীর বারণ-না-মানা গুণগ্রাহিণী অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী।

অনুসূয়া তাঁর অঙ্গরাগ রচনা করে দিয়েছিলেন, তার পবিত্র গন্ধে ভ্রমরেরা ফুল (এর মধু) ছেড়ে (তাঁর কাছেই) উড়তে লাগল।

(হঠাৎ)

রাহু যেমন চাঁদের পথ অবরোধ করে, তেমনি করে সন্ধ্যাবেলার মেঘের মতো লালচে-বাদামী রঙের বিরাধ নামে এক রাক্ষস রামের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অশুভ বর্ষণের প্রতিবন্ধ যেমন শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্র মাসের মধ্যেকার বৃষ্টিকে হরণ করে, তেমনি মানুষখেকো ঐ রাক্ষস তাঁদের দুজনের মধ্যে থেকে সীতাকে হরণ করল।

রাম-লক্ষ্মণ তাকে পিষে মেরে ফেললেন ; অপবিত্র গন্ধে বনস্থলী দূষিত হবে এই ভেবে তাকে মাটিতে পুঁতে দিলেন।

পঞ্চবটীবনে

তারপর রামচন্দ্র ঋষি অগস্ত্যের আদেশে পঞ্চবটীতে বাস করলেন। যেমন অগস্ত্যের আদেশেই বিন্ধ্যপর্বত ক্রমবৃদ্ধি সংযত করে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন (মাথা নত করেছিলেন)।

সেখানে কামাতুরা রাবণভগিনী রামচন্দ্রের কাছে এল ; গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ সর্পিণী যেন চন্দনতরুর আশ্রয় নিল।

সীতার সামনেই সে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকল। নারীদেহে কামাবেগের তীব্রতা স্থান-কালের জ্ঞান মানে না।

বৃষস্কন্ধ রামচন্দ্র কামিনী রাক্ষসীকে বললেন—আমার বউ রয়েছে ; তুমি আমার ছোট ভাইয়ের কাছে যাও লক্ষ্মীটি।

আগেই জ্যেষ্ঠের কাছে যাওয়ার ফলে তিনিও (লক্ষ্মণও) তাকে গ্রহণ করলেন না ; তখন সে আবার রামের কাছেই ঘুরে এল ; নদীর জল যেমন দুই দিকের তীরেই আঘাত করে তেমনি।

ঝোড়ো হাওয়া বন্ধ থাকায় শান্ত সমুদ্রের বেলাভূমি যেমন চন্দ্রোদয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সীতার মুখের হাসিও একটুখানির জন্যে শান্ত-হয়ে-থাকা তাকে ক্ষিপ্ত করে দিল।

'আমাকে দেখে রাখ, এই মজা দেখার ফল তুই শীগগিরই ভোগ করবি ; তোর এই (উপহাস) বাঘিনীকে দেখে হরিণীর ঠাট্টার মতো, তা জেনে রাখিস'।

সীতা তো ভয়ে স্বামীর কোলে (নিজেকে) লুকিয়েছেন, তাঁকে এই কথা শুনিয়ে শূর্পনখা তার নামের মতোই (ভয়ঙ্কর) রূপটি বার করল।

প্রথমে কোকিলার মতো মধুর স্বর শুনে তার পরেই শেয়ালীর মতো গলা শুনে লক্ষ্মণ বুঝলেন সে কোনো মায়াবিনী।

তখন লক্ষ্মণ খুব তাড়াতাড়ি পর্ণকুটীরে প্রবেশ করে, খোলা তলোয়ার নিয়ে

এমনিতেই বিকট রাক্ষসীটাকে আরও বিকৃত করে দিলেন।

তার নখগুলি বাঁকা বাঁকা, আঙুলের পর্বগুলি বাঁশের গিঁটের মতো খসখসে (হাতে-পায়ের) আঙুলগুলি অঙ্কুশের মতো—(তাই নেড়ে নেড়ে) সে শূন্যে তাঁদের দুজনকে শাসাতে লাগল।

তক্ষুণি জনস্থানে এসে সে খর ও অন্যান্যদের কাছে রামের অত্যাচারে রাক্ষসদের এই অভিনব পরাজয়ের কথা জানিয়ে দিল।

নাক-কান-কাটা তাকে (শূর্পণখাকে) সামনে রেখে রাক্ষসেরা তেড়ে এল ; রামের বিরুদ্ধে অভিযানের পক্ষে সেটাই ছিল তাদের অমঙ্গলসূচক।

অস্ত্র উঁচিয়ে গর্বিত তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রাঘব ধনুকে বিজয়ের আশা রাখলেন আর লক্ষ্মণের (হাতে) সীতাকে রাখলেন।

রাম একা। রাক্ষসেরা আছে হাজারে হাজারে। তারা যতজন, যুদ্ধে ঠিক ততজন তাঁকেই (রামকেই) ওরা দেখল।

শুদ্ধাচারী ককুৎস্থ দুর্জনের (রাক্ষসের) পাঠানো দূষণকে নিজের কোনো দোষের মতোই সহ্য করলেন না।

তাকে শরবর্ষণে ঘায়েল করলেন, খর এবং ত্রিশিরাকেও শেষ করলেন। তাঁর ধনুক থেকে একে একে নিক্ষিপ্ত হলেও মনে হচ্ছিল তীরগুলি যেন একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে।

দেহ ভেদ করে বাণ ছুটে গেল, তবু আগের মতোই পরিষ্কার ; তীক্ষ্ম বাণগুলি ওদের তিনজনের আয়ু পান করল মাত্র, রক্ত পান করল চিল-শকুনে।

রামের বাণে বিশাল রাক্ষসবাহিনী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ; মুণ্ডহীন চঞ্চল কবন্ধ ছাড়া অন্য কিছুই সেখানে চোখে পড়ছিল না।

রাক্ষসদের সেনাবাহিনী রামের অজস্র বাণবর্ষণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল, আর জাগল না, শকুনেরা এসে (ডানা মেলে) ছায়া ফেলল।

রাক্ষসেরা রাঘবের অস্ত্রে নিহত ; তাদের মধ্যে একমাত্র শূর্পণখা বেঁচে ছিল, রাবণের কাছে সে-ই তাদের দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেল।

বোনের উপর অত্যাচার, আপনজনের বধ—এইসবের ফলে রাবণের মনে হল, রাম তার দশটা মাথায় (একসঙ্গে) পদাঘাত করছেন।

সীতাহরণ

একটা রাক্ষসকে হরিণের রূপ ধরে পাঠিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে ঠকিয়ে সে সীতাকে চুরি করল ; মাঝপথে পক্ষীরাজ জটায়ু একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই যা ! (কিন্তু কিছুই করতে পারে নি !)

তাঁরা দুজনে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে ডানা-কাটা পাখিকে দেখতে পেলেন। দশরথের প্রীতি-ঋণ শোধ করে তাঁর তখন কণ্ঠাগত প্রাণ।

রাবণ মৈথিলীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, এ বৃত্তান্ত তিনি মুখে বলে জানালেন ; নিজের মহৎ (যুদ্ধরূপ) কর্মের কথা শরীরের আঘাতগুলিতে বুঝিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

তাঁরা (রাম-লক্ষ্মণ) নতুন করে পিতৃবিয়োগের শোক অনুভব করলেন ; বাবার মতো করেই অগ্নি-সংস্কার থেকে শুরু করে সব পারলৌকিক কাজ তাঁরা সম্পন্ন করলেন।

(রামের হাতে) প্রাণ দিয়ে এক কবন্ধ রাক্ষস শাপমুক্ত হল, তার কথামতো রামচন্দ্র সমদুঃখী বানরের (সুগ্রীবের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

তিনি বালীকে বধ করলেন; বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই সিংহাসনে, ধাতুর স্থানে আদেশের মতো, সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রাজার আদেশে অসংখ্য বানর, যেন বিপন্ন রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায়, সীতার অন্বেষণে চারদিকে বিচরণ করছিল।

হনুমানের কীর্তি

সম্পাতির দেখা পেয়ে, তার মুখে সীতার বৃত্তান্ত জানতে পারল পবননন্দন (হনুমান)। নিরাসক্ত মানুষ যেমন সংসার পার হয় সেও তেমনি (সহজেই) সাগর পার হল।

খুঁজতে খুঁজতে লংকায় এসে সে সীতাকে দেখল, রাক্ষসীরা ঘিরে রয়েছে তাঁকে; কোনো মহৌষধি-লতাকে যেন বিষাক্ত লতারা জড়িয়ে ধরেছে।

প্রভুর অভিজ্ঞান-আংটিটি বানর তাঁকে দিল, তিনি (সীতা) শান্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে সেটিকে অভ্যর্থনা করলেন যেন।

প্রিয়তমের সব খবর দিয়ে সীতাকে শান্ত করল, অক্ষরাক্ষসকে বধ করল; তারপর সে শত্রুর হাতে সামান্য লাঞ্ছনা ভোগ করে লংকাপুরী দহন করল।

কাজ শেষ করে সে সীতার অভিজ্ঞান-রত্ন এনে রামকে দেখাল, জানকীর হৃদয়খানিই বুঝি মূর্তি ধরে স্বয়ং উপস্থিত।

বুকের মধ্যে সেই রত্নখানি চেপে ধরে চোখ বুজে এল তাঁর; (রাম) বুঝি প্রিয়াকে আলিঙ্গনের সুখই অনুভব করলেন, নেই শুধু স্তনস্পর্শ টুকু।

প্রেয়সীর আগাগোড়া সব ঘটনা শুনে তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন; লঙ্কার চারদিকের বিশাল সমুদ্রকেও সামান্য পরিখার মতো মনে হল তাঁর।

রামের লংকাভিযান

তিনি শত্রু বিনাশ করতে যাত্রা করলেন। অসংখ্য বানরসৈন্য দুর্গম পথে তাঁকে অনুসরণ করল; শুধু ভূতলে নয়, আকাশপথেও।

সমুদ্রের তীরে আসামাত্র বিভীষণ এসে তাঁর শরণ নিলেন। রাক্ষস-রাজলক্ষ্মীই তাঁকে সুমতি দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

রাক্ষস-রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁকে দেবেন—রামচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। নীতি-সমূহকে যথাসময়ে প্রয়োগ করলে তবেই সুফল পাওয়া যায়।

নোনা জলের সমুদ্রে বানরদের সাহায্যে তিনি এক সেতু নির্মাণ করালেন; দেখে মনে হল, নারায়ণকে শুতে দিয়ে শেষনাগ পাতাল ছেড়ে উঠে এসেছে যেন।

সেই পথে সাগর পার হয়ে তিনি লংকায় অবরোধ তৈরি করলেন, সোনালী রঙের বানরেরা (চারদিক) ঘিরে রয়েছে, যেন (স্বর্ণলংকার) দ্বিতীয় স্বর্ণ প্রাচীর।

যুদ্ধ

বানরে আর রাক্ষসে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। দিকে দিকে শুধু রামের অথবা রাবণের জয়ধ্বনির ঘোষণা গমগম করতে থাকল।

গাছের ঘায়ে লোহাতে-বাঁধা কাঠের বড় বড় গুঁড়ি ভেঙে গেল, পাথরে পাথরে লোহার মুগুর পিষে গেল, নখের আঁচড়ে শস্ত্রের আঘাত তুচ্ছ হয়ে গেল, আর বড় বড় পাথরের আঘাতে (জাঁকালো) হাতিও মারা পড়ল।

এদিকে রামের ছিন্নমুণ্ড দেখে সীতা জ্ঞান হারালেন; এটা (রাবণের) মায়া তা বুঝিয়ে ত্রি-জটা (রাক্ষসী) তাঁকে সুস্থ করল।

আমার স্বামী নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন এই ভেবে তিনি শোক ভুললেন ঠিকই; (কিন্তু) সত্যি তাঁর মৃত্যু জেনেও তিনি যে বেঁচে ছিলেন এই ভেবে তিনি লজ্জা পেলেন।

রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন গরুড় এসে খুলে দিল, মেঘনাদের হাতে তাঁদের এই কষ্ট সামান্য দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে থাকল।

তারপর

রাবণ শক্তিশেল হানল লক্ষ্মণের বুকে; তা রামকে আঘাত না করলেও, শোকের তীরে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ।

হনুমানের আনা মহৌষধিতে (বিশল্যকরণী) তিনি সুস্থ হলেন। (লক্ষ্মণ) শরবর্ষণ করে করে লঙ্কার রমণীকুলকে আবার কাঁদতে শেখালেন।

শরৎকাল মেঘের গর্জন বন্ধ করে, বর্ষার ইন্দ্রধনুকে বিলোপ করে, তিনি (লক্ষ্মণ) মেঘনাদের তর্জন-গর্জন এবং শক্তিশালী ধনুক—দুটিই থামিয়ে দিলেন।

সুগ্রীবের হাতে কুম্ভকর্ণের দশা তার বোনের মতোই হল; পাষাণভেদী অস্ত্রের ঘায়ে গা-বেয়ে লাল মনঃশিলা গড়িয়ে-পড়া পাহাড়ের মতো (রক্তাক্ত শরীর নিয়ে) সে রামের পথ আটকে দাঁড়াল।

আহা! তুমি ঘুমোতে ভালোবাসো, শুধু শুধু তোমার ভাই তোমাকে অসময়ে জাগিয়ে দিয়েছে—এই বলেই যেন রামের শরজাল তাকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল।

বানরদের মধ্যে অন্যান্য রাক্ষসেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল; তাদেরই রক্তস্রোতে যুদ্ধের ধুলোরাশির মতোই (তারা মিলিয়ে গেল)।

রাম ও রাবণ

তারপর—

আজ পৃথিবীতে হয় রাম থাকবে, নয় রাবণ থাকবে—এই বলে আবারও যুদ্ধ করার জন্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল।

ইন্দ্র দেখলেন, রাম পদাতিক হয়ে রয়েছে, আর লঙ্কেশ্বর রথারোহী; তিনি রামকে কপিলবর্ণের অশ্বমণ্ডিত (নিজের) রথখানি পাঠিয়ে দিলেন।

আকাশগঙ্গার তরঙ্গবাতাসে সেই রথের ধ্বজা কাঁপছিল; রামচন্দ্র দেবসারথির হাতে ভর দিয়ে সেই জয়শীল রথে আরোহণ করলেন।

মাতলি তাঁকে দেবরাজের দেওয়া দেহবর্ম পরিয়ে দিলেন, তার উপরে রাক্ষসদের অস্ত্রের আঘাত পদ্মপাপড়ির আঘাতের মতোই ব্যর্থ হল।

বহুদিন পরে পরস্পরের দেখা পেয়ে রাম ও রাবণ নিজের নিজের পরাক্রম প্রকাশের

সুযোগ পেয়েছেন। এতদিনে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ সার্থক হল।

রাবণ একা, আগের মতো (সঙ্গীসাথী) নেই ; তবু তার অনেক হাত, অনেক মাথা, অনেক পা (উরু)—মনে হচ্ছে তার গোটা মাতৃকুলই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(রাবণ) দিকপালগণকে জয় করেছে, নিজের মুণ্ডগুলি দিয়ে সে পরমেশ্বরকে (শিবকে) অর্চনা করেছিল, সে কৈলাসপর্বতকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছিল—এই রকম শত্রু পেয়ে রাম খুশিই হলেন।

ভীষণ রাগে রাবণ (রামের) দক্ষিণ বাহুকে তীরবিদ্ধ করলেন ; সীতার সঙ্গে মিলনের সূচনা জানিয়ে বাহুতে তখন স্পন্দন জেগেছিল।

রামের নিক্ষিপ্ত বাণও রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করে তীরবেগে মাটির নীচে চলে গেল—যেন (পাতালে) নাগকুলকে রাবণবধের সুসংবাদ দেবে।

কথার উত্তর তাঁরা কথায় দিলেন, অস্ত্রের জবাব দিলেন পাল্টা অস্ত্রাঘাতে, তর্কযুদ্ধের বাগ্মীদের মতো তাঁদের অন্যের উপরে জয়লাভের জেদ বেড়েই চলল।

দুজনেরই বিক্রম সমান। যুদ্ধরত সমশক্তিধর দুই মত্তমাতঙ্গের মাঝখানের বেদীর মতো, বিজয়লক্ষ্মীও দুজনের মধ্যে সমানভাবে থাকলেন (কোনো একজনের পক্ষে যেতে পারলেন না)।

আঘাত এবং প্রত্যাঘাতে খুশি হয়ে দেবতারা এবং অসুরেরা তাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলেন ; কিন্তু পরস্পরের প্রতি শরাঘাত তাকে (মস্তক স্পর্শ করতে) বাধা দিল।

অবশেষে রাক্ষস কৃতান্তের বিজয়লব্ধ 'কূটশাল্মলী' গদার মতো লোহার কাঁটাবেঁধানো শতঘ্নী-গদাটিকে শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

রথের কাছে আসার আগেই আধো-চাঁদের ফলা-দেওয়া বাণে রামচন্দ্রও তাকে কলাগাছের মতো সহজে কুচিকুচি করে ফেললেন, রাক্ষসদের সব আশাও ভেঙে চুরমার করে দিলেন।

অদ্বিতীয় ধনুর্ধর (রাম) প্রিয়াবিচ্ছেদের শোকশল্য উদ্ধারের অমোঘ ওষুধ ব্রহ্মাস্ত্রটি তাকে (রাবণকে) লক্ষ্য করে ধনুকে যোজনা করলেন।

সেই অস্ত্র শতধা খণ্ডিত হয়ে জ্বলজ্বলে মুখ নিয়ে আকাশে শোভা পেল ; মনে হল তা যেন বিশাল অনন্তনাগের ভয়ংকর ফণামণ্ডলযুক্ত শরীর।

তিনি মন্ত্রপূত সেই অস্ত্রে অর্ধনিমেষের মধ্যেই রাবণের মুণ্ডমালা মাটিতে লুটিয়ে দিলেন, আঘাতের যন্ত্রণাটুকুও বুঝতে (সময়) দিলেন না।

জলের চঞ্চল তরঙ্গে বালসূর্যের প্রতিবিম্বের মতো রাক্ষসের শরীর থেকে পর পর ছিন্ন মুণ্ডের (তরঙ্গ) দেখা গেল।

তার ছিন্ন মুণ্ডগুলি মাটিতে লুটিয়ে আছে দেখেও দেবতাদের মনে ঠিক যেন বিশ্বাস আসছিল না, ভয় হচ্ছিল আবার যদি সেগুলি তার শরীরে জুড়ে যায়।

আসন্ন অভিষেকে যা রত্নে শোভিত হবে রাবণারি রামের সেই মস্তকে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করলেন ; ভ্রমরপঙক্তি দিগগজদের মদধারাস্রাবী গণ্ডমণ্ডল ত্যাগ করে এই সুগন্ধি পুষ্পরাশির অনুসরণ করল।

দেবকার্য সম্পন্ন হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র ধনুকে শরাসন গুটিয়ে নিলেন—ইন্দ্রের সারথি মাতলি তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এক হাজার ঘোড়ার রথটি নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেন, রথের দণ্ড এবং পতাকায় তখনও রাবণের নামাঙ্কিত শরজাল বিঁধে রয়েছে।

রঘুপতি অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে গ্রহণ করলেন ; প্রিয় বন্ধু বিভীষণের হাতে শত্রুর রাজ্যশ্রীকে অর্পণ করলেন, বাহুবলে জয় করে নেওয়া রত্নবিমানে (পুষ্পকরথে) আরোহণ করে আপন নগরীর দিকে যাত্রা করলেন, সঙ্গে রইলেন সূর্যপুত্র (সুগ্রীব), বিভীষণ এবং লক্ষ্মণ।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'রাবণবধ' নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ সর্গ

আকাশপথে রাম ও সীতা

তারপর গুণজ্ঞ সেই 'রাম'-নামে হরি শব্দগুণাত্মক আকাশে যাত্রাকালে বিমানে আরোহণ করে সমুদ্র দেখে জায়াকে একান্তে বলতে লাগলেন—

হে বৈদেহী! শরৎকালে ছায়াপথে দ্বিধা-বিভক্ত রমণীর তারকা-খচিত সুনির্মল আকাশের মতো আমার সেতুতে দ্বিধা-বিভক্ত মলয়পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ফেনিল জলরাশি দেখ।

যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক গুরুর যজ্ঞীয় অশ্ব কপিল রসাতলে রাখলে তার জন্যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একে (এই সমুদ্রকে) আরও বর্ধিত করেছেন।

সূর্যের কিরণমালা এর থেকেই (জল আকর্ষণ করে) গর্ভধারণ করে, এখানে রত্নরাজি বর্ধিত হয়, এই সাগরই বাড়বানল বহন করে, এই সমুদ্র থেকেই সেই আনন্দদায়ক জ্যোতি চন্দ্রের জন্ম।

মহিমায় সর্বব্যাপী বিষ্ণুর মতো অক্ষোভ্যাদি নানা অবস্থাপন্ন এবং বিশালতায় দশদিক জুড়ে অবস্থিত এই মহাসমুদ্রের রূপও প্রকারগত বা পরিমাণগতভাবে অবধারণ করা যায় না।

বিষ্ণু সমস্ত লোক সংহার করে নিজের নাভিজাত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আদি বিধাতা দ্বারা স্তুত হয়ে কল্পান্তকালোচিত যোগনিদ্রায় এই সমুদ্রেই শয়ন করেন।

শত্রুভয়ে ভীত হয়ে রাজারা যেমন মধ্যবর্তী ধর্মপরায়ণ কোনো রাজাকে আশ্রয় করেন, তেমনি পক্ষচ্ছেদক ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়ে শত শত পর্বতশরণ্য এই সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আদিপুরুষ যখন (বরাহরূপে) রসাতল থেকে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেছিলেন তখন এই সমুদ্রের প্রলয়প্রবৃদ্ধ স্বচ্ছ জলরাশি ক্ষণকালের জন্যে তাঁর (বসুন্ধরার) অবগুণ্ঠন হয়েছিল।

এই সমুদ্রের প্রিয়াসম্ভোগ অনন্যসাধারণ। তরঙ্গরূপ অধরপ্রদানে দক্ষ এই সমুদ্র মুখার্পণে স্বভাবপ্রগল্‌ভা তটিনীদের অধরসুধা পান করায় এবং নিজে পান করে।

ঐ দেখ তিমিরা হাঁ-করে নদীমোহনার প্রাণী-সমৃদ্ধ জল মুখে নিয়ে মুখ বন্ধ করে মাথার ছিদ্র দিয়ে সেই জলপ্রবাহকে আবার উঁচুতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দেখ, হাতির মতো জলজন্তুরা হঠাৎ মাথা তোলায় সমুদ্রের ফেনরাশি দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। এই ফেনরাশি এদের গণ্ডলগ্ন হয়ে ক্ষণকালের জন্যে কর্ণলগ্ন চামরের সাদৃশ্য লাভ করছে।

সাপেরা সৈকতবায়ু সেবনের জন্যে ছুটে যাচ্ছে। এতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কোনো তফাৎ বোঝাই যাচ্ছে না। কেবল ফণাস্থিত মণিগুলি সূর্য-কিরণে ঝলমল করে ওঠাতেই তাদের সাপ বলে চেনা যাচ্ছে।

শংখগুলি তরঙ্গের বেগে হঠাৎ তোমার অধর-তুল্য প্রবালে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তাদের মুখে প্রবালের অংকুর বিঁধে যাচ্ছে, তারা অতি কষ্টে বেরিয়ে আসছে।

মেঘেরা জলপানে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হওয়ায় নিশ্চিত মনে হচ্ছে, মন্দারপর্বত দিয়ে আবার সমুদ্র মন্থন করা হচ্ছে।

লোহার চাকার মতো ঐ সমুদ্র।

তমাল ও তালবনে তার নীলবর্ণ বেলাভূমি সূক্ষ্মরেখার মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোহার পরিধি-রেখায় যেন মালিন্য লেগেছে (মরচে ধরেছে)।

হে আয়তনয়না! তটবায়ু কেয়াফুলের রেণুতে তোমার মুখের প্রসাধন সম্পাদন করছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে তোমার বিম্বাধরে সতৃষ্ণ আমি প্রসাধনের সময়টুকু দিতেও অক্ষম।

বিমানবেগে আমরা সমুদ্রতীরে মুহূর্তে উপনীত হলাম, দেখ তীরে ঝিনুকের মুখের জোড় খুলে পড়ছে এবং তা থেকে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ছে, আর সুপারিগাছের সারি ফল-ভারে নুয়ে পড়ছে।

হে করভোরু! হে মৃগাক্ষী! একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমরা সমুদ্র থেকে যত দূরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সকানন ভূমিও যেন ততই সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। (এর আগে যেন তা সমুদ্রের অঙ্গেই লীন হয়ে ছিল)।

দেখ এই বিমান আমার অভিলাষ অনুসরণ করে কখনও দেবতাদের পথে, কখনও মেঘমালার পথে, কখনও বা পাখিদের পথে সঞ্চরণ করছে।

সুরনদীর তরঙ্গস্পর্শে শীতল ঐরাবত-মদগন্ধি আকাশবায়ু তোমার মুখ থেকে মধ্যাহ্ন-জনিত ঘর্মজল দূর করছে।

হে কোপনা! তুমি কৌতূহলবশতঃ (পুষ্পকরথের) জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেঘ স্পর্শ করছ, আর মেঘও যেন বিদ্যুৎ-বলয় তৈরি করে তোমার হাতে দ্বিতীয় অলংকার হিসেবে তা পরিয়ে দিচ্ছে।

জনস্থানের স্মৃতি ও পঞ্চবটী

ঐ দেখ, চীরপরিহিত তাপসেরা জনস্থানকে নির্বিঘ্ন জেনে চিরপরিত্যক্ত আশ্রমে আবার নতুন করে পর্ণকুটির বানিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছে।

এই সেই বনস্থলী যেখানে তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে মাটিতে পড়ে-থাকা তোমারই একটি নূপুর দেখতে পেয়েছিলাম, তোমার চরণকমল থেকে স্খলিত হবার দুঃখেই যেন তা মৌন অবলম্বন করেছিল।

হে ভীরু! রাক্ষস (রাবণ) তোমাকে যে-পথ দিয়ে হরণ করেছিল, তা বলে দিতে না পারলেও লতারাজি কৃপা করে অবনত পল্লবযুক্ত শাখা সঞ্চালনে সে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।

মৃগীরাও দর্ভাংকুরে উদাসীন হয়ে চোখের পাতা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তোমার গতিপথবিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল।

(ঐ দেখ) মাল্যবান পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ সম্মুখে আবির্ভূত হচ্ছে। যেখানে মেঘ নবজলধারা এবং আমি তোমার বিচ্ছেদজনিত অশ্রুধারা একই সঙ্গে বর্ষণ করেছিলাম।

যেখানে বৃষ্টিধারা-তাড়িত পল্লবের গন্ধ, অর্ধপ্রস্ফুটিত কদম্ব এবং ময়ূরদের মধুর কেকাধ্বনি তোমার বিরহে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল।

হে ভীরু! যেখানে পূর্বানুভূত তোমার কম্পন এবং তার পরবর্তী আলিঙ্গন স্মরণ করে গুহায় প্রতিধ্বনিত মেঘগর্জনকে আমি অতি কষ্টে সহ্য করেছি!

যেখানে প্রস্ফুটিত নব কদলী-ফুল ধারাসিক্ত ভূমির (ধূমল) বাষ্পের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় পরিণয়কালে যজ্ঞধূমে আরক্ত তোমার নয়নের কান্তি অনুকরণ করে আমাকে পীড়িত করত।

দূর থেকে অবতীর্ণ আমার (অবতরণের) ক্লেশ লাঘব করতেই যেন উপান্ত দেশে বেতস বনে ব্যাপ্ত ঈষদ্দৃশ্যমান চঞ্চল সারসে সমাকীর্ণ পম্পা-সরোবরের জল আমার দৃষ্টিকে পান করছে।

তোমার কাছ থেকে দূরবর্তী হয়ে এখানে মিলিত চক্রবাকমিথুনকে আমি সতৃষ্ণ নয়নে দেখতাম, ওরা দুজনে দুজনকে পদ্মকেশর উপহার দিত।

স্তনের মতো মনোহর স্তবকের ভারে অবনতা নদীতটের ঐ তন্বী অশোকলতাকে তোমাকেই পেয়েছি মনে করে সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করতে চাইলে লক্ষ্মণ আমাকে নিষেধ করত।

ঐ গোদাবরীর সারসপঙক্তি বিমানের মধ্যে লম্বিত সুবর্ণকিঙ্কিনীর ধ্বনি শুনে (সারসের ক্রেংকার মনে ভেবেই) আকাশে উড়ে যেন তোমাকেই প্রত্যুদগমন করছে।

তোমার কটিদেশ কোমল হলেও ঘটে করে জল দিয়ে তুমি যার (যে বনের) আমের চারাগুলি বাড়িয়ে তুলেছিলে দীর্ঘকাল পরে দেখছি বলে সেই পঞ্চবটী—আমাকে আনন্দিত করে তুলছে। এ বনের কৃষ্ণসার মৃগগুলি যেন উন্মুখ হয়ে তোমাকেই দেখছে।

মনে পড়ে, এখানে মৃগয়া থেকে ফিরে গোদাবরী কূলে তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুতে ক্লান্তি দূর করে নির্জন বেতসগৃহে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছি।

পঞ্চবটীর তপস্বীরা

যিনি ভ্রূভঙ্গে (রাজা) নহুষকে ইন্দ্রপদ থেকে বিচ্যুত করেছিলেন, যাঁর উদয়ে আবিল জল নির্মল হয়ে যায় সেই (অগস্ত্য) মুনির মর্ত্যলোকস্থিত আবাস ঐ দেখা যাচ্ছে।

অনিন্দ্যকীর্তি ঐ মুনির বিমান-পথ-স্পর্শী ত্রিবিধ অগ্নির ঘৃতবাসিত ধূমশিখা আঘ্রাণ করে আমার অন্তঃকরণ রজোবিমুক্ত হয়ে লঘুভার হচ্ছে।

মানিনি! ঐ দেখ শাতকর্ণিমুনির 'পঞ্চাপসর' নামে কেলিসরোবর। চারদিকে উপবন বেষ্টিত হওয়ায় দূর থেকে তা মেঘের অন্তরালে ঈষৎ দৃশ্যমান চন্দ্রবিম্বের মতো দেখাচ্ছে।

পুরাকালে এই মুনি মৃগদলের সঙ্গে বিচরণ করে এবং কুশাঙ্কুরমাত্র আহার করে তপস্যা করেন। তাঁর সেই তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ পাঁচটি অপ্সরার যৌবনরূপ-মায়াপাশে এঁকে আবদ্ধ করেন।

সম্প্রতি জলের অন্তর্গত প্রাসাদে অধিষ্ঠিত সেই মুনির সঙ্গীত সহ মৃদঙ্গধ্বনি আকাশগামী হয়ে কিছুক্ষণ পুষ্পকরথের চূড়াগৃহকে মুখরিত করছে।

ঐ দেখ, আর একজন তপস্বী ইন্ধনযুক্ত চতুরাগ্নির মধ্যে অবস্থান করে সূর্যের দিকে কপাল রেখে তপস্যা করছেন। এঁর নাম সুতীক্ষ্ন হলেও ইনি শান্তচরিত্র।

ইনি তপস্যায় দেবরাজকে শঙ্কিত করে তুলেছিলেন। (তাঁরই পাঠানো) অপ্সরাদের সাহায্যে তাকানো বা ছলক্রমে একটু মেখলা দেখানো–এ ধরনের বিলাস চেষ্টা এঁর মনে কোনো বিকার সৃষ্টি করতে পারে নি।

ঊর্ধ্ববাহু এই মুনি অক্ষমালারূপে বলয়যুক্ত এবং মৃগদেহ কণ্ডূয়ন ও কুশাচ্ছাদনে অভ্যস্ত দক্ষিণবাহুটি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এই দিকেই অনুকূলভাবে মেলে ধরেছেন।

মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন বলে এই ঋষি একটু মাথা কাঁপিয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন এবং বিমানগতিতে ক্ষণকাল যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল সেই বাধা থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত করে আবার তা সূর্যের দিকে নিবন্ধ করলেন।

যিনি দীর্ঘকাল সমিধ নিক্ষেপ করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করে নিজের দেহকেও আহুতি প্রদান করেছিলেন, ঐ সেই শরভঙ্গ নামে সাগ্নিক ঋষির পবিত্র ও শরণ্য তপোবন।

এখন ঐ ঋষির অতিথিসংকারবৃত্তি তাঁর সুপুত্রতুল্য ঐ তরুরাজিতে বর্তমান ; তারা ছায়াদানে পথশ্রম নাশ করে এবং প্রচুর ফল দান করে।

চিত্রকূট

হে বন্ধুরগাত্রী ! যার গুহারূপ মুখ নির্ঝরধারার ধ্বনি উদ্গিরণ করছে এবং যার (শিখররূপ) শৃঙ্গকোটিতে মেঘরূপ বপ্রক্রীড়ার পঙ্ক সংলগ্ন হয়ে আছে, উদ্ধত বৃষভের মতো সেই চিত্রকূট পর্বত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

পর্বতের উপকণ্ঠে নির্মল ও নিশ্চল প্রবাহমণ্ডিত মন্দাকিনী মধ্যবর্তী অবকাশের দূরত্বের জন্যে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়ে পৃথিবীর কণ্ঠে মুক্তাহারের মতো শোভা পাচ্ছে।

চিত্রকূটের কাছে ঐ সুন্দর তমালতরু। এর সুগন্ধি পল্লব নিয়ে আমি তোমার যবাঙ্কুরের মতো ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে শোভমান কর্ণভূষণ রচনা করেছিলাম।

ঐ (দেখ) অত্রিমুনির প্রভূত প্রভাবমণ্ডিত তপোবন। এখানকার জন্তুরা দণ্ডভয়রহিত হয়েও শান্তভাব ধারণ করেছে এবং তরুরা পুষ্পোদ্গমরূপ কারণ ছাড়াই ফলপ্রসব করছে।

সপ্তর্ষিরা নিজের হাতে যাঁর স্বর্ণপদ্ম চয়ন করেন, যিনি শিবের শিরোমালাস্বরূপ, শোনা যায়, সেই মন্দাকিনীকে অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া মুনিদের স্নানের জন্যে এইখানেই প্রবাহিত করেন।

বীরাসনে উপবেশন করে ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, তাঁদের অধ্যুষিত বেদীর তরুরাজিও যেন বায়ুর অভাবে স্থির হয়ে যোগস্থিত মুনিদের মতোই শোভা পাচ্ছে।

তুমি আগে যার কাছে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে) প্রার্থনা করেছিলে 'শ্যাম' নামে খ্যাত ঐ গাছ ফলবান হওয়ায় পদ্মরাগের সঙ্গে মিলিত মরকতমণির মতো শোভা পাচ্ছে।

গঙ্গাযমুনাসঙ্গম

হে সুন্দরী ! দেখ, গঙ্গাপ্রবাহ যমুনাতরঙ্গে সঙ্গত হয়ে–কোথাও উজ্জ্বল ইন্দ্রনীল মণিতে গাঁথা মুক্তামালার মতো, কোথাও বা নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালার মতো, কোথাও নীলহংসে-মেশানো মানসসরোবর-প্রিয় রাজহংসের সারির মতো, অন্য কোনোখানে

ছায়ামিশ্রিত অন্ধকারে খণ্ড খণ্ড করা চাঁদের কিরণের মতো, কোথাও বা ফাঁক দিয়ে (নীল-) আকাশ-উঁকি-দেওয়া শরৎকালের সাদা মেঘের মতো, কোথাও বা কালো কালো সাপে জড়ানো শিবের ভস্মে-ঢাকা দেহের মতো শোভা পাচ্ছে।

যাঁরা সমুদ্রপত্নী গঙ্গা ও যমুনার এই সঙ্গমে অবগাহন করে দেহত্যাগ করেন সেই পুণ্যাত্মাদের তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই পুনর্জন্ম বন্ধ হয়।

ঐ সেই নিষাদরাজ গুহকের আশ্রম যেখানে আমি মাথার মণি ত্যাগ করে জটাধারণ করলে সারথি সুমন্ত্র 'হে কৈকেয়ী! তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ হল!' বলে রোদন করেছিলেন।

সরযূতীর

যাঁর স্বর্ণপদ্মের রেণু যক্ষরমণীদের স্তনে সংলগ্ন হয়ে থাকে, অব্যক্ত যেমন মহত্তত্ত্বের কারণ, তেমনি ঋষিরা মানসসরোবরকে যাঁর উৎস বলে থাকেন, যাঁর তীরে যজ্ঞের যূপাবলী প্রোথিত রয়েছে, যাঁর জলপ্রবাহ রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা অশ্বমেধ যজ্ঞের পর অবভৃথ স্নানের জন্যে অবতরণ করে যাঁর জল আরও পবিত্র করে তুলেছেন, অযোধ্যাবাসীরা যাঁর সিকতাময় অঙ্গে অবস্থান করে পরম সুখভোগ করে, যাঁর প্রচুর জলপানে সংবর্ধিত হচ্ছেন এবং আমার মতে যিনি সকলেরই ধাত্রীরূপে পরিগণিত, ঐ দেখ, আমার মায়ের মতো সেই সরযূ, মাননীয় সেই নৃপতিবিরহিত হয়ে (এতদিন পরে) দূর দেশ থেকে ফিরেছি বলে আমাকে যেন বায়ু-শীতল-করা তরঙ্গরূপবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছেন।

রক্তিম সন্ধ্যার মতো তামাটে-রঙের ধুলো মাটি থেকে উঠছে, দেখে মনে হচ্ছে হনুমানের মুখে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে ভরত সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের প্রত্যুদগমন করতে আসছে।

আমি যুদ্ধে খর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করে ফিরে এলে লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছিল, প্রতিজ্ঞা পালন করে ফিরে এলে আমার হাতে তেমনি সচ্চরিত্র ভরত সংরক্ষিত ও অনুচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যর্পণ করবে।

ঐ দেখ ছিন্নবাস পরিহিত ভরত পিছনে সৈন্যদের রেখে কুলগুরুকে সামনে নিয়ে বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে অর্ঘ্য-হাতে আমার কাছে আসছে।

যুবক হয়েও সে পিতৃদত্ত অংকগত রাজলক্ষ্মীকে আমারই অপেক্ষায় উপভোগ না করে এত বছর ধরে তার (রাজলক্ষ্মীর) সঙ্গে যেন অতি কঠোর অসিধার-ব্রত পালন করছে।

ভরতের অভ্যর্থনা

রাম এসব কথা বলতে থাকলে বিমানটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেরণায় তাঁর ইচ্ছা জানতে পেরে আকাশ থেকে নেমে এল। ভরতের অনুগামী প্রজারা সবিস্ময়ে তা নিরীক্ষণ করছিল।

রাম সেবানিপুণ সুগ্রীবের হাত ধরে মাটিতে-রাখা স্ফটিকরচিত সোপানপথে বিমান থেকে নামলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিভীষণ সেই সোপানপথ দেখিয়ে দিলেন।

ভক্তিনম্র রাম প্রথমেই ইক্ষ্বাকুকুলগুরুকে প্রণাম করলেন। পরে অর্ঘ্যগ্রহণ করে

আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে ভাই ভরতকে আলিঙ্গন করলেন, তিনি তাঁর প্রতি ভক্তিভাববশতঃ রাজ্যাভিষেকে পরাঙ্মুখ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তাঁকে প্রণাম জানালেন। (সংস্কারের অভাবে) শ্মশ্রুবৃদ্ধিতে তাঁদের মুখ বিকৃত হয়েছিল। এ অবস্থায় ঝুরি-নামা জটাধারী বটগাছের মতো দেখাচ্ছিল তাঁদের। রাম অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে কুশলপ্রশ্ন ও মধুর সম্ভাষণে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ভল্লুক ও বানরদের অধিপতি ইনি (সুগ্রীব) আমার দুঃসময়ের বন্ধু। আর ইনি সংগ্রামে অগ্রগামী পুলস্ত্যনন্দন (বিভীষণ)—রাম এইভাবে সাদরে তাঁদের পরিচয় দিলে ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে এসে এঁদের দুজনকে বন্দনা করলেন।

তারপর তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করলে তাঁকে উঠিয়ে মেঘনাদের প্রহারজনিত ব্রণে কর্কশ তাঁর বক্ষটিকে নিজের বক্ষে যেন পীড়া দিয়েই নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

বানর সেনাপতিরা রামের আদেশে মানুষের দেহ ধারণ করে হাতির পিঠে উঠল। অজস্রধারায় মদজলবর্ষী ঐ গজরাজদের পিঠে উঠে তারা পাহাড়ে চড়ার সুখ অনুভব করতে লাগল।

রাক্ষসরাজ বিভীষণও রামের আদেশে অনুচরদের নিয়ে রথে উঠলেন। তাঁর রথটি বিশেষ মায়ায় রচিত হলেও রচনাচাতুর্যে রামনির্দিষ্ট রথের সাদৃশ্যলাভে সমর্থ হল না।

তারপর রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পতাকাশোভিত ইচ্ছা-গতি রথে আবার আরোহণ করলেন। মনে হল যেন বুধ ও বৃহস্পতির সঙ্গে বিশেষ যোগে দর্শনীয় চন্দ্রমা চঞ্চল বিদ্যুতে মণ্ডিত সান্ধ্য মেঘমালায় আরোহণ করল।

প্রলয়কালে ভগবান (হরি) যেমন পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, শরৎকাল যেমন গাঢ় মেঘাবরণ থেকে চাঁদের কিরণকে উদ্ধার করে, তেমনি রাম রাবণরূপ সংকট থেকে যাঁকে উদ্ধার করেন ভরত সেই ধৈর্যবতী সীতাকে প্রণাম করলেন।

যিনি রাবণের প্রণাম প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সেই সীতার বন্দনীয় চরণযুগল এবং সদাশয় ভরতের জ্যেষ্ঠের অনুবর্তন-বশতঃ জটামণ্ডিত মস্তক একত্র মিলিত হয়ে পরস্পরের পবিত্রতার পোষক হল।

তারপর আর্য রামচন্দ্র প্রজাদের আগে রেখে পুষ্পকরথের গতি শিথিল করে আধক্রোশ পথ গিয়ে অযোধ্যার উপবনে শত্রুঘ্নরচিত পটমণ্ডপে অবস্থান করতে লাগলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্য 'দণ্ডকপ্রত্যাগমন' নামক ত্রয়োদশ সর্গ ॥

চতুর্দশ সর্গ

রাম-লক্ষ্মণ আবার অযোধ্যাতে

সেখানে রাম-লক্ষ্মণ দেখলেন বড় গাছটি ভেঙে পড়লে তাকে জড়িয়ে থাকা লতার মতো স্বামীর মৃত্যুতে দুই জননীর (কৌশল্যা এবং সুমিত্রা) বড় শোচনীয় দশা হয়েছে।

যাঁরা শত্রুনিধন করেছেন এবং পরাক্রমের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, সেই দুজন

পর পর দুজনকে প্রণাম করলেন। মায়েরা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন, চোখে ভালো দেখতে পেলেন না, ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে সুখস্পর্শে বুঝতে পারলেন কোন্‌টা কে।

তাঁদের শান্ত আনন্দাশ্রু উষ্ণ শোকাশ্রুকে ধুয়ে দিল, হিমালয়ের নির্ঝর যেমন গঙ্গা-সরযূর গ্রীষ্মতপ্ত জলকে ভাসিয়ে দেয় তেমনি।

তাঁরা দুই ছেলের গায়ের রাক্ষসযুদ্ধের ক্ষত চিহ্নগুলিতে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন, মনে হল সেগুলি বুঝি এখনো রক্তে ভেজা, ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গনাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত 'বীরপ্রসবিনী' নামেও তাঁদের আর কোনো আগ্রহ নেই।

'আমি সীতা, বড় অলক্ষুণে, স্বামীকে কত কষ্ট দিয়েছি' এই বলতে বলতে বধূ স্বর্গত শ্বশুরের দুই মহিষীকে সমান ভক্তি সহকারে প্রণাম করলেন।

'বাছা ওঠ! তোমার পবিত্র চরিত্রের জোরেই ও (রামচন্দ্র) ভাইয়ের সঙ্গে থেকে এই বিরাট কষ্ট জয় করতে পেরেছে।' তাঁরা আদরিণী বধূকে এইভাবে প্রিয় অথচ সত্য কথা বললেন।

তারপর রঘুকুলের ধ্বজাস্বরূপ রামচন্দ্রের অভিষেক শুরু হল প্রথমে জননীর আনন্দাশ্রু বর্ষণে, বৃদ্ধ অমাত্যেরা অনুষ্ঠান শেষ করলেন তীর্থস্থান থেকে আনা সোনার কলসের জলসিঞ্চনে।

নদীতে সমুদ্রে সরোবরে গিয়ে জল এনে দিয়েছে রাক্ষস এবং বানরবৃন্দ; সেই জলের রাশি জয়দীপ্ত তাঁর মাথায় ঝরতে থাকল—মনে হল বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় বুঝি মেঘের বর্ষণ শুরু হয়েছে।

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেও তাঁকে বড় সুন্দর মানিয়েছিল, আজ রাজরাজেন্দ্রর সাজসজ্জায় সেই শোভা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

রামচন্দ্র নিজবংশের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন—সঙ্গে ছিল কুলক্রমাগত অমাত্যের দল, অনুগত রাক্ষস আর বানরেরা, ছিল সেনাদল, ছিল তূর্যধ্বনিতে আনন্দে মাতোয়ারা পুরবাসীরা; রাজধানী উচ্চ তোরণে সাজানো, প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে লাজবর্ষণ করছিল (পুরনারীরা)।

রামচন্দ্র রথে বসে আছেন—লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে চামর দোলাচ্ছেন, ভরত ধরে রয়েছেন রাজচ্ছত্রটি—মনে হল উপায়চতুষ্টয়ের সমষ্টিই বুঝি (অযোধ্যাতে প্রবেশ করছে)।

প্রাসাদের কৃষ্ণাগুরুর ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল বনবাস থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্র নিজে হাতে সেই (অযোধ্যা) নগরীর (বিরহের) বেণীটি খুলে দিয়েছেন।

শ্বাশুড়ীরা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন, কর্ণীরথে করে চলেছেন রঘুবীর-পত্নী, প্রাসাদের গবাক্ষে গবাক্ষে দেখা গেল অযোধ্যার রমণীকুল কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন।

অনসূয়ার এঁকে দেওয়া অক্ষয় অঙ্গরাগে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী সীতাকে দেখে মনে হল তাঁর স্বামী বুঝি অযোধ্যাকে দেখাচ্ছেন তিনি বিশুদ্ধা, তিনি যেন আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

বন্ধুবৎসল রামচন্দ্র বন্ধুজনদের জন্যে বিশ্রামগৃহ এবং সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সজল নয়নে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলেন—পিতা নেই, আছে শুধু তাঁর একখানি প্রতিকৃতি, আর পুজার চিহ্ন (ফুলমালা)।

সেখানে তিনি ভরতজননীর লজ্জা দূর করে দিলেন ; করজোড়ে বললেন—'মা, আমাদের পিতৃদেব যে সত্যভ্রষ্ট হন নি এবং স্বর্গে গমন করেছেন, ভেবে দেখ সে তোমারই সুকৃতি'।

ইচ্ছা করা মাত্রই সব কিছু হাতে পাওয়ার বিদ্যা জানা ছিল ওদের ; তবুও রামচন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্যদের নানাভাবে সংগৃহীত বস্তুতে এমনই পরিচর্যা করলেন যে তারা মনে মনে খুবই অবাক হয়ে গেল।

তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যাঁরা এসেছিলেন সেই দিব্যমুনিদের তিনি অভ্যর্থনা করলেন, তাঁদের মুখে শুনলেন নিহত শত্রু দশাননের জন্ম থেকে শুরু করে নানা কীর্তিকাহিনী ; এতে তাঁর বীরত্বের গৌরব সূচিত হল।

তপোধনেরা চলে যাবার পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল, সীতা স্বহস্তে রাক্ষসরাজ এবং বানরাধিপতিদের বহু সেবাযত্ন করেছেন ; এখন রামচন্দ্র তাঁদের বিদায় জানালেন।

মনে মনে স্মরণ করামাত্রই যে বিমানটি এসে উপস্থিত হয়, রাক্ষস-রাবণের জীবনের সঙ্গে যাকে তিনি জয় করে নিয়েছেন, স্বর্গের পুষ্প-আভরণ স্বরূপ সেই পুষ্পক রথটিকে রাম আবারও কৈলাসপতি কুবেরকে বহন করার জন্যে অনুমতি দিলেন।

এইভাবে পিতার আদেশ মেনে বনবাসদুঃখকে অতিক্রম করে রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ধর্ম, অর্থ এবং কামে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল সমান ; তিন ভাইয়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারও ছিল ঠিক একরকম।

দেবসেনাপতি (কার্তিক) যেমন ছয় মুখে স্তন্য পান করে কৃত্তিকাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেন, তেমনি সব মায়ের প্রতিই মাতৃবৎসল রামচন্দ্র সমান ভক্তি প্রদর্শন করতেন।

তাঁর নির্লোভ ব্যবস্থায় রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি হল ; তিনি সমস্ত বিঘ্নভয় দূর করে দিলেন, রাজ্যে সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হল ; তিনি লোকশিক্ষা দান করলেন, যেন রাজ্যসুদ্ধ লোকের তিনি পিতা, তিনিই পুত্ররূপে সবার সব শোক অপনয়ন করলেন।

তিনি সময়মতো রাজকার্য দেখেশুনে বিদেহ-রাজনন্দিনীর সঙ্গ উপভোগ করেন ; লক্ষ্মীদেবী নিজেই যেন তাঁকে পাবার আগ্রহে সীতার সুন্দর শরীরটিকে আশ্রয় করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

তাঁরা (রাম-সীতা) বাসনামতো ভোগ্যবস্তু সবই পেয়েছিলেন ; চিত্রশালায় এসে (ছবি দেখে) দণ্ডকারণ্যে পাওয়া দুঃখকেও আজ চিন্তা করতে গিয়ে সুখের বলেই মনে হল।

ধীরে ধীরে সীতার চোখের দৃষ্টি আরও স্নিগ্ধ হয়ে এল, মুখখানি শরযষ্টির মতো ম্লান ; কথায় বলতে হল না, তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে বুঝে স্বামী আনন্দিত হলেন।

তাঁর শরীরটি ক্ষীণ, স্তনাগ্রে অন্য বর্ণ, অঙ্কশায়িনী লজ্জাবতী স্ত্রীর কাছে স্বামী গোপনে তাঁর মনের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন।

সীতা ভাগীরথীনদীর তীরে কুশঘাসে ছাওয়া তপোবনগুলিতে আর-একবার যেতে চাইলেন, সেখানে হিংস্র প্রাণীরা নীবার-ধানের মুঠো চিবোয় আর বৈখানস-কন্যারা হাত ধরাধরি করে বেড়ায়।

রঘুবীর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইচ্ছাপূরণ হবে। তারপর আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ অযোধ্যাকে দেখার জন্যে একটি অনুচরকে নিয়ে আকাশছোঁয়া প্রাসাদে উঠলেন।

রাজপথ দোকানপাটে সরগরম, সরযূনদীতে নৌকাবিহার করছে লোকে, বহু বিলাসী মানুষ নগরের উপকণ্ঠের উপবনে উৎসবরত—দেখেশুনে তাঁর ভারি ভালো লাগল।

শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, সচ্চরিত্র, সর্পরাজের মতো দীর্ঘবাহু-সমন্বিত মহাশত্রুজয়ী রাম ভদ্র নামে এক অনুচরকে ডেকে লোকে কী বলছে না বলছে তা জিগ্যেস করলেন।

বারবার জিগ্যেস করাতে সে বলল—'মহারাজ, রাক্ষস-ভবনে বাস করার পরেও আপনি রাণীকে গ্রহণ করেছেন—এই একটি বিষয় বাদে পুরবাসীরা আপনার অন্য সমস্ত কাজকর্মকেই প্রশংসা করছে।'

স্ত্রীর বিষয়ে অপযশমূলক এই ঘোর নিন্দার আঘাতে জানকী-বল্লভের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল, তপ্ত লোহায় যেন লোহার হাতুড়ির ঘা পড়ল।

নিজের এই নিন্দাবাদকে অগ্রাহ্য করব? না নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করব?—দুই মতের একটিও গ্রহণ করতে না পেরে তিনি মনে মনে চঞ্চল দোলার মতো অস্থির হয়ে পড়লেন।

সীতা পরিত্যাগ

এই অপবাদ কিছুতেই বন্ধ হবে না এ কথা বুঝে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেই দোষস্খালন করতে চাইলেন। কারণ, যশস্বী মানুষের কাছে ভোগ্যবস্তুর কথা দূরে থাক, নিজের শরীরের চেয়েও যশই বেশী কাম্য।

রাম ভগ্নহৃদয়ে অনুজদের ডেকে আনলেন, তাঁর এই বিকার দেখে তাঁরাও নিরানন্দ—তিনি তাঁদের নিজের নিন্দার কথা জানালেন, তারপর বললেন—

দেখ সূর্যসম্ভূত সদাচারে পবিত্র রাজর্ষিবংশেও আমার জন্যে কি রকম কলঙ্ক দেখা দিল—জলসিক্ত বাতাসে যেমন স্বচ্ছ দর্পণেও মালিন্য দেখা যায় তেমনি।

হাতি যেমন তার বন্ধনস্তম্ভকে সহ্য করতে পারে না, আমিও পুরবাসীদের মধ্যে ক্রমশঃ জলের ঢেউয়ে তৈলবিন্দুর মতো ছড়িয়ে-পড়া এই নিন্দাকে মেনে নিতে পারছি না।

একদিন যেমন পিতার আদেশে সসাগরা পৃথিবীকে ত্যাগ করেছিলাম, আজ তেমনি এই অপযশ দূর করার জন্যে জানকীকে আমি ত্যাগ করব; তাঁর প্রসবসময় আসন্ন, তবুও আমি আর অপেক্ষা করব না।

আমি জানি তার কোনো দোষ নেই কিন্তু আমার চোখে লোকনিন্দার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে; নিষ্কলঙ্ক চাঁদে পৃথিবীর ছায়াকেই মানুষ তার মালিন্য বলে আরোপ করে।

এতে রাক্ষসবধের প্রয়াস ব্যর্থ হয়? না, তাও নয়। সে তো শত্রুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কেউ পদাঘাত করলে ক্রুদ্ধ সর্প কি তার রক্তপান করার জন্যে তাকে দংশন করে?

তাই তোমরা যদি চাও যে আমি এই নিন্দার কাঁটা নির্মূল করে প্রাণে বেঁচে থাকি তাহলে করুণাসিক্ত মনে তোমরা আমাকে এই পরিত্যাগ-কাজে বাধা দিও না।

তিনি জানকীর প্রতি এই নিতান্ত নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কথা বললে ভায়েদের মধ্যে কেউই জ্যেষ্ঠকে নিষেধ করতে পারলেন না, অনুমোদনও করতে পারলেন না।

লক্ষ্মণের প্রতি দায়িত্ব

রামচন্দ্র ত্রিলোকবিশ্রুত, সত্যভাষী ; আদেশপালনে প্রস্তুত লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'সৌম্য' ! তাঁকে আলাদা করে ডেকে আদেশ করলেন—

তোমার ভ্রাতৃবধূ আসন্নপ্রসবা, তাঁর তপোবন দেখার বড় সাধ। তুমি সেই অজুহাতে তাঁকে রথে নিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে সেখানেই তাঁকে ত্যাগ করে আসবে।

তিনি (লক্ষ্মণ) শুনেছিলেন পিতার আদেশে পরশুরাম নিষ্ঠুরভাবে মাতাকে হত্যা করেছিলেন। তিনিও অগ্রজের আদেশ গ্রহণ করলেন ; কারণ গুরুজনের আদেশের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে নেই।

তারপর

মনোমতো ব্যবস্থা শুনে আনন্দিত সীতাকে গর্ভিণী-বহনের উপযুক্ত ঘোড়ায়-টানা রথে বসিয়ে সুমন্ত্রকে সারথি করে (লক্ষ্মণ) প্রস্থান করলেন।

পথে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর প্রদেশ দেখে সীতার খুব আনন্দ ; মনে ভাবলেন, 'সত্যি আমার প্রিয় আমি যা ভালোবাসি তাই করেন' ; তখনও তিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে তিনি (রাম) কল্পতরু নেই, হয়ে গেছেন ইক্ষুতরু।

অনেকক্ষণ স্বামীকে দেখেন নি ; তাঁর ডানচোখ কেঁপে উঠল, লক্ষ্মণ তাঁর কাছে যে-কথা গোপন করেছিলেন মাঝপথে সেই ভয়ঙ্কর দুঃখের কথা (কে) যেন তাঁর কাছে বলে দিল।

এই দুর্লক্ষণের মুহূর্তে তাঁর মুখকমল বিষাদে ম্লান হয়ে গেল। তিনি মনে মনে কামনা করলেন, রাজা এবং অনুজদের কল্যাণ হোক।

গুরুজনদের আদেশ মাথায় নিয়ে সৌমিত্রি রাজবধূকে বনপ্রান্তে ফেলে আসতে চলেছেন, সামনে গঙ্গানদী উত্তাল তরঙ্গময়, যেন হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করছেন।

সারথি রথের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, তিনি ভ্রাতৃবধূকে তীরে অবতরণ করালেন— সত্যসন্ধ কঠোর প্রতিজ্ঞা উত্তরণের মতো নিষাদের আনা নৌকায় গঙ্গানদী পার হলেন।

লক্ষ্মণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কোনোমতে কথাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে রাজার আদেশ উচ্চারণ করলেন—মেঘ যেন সৃষ্টিধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ করল।

সীতার বিলাপ

এই ভয়ঙ্কর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সীতা (নিজ) জননী ধরিত্রীর উপরে লুটিয়ে পড়লেন, তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খসে পড়ল ; ঝঞ্ঝাবাতে তাড়িত লতা যেন চারিদিকে ফুল ছড়িয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ল।

'ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম নিয়ে শুদ্ধচরিত্রের স্বামী অকারণে কেন তোমাকে ত্যাগ করবেন'— মা ধরিত্রী যেন এই সংশয়েই তাঁকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

জ্ঞান হারিয়ে তিনি (সীতা) কোনো দুঃখ অনুভব করেন নি ; চেতনা ফিরে পেয়ে তাঁর অন্তর পুড়ে খাক হয়ে গেল ; সুমিত্রাতনয়ের যত্নে-পাওয়া এই জ্ঞান তাঁর কাছে মূর্ছার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর হয়েছিল।

আর্যপত্নী স্বামীকে একটুও নিন্দা করলেন না যদিও তিনি বিনা দোষে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। চিরদুঃখিনী নিজের দুর্ভাগ্যকেই বারে বারে তিরস্কার করলেন।

লক্ষ্মণ তাঁকে শান্ত করলেন, বাল্মীকির আশ্রমে যাবার পথও বলে দিলেন ; তারপর

তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

সীতা তাঁকে উঠিয়ে বললেন—'সৌম্য! আমি প্রীত হয়েছি। তুমি চিরজীবী হও। কারণ, (আমি তো জানি) বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের অধীন, তুমিও তোমার অগ্রজের অধীন।

একে একে সব শ্বশ্রূমাতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে তুমি বলবে, আমার মধ্যে রয়েছে তাঁদেরই পুত্রের সন্তান, তাঁরা যেন মনে মনে তার মঙ্গলকামনা করেন।

আর আমার কথামতো সেই রাজাকে তুমি বোলো, নিজে চোখে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ জেনেও লোকনিন্দা শুনে তিনি যে আমাকে ত্যাগ করলেন, এ কাজ কি তাঁর বিদ্যা অথবা কুলগৌরবের উপযুক্ত ?

অথবা, তুমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আমার প্রতি তোমার কোনো স্বেচ্ছাচার আশংকা করা উচিত হবে না ; এ নিশ্চয় আমার জন্মান্তরের পাপকর্মের ফলের অসহ্য অশনিসংকেত।

একদিন রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়েছিলে ; তাই কি আজ তার আশ্রয়ে স্থান পেয়ে তারই প্রচণ্ড রোষে আমি রাজভবনে থাকতে পারলাম না !

নিশাচর রাক্ষসেরা তাদের স্বামীদের আক্রমণ করলে তোমারই গৌরবে আমি তপস্বিনীদের আশ্রয়ে ছিলাম ; আজ তুমি রাজা থাকতে আমি কেমন করে অন্যের আশ্রয় নেব ?

কী আর বলব ! আমার গর্ভে তোমারই সন্তান, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য—এই বাধাটুকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের পরে এই নিষ্ফল দুর্ভাগা জীবনে আর মায়া করতাম না।

তাই আমি সন্তান-প্রসবের পরে ঊর্ধ্বে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তপস্যা করব—যাতে জন্মান্তরে আমি তোমাকেই আবার স্বামীরূপে পাই কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ যেন না ঘটে।

মনু বিধান করেছেন—রাজার ধর্ম বর্ণাশ্রমের পালন। তাই এভাবে পরিত্যাগ করলেও সাধারণ তপস্বিনীরূপে আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।'

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলে তাঁর কথা শুনে ফিরে গেলেন, আর তাঁকে দেখা গেল না। দুঃখের দুর্বহ ভারে সীতা মুক্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, যেন বাণবিদ্ধা কুররী।

ময়ূরের নাচ থেমে গেল, গাছের ফুল ঝরে পড়ল, হরিণীরা মুখ থেকে কুশের গ্রাস ফেলে দিল—তাঁর বেদনায় সমব্যথী ঐ বনও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

আদিকবি বাল্মীকি এলে

ব্যাধের বাণে বিদ্ধ পাখিকে দেখে যাঁর শোক শ্লোক হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল সেই আদিকবি চলেছিলেন (বনপথে) কুশসমিধ আনতে। কান্না শুনে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কান্না থামিয়ে, ঝাপসা চোখের অশ্রু মুছে নিয়ে সীতা তাঁকে বন্দনা করলেন। মুনি তাঁকে গর্ভিণী দেখে সুপুত্রের আশীর্বাদ দিলেন। তারপরে বললেন—

আমি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছি, তোমার স্বামী মিথ্যা অপবাদে অস্থির হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছেন। জানকি ! দুঃখ কোরো না, তুমি অন্য এক পিতৃগৃহে এসেছ।

(তোমার স্বামী) ত্রিলোকের শত্রুকণ্টক উন্মূলিত করেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি নিরহংকার ; তবুও তোমার প্রতি অকারণে এই গর্হিত আচরণ করাতে রামচন্দ্রের প্রতি আমি সত্যিই রুষ্ট হয়েছি।

তোমার বিশ্রুতকীর্তি শ্বশুর আমার বন্ধু (ছিলেন), তোমার পিতা (তত্ত্বোপদেশ দিয়ে) সজ্জনদের মুক্তি এনে দেন, তুমি পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা, তোমাকে অনুগ্রহ না করার তো কোনো কারণ নেই।

তপস্বীদের সংসর্গে তপোবনে প্রাণীরা শান্ত, তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস কর। নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেলে তোমার সন্তানের সংস্কারবিধি এখানেই অনুষ্ঠিত হবে।

তমসার তীর জুড়ে মুনিদের আশ্রম, শোকনাশিনী ঐ নদীতে স্নান সেরে তার বেলাভূমির কোলে পূজাপার্বণের কাজ করে তোমার মন শান্ত থাকবে।

(তাছাড়া) মুনিকন্যারা রয়েছে। তারা প্রত্যেক ঋতুতে ফুল তোলে, ফল কুড়োয়, ক্ষেত থেকে পুজোর বীজধান সংগ্রহ করে; নতুন নতুন বিষয়ে মধুর আলাপে তারা তোমাকে আনন্দ দেবে।

তোমার শক্তি অনুসারে জলের কলসে আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বড় করে তোল, এতে সন্তান-জন্মের আগেই তুমি নিশ্চয়ই শিশুকে স্তন্যদানের আনন্দ অনুভব করবে।

তাঁর অনুগ্রহে সীতা প্রসন্ন, বাল্মীকি করুণাদ্র চিত্তে তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা নিজের আশ্রমে পৌঁছলেন; পশুরা সেখানে শান্ত, যজ্ঞবেদীর পাশে হরিণেরা শুয়ে আছে।

তিনি শোকাতুরা সীতাকে অর্পণ করলেন তপস্বীদের কাছে, তাঁরা তাঁকে দেখেই প্রসন্ন হয়েছিলেন; পিতৃগণ চাঁদের সারাংশ পান করে নিলে অমাবস্যা যেমন অবশিষ্ট অংশটুকু ওষধিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তেমনি।

তাঁরা (তাপসীরা) যথাবিধি অতিথি-সৎকার করে তাঁকে রাত্রিবাসের জন্যে একটি কুটীর দিলেন, তার মধ্যে জ্বলছিল ইঙ্গুদীতেলের একটি প্রদীপ এবং পবিত্র মৃগচর্মের শয্যা পাতা ছিল।

সেখানে সীতা অভিষেক-স্নান করে সংযতভাবে যথানিয়মে অতিথির পূজা করতেন; তিনি বল্কল ধারণ করেছিলেন এবং সন্তানের রক্ষার্থে বন্য ফলমূলেই শরীর ধারণ করতেন।

লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন

রাজা কি একটুও অনুশোচনা করবেন না? ইন্দ্রজিতের নিহন্তা লক্ষ্মণ উৎসুক হয়ে অগ্রজের কাছে আদেশ পালনের বৃত্তান্ত (আগাগোড়া) বর্ণনা করলেন, সীতার বিলাপ পর্যন্ত।

হঠাৎ রামচন্দ্রের চোখে জল এল, যেন পৌষমাসের তুষারবর্ষী চাঁদ; কলঙ্কের ভয়ে তিনি জানকীকে গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলেন নি।

তিনি বুদ্ধিমান, বর্ণাশ্রমপালনে সদা সতর্ক, তিনি নিজেই শোক সংযত করলেন; কোনোরকম ভোগাসক্তি না রেখে অনুজদের সঙ্গে একযোগে তিনি সমৃদ্ধ রাজ্যশাসন করলেন।

সাধ্বী জেনেও লোকনিন্দার ভয়ে রাজা একমাত্র পত্নীকে ত্যাগ করলেন। সপত্নীশূন্য হয়ে রাজলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ে অনন্ত সুখে বিরাজ করতে থাকলেন।

সীতাকে ত্যাগ করে দশাননশত্রু (রামচন্দ্র) অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেন নি, তাঁরই প্রতিকৃতি নিয়ে যজ্ঞ করছিলেন। স্বামীর এই কাহিনী কানে শুনে দুঃসহ পরিত্যাগ-দুঃখকে সীতা কোনোমতে মেনে নিয়েছিলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'সীতাপরিত্যাগ' নামক চতুর্দশ সর্গ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

শত্রুঘ্নের লবণাসুরবধ

সীতাকে পরিত্যাগ করে সেই পৃথিবীপতি কেবল সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকেই ভোগ করতে লাগলেন।

পাপাচারী লবণরাক্ষস যমুনাতীরবাসী মুনিদের যজ্ঞনাশ করছিল বলে তাঁরা এসে তাঁর (রামচন্দ্রের) শরণ নিলেন।

তাঁরা রামকে দেখে (রাম স্বয়ং আছেন বলে) লবণরাক্ষসকে নিজেরা ধ্বংস করলেন না। কারণ রক্ষকের অভাবেই অভিশাপরূপ অস্ত্রের প্রয়োগ করে মুনিরা তপস্যার ক্ষয় করেন।

ককুৎস্থ রাম তাঁদের কাছে বিঘ্নের প্রতিকার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারণ বিষ্ণুর (রামরূপে) অবতরণ ধর্মসংরক্ষণের জন্যেই।

তাঁরা রামকে সেই দেবাবিদ্বেষী রাক্ষসের বধের উপায় বলে দিলেন। লবণরাক্ষসের হাতে যতক্ষণ শূল থাকবে ততক্ষণ সে দুর্জয়, তাই শূলহীন অবস্থাতেই তাকে আক্রমণ করতে হবে।

তাঁদের মঙ্গল করার জন্যে, শত্রুবধ করে নাম সার্থক করুক এই উদ্দেশ্যেই যেন রাম শত্রুঘ্নকেই আদেশ দিলেন।

একটি বিশেষ বিধি যেমন সামান্য-বিধিকে বাধিত করতে পারে তেমনি রঘুবংশের যে-কেউ একাই শত্রুনিপাতে সমর্থ।

তারপর জ্যেষ্ঠ আশীর্বাদ দেবার পর নির্ভীক দশরথপুত্র শত্রুঘ্ন রথে আরোহণ করে পুষ্পিত ও সুবাসিত বনস্থলী দেখতে দেখতে (লবণবধে) চললেন।

অধ্যয়নার্থক ধাতুর (ই ধাতুর) সঙ্গে অধি-উপসর্গ যুক্ত হয়ে যেমন অর্থসিদ্ধির সহায়ক হয় রামের আদেশে সেনাবাহিনীও তাঁর (শত্রুঘ্নের) সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যসিদ্ধির সহায়ক হল।

রথগামী মুনিরা সেই তেজস্বি-প্রবর শত্রুঘ্নকে পথ দেখিয়ে চলতে থাকলেন, বালখিল্য মুনিরা পথ দেখিয়ে চললে সূর্যদেব যেমন শোভা পেয়েছিলেন, তিনিও তেমনি শোভা পেলেন।

পথ চলতে চলতে বাল্মীকির তপোবন পড়ল। সেই তপোবনের হরিণেরা রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। শত্রুঘ্ন ঐ তপোবনে একরাত বাস করলেন।

তাঁর রথবাহন অশ্বেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঋষি তপঃপ্রভাবে নানারকম উৎকৃষ্ট উপকরণ সৃষ্টি করে তাঁকে সেবা করলেন।

সেই রাতেই তাঁর ভ্রাতৃবধূ সীতা দুটি পুত্র প্রসব করলেন। মনে হল ধরিত্রী যেন সুসম্পন্ন কোশ ও দণ্ড প্রসব করলেন।

অগ্রজের সন্তান লাভের সংবাদ শুনে শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। প্রভাতে তিনি রথ প্রস্তুত করে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন।

তিনি মধুপঘ্নে (লবণরাক্ষসের নগরে) পৌঁছলেন। কুম্ভীনসীর পুত্র লবণও সেই সময় বন থেকে কিছু প্রাণী সংহার করে ফিরল। মনে হল সে যেন (বনভূমি থেকে) রাজস্ব আদায় করে এল।

ধোঁয়ার মতো ধূসর রং তার, দেহময় চর্বির গন্ধ, কেশরাশি অগ্নিশিখার মতো পিঙ্গলবর্ণ; চারদিকে সে রাক্ষসবেষ্টিত। সে যেন ধাবমান চিতাগ্নির মতো।

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন শূলবিহীন অবস্থায় লবণরাক্ষসকে পেয়ে তার গতিরোধ করলেন। সুযোগ বুঝে যারা শত্রুকে আঘাত করে, জয় তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'আজ আমি যে-আহার সংগ্রহ করেছি তাতে আমার পেট ভরবে না। তাই ভীত বিধাতা সৌভাগ্যক্রমে আগে থেকেই যেন তোকে আমার কাছে হাজির করেছেন।' এই বলে শত্রুঘ্নকে তর্জন করে তাঁকে বধ করবার জন্যে সে বিশাল একটি গাছকে মুথাগুচ্ছের মতো (অনায়াসে) উৎপাটিত করল।

নৈঋতবায়ুপ্রেরিত সেই গাছটিকে শত্রুঘ্ন মাঝপথেই তীক্ষ্নবাণে খণ্ড খণ্ড করে ফেলায় তা তাঁর গায়ে লাগল না, শুধু ফুলের পরাগে মণ্ডিত হলেন তিনি।

সেই গাছটি বিনষ্ট হল দেখে রাক্ষস যমরাজের পৃথকভাবে অবস্থিত মুষ্টির মতো একটা বিশাল পাথর উঠিয়ে তাঁর উপরে নিক্ষেপ করল।

তিনিও ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করে ঐ পাথরকে আঘাত করায় তা বালুর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হল।

রাক্ষস ডান হাত তুলে শত্রুঘ্নের দিকে ধাবিত হল, মনে হল যেন প্রলয়বায়ুতে সঞ্চালিত হয়ে একটি-তালগাছবিশিষ্ট কোনো পাহাড় ছুটে চলেছে।

এবার বৈষ্ণব (বিষ্ণু-প্রভাবমণ্ডিত) বাণে আহত হয়ে বিদীর্ণবক্ষ সেই শত্রু লুণ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর কম্পন উৎপাদন করল এবং সেই সঙ্গে আশ্রমবাসীদের কম্প দূর করল।

নিহত শত্রুর উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এসে বসল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুঘ্নের মাথায় স্বর্গ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগল।

সেই বীর লবণরাক্ষসকে বধ করে তখন ইন্দ্রজিৎ বধে শোভিত মহাতেজা লক্ষ্মণের যথার্থ সহোদর বলে মনে করলেন।

কৃত-কৃত্য তপস্বীরা প্রশংসা করতে থাকলে তাঁর বিক্রমোন্নত মস্তকটি লজ্জানত হয়ে শোভা পেল।

তারপর পৌরুষই যার একমাত্র ভূষণ, এবং অর্থব্যয়ে যিনি অকৃপণ সেই মধুরাকৃতি শত্রুঘ্ন যমুনানদীর তীরে 'মধুরা' নামে একটি নগরী নির্মাণ করলেন।

শত্রুঘ্নের সুশাসনে পুরবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দরুন ঐ নগরী স্বর্গের অতিরিক্ত অধিবাসীদের এনে বসানো উপনিবেশের মতো শোভা পেল।

সেখানে সৌধে আরোহণ করে তিনি যখন চক্রবাকশোভিত যমুনানদী দেখতেন তাঁর মনে হত যেন পৃথিবীর স্বর্ণরচনাবতী বেণী শোভা পাচ্ছে।

লব-কুশের জন্ম-সংস্কার

দশরথ ও জনকের সখা মন্ত্রকৃৎ বাল্মীকি উভয় ব্যক্তির উপরে প্রীতিবশতঃ সীতার দুই পুত্রের যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পন্ন করলেন।

সেই কবি (বাল্মীকি) কুশ ও লব (গোরুর লেজের লোম) দিয়ে তাদের দুজনের গর্ভ-ক্লেদ মুছে দিয়েছিলেন বলে যথাক্রমে একজনের নাম কুশ ও আর একজনের নাম লব রাখলেন।

শৈশব কিছুটা কাটিয়ে ওঠবার পরই তাদের দুজনকে সাঙ্গ বেদ পড়িয়ে পরবর্তী

কবিদের প্রধান উপজীব্য স্বরূপ তাঁর নিজের রচিত রামায়ণ গান অভ্যাস করালেন।

সেই দুই পুত্র মায়ের কাছে মধুর স্বরে রামচরিত গেয়ে তাঁর বিরহবেদনাকে কিছুটা লাঘব করত।

এই সময়ে ত্রেতাগ্নির মতো তেজোময় ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিনজনেও তাঁদের পতিব্রতা পত্নীতে দুইটি করে পুত্র উৎপাদন করলেন।

জ্যেষ্ঠপ্রিয় শত্রুঘ্ন বহুবিদ্যাবিদ শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামে নিজের দুই পুত্রকে যথাক্রমে মধুরা ও বিদিশা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আবার বাল্মীকির আশ্রম তাঁর পথে পড়ল। সেখানে সীতাতনয়দের সঙ্গীত শ্রবণে হরিণেরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুনির তপস্যার বিঘ্ন হবে মনে করে শত্রুঘ্ন ঐ আশ্রম অতিক্রম করে গেলেন।

জিতেন্দ্রিয় শত্রুঘ্ন লবণবধ করে ফিরছেন বলে পুরবাসীরা অত্যন্ত গৌরব নিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। পথের সংস্কার করায় অযোধ্যা শোভামণ্ডিত হয়েছিল। তিনি সেই অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন।

সীতাপরিত্যাগের পর এখন পৃথিবীর একমাত্র পতি রামকে তিনি সভায় সভাসদগণের সঙ্গে উপবিষ্ট দেখলেন।

উপেন্দ্র কালনেমিকে বধ করে ফিরলে ইন্দ্র যেমন প্রীত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, অগ্রজ রামও তেমনি লবণনিহন্তা প্রণত অনুজকে অভিনন্দিত করলেন।

জিজ্ঞাসা করলে শত্রুঘ্ন সমস্ত কুশল সংবাদই রাজাকে দিলেন, কিন্তু পুত্রজন্মের কথা কিছু বললেন না। যথাকালে তিনি নিজেই প্রত্যর্পণ করবেন বলে আদিকবি এ বিষয়ে এখন কিছু না বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রামচন্দ্রের শম্বুকবধ

তারপর একদিন দূর-জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ কোলে-করা এক কিশোর সন্তানকে রাজদ্বারে নামিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'হা পৃথিবী ! দশরথের হাত থেকে রামের হাতে গিয়ে তুমি কী চরম শোচনীয় অবস্থায় এসেছ' !

রক্ষক রাম তাঁর শোকের কারণ শুনে লজ্জিত হলেন। কারণ অকালমৃত্যু ইক্ষ্বাকুদের রাজ্যকে (এর আগে) কখনও স্পর্শ করে নি।

রাম শোকার্ত ব্রাহ্মণকে 'ক্ষণকাল ক্ষমা করুন' এই বলে আশ্বস্ত করে যমরাজকে জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে কুবেরের রথকে (পুষ্পক রথকে) স্মরণ করলেন।

রঘুবংশজ (রাম) অস্ত্র নিয়ে সেই রথে চড়ে প্রস্থানে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁর সম্মুখে এক রহস্যময়ী দৈববাণী উচ্চারিত হল—

হে রাজন ! তোমার প্রজাদের মধ্যে কোথাও কোনো অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। অন্বেষণ করে তারই প্রতিকার কর।

এই বিশ্বস্ত বচন শুনে রাম বর্ণাশ্রমধর্মের সেই অনাচার দূর করবার জন্যে রথে চড়ে দিঙ্‌মণ্ডল ভ্রমণে নির্গত হলেন। রথ এত দ্রুত ছুটছিল যে পতাকাটি একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

তারপর রাম এক পুরুষকে দেখলেন। সে একটি তরুশাখা অবলম্বন করে মুখ

নিচু দিকে দিয়ে তপস্যা করছিল, ধোঁয়ায় তার চোখ তামাটে রঙের হয়ে গিয়েছিল।

রাজা নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করায় সেই ধূমপায়ী পুরুষ বলল, সে ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়, তার নাম শম্বুক, সে জাতিতে শূদ্র।

তপস্যায় তার অধিকার না থাকাতেই সে অনর্থ বয়ে এনেছে, তাই তার শিরশ্ছেদ করাই কর্তব্য এই স্থির করে রাম অস্ত্র গ্রহণ করলেন।

সেই রাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধশ্মশ্রু তার মুখটি তুষারপাতে ক্লিষ্টকেশর পদ্মের মতো কণ্ঠনাল থেকে বিচ্যুত করলেন।

স্বয়ং রাজা দণ্ড দিলেন বলে শূদ্র সদ্গতি লাভ করল, তার তপস্যা দুশ্চর হলেও অনধিকার দোষে দুষ্ট হওয়ায় তা দিয়ে সে এই সদ্গতি লাভ করতে পারত না।

তারপর রঘুনাথ পথে অগস্ত্যের সঙ্গে মিলিত হলেন, মনে হল শশাঙ্কের সঙ্গে শরৎকালের মিলন হল।

অগস্ত্যের অলংকার প্রদান

কুম্ভযোনি অগস্ত্যকে পূর্বে পীত (এবং পরে নির্গলিত) সমুদ্র আত্মমোচনের মূল্য-স্বরূপ যে দিব্য-অলংকার দিয়েছিলেন তিনি তা রামকে প্রদান করলেন।

সীতার কণ্ঠধারণে বঞ্চিত বাহুতে সেই অলঙ্কার ধারণ করে রাম ফিরলেন, তার আগেই ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র যমালয় থেকে ফিরে এসেছিল।

তখন পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণ যমের গ্রাস থেকেও পুত্র-ত্রাণে সমর্থ রামকে তিনি আগে যে নিন্দা করেছিলেন, নানাভাবে স্তুতি করে তা সংশোধন করতে লাগলেন।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ

তারপর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মোচন করলেন। মেঘ যেমন শস্যরাশিকে জলদানে সন্তুষ্ট করে, নর বানর ও রাক্ষসদের অধিপতিরা তাঁকে তেমনি উপঢৌকন-দানে সংবর্ধিত করলেন।

কি নক্ষত্রলোক কি ভূলোক—সব স্থান ত্যাগ করে সমস্ত দিক থেকে নিমন্ত্রিত মহর্ষিরা তাঁর কাছে আসতে লাগলেন।

সমাগত মহর্ষিদের উপান্তভাগে সন্নিবেশিত করা হল। চতুর্দ্বারে শোভিত অযোধ্যা-নগরীকে দেখে মনে হল চতুর্মুখ ব্রহ্মা সদ্য লোকসৃষ্টির পর যেন সশরীরে বিরাজ করছেন।

রামের সীতা-পরিত্যাগও গৌরবের বিষয়, কারণ তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নি। হিরণ্ময়ী সীতাই (অর্থাৎ সীতার হিরণ্ময়ী মূর্তিই) যজ্ঞশালায় পতির সহধর্মচারিণী পত্নীর স্থান গ্রহণ করেছিল।

যা নিয়ম তার চেয়ে অনেক বেশী জিনিস দিয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করা হল। এতদিন যারা যজ্ঞবিঘ্ন ঘটিয়ে এসেছে সেই রাক্ষসেরাই যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হল।

লব-কুশের রামায়ণ গান

এদিকে গুরুর আদেশে সীতাতনয় লব ও কুশ সর্বত্র বাল্মীকির প্রথম উপলব্ধ রামায়ণ গান করতে লাগল।

একে রামের চরিত, তা আবার বাল্মীকির রচনা তার উপর কিন্নরকণ্ঠ সেই দুজন—শ্রোতাদের মন তারা হরণ করতে পারবে না কেন ?

যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং শুনেছেন তাঁরা বার বার এসে বলতে থাকলে রাম কুতূহলী হয়ে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের রূপ, সঙ্গীত ও মাধুর্য দেখতে এবং শুনতে লাগলেন।

তাদের সঙ্গীত-শ্রবণে তন্ময় ও অশ্রুসজল সভা প্রভাতে হিমবর্ষী নিষ্কম্প বনস্থলীর মতো শোভা পেল।

লোকেরা কেবল বয়স ও বেশ ছাড়া আর সব বিষয়েই রামের সঙ্গে তাদের দুজনের সাদৃশ্য দেখে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল।

লোকেরা দুই কুমারের দক্ষতায় ততটা অবাক হয় নি যতটা অবাক হয়েছিল রাজার দেওয়া প্রীতি-উপহারে তাদের নিস্পৃহতা দেখে।

কে তোমাদের এই গান শিখিয়েছেন, কে-ই বা এই গানের কবি—রাজা নিজে এ কথা জিগ্যেস করলে তারা বাল্মীকির নাম বলল।

তারপর রাম ভাইদের নিয়ে বাল্মীকির কাছে গেলেন এবং শুধু দেহ সম্মুখে রেখে (দেহটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্য) তাঁকে নিবেদন করলেন।

করুণাময় সেই কবি রামকে 'এ দুটি সীতার গর্ভজাত তোমারই পুত্র'; একথা বলে সীতাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

(রাম বললেন) হে তাত! আপনার পুত্রবধূ আমাদের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা প্রতিপন্ন হলেও প্রজারা রাক্ষস রাবণের দুশ্চরিত্রতার দরুন তিনি শুদ্ধা বলে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারছেন না।

সীতা স্ব-চরিত্র বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহলে আপনার আদেশে আমি পুত্রবতী সীতাকে গ্রহণ করব।

রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলে মুনি শিষ্যদের দিয়ে আশ্রম থেকে তাঁর তপস্যা-বলে আনীত সিদ্ধির মতোই যেন সীতাকে নিয়ে এলেন।

তার পরদিন রাম প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে পুরবাসীদের একত্রিত করে কবিকে আহ্বান করে আনলেন।

সীতার পাতাল প্রবেশ

তারপর পুত্র দুটি সহ সীতাকে নিয়ে মুনি রামের কাছে এলেন। মনে হল যেন তিনি (উদাত্তাদি) স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রীর সঙ্গে উদীয়মান সূর্যের কাছে এলেন।

সীতার পরিধানে গেরুয়া-বসন, তাঁর চোখ দুটি নিজের পায়ের দিকে নিবদ্ধ। সীতার সেই শান্ত দেহ দেখে তিনি যে শুদ্ধা তা সহজেই অনুমিত হল।

(সীতা সভায় এলে) সভাজনেরা তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে চোখ সরিয়ে এনে ফলন্ত শালিধানের মতো মুখ নিচু করে রইল।

আসন গ্রহণ করে মুনি সীতাকে আদেশ দিলেন, 'বাছা! পতির সম্মুখে স্বচরিত বিষয়ে প্রজাদের সংশয় দূর কর।'

তখন সীতা বাল্মীকির শিষ্যদের-আনা পুণ্যজলে আচমন করে এই সত্য বাণী উচ্চারণ করলেন—

বাক্যে মনে ও কর্মে যদি পতির বিষয়ে আমার কোনো ব্যভিচার হয়ে থাকে তাহলে, হে ধরিত্রী দেবী! তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও।

সাধ্বী সীতা এ কথা বলতেই সদ্য-সংঘটিত ভূমিরন্ধ্র থেকে বৈদ্যুতিক জ্যোতির মতো প্রভামণ্ডল নির্গত হল।

সেই প্রভামণ্ডলে নাগফণাবাহিত সিংহাসনে উপবিষ্টা সমুদ্রমেখলা সাক্ষাৎ ধরিত্রীদেবী আবির্ভূতা হলেন।

তিনি পতির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সীতাকে কোলে নিয়ে, পতি 'না না' বলতে বলতেই পাতালে প্রবেশ করলেন।

সীতার প্রত্যর্পণ আকাঙ্ক্ষা করে রাম ধনুর্যোজনা করলে জগদ্গুরু ব্রহ্মা দৈববলে পৃথিবীর প্রতি তাঁর ক্রোধকে শান্ত করলেন।

রাম যজ্ঞশেষে (যথাবিধি) পুরস্কৃত মুনি ও সুহৃদদের বিদায় দিয়ে সীতাগত স্নেহ তাঁর সন্তানদের উপরে ন্যস্ত করলেন।

রামচন্দ্রের রাজ্যবিন্যাস

সেই প্রজাপালক (রাম) যুধাজিতের (ভরত-মাতুলের) পরামর্শক্রমে ভরতকে রাজ-প্রভুত্ব অর্পণ করে সিন্ধুপ্রদেশ প্রদান করলেন।

সেখানে ভরত যুদ্ধে গন্ধর্বদের পরাজিত করে তাদের শুধু বীণা গ্রহণ করালেন এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করালেন।

ভরত অভিষেকের যোগ্য তাঁর পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে তাঁদের নামাঙ্কিত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী রাজধানীতে অভিষিক্ত করে আবার রামের কাছে এলেন।

লক্ষ্মণও রামের আদেশে তাঁর পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্য প্রদান করলেন।

এইভাবে রামাদি রাজারা পুত্রদের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে পতিলোকে প্রস্থিত জননীদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

তারপর যম মুনিবেশ ধারণ করে এসে রামকে বললেন, 'আমাদের দুজনের কিছু গোপন কথা আছে। যে আমাদের এ অবস্থায় দেখবে আপনাকে তাকেই পরিত্যাগ করতে হবে'।

'তাই হবে' রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বললেন, 'ব্রহ্মার আদেশে আপনি এখন স্বর্গবাস করুন'।

দ্বারে স্থিত লক্ষ্মণ জেনেশুনেও দুর্বাসা রামদর্শনে এসেছেন বলে মুনির অভিশাপে ভীত হয়ে তাঁদের নির্জনালাপে বাধা সৃষ্টি করলেন।

যোগবিদ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গিয়ে দেহত্যাগ করে অগ্রজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন।

নিজের চতুর্থ অংশরূপে লক্ষ্মণ আগে স্বর্গগমন করলে রাম ত্রিপাদ ধর্মের মতো শিথিল হয়ে মর্ত্যবাস করতে লাগলেন।

স্থিতধী সেই রাম শত্রুরূপ গজের পক্ষে অংকুশরূপ কুশকে কুশাবতী নগরীতে এবং সদুক্তিবর্ষণে সজ্জনের অশ্রু-উদ্রেককারী লবকে শরবতীতে অধিষ্ঠিত করে অগ্নিকে সম্মুখে করে অনুজ-দুজনকে নিয়ে উত্তর দিকে (মহাপ্রস্থানে) যাত্রা করলেন। প্রভুপ্রেমে সমস্ত অযোধ্যানগরী গৃহত্যাগ করে তাঁর অনুগমন করল।

চিত্তজ্ঞ বানর ও রাক্ষসেরাও প্রজাদের কদম্বের মতো স্থূল অশ্রুবিন্দুতে সিক্ত রামের পথে অনুগমন করল।

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

(দিব্য) বিমান এসে উপস্থিত হল। ভক্তবৎসল রাম অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাবার জন্যে সরযূকেই সোপানস্থানীয় করে দিলেন।

তখন সেখানে সরযূতে নিমগ্ন হবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। অজস্র গো-ধন নদীপার হবার সময় যেমন হয় সেখানেও তেমনি হয়েছিল বলে তা পবিত্র 'গোপ্রতর' নামে পরিগণিত হল।

(সুগ্রীবাদি) দেবাংশরা নিজ নিজ দেবমূর্তিতে বিলীন হবার পর বিভু রাম দেবত্বপ্রাপ্ত পুরবাসীদের জন্যে একটি পৃথক স্বর্গ নির্মাণ করে দিলেন।

বিষ্ণু এইভাবে (রামরূপে) রাবণবধরূপ কাজ শেষ করে লঙ্কাপতি বিভীষণকে এবং পবনতনয় হনুমানকে উভয়ের কীর্তিস্তম্ভের মতো দক্ষিণে চিত্রকূট পর্বতে এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতে অধিষ্ঠিত করে নিজের মূর্তিতে প্রবেশ করলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'শ্রীরামের স্বর্গারোহণ' নামক পঞ্চদশ সর্গ ॥

ষোড়শ সর্গ

তারপর—

সাতজন রঘুকুলবীর বয়সে এবং গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠ কুশকে শ্রেষ্ঠরত্ন অর্পণ করলেন। কারণ সৌভ্রাতৃত্ব এঁদের বংশগত ধর্ম।

তাঁরা সকলেই সেতুবন্ধন, গজসংগ্রহ, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যন্ত সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন; কিন্তু সমুদ্র যেমন কখনই বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁরাও তেমনি একে অন্যের দেশের সীমা লঙ্ঘন করলেন না।

তাঁদের বংশের জন্ম চতুর্ভুজ বিষ্ণু থেকে, তাঁরা সর্বদা দানপ্রবৃত্তিসম্পন্ন; সামযোনি থেকে উৎপন্ন নিত্য দানবর্ষী দিগ্‌গজদের বংশের মতো রঘুকুলও আট ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রসার লাভ করল।

একদিন মধ্যরাত্রে শয়নগৃহের প্রদীপ স্তিমিত, মানুষ ঘুমিয়ে আছে; হঠাৎ কুশ জেগে উঠলেন। দেখলেন প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীলোকের বেশধারিণী এক রমণী সম্মুখে, তাঁকে তিনি পূর্বে কখনো দেখেন নি।

ইন্দ্রের মতো তেজস্বী ও বন্ধুবৎসল কুশ সাধুসজ্জনদের সঙ্গে সমানভাবে রাজ্যভোগ করতেন; সেই নারী শত্রুজিৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে জয়-শব্দ উচ্চারণ করলেন।

প্রাসাদকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সেখানে দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো প্রবিষ্ট তাঁকে দেখে সবিস্ময়ে শয্যা থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঈষৎ উন্নত করে (অর্থাৎ বালিশ থেকে মাথাটি তুলে) দশরথের পৌত্র বললেন—

"বন্ধদুয়ার গৃহে প্রবেশ করেছেন আপনি, কিন্তু আপনার তেমন কোনো যোগশক্তি দেখতে পাচ্ছি না, শিশিরসিক্ত মৃণালিনীর মতো আপনার আকৃতি বিষণ্ণ; আপনি কে?

কার ঘরণী ?

আমার কাছে কেন এসেছেন ?

জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দের মন পরস্ত্রীতে বিমুখ—এই জেনে আপনার যা বলার বলুন।”

অযোধ্যালক্ষ্মীর অনুযোগ

তাঁকে সেই নারী বললেন—“রাজন ! আপনার পিতা স্বর্গে গমনের সময়ে যে নগরীর পুরবাসীদেরও সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আমি সেই (অযোধ্যা) নগরীর অনাথা অধিদেবতা।

একদিন আমি সুশাসনের গৌরবমহিমার বিভূতিতে অলকাপুরীকেও উপহাস করতাম। আজ অশেষ শক্তিসম্পন্ন আপনি থাকা সত্ত্বেও আমি এই করুণ অবস্থা ভোগ করছি।

প্রভু-বিনা আজ আমার শত শত অট্টালিকা জীর্ণ, প্রাচীরগুলির ভগ্নদশা ; আমার অবস্থা সূর্যাস্তের সময়ে প্রচণ্ড বাতাসে মেঘমালা-ছিন্নবিচ্ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া দিনান্তের মতো বিড়ম্বনাময়।

রাত্রে যে রাজপথ পথ-আলো-করা চঞ্চলনূপুরধারিণী অভিসারিকাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্থান ছিল, আজ সেখানে উল্কামুখী আমিষলোলুপ শৃগালেরা চিৎকার করতে করতে যাতায়াত করে।

যে দীর্ঘিকাগুলির জলে প্রমদাগণের (সুখসন্তরণে) করাগ্রের আঘাতে যেন ধীরমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হত, আজ বন্যমহিষদের শৃঙ্গের আঘাতে সে জল যেন (যন্ত্রণায়) হাহাকার করে।

(অট্টালিকার) বাস-যষ্টিগুলি ভেঙে পড়েছে, মৃদঙ্গধ্বনিও নেই ; ক্রীড়াময়ূরেরা এখন বৃক্ষকে আশ্রয় করেছে, তাদের লাস্য ঘুচেছে, তাদের কলাপ যেন দাবানলদগ্ধ, তারা আজ বনময়ূরেই পরিণত হয়েছে।

আমার যে-সমস্ত সোপানপথে রমণীরা অলক্তরঞ্জিত পদচিহ্ন রাখতেন (আলতারাঙা পা--ফেলে হেঁটে যেতেন) আজ সেখানে সদ্যোনিহত হরিণের রক্তে পথ রাঙিয়ে হিংস্র বাঘেরা চলাফেরা করছে।

পদ্মবনে গজবধূরা গজপতিদের কাছে মৃণালভঙ্গ তুলে ধরছে—(প্রাসাদসমূহের গাত্রে) এই আলেখ্যচিত্রিত দৃশ্যকে সত্যি ভেবে আজ কুপিত সিংহেরা নখের আঘাতে তাদের কুম্ভ বিদীর্ণ করছে।

স্তম্ভসমূহে অঙ্কিত নারীমূর্তিগুলির বিবর্ণ ধূসর অবস্থা, সাপের খোলস জড়িয়ে গেছে তাদের গায়ে, সেগুলি যেন তাদের স্তনোত্তরীয় হয়েছে।

সে দিন আর নেই ! অযোধ্যার সুধাধবল শোভা এখন শ্যামবর্ণ, ইতস্ততঃ তৃণ জন্মেছে ; রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ আগের মতোই মুক্তাধবল কিন্তু তারা আর তেমন প্রতিফলিত হয় না।

আমার উদ্যানের যে-লতাবিতান থেকে বিলাসিনীরা বড় যত্নে শাখা নুইয়ে ফুল তুলতেন আজ বন্য ব্যাধদের মতো বানরের দল তার লতাগুচ্ছকে তছনছ করছে।

রাত্রে নেই দীপালোক, দিনে দেখা যায় না কান্তার মুখশ্রী—গবাক্ষগুলি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, তাদের ধূমনির্গমনের পথও রুদ্ধ।

সরযূনদীর তীরে তীরে আর যাগযজ্ঞ হয় না, স্থানীয় সুগন্ধিদ্রব্যের সুবাসও নেই,

তীরের বেতসলতামণ্ডপগুলি জনশূন্য—সরযূনদীকে দেখে আমি বড় কষ্ট পাই।

সুতরাং এই বসতিকে পরিত্যাগ করে কুলরাজধানী আমাকে গ্রহণ করুন; আপনার পিতা যেমন নৈমিত্তিক মনুষ্যশরীর ত্যাগ করে বিষ্ণুমূর্তিকে লাভ করেছেন।"

তাঁর কথায় প্রীত হয়ে রঘুশ্রেষ্ঠ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 'তাই হবে'। পুরদেবতাও প্রসন্নমুখে সশরীরে অন্তর্ধান করলেন।

অযোধ্যায় যাত্রা

সকালবেলায় রাজা রাত্রির সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা ব্রাহ্মণদের জানালেন। সব শুনে তাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন—কুলরাজধানী স্বয়ং তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছেন যে।

কুশাবতী-নগরীকে ব্রাহ্মণদের কাছে দান করে দিয়ে রাজা শুভদিন দেখে পরিজনবর্গ নিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন—মেঘরাশি যেমন বায়ুকে অনুসরণ করে, তেমনি সৈন্যগণ তাঁকে অনুগমন করল।

সৈন্যদল চলতে থাকলে মনে হল গোটা রাজধানীটাই বুঝি চলতে আরম্ভ করেছে; পতাকাশ্রেণী তার উপবনরাজি, বড় বড় হাতিগুলি তার ক্রীড়াকৌশল, রথগুলি যেন প্রাসাদ।

রাজচ্ছত্র নিয়ে তিনি সেনাদলকে পূর্বদিকে যাত্রা করালেন, নবোদিত চাঁদ যেমন সমুদ্রের জলরাশিকে বেলাভূমিতে নিয়ে আসে তেমনি তাঁর শোভা হয়েছিল।

যাত্রাকালে তাঁর সৈন্যসামন্তের বিক্রম বসুন্ধরা যেন সহ্য করতে পারলেন না, ধুলোয় ধুলোয় (আকাশ ভরে) তিনি যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে আরোহণ করলেন।

কোনো অংশ এগিয়ে চলেছে, কোনো অংশ (শিবির) সন্নিবেশের উদ্যোগ করছে, পথে চলেছে কোনো অংশ; সৈন্যদলকে যেখানেই দেখা গেল মনে হল গোটা বাহিনীই বুঝি রয়েছে।

রাজার হাতিদের মদবারিসিঞ্চনে পথের ধুলো কাদা হয়ে উঠল, ঘোড়াদের খুরের আঘাতে তারা আবার ধুলোয় পরিণত হল।

বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে পথ খুঁজতে খুঁজতে সেনাদল বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। নর্মদার কলধ্বনির মতো তাদের তুমুল কোলাহলে পর্বতের গুহাগুলি প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল।

পর্বতের গলিত ধাতুস্রোতে তাঁর রথের চাকা রক্তিম হল, অভিযানের কোলাহলে মিশ্রিত হল তূর্যধ্বনি, রাজা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করলেন; পুলিন্দরা তাঁর কাছে নানা উপঢৌকন নিয়ে এল।

বিন্ধ্যের অবতরণপ্রদেশে গজশ্রেণীর সেতুবন্ধন করে তিনি পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাকে উত্তরণ করলেন; আকাশপথে-পারাপার-করা চঞ্চল পাখার বাতাসে হংসশ্রেণী তাঁকে অনায়াসে ব্যজন করল।

তিনি (কুশ) তরণীচঞ্চলা ত্রিস্রোতাকে (গঙ্গাকে) প্রণাম করলেন; কপিলমুনির রোষে কুশের পূর্বপুরুষেরা ভস্মসাৎ হয়ে গেলে তাঁরই স্পর্শে তারা (আবার) স্বর্গে গমন করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে পথ শেষ হলে কুল সরযূর তীরে উপস্থিত হলেন, দেখলেন যজ্ঞানুষ্ঠাতা রঘুবংশীয়দের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত শত শত যূপকাষ্ঠ সেখানে শোভমান।

কুলরাজধানীর উপবনের বাতাস ফুলগাছের শাখা কাঁপিয়ে শীতল সরযূনদীর তরঙ্গমালাকে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়ে তাঁর এবং ক্লান্ত সৈন্যবর্গকে যেন প্রত্যুদগমন করল।

তাঁর শত্রুকুল উচ্ছিন্ন, পুরবাসীদের সখা তিনি, বংশের পতাকাস্বরূপ, পরাক্রমশালী রাজা চঞ্চল পতাকায় শোভিত সৈন্যদলকে নগরীর উপকণ্ঠে সন্নিবেশিত করলেন।

প্রভুর আদেশে শিল্পীরা সবরকম উপকরণে সেই অবস্থা থেকে (অযোধ্যা) নগরীকে নতুন করে তুললেন ; মেঘেরা যেমন জলবর্ষণ করে গ্রীষ্ম-দগ্ধ পৃথিবীকে সজীব করে তোলে তেমনি।

তারপর, রঘুশ্রেষ্ঠ (কুশ) উপবাসী, বাস্তুযজ্ঞে-নিপুণ ব্রাহ্মণদের হাতের পশুবলি-উপহারে বিশাল দেবালয়যুক্ত নগরীর অর্চনা সম্পাদন করলেন।

রাজা কুশ কান্তার হৃদয়ে কামীর মতো অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং অনুজীবীদেরও সম্মান অনুসারে এবং পদমর্যাদা অনুসারে ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি--বন্ধনস্তম্ভে নিয়মে নিগাড়িত ; বিপণিতে দ্রব্য-সম্ভার—অযোধ্যা ঝলমল করে উঠল ; যেন আপাদমস্তক অলংকৃতা কোনো নারী।

এইভাবে পূর্বশোভায় শোভাময়ী রঘুবংশের কুলরাজধানীতে বাস করে মহারাজ কুশের স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পদে অথবা অলকাপতির (কুবেরের) ঐশ্বর্যেও স্পৃহা ছিল না।

গ্রীষ্মকাল, কুশের জলবিহার

তারপর গ্রীষ্মকাল এল,

যেন প্রিয়ার বেশভূষা উপদেশ করার জন্যেই সে এসেছে ; (গ্রীষ্মে কামিনীদের) উত্তরীয়ে রত্নখচিত, পাণ্ডুর স্তনে হারশোভিত, নিঃশ্বাসেও উড়ে যায় এমনই সূক্ষ্ম তাদের বসন।

দক্ষিণদিক থেকে সূর্য উত্তরায়ণে এগিয়ে এলে উত্তরদিক হিমালয়ের বরফগলা জলে যেন আনন্দশীতল অশ্রুবর্ষণ করল।

পরিণত গ্রীষ্মে দিনে প্রচণ্ড তাপ, রাত্রি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল ; পরস্পর (প্রণয়-) কলহে যেন জায়াপতি বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুতাপে কষ্ট পাচ্ছে।

দিনে দিনে গৃহদীর্ঘিকার জলরাশি সোপানপর্বের নীচে নেমে গেল, সেখানে শৈবালদল দেখা দিল, পদ্মের মৃণাল ভেসে উঠল—জলের শোভা নারীর নিতম্বের মতো হল।

বনে বনে সন্ধ্যামল্লিকার কোরক ফুটছে, সৌরভে চারিদিক ভরপুর ; তাদের প্রত্যেকটিতে গুঞ্জনরত ভ্রমর উড়ে বসছে, সে যেন তাদের সংখ্যা গুণছে।

কামিনীদের কপোলদেশ আর্দ্র এবং (প্রিয়তমের) সদ্য-নখক্ষতে লাঞ্ছিত ; তাই তাদের কান থেকে শিরীষফুল খুলে খসে পড়ল না, কপোলে তার শিখাটি জড়িয়ে থাকল।

ধনশালী মানুষেরা ধারাগৃহসমূহে যন্ত্রসঞ্চালিত সুশীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ এবং চন্দনজলে বিধৌত (চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি) শিলাবিশেষে শয়ন করে গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করলেন।

বসন্তশেষে কামদেবের শক্তি যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, সুন্দরীদের স্নানসিক্ত ধূপ-বাসিত কেশকলাপ দেখে এবং সন্ধ্যায় তাতে মল্লিকাকুসুমের শোভা দেখে তাঁর নতুন শক্তি এল।

অর্জুনগাছের মঞ্জরীতে পরাগ লেগে পিঞ্জরবর্ণ হয়ে তা অপূর্ব শোভা পেল ; মনে হল মহাদেবের রোষে মদনের শরীর দগ্ধ হবার পরেও তার খণ্ড-বিখণ্ড ধনুকের জ্যা।

স্বয়ং সুগন্ধি আম্রপল্লব ভঙ্গ করে, সুগন্ধ পুরাতন আসবে ও সুগন্ধি নতুন পাটল-ফুলে গ্রীষ্মকাল নিদাঘতপ্ত কামিজনদের সব কষ্ট দূর করল।

গ্রীষ্মকাল প্রচণ্ড হয়ে উঠলে দুটি বস্তু মানুষের প্রীতিকর হল—নবোদিত রাজা এবং চাঁদ—যার পাদ-(কিরণ-সেবায়) দুঃখ (নিদাঘসন্তাপ) দূর হয়।

সরযূর ঢেউয়ের ছন্দে তীরে রাজহংসেরা উন্মাদ নৃত্য করে, বৃক্ষলতা পুষ্পভারে আনত, রমণীবল্লভ তাঁর (কুশের) ইচ্ছা হল গ্রীষ্মে সুখাবহ সেই নদীতে বিহার করেন।

চক্রধারীর (বিষ্ণুর) প্রভাবসম্পন্ন তিনি তীরভূমিতে মণ্ডপ নির্মাণ করালেন, জেলেদের দিয়ে সরযূকে হাঙর-কুমির-মুক্ত করালেন ; তারপর নিজের সম্পদ ও গৌরব অনুসারে জলবিহারের উপক্রম করলেন।

তার (সরযূনদীর) সোপানপথে বিলাসিনীরা অবতরণ করতে থাকল, তাদের পরস্পরের কেয়ূরঘর্ষণে এবং পদসঞ্চালনেম মুখরিত নূপুরের শব্দে হংসশ্রেণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

তারা পরস্পরের উপরে জলসেচনে মত্ত ; নৌবিহারী রাজা তাদের স্নান দেখতে দেখতে পার্শ্বচারিণী চামরধারিণী কিরাতবালাকে বললেন—

'দেখ। আমার শত শত অন্তঃপুরিকা স্নান করছে, তাদের অঙ্গরাগ ধুয়ে জলে মিশে গেছে ; সরযূর জলপ্রবাহকে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালের মতো বহু বর্ণরঞ্জিত মনে হচ্ছে।

নৌকাতরঙ্গিত জলে পুরসুন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল, (জলকেলির পরে) তাদের চোখে মদরাগশোভার মধ্যে দিয়ে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গুরুশ্রোণিভারে ও পীন-পয়োধরে দেহটি বহন করতেও তাদের কষ্ট ! তবুও এই বালিকারা মাতোয়ারা হয়ে হাতের কেয়ূর বলমলিয়ে কষ্ট করে করে সাঁতার দিচ্ছে।

জলবিহারিণীদের কানের অবতংস শিরীষফুল খসে পড়ে নদীর স্রোতে ভাসছে যেন শৈবালদল—তাইতে শৈবাললুব্ধ মৎস্যকুল প্রতারিত হচ্ছে।

জলাস্ফালনে তৎপর কামিনীকুল, তাদের পয়োধরলগ্ন মুক্তাহার ছিঁড়ে (মুক্তা) ছড়িয়ে পড়লেও মুক্তাফলসদৃশ জলকণার মধ্যে তাকে চেনা যাচ্ছে না।

অদূরের ঐ বস্তুগুলি বিলাসিনীদের রূপ এবং অবয়বের উপমান হয়েছে—জলের ঘূর্ণি নাভিসৌন্দর্যের উপমান, তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গের এবং চক্রবাকমিথুন স্তনযুগলের উপমান।

এদের জলকেলির শ্রুতিমধুর মৃদঙ্গধ্বনির সুরধুনী কান ভরে দিচ্ছে—কলাপ মেলে মধুর কেকাধ্বনিতে তীরস্থলীর ময়ূরেরা তাকে অভিনন্দিত করছে।

অঙ্গনাদের নিতম্বে সিক্ত বসন সংলগ্ন হয়ে আছে, চাঁদের আলোয় অল্প-প্রকাশিত নক্ষত্রমালার মতো মেখলাটি দেখা যাচ্ছে ; সুতোর পথটি জলে ভরে যাওয়াতে রশনাদাম নিঃশব্দ।

একদল আচমকা আঁজলাভরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, অন্যেরা তেমনি করেই আবার

তাদের মুখে জল দিচ্ছে, তাদের অলক আর কুঞ্চিত নেই, মুখের প্রসাধন মিশে গিয়ে রক্তাভ জল ঝরাচ্ছে তারা।

ওদের কেশপাশ খুলে পড়েছে, পত্রলেখা ধুয়ে গেছে, মুক্তাখচিত কর্ণভূষণ খসে পড়েছে—জলবিহারে ক্লান্ত হলেও প্রমদাজনের মুখশ্রী সত্যিই সুন্দর লাগছে।

নৌকাযান থেকে জলে নেমে তিনি (কুশ) গলার হার দুলিয়ে তাদের সঙ্গে কেলি করলেন—যেন গজরাজ স্কন্ধলগ্ন উৎপাটিত পদ্মিনীকে নিয়ে করেণুদের সঙ্গে মিলিত হল।

বিলাসচঞ্চল তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরাঙ্গনাদের অতিশয় শোভা হল; মুক্তা এমনিতেই সুন্দর, তাতে উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণির যোগ ঘটলে তো কথা নেই।

আয়তনয়নারা কাঞ্চনশৃঙ্গযুক্ত যন্ত্র দিয়ে তাঁর উপরে বর্ণরঞ্জিত বারি-সেচন করল—ধাতুদ্রবস্রাবী হিমালয়ের মতোই তিনিও সে-অবস্থায় অত্যন্ত সুন্দর শোভা পেলেন।

এইভাবে

অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নদীশ্রেষ্ঠ সরযুতে যখন তিনি বিহার করছিলেন তখন আকাশগঙ্গাতে অপ্সরাগণের সঙ্গে কেলিপরায়ণ ইন্দ্রের শোভাকেই যেন তিনি অনুকরণ করেছিলেন।

হারানিধিপ্রাপ্তি ঃ কুমুদ্বতী লাভ

যে জয়প্রদ আভরণ রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির কাছে পেয়েছিলেন, যা তিনি রাজ্যের সঙ্গে কুশের হাতে অর্পণ করেছিলেন জলবিহারকালে সেই অলংকার তাঁর অজান্তে কোথায় পড়ে ডুবে গেল।

মনের সাধে রমণীকুলের সঙ্গে স্নান সেরে তীরের মণ্ডপে আসামাত্র বেশবিন্যাসের পূর্বেই দেখলেন—তাঁর বাহুতে দিব্য বলয়টি নেই।

সেটি জয়শ্রীর মোহনমন্ত্রস্বরূপ এবং তা পরমগুরু পিতৃদেবের অলঙ্কার ছিল; তাই তাকে হারানো কুশের পক্ষে অসহ্য, লোভের কারণে নয়—যেহেতু কুসুম ও আভরণ দুইই তাঁর চোখে সমতুল্য।

তৎক্ষণাৎ তিনি নিপুণ ডুবুরি ও জালিকদের আদেশ দিলেন (রত্ন) সন্ধান করতে; সরযুতে জাল ফেলেও তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হল—তারা বিষণ্নমুখে এসে তাঁকে বলল—

প্রভু! অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু জলের মধ্যে থেকে আপনার শ্রেষ্ঠ অলংকার পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই কুমুদ-নাগ, এই হ্রদের ভেতরই যার বাসভূমি, লোভে পড়ে সেটিকে হরণ করেছে।

তখন সেই ধনুর্ধর ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে প্রবল পরাক্রমে তীরদেশে গিয়ে ধনুকে গুণ টেনে সর্পকে বিনাশের উদ্দেশ্যে 'গারুত্মত' (গারুড়াস্ত্র) অস্ত্র গ্রহণ করলেন।

সেই অস্ত্র যোজনা করামাত্র প্রবল ঘূর্ণিতে তরঙ্গ-হস্তের আন্দোলনে হ্রদ চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের ঢেউগুলি প্রবল বেগে তীরে আছড়ে পড়ল. যেন কোনো বন্যগজ বন্ধনগর্তে পতিত হয়ে ক্ষুব্ধ গর্জন করছে।

যেন সমুদ্র-মন্থন হচ্ছে, জলজন্তুরা ভয় পেয়ে গেল; হঠাৎ (সমুদ্রমন্থনকালে) লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে পারিজাতবৃক্ষের মতো একটি কন্যাকে সামনে নিয়ে ভুজঙ্গরাজ উঠে এলেন।

রাজা (কুশ) দেখলেন, তিনি ভূষণটি প্রত্যর্পণের জন্যে হাতে নিয়ে এসেছেন; সঙ্গে সঙ্গে গারুড়াস্ত্র প্রতিসংহার করলেন—বিনীতদের প্রতি সজ্জনেরা ক্রোধ পোষণ করেন না।

(নাগরাজ) কুমুদ ঐ অস্ত্রের মহিমা জানতেন; তিনি নিজের গর্বোন্নত মস্তক আনত করে ত্রিলোকপতির (রামচন্দ্রের) আত্মজ এবং নিজ শক্তিতে শত্রুকুলের অঙ্কুশস্বরূপ কুশকে বন্দনা করে বললেন—

বিশেষ (দেব-) কার্যসাধনের জন্যে যিনি মনুষ্যশরীর গ্রহণ করেছিলেন সেই ভগবান বিষ্ণুরই আপনি পুত্ররূপ অন্য মূর্তি—এ তো আমি জানি। সেই আমি সর্বজন-পূজ্য আপনার সন্তোষের প্রতিকূল কোনো কাজ কেন করব?

এই বালিকা হাতে একটি কন্দুক নিয়ে আঘাত করে করে খেলা করছিল, অন্তরীক্ষ থেকে পতিত জ্যোতির মতো আপনার এই জয়শীল আভরণটি দেখে সে কৌতূহলের বশে তা গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং যে বাহু ধনুকের জ্যা-আকর্ষণে কিণাঙ্কিত এবং যে বাহু বসুমতীর রক্ষাকল্পে অর্গলস্বরূপ সেই আজানুলম্বিত বাহুতে এটি আবারও যুক্ত হোক।

রাজন! আপনার চরণযুগল চিরকাল সেবা করে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতী তার অপরাধ ক্ষালন করতে আগ্রহী, আপনি একে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কুমুদ অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করলেন; রাজা বললেন—'হে কুমুদ! আপনার মতো কুটুম্ব আমার গর্বের বিষয়'। তারপর আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কুলের অলঙ্কার-স্বরূপ সেই কন্যাকে কুমুদ যথাবিধি (রাজার হাতে) সমর্পণ করলেন।

নররাজ যখন শিখাযুক্ত অগ্নির সমুখে তার (কুমুদ্বতীর) মাঙ্গলিক ঊর্ণাবলয়-ভূষিত হস্ত গ্রহণ করলেন তখন দিগন্ত পূরিত করে দিব্য তূর্যধ্বনি উত্থিত হল। তারপর আশ্চর্য সব মেঘেরা অত্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করল।

এইভাবে ত্রিভুবনপতি (রামের) ও মৈথিলীর পুত্রকে বন্ধু পেয়ে নাগরাজ পিতৃহন্তা বিনতানন্দন গরুড়ের ভয় থেকে মুক্ত হলেন; কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র তাঁকে (কুমুদকে) বন্ধু পেয়ে নাগভয়শূন্য পৃথিবীকে শাসন করে পুরবাসীদের অধিকতর প্রিয়পাত্র হলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'কুমুদ্বতীপরিণয়' নামক ষোড়শ সর্গ ॥

সপ্তদশ সর্গ

পুত্র অতিথির জন্ম

রাত্রির শেষ প্রহর থেকে চেতনা যেমন প্রসাদ (প্রসন্নতা) লাভ করে, কুমুদ্বতীও তেমনি মহারাজ কুশ থেকে 'অতিথি' নামে পুত্র লাভ করলেন।

সবিতা যেমন উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পথই পবিত্র করেন পিতৃমান অনুপমকান্তি অতিথিও তেমনি মাতা ও পিতা উভয়েরই বংশ পবিত্র করলেন।

অর্থশাস্ত্রবিদদের অগ্রগণ্য পিতা (কুশ) প্রথমে অতিথিকে কুলবিদ্যাগুলির অর্থ গ্রহণ করিয়ে পরে রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করালেন।

সদ্বংশজাত, বীর ও জিতেন্দ্রিয় কুশ পুত্র অতিথিকে পেয়ে একাকী হয়েও নিজেকে অনেক বলে মনে করলেন।

কুশ সূর্যকুলের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে গিয়ে যুদ্ধে দুর্জয়-নামে দৈত্যকে বধ করলেন, নিজেও নিহত হলেন তারই হাতে।

জ্যোৎস্না যেমন কুমুদফুলের আনন্দদায়ক চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনি নাগরাজ কুমুদের ভগ্নী কুমুদ্বতীও কুশের অনুগমন করলেন।

তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন (কুশ) ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্ধাংশে উপবেশনের অধিকার পেলেন, অন্যজন (কুমুদ্বতী) শচীর সহচরী হয়ে পারিজাতকুসুমের অংশভাগিনী হলেন।

অতিথির অভিষেক

যুদ্ধে যাবার সময় মহারাজ কুশের অন্তিম আদেশ স্মরণ করে মন্ত্রিবৃদ্ধেরা তাঁর পুত্র অতিথিকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন।

তাঁরা (মন্ত্রিবৃদ্ধেরা) তাঁর (অতিথির) অভিষেকের জন্যে শিল্পীদের দিয়ে উঁচু বেদী সমেত চতুঃস্তম্ভমণ্ডিত নূতন মণ্ডপ নির্মাণ করালেন।

সেখানে (সেই মণ্ডপে) ভদ্রপীঠে উপবেশন করিয়ে মন্ত্রীরা হেমকুম্ভে সঞ্চিত তীর্থবারি নিয়ে তাঁর কাছে এলেন।

আহত-মুখ তূর্যের স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে তাঁর চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ সূচিত হল।

বৃদ্ধ কুটুম্বেরা দূর্বা, যবাঙ্কুর, বটছাল ও অসম-বিকশিত পল্লবাদি দিয়ে তাঁর আরতি করলেন।

পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণেরা বিজয়প্রদ অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই জয়শীল অতিথির অভিষেক করতে আরম্ভ করলেন।

তখন তাঁর মাথায় সবেগে ও সশব্দে পতিত অভিষেকজলের শোভা শিবের মাথায় পতিত গঙ্গার মতো মনোজ্ঞ মনে হল।

সেই সময়ে বন্দীরা তাঁকে স্তব করতে লাগল। মনে হল চাতকেরা যেন জলসম্ভৃত মেঘকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বর্ষণসিক্ত হলে বিদ্যুতের অগ্নির দ্যুতি যেমন বৃদ্ধি পায় সুমন্ত্রপূত অভিষেক জলে স্নাত হওয়ায় অতিথির কান্তিও তেমনি বৃদ্ধি পেল।

অভিষেক শেষ হলে অতিথি স্নাতকদের (গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের) এত ধনরত্ন দান করলেন যে, তা দিয়ে তাঁরা পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে (বড় বড়) যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবেন।

পরিতুষ্ট মনে তাঁরা অতিথিকে যে আশীর্বাদ দিলেন তাঁর সৎকর্ম-অর্জিত (সাম্রাজ্যাদি) ফললাভে সেই আশীর্বাদ দূর থেকেই নিবর্তিত হল।

তিনি বন্দীদের মুক্তি দেবার, বধ্যদের দণ্ড রহিত করার, ভারবাহী পশুদের ভার মোচনের এবং বৎসদের পানের জন্যে ধেনুদের দোহন বন্ধ করার আদেশ দিলেন।

খাঁচায় বন্দী শুক প্রভৃতি ক্রীড়াবিহঙ্গেরাও তাঁর আদেশে মুক্তি পেয়ে যার যেদিকে খুশি উড়ে গেল।

তারপর তিনি রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হবার জন্যে প্রাসাদের মধ্যেকার একটি কক্ষে সাজানো আস্তরণমণ্ডিত গজদন্ত-আসনে উপবেশন করলেন।

প্রসাধকেরা জলে হাত ধুয়ে, ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর চুলের প্রান্ত শুকিয়ে রাজোচিত নানা বসনভূষণে তাঁকে সাজিয়ে দিল।

তারা (প্রসাধকেরা) মুক্তাগুণ দিয়ে তাঁর চুল একটু উঁচু করে বেঁধে দিল এবং তার মধ্যে মালা বসিয়ে তা রশ্মিজালমণ্ডিত পদ্মরাগমণিতে খচিত করল।

(তারা) মৃগনাভিসুবাসিত চন্দনে অঙ্গরাগ শেষ করে গোরোচনাদি সহযোগে পত্ররচনা করে দিল।

রাজলক্ষ্মীরূপিণী বধূর বররূপী অতিথি পুষ্পমালা, মুক্তার আভরণ এবং কলহংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র ধারণ করে অত্যন্ত দর্শনীয় হলেন।

কেমন বেশভূষা হল তা দেখার জন্যে তিনি যখন সোনার আয়নার কাছে এলেন তখন তাতে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ায় তিনি উদিত সূর্যে প্রতিবিম্বিত মেরু-কল্পতরুর মতো শোভমান হলেন।

(তারপর) পার্শ্ববর্তী পুরুষেরা (ছত্রচামরাদি) রাজচিহ্ন ধারণ করে 'জয়ধ্বনি' করতে থাকলে অতিথি দেবসভাসদৃশ রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

(সভায়) চন্দ্রাতপশোভিত পৈতৃক সিংহাসনে বসলেন অতিথি। ঐ সিংহাসনের পাদপীঠ অন্যান্য রাজাদের চূড়ামণিতে বহু-ঘর্ষিত।

শ্রীবৎস-নামে প্রকোষ্ঠে চিহ্নিত সেই বিশাল মণ্ডপে যখন অতিথি প্রবেশ করলেন, তখন ঐ মণ্ডপ কেশবের কৌস্তুভমণি-ভূষিত শ্রীবৎস-চিহ্নিত বক্ষের মতো শোভা পেল।

অতিথি কুমার-ভাব থেকে ক্রমে যৌবরাজ্য এবং তারপর পূর্ণনৃপতিত্ব লাভ করে রেখাভাব থেকে ক্রমে অর্ধেন্দু এবং পরে পূর্ণেন্দুর মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

তিনি প্রসন্নমুখে থাকতেন এবং সবার সঙ্গেই হেসে কথা বলতেন, অনুজীবীরা তাঁকে মূর্তিমান বিশ্বাস বলে মনে করত।

তিনি ছিলেন সম্পদে ইন্দ্রতুল্য, তাঁর রাজপুরীতে ছিল কল্পতরুরূপ ধ্বজ। তাই ঐরাবতের মতো বলশালী হাতিতে চড়ে বিচরণ করে তিনি তাঁর রাজপুরীকে করে তুলেছিলেন স্বর্গ।

সেই একচ্ছত্র অতিথির মস্তকে ধৃত অমল প্রভায় মণ্ডিত রাজচ্ছত্রে সমস্ত জগতের পূর্বতন রাজার বিচ্ছেদজনিত তাপ দূর হল।

আগুনের প্রথমে ধোঁয়া পরে শিখা, সূর্যের প্রথমে উদয় পরে কিরণমালা। কিন্তু অতিথি তেজঃপদার্থের এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একেবারে প্রথমেই সমস্ত গুণগরিমায় ভূষিত হয়ে উদিত হলেন।

পুরনারীরা প্রীতি-বিকশিত নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। মনে হল রাত্রিরা যেন শরতের নির্মল নক্ষত্রের জ্যোতিতে ধ্রুবকে দেখছে।

বড় বড় মন্দিরে যে-সব দেবতার পুজো করা হত, অযোধ্যার অর্চিত দেবতারা নিজের নিজের প্রতিমায় আবির্ভূত হয়ে অনুগ্রহাস্পদ অতিথিকে অনুগৃহীত করলেন।

অতিথির রাজ্যশাসন

অতিথির অভিষেকজলে সিক্ত বেদী ভালো করে না শুকোতেই তাঁর দুঃসহ প্রতাপ

সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল।

গুরু বশিষ্ঠের মন্ত্র এবং ধনুর্ধারী অতিথির বাণ এ দুইয়ে মিলিত হয়ে যা করা সম্ভব তাকে সম্পাদন করে নি এমন কী আছে?

বাদী ও প্রতিবাদীদের যে-সমস্ত মামলা-মোকর্দমার বিচার বেশ জটিল, তিনি ধর্মপরায়ণ বিচারকদের সহায়তায় অতন্দ্রিত থেকে সেগুলি নিজেই বিচার করতেন।

তারপর তাঁর সিদ্ধান্তের ফল অনুজীবীদের জানাতেন। তারা ঈপ্সিতফল শুনতে পেয়ে প্রীতি প্রকাশ করত। এ ফল যে সুখকর হবে তা তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখে আগেই বোঝা যেত।

প্রজারা তাঁর পিতার সময়ে শ্রবণমাসের নদীর মতো বৃদ্ধিলাভ করেছিল সত্য কিন্তু অতিথির রাজত্বে তারা ভাদ্রমাসের নদীর মতো আরও বেশী সমৃদ্ধি লাভ করল।

তিনি যা বলতেন তা মিথ্যা হত না। যা দান করতেন তা আর গ্রহণ করতেন না। কিন্তু শত্রুদের ব্যাপারে তিনি এ ব্রত ভঙ্গ করতেন (অর্থাৎ এর বৈপরীত্য ঘটত), কারণ তাঁদের সমূলে উৎপাটিত করে আবার যার যার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতেন (অর্থাৎ রাজ্য গ্রহণ করে তা আবার দান করতেন)।

নবীন বয়স, রূপ ও সম্পদ এর যে কোনো একটিই মত্ততার কারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে সমস্ত-কিছু মিলিতভাবে থাকলেও তাঁর মন কখনও মত্ত (গর্বিত) হয় নি।

এইভাবে প্রতিদিন প্রজাদের অনুরাগ জন্মিয়ে রাজা নূতন হলেও তা দৃঢ়মূল তরুর মতো অবিচল হল।

বাইরে শত্রুরা অনিত্য, কারণ তারা দূরবর্তী, তাই তিনি ভিতরের (কামক্রোধাদি) ছয়টি শত্রুকে আগে জয় করলেন।

লক্ষ্মী স্বভাবচপলা হলেও সেই প্রসন্নমুখ রাজাতে নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখার মতো স্থির হয়ে রইলেন।

কেবল নীতি কাতরতামাত্র, কেবল শৌর্য শ্বাপদের ধর্ম। তাই তিনি (নীতি ও শৌর্য) উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সিদ্ধিলাভে যত্নবান হলেন।

গুপ্তচররূপ রশ্মিতে ব্যাপ্ত থাকায় মেঘমুক্ত সূর্যমণ্ডলের মতো সেই অতিথির রাজ্যমণ্ডলে কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

দিন ও রাত্রিকে সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে যে-সময় রাজার যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট অতিথি তা নিঃসংশয়ে নিয়ম মতো পালন করতেন।

প্রতিদিনই তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতেন। তার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা কখনও প্রকাশ হয়ে যেত না, কারণ সে মন্ত্রণার দ্বার ছিল গুপ্ত (অর্থাৎ আভাসে ইঙ্গিতে সে মন্ত্রণা চলত)।

অতিথি যথাসময়ে নিদ্রিত হলেও শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সর্বত্র পরস্পরের অজ্ঞাত চর নিযুক্ত থাকায় মনে হত তিনি যেন সর্বদা জেগেই আছেন।

তিনি স্বয়ং শত্রুদের অবরোধক ছিলেন, তবু দুর্গগুলিকে তিনি শত্রুর কাছে দুর্গ্রহ করে রেখেছিলেন কিন্তু ভীত হয়ে তিনি তা করেন নি, (কারণ) গজজয়ী সিংহ ভয় পেয়ে গিরিগুহায় শয়ন করে না।

রাজ্যের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই কৃতাকৃত্য বিচার করে তিনি কাজ করতেন বলে তা সফল হত। শালিধান যেমন কাণ্ডের মধ্যেই পেকে যায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাঁর

কাজও তেমনি অপ্রকাশ্যভাবেই ফল প্রসব করত।

তিনি সমৃদ্ধিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও কখনও বিপথে যেতেন না। যেমন, সমুদ্র উদ্বেলিত হলেও নদীমুখেই তার গতি, অন্য পথে নয়।

প্রজাদের বিরাগ তৎক্ষণাৎ দমন করতে তিনি অবশ্যই সমর্থ ছিলেন, কিন্তু যার প্রতিকার করতে হবে তাকে তিনি জন্মাতেই দিতেন না।

তিনি শক্তিমান হলেও অপেক্ষাকৃত হীনবলের বিরুদ্ধেই অভিযান করতেন। কারণ, বায়ু সহায় থাকলেও দাবানল (তৃণকাষ্ঠাদিরই অন্বেষণ করে) জলের অন্বেষণ করে না।

তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকে সমানভাবে সেবা করতেন। কখনও অর্থ ও কামসেবায় ধর্মের, ধর্মসেবায় অর্থ ও কামের এবং কামসেবায় অর্থের বা অর্থসেবায় কামের বাধা জন্মাতেন না।

মিত্রেরা হীন হলে কোনো উপকারে আসে না আবার তাদের শক্তি বেড়ে গেলে তারা বিরুদ্ধে যায়। তাই মিত্রেরা যাতে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে অতিথি সেই ব্যবস্থা করতেন।

(অভিযানের আগে) তিনি নিজের বল ও শত্রুর বলের আধিক্য বা ন্যূনতা বিচার করে যদি নিজেকে শত্রুর চেয়ে সর্বদিক দিয়ে শক্তিমান মনে করতেন তবেই যুদ্ধযাত্রা করতেন, না হলে বিরত থাকতেন।

ধনাগারে ধনসঞ্চয় থাকলে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া যায়, তাই তিনি ধনসঞ্চয়ে তৎপর ছিলেন, (লোভবশতঃ নয়)। যে মেঘে জল থাকে চাতকেরা তাকেই অভিনন্দন জানায়।

তিনি নিজের কর্তব্যকাজে অবহিত থেকে শত্রুর কাজ পণ্ড করতেন, এবং রন্ধ্র অন্বেষণ করে শত্রুকে আঘাত করতে করতে নিজের রন্ধ্র আবৃত করতেন (অর্থাৎ নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করতেন)।

সেনাসমৃদ্ধ সেই রাজার পিতা যে-সব যুদ্ধবিশারদ সুশিক্ষিত সৈন্য পোষণ করতেন তিনি তাদের নিজের দেহ থেকে পৃথক মনে করতেন না।

এই রাজার সাপের মাথার মণির মতো তিনটি শক্তি শত্রুরা আকর্ষণ করতে পারত না, তিনি কিন্তু অয়স্কান্ত মণি যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি করে শত্রুর সেই শক্তি আকর্ষণ করে নিতেন।

(তাঁর রাজ্যে) বণিকদল নদীগুলিতে বাড়ির পুকুরের মতো, বনগুলিতে উপবনের মতো এবং পাহাড়গুলিতে নিজের বাড়ির মতো যথেচ্ছ বিচরণ করত।

(রাক্ষসাদির) উপদ্রব থেকে তপস্যাকে রক্ষা করে, তস্করদের হাত থেকে (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের) সম্পদ রক্ষা করায় তিনি রাজস্বের মতো বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মেরও ষড়ংশভাগী ছিলেন।

বসুন্ধরা খনি থেকে রত্ন, ক্ষেত্র থেকে শস্য এবং অরণ্য থেকে মাতঙ্গ অর্পণ করে রাজাকে রক্ষার অনুরূপ বেতন দিতেন।

কার্তিকেয়র মতো পরাক্রান্ত অতিথি যেখানে প্রয়োজন সেখানে ছয় রকম গুণ ও বলের প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে চাররকম রাজনীতি প্রয়োগ করে তিনি মন্ত্রাদি আঠারোটি বিষয় পর্যন্ত অবাধে সেই রাজনীতির ফল লাভ করতেন।

কূট যুদ্ধ জানলেও তিনি ধর্মসম্মত যুদ্ধই করতেন, তাই বীরানুরাগিণী জয়লক্ষ্মী

অভিসারিকার মতো তাঁর অনুগামিনী হত।

তাঁর অখণ্ড প্রতাপে প্রায় সমস্ত শত্রুই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। গন্ধগজের মদগন্ধে অন্যান্য গজেরা যেমন দূর থেকেই পালায় (প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগোয় না), তেমনি অতিথিরও যুদ্ধ প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়েছিল।

বৃদ্ধিলাভ করে চাঁদ আবার ক্ষীণ হয়, সমুদ্রও তেমনি। কিন্তু অতিথির সমভাবে বৃদ্ধি হলেও চাঁদ ও ও সমুদ্রের মতো কখনও তিনি ক্ষীণ হন নি।

(জলহীন) মেঘ যেমন সাগরের কাছে গিয়ে (জললাভ করে) দাতা হয় (অর্থাৎ পৃথিবীকে জলদান করে), তেমনি অত্যন্ত দরিদ্র বিদ্বান প্রার্থী মহান সেই রাজার কাছে গিয়েও দাতা হতে পারতেন (অর্থাৎ অন্যকে দান করবার মতো ধনলাভ করতে পারতেন)।

তিনি প্রশংসনীয় কাজ করতেন কিন্তু কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি লজ্জিত হতেন এবং স্তাবকদের উপরে রুষ্ট হতেন। কিন্তু এতে তাঁর যশ বেড়েই যেত।

তিনি উদিত সূর্যের মতো দর্শনেই পাপনাশ করে যথার্থই অন্ধকার দূর করে সর্বদা প্রজাদের অনন্য করে তুলতেন।

চাঁদের কিরণ পদ্মে প্রবেশ করে না, সূর্যের কিরণ কুমুদে স্থান পায় না, কিন্তু সেই গুণীর গুণরাশি বিপক্ষেও (শত্রুপক্ষে) স্থান লাভ করত।

অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনে জয়েচ্ছু অতিথির উদ্যমের উদ্দেশ্য যদিও শত্রুর সম্পদ আহরণ, তবুও তা ধর্মপালনের জন্যেই (বিলাসের জন্যে নয়)।

এইভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলে সমৃদ্ধি লাভ করে, ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রাজা, তিনিও তেমনি (মর্ত্যে) রাজাদের রাজা হলেন।

রাজধর্ম যথাযথভাবে পালনের জন্যে লোকে তাঁকে ইন্দ্রাদি চতুর্লোকপালকের পঞ্চম, ক্ষিতি-আদি পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ এবং মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতরাজির অষ্টম বলত।

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের শাসন নতমস্তকে গ্রহণ করেন, তেমনি তিনি পত্রযোগে কোনো আদেশ পাঠালে রাজারা দূর থেকেই রাজচ্ছত্র অবনত করে তা শিরোধার্য করতেন।

তিনি মহাযজ্ঞে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের এত ধন দিয়ে অর্চনা করেছিলেন যে সেই রাজার এবং কুবেরের নাম সাধারণ্যে সমভাবেই কীর্তিত হত।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করতেন, যম মহামারী নিবারণ করতেন, বরুণ নৌচালনার জন্যে সমস্ত জলপথই নিরাপদ রাখতেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মহিমা জানতেন বলে কুবের তাঁর কোষ বৃদ্ধি করতেন। এইভাবে লোকপালেরা তাঁর সঙ্গে শরণাগতের মতো আচরণ করতেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অতিথিবর্ণনা' নামক সপ্তদশ সর্গ ॥

অষ্টাদশ সর্গ

অতিথির পরে

শত্রুদমনকারী তিনি (অতিথি) নিষধদেশাধিপতি রাজা অর্থপতির কন্যার গর্ভে নিষধ-পর্বতের তুল্য দৃঢ়কায় এক পুত্র উৎপাদন করলেন ; তার নাম রাখা হল 'নিষধ'।

পরম্পরাক্রান্ত পুত্র (নিষধ) যৌবনে পদার্পণ করলে, ভবিষ্যতে তার দ্বারা প্রজা-

পুত্রের অশেষ মঙ্গল হবে, এই মনে ভেবে পিতা আনন্দিত হলেন, যথাকালে বর্ষণে শস্য ফলোন্মুখ হলে জীবলোক যেমন আনন্দ পায় তেমনি।

কুমুদ্বতীর পুত্র (অতিথি) শব্দ প্রভৃতি সকল সুখ সম্ভোগ করে তাঁর (নিষধের) উপরে রাজত্ব ন্যস্ত করে কুমুদের মতো নির্মল কর্মযজ্ঞে অর্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন।

কুশের পৌত্র পদ্মলোচন সাগরের মতো প্রশান্তচেতা, অপ্রতিহত বীর, তাঁর বিশাল বাহু নগরতোরণদ্বারের অর্গলের মতো—তিনি সসাগরা ধরণীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করলেন।

তাঁর পুত্রের নাম 'নল'—তিনি অনলের মতো তেজস্বী এবং কমলতুল্য তাঁর বদন; পিতার দেহান্তে তিনি রাজলক্ষ্মীকে লাভ করলেন এবং মাতঙ্গ যেমন নলবহুল স্থানকে বিমর্দিত করে তেমনি শত্রুবলকে বিমর্দিত করলেন।

তিনি (নল) 'নভঃ' নামে এক পুত্র লাভ করলেন, নভশ্চর (সিদ্ধ-গন্ধর্বগণ) তাঁর যশোগান করতেন, নভস্তলের মতো শ্যামল তাঁর গাত্রবর্ণ, জীবলোকের কমনীয় নভোমাসের (শ্রাবণমাসের) মতো তিনি প্রজাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

পরমধার্মিক তিনি (নল) প্রভাবশালী পুত্রকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং (তারপর) জরা আসন্ন বুঝে সংসারনিবৃত্তির জন্যে (বাণপ্রস্থ নিয়ে) মৃগকুলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

গজকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকের মতো তাঁর (নভঃ-এর) পুণ্ডরীক নামে একটি অজেয় পুত্র জন্ম নিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্বেতকমলধারিণী (রাজ্য-) লক্ষ্মী পুণ্ডরীকাক্ষের মতো করেই তাঁকে বরণ করলেন।

সেই অব্যর্থ ধনুর্ধর (পুণ্ডরীক) প্রজাকুলের মঙ্গলবিধানে সমর্থ, ক্ষমাগুণান্বিত 'ক্ষেমধন্বা' নামে পুত্রকে পৃথিবীর আধিপত্যে নিযুক্ত করে ক্ষমাপূর্ণ হৃদয়ে বনে তপশ্চারণ করতে গেলেন।

তাঁরও (ক্ষেমধন্বার) যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দেবপ্রতিম এক পুত্র জন্ম নিল। সেই 'দেবানীকের' খ্যাতি দেবলোক পর্যন্ত বিশ্রুত ছিল।

সেই পিতৃসেবাপরায়ণ পুত্রের (দেবানীকের) দ্বারা পিতা যেমন প্রকৃত পুত্রবান হয়েছিলেন, তেমনই পুত্রবৎসল পিতার দ্বারা পুত্রও যথার্থ পিতৃমান হয়েছিলেন।

সকল গুণের নিধিস্বরূপ পরম যাজ্ঞিক পিতা (ক্ষেমধন্বা) দীর্ঘকাল চতুর্বর্ণের প্রতিপালন করে নিজের সমকক্ষ পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গে গমন করলেন।

তাঁর সংযমী পুত্র বিনয়-গুণে স্বপক্ষের মতো বিপক্ষেরও প্রিয় ছিলেন। মাধুর্যগুণে (মধুর সঙ্গীতের প্রভাবে) একবার যে ভয় পেয়েছে এমন মৃগকেও বশীভূত করা যায়।

তাঁর নাম 'অহীনগু', বাহুবলেও অহীন ছিলেন তিনি, হীনসংসর্গে পরাঙ্মুখ থেকে তিনি যুবা বয়সেও অনর্থ ব্যসনে অনাসক্ত ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন।

মানুষের অন্তর্দর্শী, বুদ্ধিমান তিনি পিতার পর পৃথিবীতে অবতীর্ণ আদিপুরুষের (বিষ্ণুর) মতো চারটি উপায়ের সহায়তায় চতুর্দিকের অধিপতি হলেন।

শত্রুকুলজেতা তিনি পরলোকে গমন করলে উন্নত মস্তকে 'পারিযাত্র'-পর্বতকে যিনি

জয় করেছেন সেই 'পারিযাত্র'-নামে তাঁর পুত্রকে রাজশ্রী গ্রহণ করলেন।

তাঁর পুত্র 'শিল' উদারচরিত্র এবং শিলাপট্টের মতো বিশালবক্ষ। তিনি বাণ নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষকে জয় করে প্রশংসিত হলেও সংকুচিত হয়ে পড়তেন।

বহুপ্রশংসিত তিনি (পারিযাত্র) সংযতস্বভাব যুবক তাঁকে (শিলকে) যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করে সুখসমূহ ভোগ করলেন; কারণ, রাজার কাজ কারাজীবনের মতোই সুখের পরিপন্থী।

অনুরাগের ভোগবিলাসে তাঁর তখনও তৃপ্তি হয় নি; রতির প্রতি অকারণ বিদ্বেষ-বশতঃই যেন বৃদ্ধা ঈর্ষাপরায়ণ জরা বিলাসিনীদের বিশেষ সৌভাগ্যযুক্ত সম্ভোগের পাত্র তাঁকেও (পারিযাত্রকে) গ্রাস করল।

তাঁর পুত্রের নাম 'উন্নাভ', অথচ তাঁর নাভিরন্ধ্র অত্যন্ত নিম্ন ছিল, তিনি সব বিষয়ে পদ্মনাভ বিষ্ণুর সমকক্ষ ছিলেন এবং রাজমণ্ডলের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান কেন্দ্র (নাভি)।

তারপর তাঁর পুত্র বজ্রধর (ইন্দ্রের) মতো শক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধে বজ্রঘোষকারী, 'বজ্রণাভ' বজ্রমণির খনিতে ভরা বসুমতীর অধিপতি হলেন।

তিনি আপন পুণ্যফলে স্বর্গগত হলেন, তাঁর পুত্র 'শংখণ'—সেই পরন্তপ রাজাকে সসাগরা ধরণী নানা খনির বহুবিধ রত্ন-উপহারে সেবা করলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে সূর্যের মতো প্রভাবশালী, অশ্বিনীদ্বয়ের মতো সৌন্দর্যসম্পন্ন পুত্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করলেন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে আপন সৈন্য ও অশ্বকে সন্নিবেশিত (=উষিত) করেছিলেন বলে পুরাবিদেরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ব্যুষিতাশ্ব'।

ক্ষিতিপতি ব্যুষিতাশ্ব বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে বিশ্বের পরম বন্ধু এবং সমগ্র পৃথিবীকে পালনে সক্ষম নিজের মূর্তিমান আত্মার মতো এক পুত্রকে জন্ম দিলেন—তাঁর নাম 'বিশ্বসহ'।

সেই নীতিজ্ঞ রাজার হিরণ্যাক্ষের শত্রুর (বিষ্ণুর) অংশে 'হিরণ্যাভ' নামে পুত্র জন্ম নিল—ফুল তরুরাজির পক্ষে বায়ুসমন্বিত অগ্নির মতো তিনি (বিশ্বসহ) শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলেন।

পিতৃঋণমুক্ত কৃতী পিতা (বিশ্বসহ) পরিণত বয়সে অক্ষয় সুখের অভিলাষে আজানুলম্বিতবাহু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে (নিজে) বল্কল গ্রহণ করলেন।

উত্তরকোসল রাজ্যের অধীশ্বর এবং সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ সোমযাজী তাঁর (হিরণ্যাভের) দ্বিতীয় চাঁদের মতো নয়নের আনন্দ একটি পুত্র জন্ম নিল—তাঁর নাম 'কৌসল্য'।

তাঁর যশ ব্রহ্মার সভা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যথাকালে তিনি 'ব্রহ্মিষ্ঠ' নামে স্বীয় ব্রহ্মবিদ পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে ব্রহ্মলোক লাভ করলেন।

বংশের অলংকারস্বরূপ, সৎপুত্রের পিতা তিনি (ব্রহ্মিষ্ঠ) শাসনাঙ্কিতা ধরণীকে অপ্রতিহতভাবে শাসন করতে থাকলে প্রজাপুঞ্জ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার প্রতি নিতান্ত প্রীত হলেন।

গুরুজনের সেবা করে কৃতার্থ, সুদর্শন, গরুড়ধ্বজের আকৃতিবিশিষ্ট, পদ্মপলাশ-লোচন 'পুত্র' তাঁকে (ব্রহ্মিষ্ঠকে) সপুত্রকদের মধ্যে অগ্রগণ্য করেছিলেন।

(তারপর) নশ্বর বিষয়সুখে নিস্পৃহ হয়ে তিনি (ব্রহ্মিষ্ঠ) ইন্দ্রের সখা হবার বাসনা

নিয়ে বংশধর 'পুত্রের' উপরে কুলরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নান করে অমরত্ব লাভ করলেন।

তাঁর (পুত্রের) পত্নী পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত (পূর্ণিমা)-তিথিতে দেহপ্রভায় পুষ্পরাগ-মণিকেও হার-মানানো 'পুষ্য' নামে পুত্রকে জন্ম দিলেন। দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রের মতো তাঁর অভ্যুদয়ে জীবলোক পরিপূর্ণ পুষ্টি লাভ করল।

উদারমতি মহারাজ (পুত্র) সংসারভয়ে (পুনর্জন্মের ভয়ে) ভীত হয়ে পুত্রের (পুষ্যের) উপরে পৃথিবীর ভার দিয়ে ব্রহ্মবিদ জৈমিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগাভ্যাস করে যোগবলে নির্বাণপ্রাপ্ত হলেন।

তারপর তাঁর (পুষ্যের) ধ্রুবপ্রতিম পুত্র ধ্রুবসন্ধি পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সত্যসন্ধ এবং সর্বজনপ্রশংসিত ছিলেন ; শত্রুরা নতশিরে তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।

প্রতিপদের চাঁদের মতো প্রিয়দর্শন 'সুদর্শন' নামে তাঁর পুত্র যখন শিশুমাত্র তখনই মৃগনয়ন রাজা (ধ্রুবসন্ধি) মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের মুখে প্রাণ দিলেন।

তিনি স্বর্গে গেলে তাঁর অমাত্যবর্গ দেখলেন প্রজাকুল অনাথ ও ভাগ্যহীন ; তাই তাঁরা একমত হয়ে বংশের কুলতন্তুর মতো তাঁকে বিধিমতো অযোধ্যার রাজা (-রূপে অভিষিক্ত) করলেন।

তখন সেই রঘুবংশ শিশুনৃপতিকে (সুদর্শনকে) নিয়ে নবেন্দুশোভিত নভস্তল, একটিমাত্র সিংহশাবকশোভিত অরণ্য এবং মুকুল-অবস্থার কমলশোভিত জলের সদৃশ শোভা পেল।

বালকের রাজমুকুট দেখে লোকে মনে ভাবল তিনি ভবিষ্যতে পিতার মতোই হবেন। অনুকূল বাতাস পেয়ে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলে।

তিনি যখন মাতঙ্গে আরোহণ করে রাজপথে বহির্গমন করতেন তখন (রাজবেশটি এত বড় যে) মাহুতে তাঁর পরিচ্ছদের লম্বিত অংশ ধরে থাকত ; তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর ; তবুও পুরবাসীরা তাঁকে প্রভু ভেবে তাঁর পিতার গৌরবের সমান করেই তাঁকে অবলোকন করত।

তিনি পিতার সিংহাসনের সবটা জুড়ে বসতে পারতেন না, কিন্তু স্বর্ণজালের মতো তাঁর তেজের মহিমায় তিনি যেন শরীর আবৃত করে তাকে ব্যাপৃত করতেন।

চরণযুগল সামান্য ঝুলিয়ে সিংহাসনের নীচে রাখা সোনার পাদপীঠে ঈষৎ স্পর্শ রাখতেন তিনি, অলক্তরঞ্জিত তাঁর চরণদ্বয়ে নরপতিরা গর্বোন্নিত মস্তক আনত করে প্রণাম করতেন।

স্বল্পাকার ইন্দ্রনীলমণি ক্ষুদ্র হলেও উজ্জ্বল-প্রভা-গুণে তাকে মহানীল বললে অত্যুক্তি হয় না ; তেমনি শিশু হলেও তাঁর 'মহারাজ' নাম মিথ্যা হয় নি।

(সিংহাসনের) উভয় পার্শ্বের চামরব্যজনে তাঁর কপোললম্বিত দুটি কাকপক্ষ (জুলফি) চঞ্চল হত, কিন্তু তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত আদেশ সুদূর সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত কোথাও অমান্য করা হত না।

স্বর্ণময় উষ্ণীষশোভিত ললাটে তিনি তিলক ধারণ করে সর্বদা স্মিতমুখে শত্রু-রমণীদের মুখ তিলকশূন্য করে দিয়েছিলেন।

শিরীষফুলের চেয়ে কোমল শরীরটি, বসনভূষণে তাঁর কষ্ট হত ; কিন্তু হৃদয়ের বলে

তিনি বিশাল পৃথিবীর গুরুভার বহন করতেন।

'অক্ষরভূমিকায়' ভালো করে বর্ণবিন্যাস শেখার আগেই তিনি জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছে দণ্ডনীতির সর্ববিধ ফলাফল শিক্ষা করেছিলেন।

(বালক সুদর্শনের) অনতিপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠানের পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে রাজলক্ষ্মী তাঁর যৌবনের অপেক্ষা করতে থাকলেন এবং সলজ্জভাবে রাজচ্ছত্রের ছায়ার ছলেই তাঁকে আলিঙ্গন করতেন।

কালক্রমে তাঁর শরীরের অবয়বসমূহ শুধু বৃদ্ধি পেল তা নয়, তাঁদের কুল ক্রমাগত সর্বজনপ্রিয় গুণরাশিও সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হল।

পূর্বজন্মে অর্জিত বিদ্যাসমূহ স্মরণ করেই যেন তিনি গুরুর ক্লেশ উৎপাদন না করে তিনি বর্গকে আয়ত্ত করার উপায় স্বরূপ তিনটি বিদ্যা এবং পিতৃরাজ্যের প্রজাকুলকে (সহজে) গ্রহণ করলেন।

অস্ত্রশিক্ষাকালে শরীরের পূর্বার্ধ প্রসারিত করে, মাথার চূড়া উন্নত রেখে, জানু আকুঞ্চিত করে—এবং আকর্ণ-বিস্তৃত শরাসন আকর্ষণ করে তিনি বিশেষ শোভা পেতেন।

তারপর—তিনি সুন্দরীদের নয়নের মধুস্বরূপ, মদনবৃক্ষের অনুরাগময় প্রবাল-কুসুমস্বরূপ, এবং বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্বরূপ সর্বাঙ্গব্যাপী অকৃত্রিম ভূষণরূপ মনোহর যৌবন লাভ করলেন।

তাঁর শুদ্ধ সন্তানের কামনায় অমাত্যেরা দূতের মাধ্যমে পাওয়া, প্রতিকৃতির চেয়ে বাস্তবে অধিক সুন্দরী কন্যাদের (বধূরূপে) সংগ্রহ করলেন ; তাঁরা (কুমারের) প্রথম দুই পত্নী—রাজলক্ষ্মী ও পৃথিবীকে সপত্নী পেলেন।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'বংশানুক্রম' নামক অষ্টাদশ সর্গ ॥

ঊনবিংশ সর্গ

শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ

বার্ধক্য উপস্থিত হলে বিম্বৎশ্রেষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় রঘুরাজ (সুদর্শন) অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী আত্মজ অগ্নিবর্ণকে অভিষিক্ত করে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করলেন।

সেখানে তিনি (সুদর্শন) তীর্থবারিতে (স্নান করে) দীর্ঘিকাকে বিস্মৃত হয়ে, ভূমিতে কুশশয্যায় (শয়ন করে) পালংককে এবং কুটীরে (বাস করে) প্রাসাদকে বিস্মৃত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষায় স্পৃহা না রেখে তপশ্চর্যা করলেন।

তাঁর পুত্র রাজ্যপালনের ভারে কষ্ট পেলেন না। কারণ, তাঁর পিতা বাহুবলে শত্রুজয় করে পৃথিবীকে এঁর ভোগের জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, কণ্টক উদ্ধারের জন্যে রাখেন নি।

কামপ্রিয় অগ্নিবর্ণ রাজ্যপালনের অধিকার কয়েক বৎসর নিজে পালন করলেন ; তারপর সচিবদের উপরে সব দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি নবীন যৌবন নিয়ে স্ত্রী-সম্ভোগের অধীন হয়ে পড়লেন।

সম্ভোগবিলাস

কামুক অগ্নিবর্ণ কামিনীদের সহচর হলেন, মৃদঙ্গ-ধ্বনিমুখরিত তাঁর ভবনে ভবনে উৎসব বৃদ্ধি পেল, তারা ক্রমশঃ পূর্বেকার উৎসব-সমূহকে ছাড়িয়ে গেল।

তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ বিনা এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না ; ফলে অন্তঃপুরেই তাঁর অহর্নিশ কেটে যেত, অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না।

কখনও মন্ত্রিগণের পীড়াপীড়িতে প্রজাকুলের আকাঙ্ক্ষিত দর্শন দিলেও তিনি গবাক্ষপথে কেবলমাত্র একটি চরণ প্রলম্বিত করেই তা সাধন করতেন.

অতি কোমল নখরাগে উদ্ভাসিত ঐ চরণ অরুণরাগরঞ্জিত পদ্মের মতো। প্রজাবৃন্দ অবনতমস্তকে ঐ চরণকে প্রণাম করত।

কামতরঙ্গে অবগাহন করে তিনি বিলাসিনীদের যৌবনোন্নত স্তনের আঘাতে চঞ্চল কমলযুক্ত এবং গোপন অভিসারগৃহযুক্ত দীর্ঘিকাসমূহের জলে বিহার করতেন।

সেখানে পরস্পর জলসিঞ্চনে (সুন্দরীদের) চোখের কাজল ধুয়ে যেত, অঞ্জনায় তাদের মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে তাঁকে আরও বেশী মোহিত করে তুলত।

করিণীকে নিয়ে গজরাজ যেমন মকরন্দসৌরভময় কমলবনে অবতীর্ণ হয়, তিনিও তেমনি প্রেয়সীদের নিয়ে সৌরভময়ী পানভূমিতে গমন করতেন।

সুন্দরীরা মদজনক আসব তাঁর কাছে গোপনে পেতে অভিলাষ করতেন, তাঁদের মুখোচ্ছিষ্ট আসব তিনি বকুলবৃক্ষের মতো আমোদসহকারে পান করতেন।

মনোমোহিনী মধুভাষিণী বামলোচনা অথবা মনোহরধ্বনি বীণা—এই দুটি পর্যায়ক্রমে তাঁর ক্রোড়ে শোভা পেত, সে স্থান কখনও শূন্য থাকত না।

তিনি নিজে রসিক ; মাল্য এবং বলয় আন্দোলিত করে তিনি মৃদঙ্গ বাজাতেন এবং নর্তকীদের মনোহরণ করে নৃত্যাভিনয়ে ভুল করিয়ে সম্মুখবর্তী নাট্যাচার্যদের কাছে তাদের লজ্জিত করে তুলতেন।

নৃত্যশেষে পরিশ্রান্ত (নর্তকীদের) ঘর্মাক্ত মুখে তিলক বিশীর্ণ, তিনি সেই সুন্দর মুখে সোহাগবশে ফুৎকার দিতে দিতে (তার সুধা) পান করতেন—এতে তিনি যেন অমরেশ্বর (ইন্দ্র) ও অলকাপতিকেও (কুবেরকেও) অতিক্রম করেছিলেন।

তিনি নিত্যনতুন কাম্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর, প্রেয়সীরা তাই সম্ভোগকে অর্ধসমাপ্ত রেখে তাঁর মিলনের আনন্দকে অপূর্ণ রাখতেন।

তিনি প্রণয়িনীকে প্রবঞ্চিত করে (অন্যত্র গেলে) কখনও অঙ্গুলি-কিসলয়ের তর্জন ভোগ করতেন, কখনও কুটিল ভ্রূভঙ্গের কটাক্ষ দেখতেন কখনও বা অদৃষ্টে ছিল মেখলাদামের একাধিক বন্ধন।

অভিসারের নির্দিষ্ট রাত্রিতে তিনি দূতীর জ্ঞাতসারে (কামিনীর) পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হতেন এবং প্রিয়ার বিরহকাতর প্রলাপবাক্য (মজা করে) শুনতেন।

মহিষীরা তাঁকে ঘিরে থাকলে নর্তকী-সঙ্গ যখন দুর্লভ হয়ে উঠত, তখন তিনি অধীর হয়ে অঙ্গুলির স্বেদস্রাবে তুলিকা সিক্ত করে তাদের অঙ্গে আলেখ্য রচনা করে চিত্তবিনোদন করতেন।

প্রেমগর্বিত বিপক্ষের প্রতি ঈর্ষায় এবং নিজেরাও মদনাতুরা হয়ে রাজ্ঞীর ক্রোধ-অভিমান ত্যাগ করে কোনো উৎসবের দোহাই দিয়ে তাঁকে সেবা করে কৃতার্থ হতেন।

সকাল হলেই তিনি তাঁর শরীরে সম্ভোগচিহ্ন দেখে কুপিতা প্রণয়িনীদের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাদের প্রসন্ন করতেন, কিন্তু আবার শৈথিল্যবশতঃ তাদের দুঃখও দিতেন।

নিদ্রিত অবস্থায় তিনি অন্য কোনো প্রমদার নাম করতে থাকলে (মহিষীরা) তাঁকে কিছু না বলে চোখের জলে বুকের বসন ভিজিয়ে রেখে পাশ ফিরে শুয়ে প্রতিকার

করতে গিয়ে হাতের বলয়টি ভেঙে ফেলতেন।

তিনি দূতীর দেখানো পথে এগিয়ে কুসুম শয্যাশোভিত লতাগৃহে এসে মহিষীদের ভয়ের কাঁপন নিয়েই পরিচারিকাদের সংসর্গ উপভোগ করতেন।

অন্যমনস্কভাবে তিনি অন্য কোনো ললনার নাম উচ্চারণ করলে সুন্দরীরা তাঁকে বলত—'তুমি যে প্রেয়সীর নাম আমাকে দিলে তার সৌভাগ্যটুকুরও আকাঙ্ক্ষায় আমার মন লোলুপ হয়েছে'।

প্রসাধনচূর্ণে পিঙ্গলবর্ণ, ছিন্নমালায় পূর্ণ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেখলাশোভিত এবং অলক্ত-লাঞ্ছিত শয্যাই সেই বিলাসীর বিভিন্ন রতিবিলাসের কথা প্রকাশ করে দিত।

তিনি নিজে ললনাদের চরণে অলক্তরাগ পরিয়ে দিতেন, কিন্তু তাদের বসন শিথিল হয়ে পড়লে শুধুমাত্র মেখলাযুক্ত নিতম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি আর তেমন অভিনিবেশ করতে পারতেন না।

চুম্বনকালে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, মেখলা ছিন্ন করতে গেলে হাত চেপে ধরত, এইভাবে ইচ্ছায় বাধা পেলেও তাঁর বধূসম্ভোগের কামাগ্নি জ্বলতেই থাকত।

দর্পণে পরিভোগচিহ্নগুলি-দেখতে-থাকা কামিনীদের পশ্চাদ্দেশে পরিহাস সহকারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রতিবিম্ব দর্শনে তাদের লজ্জাবনতমুখী করে দিতেন।

শয্যাত্যাগকালে প্রণয়িনীরা কোমল বাহুবন্ধনে তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করে চরণের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে রজনীশেষের চুম্বন প্রার্থনা করত।

নবীন যুবক (অগ্নিবর্ণ) দর্পণতলে ইন্দ্রকে হার-মানানো নিজের রাজবেশ নিরীক্ষণ করে তত তৃপ্তি পেতেন না, যতটা তিনি রমণীগণের স্পষ্ট পরিভোগচিহ্ন দেখে প্রীত হতেন।

বন্ধুর কাজের ছলে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলে চঞ্চল তাঁকে প্রণয়িনীরা চুলের মুঠি ধরে বলত—'শঠ! তোমার পালাবার ছলচাতুরী আমরা বেশ বুঝি'।

তাঁর নির্দয় রতিশ্রমে ক্লান্ত কামিনীরা 'কণ্ঠসূত্র' নামে আলিঙ্গনের ছলে তাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে (বক্ষে) শয়ন করলে তাদের বিশাল স্তনমর্দনে রাজার অঙ্গরাগ লুপ্ত হত।

রাত্রিতে মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি কুট্টনী-নির্দেশিত পথে গোপনে অগ্রসর হলে সুন্দরীরা তাঁর সামনে এসে তাঁকে টেনে নিয়ে বলত—'কামুক! অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে বঞ্চনা করবে?'

চাঁদের কিরণে সারারাত প্রস্ফুটিত থেকে কুমুদবন যেমন দিনে নিমীলিত থাকে, তিনিও রমণীসংসর্গে সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে কাটিয়ে দিনে নিদ্রিত থাকতেন।

তাঁর দংশন তাদের অধর পীড়িত, নখক্ষতে উরুদেশ ক্লিষ্ট, তাই গায়িকাদের বাঁশি ও বীণা বাজাতে কষ্ট হলে তারা রোষকুটিল কটাক্ষ করলে তিনি আরও মোহিত হতেন।

তিনি নিজে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তারপর অভিনয় প্রদর্শনের সময়ে বন্ধুজনের উপস্থিতিতে প্রয়োগনিপুণ নাট্যাচার্যদের মধ্যে তর্ক বাধিয়ে দিতেন।

বর্ষাকালে তিনি কুটজ এবং অর্জুনফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দিতেন; কদম্ব-পুষ্পের পরাগে অঙ্গরাগ রচনা করতেন এবং ক্রীড়াপর্বতের চতুর্দিকে মদমত্ত ময়ূরেরা থাকায় বিহারসুখ রমণীয় হত।

(তখন) তিনি মান করে শয়নে পরাঙ্মুখী সঙ্গিনীকে খুব একটা বেশী অনুনয় করতেন না ; মনে মনে চাইতেন, মেঘগর্জনে ভীত হয়ে সে নিজেই তাঁর বাহুবন্ধনে আসুক।

কার্তিক মাসের রাত্রিতে তিনি চন্দ্রাতপমণ্ডিত প্রাসাদে ললিত বিলাসিনীদের সঙ্গে সম্ভোগশান্তিহরা মেঘমুক্তা বিমল চন্দ্রিকা উপভোগ করতেন।

তিনি সৌধের গবাক্ষপথে সৈকতরূপ নিতম্বে হংসশ্রেণীর মেখলাযুক্ত প্রেয়সীদের মতো শোভমানা সরযূনদীকে অবলোকন করতেন।

সুমধ্যমারা মর্মরধ্বনিযুক্ত এবং অগুরুধূপের ধোঁয়ায় সুবাসিত হেমন্তকালীন বসনের হেমরসনাটি একটু দেখিয়ে মেখলাবন্ধনে এবং উন্মোচনে আগ্রহী রাজাকে আরও লুব্ধ করত।

(প্রাসাদের) বাতাসশূন্য অন্তঃপ্রকোষ্ঠসমূহে নিষ্কম্প-দীপসমূহযুক্ত শীতের রাত্রিগুলি তাঁর সর্বপ্রকার কর্মলীলার সাক্ষী ছিল।

(বসন্তে) দক্ষিণ সমীরণে পল্লবযুক্ত চূতকুসুম দেখে বিরহ সইতে না পেরে সব অভিমান ভুলে অঙ্গনারা তাঁকে অনুনয় করত।

তিনি তাদের কোলে নিয়ে দোলারোহণ করলে পরিজনেরা দোল দিত, তখন তিনি দোলার রশি ছেড়ে দিয়ে তাদের ঠেলে দিলে তারাও যেন ভয় পেয়ে তাঁকে নিবিড় কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ করত।

প্রেয়সীরা গ্রীষ্মকালোচিত বেশবাসে, অর্থাৎ পয়োধরে চন্দননিষেকে, মুক্তাগ্রথিত সুন্দর অলঙ্কারসমূহে এবং শ্রোণিদেশের মণিময় মেখলা দিয়ে তাঁকে সেরা করতেন।

তিনি সহকারপল্লবমিশ্রিত এবং পাটলকুসুমের রাগরঞ্জিত আসব পান করতেন, এবং তাইতে বসন্তশেষে নিষ্প্রভ তাঁর চিত্ত নবীন উৎসাহে উদ্দীপিত হত।

এইভাবে অন্য সব কাজে বিমুখ হয়ে, একমাত্র কামপ্রবাহে মত্ত রাজা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সন্ধানে প্রত্যেকটি বিশেষ ঋতুকে অতিবাহিত করতেন।

পরিণতি

তিনি প্রমত্ত হলেও তাঁর রাজশক্তির প্রভাবে অন্য রাজারা তাঁকে আক্রমণ করতে পারতেন না ; কিন্তু, দক্ষের শাপ যেমন চন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল তেমনি অতিরিক্ত কামসম্ভোগের রোগ (যক্ষ্মা) তাঁকে ক্ষয় করতে লাগল।

চিকিৎসকদের কথা অমান্য করে তিনি দোষাবহ দেখেও আসক্তির বস্তু (স্ত্রী ও মদ) ত্যাগ করলেন না। ইন্দ্রিয়সমূহ রমণীয় বিষয়ে একবার আকৃষ্ট হলে তাদের নিবৃত্ত করা বড় কঠিন।

তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ, (শরীর ক্ষীণ হওয়ায়) অলঙ্কার সামান্য ; (যষ্টি) অবলম্বন করে চলেন, কণ্ঠস্বর ভগ্ন–রাজযক্ষ্মায় ক্ষীণ হয়ে তিনি অতিকামুকের দশাই লাভ করলেন।

রাজা যখন ক্ষয়রোগাক্রান্ত তখন সেই বংশের অবস্থা চাঁদের শেষ-কলা-যুক্ত আকাশের মতো, গ্রীষ্মের পঙ্কমাত্রাবশিষ্ট জলাশয়ের মতো এবং ক্ষীণশিখাযুক্ত দীপাধারের মতো হল।

প্রজারা অমঙ্গলাশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠলে তাঁর মন্ত্রী তাঁর রোগের কথা গোপন রেখে তাদের বারবার বললেন–'রাজা পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা সত্যি সত্যি (পুণ্য-) কর্মে ব্যস্ত থাকেন'।

দীপ যেমন বাতাসকে এড়াতে পারে না, তেমনি বহুপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কুলপাবন সন্তানকে না দেখে তিনি বৈদ্যদের সমস্ত যত্ন ব্যর্থ করে রোগকে অতিক্রম করতে পারলেন না (যক্ষ্মা তাঁকে শেষ করল)।

(মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখে) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে কুশল পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, (প্রজাদের) রোগশান্তির কথা বলে, প্রাসাদের উপবনেই মন্ত্রীরা প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁকে গোপনে দাহ করলেন।

তাঁরা (মন্ত্রীরা) যখন প্রধান প্রধান পৌরজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানলেন তাঁর সহধর্মচারিণী (প্রধানা মহিষী) সত্যিই শুদ্ধ-অন্তঃস্বত্ত্বা তখন তিনিই (মহিষী) রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজার ঐরূপ অকালমৃত্যুর শোকজনিত উষ্ণ নয়নজলে তাঁর যে-গর্ভ প্রথমে প্রতপ্ত হয়েছিল, কাঞ্চনকলসনিঃসৃত শীতল অভিষেক-সলিলে তা শান্ত হল।

প্রজারা প্রসবসময়ের অপেক্ষা করছে, তাদের মঙ্গলের জন্যে পৃথিবী যেমন করে শ্রাবণমাসে রোপিত শস্যবীজ অন্তরে ধারণ করে, তেমনি রাজ্ঞী গর্ভ ধারণ করে স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন হয়ে কুলক্রমাগত বৃদ্ধ সচিবদের সহায়তায় যথাবিধি স্বামীর রাজ্য শাসন করতে থাকলেন—তাঁর আজ্ঞা সর্বত্র অব্যাহত ছিল।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্যে 'অগ্নিবর্ণশৃঙ্গার' নামক ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

॥ রঘুবংশ মহাকাব্য সমাপ্ত ॥

নাটক

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

দুষ্যন্ত	–	হস্তিনাপুরের রাজা
মাধব্য (বিদূষক)	–	রাজার ভাঁড়
সর্বদমন (ভরত)	–	রাজার শিশুপুত্র
সোমরাত	–	রাজপুরোহিত
সূত	–	রাজসারথি
বাতায়ন	–	কঞ্চুকী
রৈবতক	–	দ্বাররক্ষী
শ্যাল	–	নগররক্ষীদের প্রধান
সূচক ও জানুক	–	দুজন নগররক্ষী
করভক	–	রাজমাতার দূত
ভদ্রসেন	–	সেনাপতি
বৈতালিকদ্বয়	–	
কাশ্যপ (কণ্ব)	–	আশ্রমপ্রধান মহর্ষি, শকুন্তলার পালকপিতা
শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস, গৌতম, নারদ	–	মহর্ষির শিষ্য
মারীচ	–	দেবর্ষি, দেব ও দানবের পিতা
গালব	–	কাশ্যপশিষ্য
সূত্রধার	–	নাট্যপরিচালক

স্ত্রী চরিত্র

শকুন্তলা	—	নায়িকা, বিশ্বামিত্র-মেনকার কন্যা, কাশ্যপের পালিত কন্যা
অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা	—	শকুন্তলার দুই সখী
গৌতমী	—	কণ্বমুনির আশ্রমের প্রধানা তাপসী
অদিতি	—	মারীচপত্নী, দেব ও দানবের মাতা
সানুমতী	—	অপ্সরা, শকুন্তলার বান্ধবী
পরভৃতিকা ও মধুরিকা	—	দুষ্যন্তের দুজন উদ্যানপালিকা
চতুরিকা	—	রাজ-পরিচারিকা
যবনী	—	রাজার মৃগয়া-কালীন পরিচারিকা
প্রতিহারী	—	দ্বার-রক্ষিণী
নটী	—	সূত্রধারপত্নী

উল্লিখিত চরিত্র

ইন্দ্র	—	দেবরাজ
জয়ন্ত	—	ইন্দ্রপুত্র
কৌশিক	—	বিশ্বামিত্র, শকুন্তলার পিতা
দুর্বাসা, নারদ	—	ঋষি
মার্কণ্ডেয়	—	ঋষিপুত্র, সর্বদমনের খেলার সাথী
পিশুন	—	প্রধানমন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ
বৃদ্ধশাকল্য	—	মারীচাশ্রমের বৃদ্ধ তাপস
পৌলোমী	—	ইন্দ্রপত্নী
মেনকা	—	অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা
হংসপদিকা, বসুমতী	—	দুষ্যন্তপত্নী, দুষ্যন্ত জননী

প্রথম অংক

যে-মূর্তি বিধাতার প্রথম সৃষ্টি (জল), যে-মূর্তি বিধিমতে আহুত ঘৃত (দেবতাদের কাছে) বহন করে (অগ্নি), যে-মূর্তি স্বয়ং হোতা, যে-মূর্তি দুটি দিন ও রাত দুই কালকে নির্দিষ্ট করে (সূর্য ও চন্দ্র), শব্দগুণ যে-মূর্তিটি সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে আছে (আকাশ), যে-মূর্তিকে সমস্ত প্রাণীর উৎস বলা হয় (পৃথিবী), যে-মূর্তির জন্যে সমস্ত প্রাণীরা প্রাণবান (বায়ু), প্রত্যক্ষ সেই আটটি মূর্তিতে পরিচিত শিব তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন !

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধার—(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে, যদি বেশ-রচনা শেষ হয়ে থাকে তাহলে এদিকে এসো !

(প্রবেশ করে)

নটী—আর্যপুত্র, এই যে আমি।

সূত্রধার—আর্যে, প্রেক্ষাগৃহে প্রধানত গুণিজনেরাই সমবেত হয়েছেন। আজকে তো আমরা কালিদাসের লেখা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামে নতুন নাটক উপহার দেব তাঁদের। তাই প্রত্যেক অভিনেতার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

নটী—আপনার নিপুণ তত্ত্বাবধানে কোথাও তো কিছু ত্রুটি নেই।

সূত্রধার—আর্যে, তোমাকে সত্যি কথা বলি। যতক্ষণ না বিশ্বজ্জন পরিতুষ্ট হচ্ছেন ততক্ষণ প্রয়োগকৌশলকে যথাযথ বলে মেনে নিতে পারব না। শিক্ষিতের মনে যত জোরই থাকুক নিজের উপর অবিশ্বাস কিছুটা থাকবেই।

নটী—সত্যি তাই। তাহলে এরপর কী করব তার নির্দেশ দিন।

সূত্রধার—এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে শ্রুতিমধুর কিছু পরিবেশন করা ছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে! তাই সদ্য-সমাগত উপভোগ্য গ্রীষ্মকালকে অবলম্বন করে গান কর। এই সময়ে দিনগুলি শেষের দিকে খুবই রমণীয়, যখন জলে অবগাহন অত্যন্ত সুখকর, বনবায়ু পাটলফুলের সংসর্গে সুরভিত, ঘন ছায়ায় সহজেই ঘুম আসে।

নটী—গাইছি তাহলে— (গান ধরলেন)

মৌমাছিরা একটু একটু করে চুম্বন করে যাচ্ছে এমন কোমল-পরাগ শিরীষফুল-গুলোকে মেয়েরা আলতোভাবে তুলে নিয়ে অলংকার হিসেবে কানে দিচ্ছে।

সূত্রধার—আর্যে! চমৎকার গেয়েছ। কী আশ্চর্য! শ্রোতৃবর্গের মন গানের সুরে বাঁধা পড়েছে, সমস্ত রঙ্গভূমি যেন চিত্রপটে আঁকা। তাহলে এখন কোন্ প্রকরণ অবলম্বনে (নাটকের বিশেষ-একটি শ্রেণী) এঁদের পরিতুষ্ট করব?

নটী—কেন, আপনি তো প্রথমেই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবার আদেশ দিলেন!

সূত্রধার—আর্যে ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। এই মুহূর্তে আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ—

দ্রুত ধাবমান এই সারঙ্গ (মৃগ) যেমন রাজা দুষ্যন্তকে দূরে ছুটিয়ে নিয়ে গেল, তোমার গানের মনোহারী সারঙ্গ-রাগও আমাকে তেমনি প্রসঙ্গ থেকে সবলে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

(প্রস্তাবনা)

(তারপর রথে করে ধনুর্বাণ হাতে মৃগের অনুসরণ করতে করতে রাজার প্রবেশ এবং সেই সঙ্গে সারথির প্রবেশ)

সূত—আয়ুষ্মন্, আপনি ধনুকে বাণ জুড়ে কৃষ্ণসার মৃগের দিকে চেয়ে আছেন, এই মৃগকে এইভাবে অনুসরণ করতে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সাক্ষাৎ পিনাকপাণি শিবকেই দেখছি।

রাজা—সারথি! এই সারঙ্গ আমাদের অনেক দূর আকর্ষণ করে এনেছে। এ-দেখি এখন সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে রথের দিকে চোখ রেখে রেখে কেবলই ছুটে চলেছে, তীর এসে লাগবার ভয়ে শরীরের পিছনের দিকটা অনেকখানি আগের দিকটায় কুঁকড়ে এনেছে, পরিশ্রমে হাঁ-করা মুখ থেকে খসে-পড়া আধোচিবানো ঘাসে পথ

ছেয়ে গেছে। দেখ খুব জোরে জোরে লাফিয়ে ওঠায় শূন্যেই বেশি করে চলছে, মাটিতে চলছে না বললেই হয়। আমি একে অনুসরণ করে চলেছি তবু একে কেন দেখাই যাচ্ছে না বল তো ?

সারথি—আয়ুষ্মন্, জমিটা উঁচুনীচু বলে আমি লাগাম টেনে রথের গতি থামিয়ে এনেছি। এই জন্যে হরিণটার দূরত্ব গিয়েছে বেড়ে। এখন আপনি সমভূমিতে এসে পড়েছেন বলে হরিণটার নাগাল পেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

রাজা—লাগাম ছাড় তাহলে।

সূত—তাই ছাড়ছি মহারাজ। (রথের গতিবেগ দেখে) মহারাজ দেখুন, দেখুন, লাগাম ছাড়ায় শরীরের সামনের দিকটা সম্পূর্ণ মেলে দিয়েছে ঘোড়াগুলো, ওদের মাথার কেশরপ্রান্তগুলো একেবারেই কাঁপছে না, নিস্পন্দ কানগুলো খাড়া হয়ে আছে। ওদের নিজেদের চলার বেগে যে ধুলো উড়ছে তা পিছনেই পড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে হরিণটার গতিবেগ সহ্য করতে না পেরেই যেন ওরা ছুটে চলেছে।

রাজা—সত্যি, ওরা সূর্য আর ইন্দ্রের অশ্বকেও যেন (গতিবেগে) ছাড়িয়ে চলেছে। রথবেগে যা দেখতে খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে হঠাৎ তা বেশ বড় দেখাচ্ছে, যা সত্যিই ছাড়া-ছাড়া তাকে মনে হচ্ছে গায়ে-গায়ে লেগে থাকা, যা আসলে বাঁকা তাকে দেখে মনে হচ্ছে সোজা। মুহূর্তের জন্যেও কোনো-কিছুই আমার দূরে নেই, পাশেও পাচ্ছি না। সারথি, এই আমি একে মারছি দেখ।

(শরসন্ধান অভিনয় করলেন)

(নেপথ্যে) রাজন্, এ-আশ্রমের মৃগ। একে মারবেন না, মারবেন না।

সারথি—(শুনে এবং দেখে) মহারাজ, এই কৃষ্ণসার মৃগ আর আপনার বাণনিক্ষেপের নাগালের মাঝখানে তপস্বীরা এসে পড়েছেন।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) তাহলে ঘোড়া থামাও।

সারথি—এই থামিয়েছি। (রথ থামালেন)

তারপর দুজনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন এক তপস্বী। তপস্বী (হাত উঠিয়ে) —তুলোর পাঁজায় আগুন দেবার মতো মৃগের কোমল দেহে তীর ছুঁড়বেন না। কোথায় এই হরিণশিশুদের নিতান্ত ক্ষণিক জীবন আর কোথায় আপনার বজ্রকঠিন তীক্ষ্ণ বাণ! তারই লক্ষ্যে স্থির আপনার বাণ সংবরণ করুন। আর্তদের রক্ষা করবার জন্যেই আপনাদের অস্ত্র, নির্দোষকে আঘাত করবার জন্যে নয়।

রাজা—এই বাণ সংবরণ করলাম। (তাই করলেন)

তপস্বী—পুরুবংশপ্রদীপ আপনার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। যে আপনার পুরুবংশে জন্ম তাঁর পক্ষে এই তো যথাযোগ্য আচরণ। আপনি এইরকম গুণান্বিত পুত্র লাভ করুন যিনি ক্ষমতায় হবেন একচ্ছত্র।

রাজা—(প্রণাম করে) আশীর্বাদ মাথায় নিলাম।

তপস্বী—রাজন্, আমরা সমিধ্ সংগ্রহে বেরিয়েছি। ওই কুলপতি কাশ্যপের মালিনী-তীরবর্তী আশ্রম, না-হয় আপনি আশ্রমে প্রবেশ করে অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন। তা ছাড়া, বাধাবিঘ্ন নিবারিত হওয়ায় তপস্বীদের যে-যাগযজ্ঞ রম্যরূপ

নিয়েছে তা দেখে জানবেন—ধনুর্গুণের আঘাতে চিহ্নিত আপনার বাহু জনপালনে কতটা সফল হয়েছে।

রাজা—কুলপতি কি এখানে ?

তপস্বী—সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসেবার ভার দিয়ে এঁরই প্রতিকূল দৈব প্রশমিত করবার জন্যে সোমতীর্থে গিয়েছেন।

রাজা—যাই, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি তাহলে। তিনিই মহর্ষিকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা জানাবেন।

তপস্বী—তাহলে যাচ্ছি আমরা। (শিষ্যদের নিয়ে প্রস্থান)

রাজা—সারথি ! ঘোড়া ছোটাও। পুণ্যাশ্রম দর্শন করে নিজেদের পবিত্র করি।

সূত—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (আবার রথবেগ দেখতে লাগলেন)

রাজা—(চারদিক তাকিয়ে) সারথি, না বললেও বেশ বোঝা যাচ্ছে এ হচ্ছে তপোবনের পরিধি।

সূত—কী করে ?

রাজা—দেখছ না, এখানে শুকপাখিদের কোটরের মুখ থেকে গাছের নিচে ঝরে পড়ছে নীবার ধান। কোথাও কোনো মসৃণ পাথরের খণ্ডগুলো বলে দিচ্ছে এখানে ইঙ্গুদীফল ভাঙা হয়। (কেউ কোনো ক্ষতি করবে না) এমন বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ায় হরিণেরা সরে যাচ্ছে না, (রথের) শব্দ সহ্য করছে। বল্কলের প্রান্ত থেকে ঝরে-পড়া জলের রেখায় অঙ্কিত হয়েছে জলাশয়ের পথ।

সারথি—সবই ঠিক।

রাজা—(একটু ভিতরে গিয়ে) তপোবনবাসীদের যেন ব্যাঘাত না হয়। এখানেই রথ থামাও নেমে পড়ি।

সারথি—লাগাম ধরেছি। আপনি অবতরণ করুন, মহারাজ।

রাজা—সারথি, বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করা উচিত। এগুলো ধর তো।
(সারথির কাছে অলংকার ও ধনুক দিয়ে) সারথি, যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা করে আমি না ফিরি ততক্ষণ ঘোড়াগুলোর পিঠ জলে ভেজাও।

সারথি—তাই করছি। (প্রস্থান)

রাজা—(পরিক্রমা করে এবং দেখে) এইটি আশ্রমের দ্বার। যাই, প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে, বিশেষ একটি লক্ষণ সূচিত করে) এই আশ্রমের পরিবেশ শান্ত (নাম ও গুণ প্রধান) কিন্তু আমার বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে এর ফল (সম্ভাবনা) কোথায় ? অথবা ভবিতব্যের দ্বার বোধহয় সর্বত্র (উন্মুক্ত)।

(নেপথ্যে—এদিকে, এদিকে, সখিরা)

রাজা—(কান পেতে) এ কি, কুঞ্জের দক্ষিণে যেন আলাপ শোনা যাচ্ছে। তবে ওখানেই যাই। (পরিক্রমা করে এবং দেখে) এদিকে দেখছি তপস্বী কন্যারা নিজেদের বহন-ক্ষমতানুযায়ী গাছে জল দেবার কলসি নিয়ে চারাগাছগুলোতে জল দিতে এইদিকেই আসছে। সত্যি, এঁরা দেখতে কী সুন্দর ! আশ্রমবাসী কারো আকৃতি যদি এমন হয় যে রাজ-অন্তঃপুরেও তা দুর্লভ তাহলে বলতে হবে গুণমাধুর্যে বনলতা উদ্যান-লতাকে পরাজিত করেছে। যা হোক, এই ছায়ার আড়ালে অপেক্ষা করি। (দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)

(তারপর সখীদের নিয়ে যথাবর্ণিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—এদিকে, এদিকে, সখিরা।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, পিতা কাশ্যপের কাছে এই আশ্রমের গাছগুলো তোর চেয়ে প্রিয় বলে মনে হয়। কারণ, নবমল্লিকা ফুলের মতো কোমল তুই, তোকেই কিনা তরুমূলে জল দেবার কাজের ভার দিয়েছেন তিনি।

শকুন্তলা—ওগো অনসূয়া, এ যে শুধু পিতার দেওয়া কাজ তা তো নয়। এদের উপর আমার যে ভাইয়ের মতো স্নেহ। (এই বলে গাছে জল দেবার অভিনয় করলেন)

রাজা—ইনিই তাহলে সেই কণ্বদুহিতা। পূজনীয় কাশ্যপ ঠিক সুবিবেচক নন, এঁকে তিনি আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

যিনি এই স্বভাবসুন্দর দেহকে তপস্যার উপযুক্ত করে তুলতে চান তিনি নিশ্চয়ই নীলপদ্ম পাতার প্রান্ত দিয়ে শমীগাছের লতা ছেদন করতে চেষ্টা করছেন।

যা হোক। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্তা শকুন্তলাকে দেখি।

(দেখতে লাগলেন)

শকুন্তলা—(একটু থেমে) সখি অনসূয়া, খুব আঁট করে বল্কল বেঁধে প্রিয়ংবদা আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। একটু আলগা করে দে তো বাঁধনটা।

অনসূয়া—দিচ্ছি। (একটু আলগা করে দিলেন)

প্রিয়ংবদা—(সহাস্যে) এ-ব্যাপারে তুই বরং তোর যৌবনকেই দোষ দে, যে-যৌবন স্তনবিস্তারের জন্যে দায়ী।

রাজা—সত্যি, বল্কল ঠিক এর দেহের উপযুক্ত নয়। তবু তা যে অলংকারের শ্রীবৃদ্ধি করছে না তা নয়।

শৈবালযুক্ত হলেও পদ্ম সুন্দরই থাকে। চাঁদের কলঙ্কচিহ্নও তার শোভাই বৃদ্ধি করে। এই তন্বী বল্কলে আরও মনোহারিণী—রমণীয়া, যে সব আকৃতি স্বভাব-সুন্দর—কোন্ জিনিসই বা তাদের অলঙ্কার না হয় ?

শকুন্তলা—(সামনে তাকিয়ে) বাতাসে নড়া পল্লবগুলোই ওর আঙুল, ঐ আঙুলের সংকেতে বকুলগাছ যেন আমাকে তাড়াতাড়ি কাছে যেতে বলছে। যাই তাকে আদর করি গে। (এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রিয়ংবদা—ওলো শকুন্তলা, এখানে একটু দাঁড়া তো।

শকুন্তলা—কেন রে ?

প্রিয়ংবদা—তুই (পাশে) এলে মনে হয় বকুল গাছটা যেন কোনো লতার সঙ্গে পরিণীত।

শকুন্তলা—এইজন্যেই তোর নাম প্রিয়ংবদা।

রাজা—প্রিয়ংবদা প্রিয় (মন ভোলানো) কথা বললেও সত্যি কথাই বলেছেন। এঁর—অধর কিশলয়ের বর্ণে মণ্ডিত, কোমল শাখার মতোই বাহু দুটি, ফুলের মতো শোভনীয় যৌবন এঁর অঙ্গে-অঙ্গে উচ্ছলিত।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, এই সেই আমগাছের স্বয়ংবর বধূ নবমল্লিকা, যাকে তুই নাম দিয়েছিস বনজ্যোৎস্না। একে ভুলে গিয়েছিস ?

শকুন্তলা—তাহলে নিজেকেও ভুলে যাব। (লতার কাছে গিয়ে এবং দেখে) ওলো, বড় ভালো সময়েই এই তরুলতা দুটির মিলন ঘটেছে। নতুন ফুলে বনজ্যোৎস্না

যৌবনবতী আর পল্লবযুক্ত হওয়ায় আমগাছটিও উপভোগ্য।

(এই বলে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)

প্রিয়ংবদা—অনসূয়া জানিস, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে খুব বেশি করে দেখছেন কেন ?

অনসূয়া—না, ঠিক ধরতে পারছি না। বল্ তো।

প্রিয়ংবদা—বনজ্যোৎস্না যেমন একটি যোগ্য তরুর সঙ্গে মিলিত হল তেমনি 'আমিও নিজের মনের মতো বর পাব কিনা' এই ওর চিন্তা।

শকুন্তলা—এটা নিশ্চয় তোর নিজেরই মনের কথা। (এই বলে কলসি উপুড় করলেন)

রাজা—ইনি কি কুলপতির অসবর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ? অথবা, সন্দেহের কারণ নেই, নিঃসন্দেহে ইনি ক্ষত্রিয়ের পরিণয়-যোগ্যা, কারণ, আমার পরিশীলিত মন এঁর প্রতি আসক্ত। সন্দেহের অবকাশ আছে এমন বিষয়ে সজ্জনদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই নির্দেশক। তবুও এঁকে ঠিকমতো জানতে হবে।

শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমে) জলসেচনে বাধা পেয়ে একটি ভ্রমর নবমল্লিকাকে ছেড়ে আমার মুখের দিকে আসছে। (এ-কথা বলে ভ্রমর বাধা দিচ্ছে এমন অভিনয় করলেন)

রাজা—(সস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখে) হে মধুকর, কোণ দুটো চঞ্চল এমন কম্পান্বিত চোখ দুটো বারবার স্পর্শ করছ তুমি, কানের কাছে উড়ে-উড়ে মৃদু গুঞ্জন করছ, যেন গোপন কথা বলছ কিছু, হাত নেড়ে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর রতিসর্বস্ব অধর (সুধা) পান করছ। আমরা বৃথাই তত্ত্ব খুঁজে মরি, তুমিই কৃতকৃত্য।

শকুন্তলা—এই বেহায়াটা এখনও বিদেয় হয় নি। অন্যদিকে যাই তবে। আরে, এদিকেও আসছে যে ? ওলো, এই হতচ্ছাড়া দস্যি ভ্রমরটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর তোরা।

দুজনে—(সহাস্যে) আমরা রক্ষা করার কে ? দুষ্যন্তকে ডাকো। তপোবন তো রাজারাই রক্ষা করে থাকেন।

রাজা—আত্মপ্রকাশ করার এই হল উপযুক্ত সময়। ভয় নেই, ভয় নেই, (অর্ধেক বলেই স্বগত) আমিই যে রাজা তা যে প্রকাশ হয়ে পড়বে। যাক, এইভাবেই বলি তাহলে।

শকুন্তলা—এ কি, এদিকেও আমায় অনুসরণ করছে যে !

রাজা—(অবিলম্বে এগিয়ে এসে) আঃ দুষ্টের দণ্ডদাতা পুরুবংশীয় একজন যখন পৃথিবী শাসন করছেন তখন সরল তপস্বী-কন্যাদের সঙ্গে কে দুর্ব্যবহার করছে ?

(সকলেই রাজাকে দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন)

অনসূয়া—আর্য, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আমাদের এই সখী এক দুষ্ট ভ্রমরের তাড়নায় কাতর হয়েছে। (এই বলে শকুন্তলাকে দেখাল)

রাজা—(শকুন্তলার দিকে ফিরে) তপস্যার কুশল তো ?

(শকুন্তলা অপ্রতিভ হয়ে নীরব রইলেন)

অনসূয়া—এমন এক বিশেষ অতিথি লাভে তপস্যার কুশলই বলতে হবে। ওলো শকুন্তলা কুটীরে যা। ফলসমেত অর্ঘ্য আন। এটিই হবে ওঁর পাদোদক।

(বলে ঘট দেখালেন)

রাজা—আপনাদের শিষ্টবাক্যেই আতিথ্য সম্পন্ন হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—আর্য ! তাহলে এই ছায়াশীতল ছাতিমগাছের বেদীতে একটু বসে বিশ্রাম নিন।

রাজা—আপনারাও তো এই কাজে (জলসেচনের কাজে) পরিশ্রান্ত।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, অতিথির পরিচর্যা করা আমাদের কর্তব্য। আয় বসি।

(এই বলে বসলেন ওঁরা)

শকুন্তলা—(স্বগত) এঁকে দেখে তপোবন-বিরোধী একটা আবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করছে, এ কেমন হল ?

রাজা—(সকলকে দেখে) সমবয়স আর সমরূপের জন্যে সত্যি কী রমণীয় আপনাদের সৌহার্দ্য !

প্রিয়ংবদা—(একান্তে) অনসূয়া, কে ইনি ? কী মধুর ও সৌম্য মূর্তি। চতুর ও প্রিয় আলাপে এঁকে প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা—(স্বগত) হে হৃদয়, চঞ্চল হোয়ো না। তুমি যা ভাবছিলে অনসূয়া ঠিক তাই বলছে।

রাজা—(স্বগত) এখন কেমন করে নিজের পরিচয় দিই, কেমন করেই বা আত্মগোপন করি ! যাক, এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) পুরুবংশীয় রাজা যে আমাকে ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত করেছেন, সেই আমি যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান নির্বিঘ্ন কিনা তাই দেখতে তপোবনে এসেছি।

অনসূয়া—ধর্মচারীরা এবারে সহায় লাভ করলেন।

(শকুন্তলা প্রণয়লজ্জা অভিনয় করছেন)

দুই সখী—(উভয়ের আচরণ লক্ষ্য করে একান্তে) ওলো শকুন্তলা, যদি আজ এখানে পিতা উপস্থিত থাকতেন—

শকুন্তলা—তাহলে কী হত ?

দুই সখী—এই বিশেষ অতিথিকে তাঁর জীবনের সর্বস্ব দিয়ে সম্মানিত করতেন।

শকুন্তলা—(কৃত্রিম ক্রোধে) দূর হ তোরা। কিছু একটা মনের মধ্যে রেখে কথা বলছিস। তোদের কথা শুনতে চাই না।

রাজা—আমি আপনাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।

দুই সখী—আর্য, এই অনুরোধ অনুগ্রহই বটে।

রাজা—ভগবান কাশ্যপ চিরব্রহ্মচারী বলে প্রকাশ। আপনাদের এই সখী তাঁর কন্যা, এ কী করে হল ?

অনসূয়া—শুনুন আর্য। 'কৌশিক' এই গোত্র-নামে মহাপ্রতাপশালী এক মহর্ষি আছেন।

রাজা—আছেন শুনেছি।

অনসূয়া—তাঁকেই আমাদের প্রিয় সখীর জন্মদাতা বলে জানুন। ইনি পরিত্যক্তা হলে লালন-পালন করেছেন বলে কাশ্যপও এঁর পিতা।

রাজা—'পরিত্যক্তা' এই শব্দে আমার কৌতূহল হচ্ছে। একেবারে গোড়া থেকে শুনতে চাই।

অনসূয়া—শুনুন আর্য। প্রাচীনকালে সেই রাজর্ষি যখন নৈষ্ঠিক তপস্যায় রত তখন কী এক কারণে ভয় পেয়ে দেবতারা মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠালেন তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে।

রাজা—অন্যের নৈষ্ঠিক সাধনায় দেবতাদের এই ভয় আছে বটে।

অনসূয়া—তারপর বসন্ত-সমাগমে তাঁর উন্মাদক রূপ দেখে—(অর্ধেক বলে লজ্জার অভিনয় করলেন)

রাজা—পরের ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ইনি অপ্সরার গর্ভজাত সন্তান?
অনসূয়া—হাঁ।
রাজা—এই তো স্বাভাবিক। মানবীদের মধ্যে এ-রূপের উদ্ভব কেমন করে সম্ভব হবে? মর্ত্যে তো এমন প্রতাপচঞ্চল জ্যোতির (বিদ্যুতের) সৃষ্টি হয় না।
(শকুন্তলা মাথা নিচু করে রইলেন)
রাজা—(স্বগত) কী সৌভাগ্য! আমার মনোবাসনা পূরণের সম্ভাবনা আছে তা হলে।
প্রিয়ংবদা—(সহাস্যে শকুন্তলাকে দেখে, নায়কের দিকে ফিরে) আপনি যেন আবার কী বলতে চাইছেন, আর্য! (শকুন্তলা সখীকে আঙুল দেখিয়ে ভর্ৎসনা করলেন)
রাজা—আপনি ঠিকই ধরেছেন। সচ্চরিত্র শ্রবণের লোভে আমার আর একটি বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে।
প্রিয়ংবদা—আপনি দ্বিধা করবেন না। তপস্বীদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই।
রাজা—আপনাদের সখীর বিষয়ে জানতে চাই বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ইনি কি তপস্বীজনোচিত ব্রত উদ্‌যাপন করবেন, যা প্রণয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরোধী? না কি, চোখ দুটো একেবারে ওদেরই মতন বলে প্রিয় হরিণবধূদের সঙ্গেই চিরকাল বাস করবেন?
প্রিয়ংবদা—ধর্মাচরণেও ইনি অন্যের অধীন। পিতার সংকল্প অবশ্য, তাকে যোগ্য বরে প্রদান করা।
রাজা—(স্বগত) এই আকাঙ্ক্ষা তাহলে দুর্লভ নয়। হে হৃদয়, তুমি আশা পোষণ কর। সংশয়ের অবসান হল এখন। তুমি যাকে অগ্নি মনে করছ, তা স্পর্শযোগ্য রত্ন।
শকুন্তলা—(যেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন এই ভাবে) অনসূয়া, আমি যাচ্ছি কিন্তু।
অনসূয়া—কেন?
শকুন্তলা—প্রিয়ংবদা কী সব আবোল তাবোল বকছে সব গিয়ে বলে দেব আর্যা গৌতমীকে।
(এই বলে উঠে পড়লেন)
অনসূয়া—সখি! বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন না করেই ইচ্ছেমতো চলে যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। (শকুন্তলা কিছু না বলেই প্রস্থানোদ্যতা হলেন)
রাজা—(স্বগত) আঃ কেন যাচ্ছেন ইনি? (তাঁকে ধরতে গিয়ে নিজেকে সংযত করে) (স্বগত) প্রেমিকের মনের গতি দৈহিক আচরণের অনুরূপ হয়। হঠাৎ মুনি-কন্যাকে অনুসরণ করতে গেলাম বটে, কিন্তু শিষ্টাচার গতিরোধ করল। আসন থেকে না উঠলেও মনে হচ্ছে গিয়ে আবার ফিরে এলাম।
প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাকে থামিয়ে) ওলো, তোর চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।
শকুন্তলা—(ভ্রূকুটি করে) কেন শুনি?
প্রিয়ংবদা—দুবার গাছে জল দেওয়ার ব্যাপারে তুই কিন্তু আমার কাছে ঋণী। আগে ঋণ শোধ কর, তারপর যাবি। (এই বলে সকলে তাকে ফেরালেন)
রাজা—ভদ্রে, গাছে জল দেবার জন্যেই ওঁকে পরিশ্রান্ত লাগছে। কারণ এঁর—জলের ঘট তুলতে তুলতে হাত দুটোর তালু রক্তবর্ণ হয়েছে, কাঁধ দুটো নুয়ে পড়েছে, একটু বেশি রকম শ্বাস নেওয়ায় এখনও ওঁর স্তনকম্পন হচ্ছে। মুখের ঘাম কানের শিরীষফুল দুটোকে এঁটে ধরেছে। খোঁপার বাঁধন খুলে গেলে এক

হাতে বাঁধার ফলে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তাই আমি ওঁকে ঋণমুক্ত করব। (এই বলে একটা আংটি দিতে উদ্যত হলেন। দুজনে আংটিতে মুদ্রিত নাম পড়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন) আমাকে ভুল বুঝবেন না। এটা রাজ-উপহার।

প্রিয়ংবদা—তাহলে আঙুল থেকে এ-আংটিটি বিচ্ছেদ না হওয়াই ভালো। আপনার কথাতেই ইনি ঋণমুক্ত হলেন। (একটু হেসে) ওলো ওলো শকুন্তলা, এঁর কৃপায় অথবা মহারাজের কৃপায় তুই ঋণমুক্ত হলি। এখন যা।

শকুন্তলা—(স্বগত) যদি নিজেকে সামলাতে পারি (তবে তো যাব)।
(প্রকাশ্যে) তুই ছেড়ে দেবার বা ধরে রাখবার কে শুনি ?

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে, মনে মনে) আমি যেমন এঁর প্রতি আকৃষ্ট, ইনিও কি তেমনি আমার প্রতি আকৃষ্টা হয়েছেন ? আমার ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনাই তো দেখতে পাচ্ছি। কারণ—যদিও ইনি আমার কথার উত্তরে কথা বলছেন না, কিন্তু আমি যখন কথা বলছি তখন কান পেতে শুনছেন। যদিও, আমার মুখের সামনে ইনি থাকছেন না, কিন্তু অন্য কিছুর দিকে বেশিক্ষণ দৃষ্টিনিবন্ধও রাখছেন না। (নেপথ্যে) তপস্বীরা শুনুন, তপোবনের সকলকে রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হোন। মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন রাজা দুষ্যন্ত, উনি খুব কাছেই এসে পড়েছেন। তাঁর (সৈন্যসামন্তের) ঘোড়ার খুরে অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তরঙের ধুলো উড়ছে। আশ্রমের তরুশাখায় মেলে দেওয়া জলে-ভেজা বল্কলগুলোতে পঙ্গপালের মতো এসে পড়েছে সেই ধুলো। তাছাড়া—একটা হাতি (রাজার) রথ দেখে ভয় পেয়ে তপস্যার মূর্তিমান বিগ্রহের মতো তপোবনে প্রবেশ করছে। তীব্র আঘাতে একটা গাছের কাণ্ডে তার একটা দাঁত গেঁথে গেছে। কোল দিয়ে সে যে সব লতা ছিঁড়ে ছুটে এসেছে তা তার গায়ে বলয়ের মতো ঘিরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন জালে জড়িয়ে পড়েছে। হরিণের দল তাকে দেখে এদিকে ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

রাজা—(স্বগত) ছি ছি ! পুরজনেরা আমার খোঁজে তপোবনের বিঘ্ন ঘটিয়েছে ! থাক আমি ফিরে যাচ্ছি।

সখীরা—আর্য, এই অরণ্যবাসীর সংবাদে আমরা বিচলিত বোধ করছি। আমাদের কুটিরে যাবার অনুমতি দিন।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) আপনারা যান। আমিও দেখছি যাতে আশ্রমের ব্যাঘাত না হয়।

(সকলে উঠল)

দুই সখী—আর্য, অতিথিসেবা আমরা ঠিকমতো করতে পারি নি। আপনাকে আবার যেন দেখতে পাই এ কথা বলতে আমাদের লজ্জা হচ্ছে।

রাজা—না না, তা বলবেন না। আপনাদের সঙ্গে যে দেখা হল এতেই আমি পুরস্কৃত।

শকুন্তলা—অনসূয়া, নতুন কুশাঙ্কুর আমার পায়ে বিঁধেছে আর বল্কলটাও কুরচির ডালে জড়িয়ে গিয়েছে। একটু দাঁড়া তো, ততক্ষণে আমি বল্কলটা ছাড়িয়ে নিই। (এই বলে বল্কল ছাড়াবার ছুতো করে দেরি করল আর রাজাকে দেখতে দেখতে সখীদের সঙ্গে চলে গেল)।

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) নগরে ফিরে যেতে আমার তেমন ইচ্ছেই হচ্ছে না। যাই

সৈনিকদের জন্যে তপোবনের কাছাকাছি শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করি। শকুন্তলার বিষয় থেকে নিজেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছি না। আমার শরীরটা যাচ্ছে আগে, পিছনে ছুটছে অস্থির মন, বাতাসের প্রতিকূলে চীনা-রেশমের পতাকা নিয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। (দণ্ডটি যায় আগে আর পিছনে যায় বস্ত্রাংশটি)।

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

(তারপর বিষণ্ন বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—(নিঃশ্বাস ফেলে) কী দুর্ভাগ্য আমার! এই মৃগয়া-পাগল রাজার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। এই হরিণ, এই শুয়োর, এই বাঘ—এমনি করে দুপুরেও বনে বনে ঘুরছেন, গ্রীষ্মে পাতা কমে যাওয়ায় সেখানে ছায়া নেই বললেই চলে। পাতা গলে-গলে পাহাড়ী নদীর জল কেমন কটু আর লাল হয়ে গিয়েছে, তাই খেতে হচ্ছে। সময়ে অসময়ে শূলে-পোড়ানো মাংসই বেশির ভাগ খেতে হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে ছুটে ছুটে শরীরের গাঁটগুলো ব্যথায় টনটন করছে, রাতেও ঘুমোতে পারি না তাই। তারপর আবার খুব ভোরে পাখি-শিকারীদের বন ঘিরে ফেলার চিৎকার চেচাঁমেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু এতেও কষ্টের শেষ নেই, হয়েছে গোদের উপর বিষফোঁড়া! কালকে আমরা একটু পিছিয়ে পড়ায় হরিণের পিছু নিয়ে মহারাজ আশ্রমে প্রবেশ করলেন আর আমারই দুর্ভাগ্য যেন তাঁকে তাপসকন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়ে দিল। এখন তো নগরে যাবার নামও করছেন না। এসব ভাবতে ভাবতে আমার চোখের উপর ভোর হয়ে গেল। কী আর করি, তাঁকেই দেখি, উনি এতক্ষণে প্রাতঃকৃত্য আর প্রসাধন সেরে ফেলেছেন। (পরিক্রমা করে দেখে) এই যে এই দিকেই আসছেন প্রিয় বয়স্য, ওঁকে ঘিরে রয়েছে যবনীরা, ওদের হাতে ধনুক, গলায় বনফুলের মালা। যা হোক, বিকলাঙ্গদের মতো হয়ে থাকি, যদি এরকম করেও একটু বিশ্রাম জোটে কপালে। (এই বলে হাতের লাঠিটায় গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)

(তারপর এইভাবে পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—(মনে মনে) প্রিয়া সহজলভ্যা নয় জানি, তবু আমার মনোভাব দেখে আশ্বস্ত। কামনা অপূর্ণ থাকলেও দুজনের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি দেয়।

(মৃদু হেসে) নিজের মনোভাব অনুসারে প্রিয়জনের মনোভাব কল্পনা করে প্রণয়-প্রার্থীরা এইভাবেই প্রতারিত হয়। অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেও তাঁর সে দৃষ্টিতে ছিল অনুরাগ, নিতম্বভারে তাঁর সে যে মৃদুমন্দ গমন, তা যেন বিলাসভাব প্রকাশের জন্যেই। 'যেন না' বলে বাধা পাওয়াতে একটু যেন হিংসে করেই সখীকে যা বলেছিল—মনে হচ্ছে সে-সবের একমাত্র লক্ষ্য ছিলাম আমিই। কী আশ্চর্য! প্রেমিক সবকিছুই নিজের অনুকূলে কল্পনা করে থাকে।

বিদূষক–(সেইভাবে থেকে) বয়স্য, হাত-পা আর চলছে না। তাই শুধু কথাতেই জয় ঘোষণা করছি ঃ জয় হোক, জয় হোক আপনার!

রাজা–তোমার গা-ব্যথার কারণ কি শুনি?

বিদূষক–নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে কেন জল পড়ছে জিজ্ঞেস করছেন?

রাজা–ঠিক বুঝলাম না।

বিদূষক–বয়স্য, বেতগাছ যে কুঁজোর ভূমিকা অভিনয় করে সে কি নিজের ইচ্ছায়, না নদীবেগই তার কারণ?

রাজা–নদীবেগই তার কারণ।

বিদূষক–আমার ব্যাপারেও আপনিই কারণ।

রাজা–কেন শুনি?

বিদূষক–এইভাবে রাজকাজে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঘোর বনে ব্যাধের বৃত্তি নিয়েছেন আপনি? সত্যি বলছি। প্রত্যেক দিন জন্তু-জানোয়ারের পিছনে ছুটে ছুটে আমার শরীরের গাঁঠগুলোই যেন সরে গিয়েছে। অঙ্গচালনায় আমি একেবারেই অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই আমার উপর একটু সদয় হোন, একটা দিনের জন্যেও অন্তত বিশ্রাম নিন।

রাজা–(মনে মনে) এ-ও এ কথাই বলছে। আমারও কাশ্যপকন্যার কথা মনে করে মৃগয়ায় বিতৃষ্ণা এসেছে। আমার প্রিয়ার সঙ্গে একস্থানে থেকে যারা (মৃগেরা) তাঁকে কি করে সুন্দর দৃষ্টিপাত করতে হয় তা শিখিয়েছে, ধনুকে বাণ জুড়েও আমি তাদের উপর তা ছুঁড়তে পারছি না।

বিদূষক–(রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) আপনি মনে মনে কী যেন ভাবছেন। আমার কথা দেখছি অরণ্যে রোদন হল।

রাজা–(হেসে) কী আর ভাবছি বল? বন্ধুর অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করা যায় না, তাই আজ বিশ্রামই নিচ্ছি।

বিদূষক–(খুশি হয়ে) দীর্ঘজীবী হোন! (এই বলে যেতে চাইলেন)

রাজা–বয়স্য। একটু অপেক্ষা কর। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি।

বিদূষক–বলুন তা হলে।

রাজা–বিশ্রামের সময় ছুটোছুটি করতে হবে না এমন একটা কাজে তোমাকে সহায় হতে হবে।

বিদূষক–সেটা কি মিঠাই খাওয়ার কাজ? তাহলে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

রাজা–কোন্ কাজে তোমাকে দরকার বলেছি। এখানে কে আছে?

দৌবারিক–(প্রবেশ করে প্রণাম করে) আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা–রৈবতক, সেনাপতিকে একটু ডেকে আনো তো।

সেনাপতি–(রাজাকে দেখে) মৃগয়ায় দোষ দেখা গেলেও মহারাজের ক্ষেত্রে কিন্তু তা কেবল গুণেই পরিণত হয়েছে। কারণ মহারাজ অরণ্যচারী মাতঙ্গের মতো শক্তিসার দেহ ধারণ করেছেন। অনবরত ধনুর্গুণ আকর্ষণ করায় সে-দেহের পূর্বভাগ সুদৃঢ় হয়েছে, যা সূর্যের তেজ সইতে পারে। শ্রমে মোটেই ক্লান্ত হয় না! যদিও তা (মৃগয়ায় একটানা পরিশ্রমে) একটু ক্ষীণ হয়েছে, তবু বিশালতার দরুণ তা তেমন বোঝাই যাচ্ছে না।

(এগিয়ে এসে) মহারাজের জয় হোক! হিংস্র জন্তুদের আবাসগুলো কোথায় তা আমরা ইতিমধ্যে ধরে ফেলেছি। এই সময়ে আপনি এখানে?

রাজা—আমার উৎসাহে ভাটা পড়েছে মাধব্যের কথায়, মৃগয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ।

সেনাপতি—(আড়ালে) বন্ধু, তোমার সংকল্পে স্থির থাক। আমি একটু মহারাজের মন বুঝে দেখছি।

(প্রকাশ্যে) এ মূর্খ প্রলাপ বকছে। এ বিষয়ে তো আপনিই প্রমাণ—মেদ কমে যাওয়ায় পেটের স্থূলতাও যায় কমে, তাতে শরীর হালকা হয়ে কঠিন কাজের উপযুক্ত হয়। ভয়ে বা ক্রোধে প্রাণীদের মনে কেমন পরিবর্তন আসে তা চোখে পড়ে। ধাবমান লক্ষ্যে যদি বাণ ঠিক ঠিক গিয়ে পড়ে ধনুর্ধরের গুণপনাই তাতে প্রকাশিত হয়। মৃগয়াকে অনর্থক পাপ বলা হয়, এ রকম আমোদ আর কিসে!

বিদূষক—(ক্রোধে) খুব উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না? দূর হ এখান থেকে। মহারাজ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তুই হতচ্ছাড়া বনবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের নাকে-লোভ এমন এক বুড়ো ভালুকের মুখে গিয়ে পড়বি।

রাজা—সেনাপতিমশাই, আমরা আশ্রমের কাছাকাছি আছি। তাই আপনার কথা সমর্থন করতে পারছি না। আজ—শিঙ দিয়ে বার বার জল আলোড়িত করে মহিষেরা ডোবায় ডুব দিক, ছায়ায় দলবেঁধে বসে হরিণেরা রোমন্থন অভ্যাস করুক। শুয়োরেরা নির্ভয়ে পুকুরের পাঁক থেকে ঘাসের মাথা ছিঁড়ুক। আর গুণ-শিথিল-করা আমার ধনুকও বিশ্রাম লাভ করুক।

সেনাপতি—মহারাজের যা অভিরুচি।

রাজা—তাহলে বন ঘিরে ফেলবার জন্যে যারা আগেই বেরিয়েছেন তাদের নিবৃত্ত করুন। আমার সৈন্যরা যাতে তপোবনের কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সেইভাবে তাদের নিষেধ করে দেবেন। দেখুন—শান্তিপ্রধান তপস্বীদের মধ্যে একটা দাহিকাশক্তি লুকিয়ে আছে। সূর্যকান্তমণি সুখস্পর্শ, কিন্তু অন্য তেজে আক্রান্ত হলে সেই শক্তিকে (দাহিকাশক্তিকে) প্রকাশ করে।

বিদূষক—ওরে হতচ্ছাড়া, যা এবার। চুলোয় যাক ফুসলানি। (সেনাপতির প্রস্থান)

রাজা—(পরিজনদের দিকে চেয়ে) তোমরা এবার মৃগয়ার সাজ খুলে ফেল। রৈবতক, তুমিও তোমার কাজে যাও।

পরিজনেরা—মহারাজের যা আদেশ। (এই বলে চলে গেল)

বিদূষক—আপনি দেখছি জায়গাটাকে একেবারে মাছি-হীন (নির্জন) করলেন। এখন এই শিলাতলে বসুন। গাছের ছায়া যেন উপরে চাঁদোয়া খাটিয়েছে। আমিও বেশ আরাম করে বসছি।

রাজা—তুমি আগে যাও।

বিদূষক—আপনি আসুন। (দুজনে পরিক্রমা করে গিয়ে বসল)

রাজা—মাধব্য, তুমি চোখ থাকতেও কানা, দেখবার মতো জিনিস তুমি দেখ নি।

বিদূষক—কেন, আপনি তো আমার সামনেই আছেন।

রাজা—সবাই নিজের লোককে ভালো দেখে। আমি সেই আশ্রমের অলংকার শকুন্তলাকে মনে রেখে কথা বলছি।

বিদূষক—(মনে মনে) এঁকে সুযোগই দেব না প্রসঙ্গ তোলার!

(প্রকাশ্যে) বয়স্য, আপনি দেখছি শেষকালে একটি ঋষিকন্যায় আসক্ত।

রাজা—বন্ধু, পুরুবংশে জন্ম এমন কারো মন নিষিদ্ধ কোনো-কিছুতে আসক্ত হয় না। মুনিকন্যা হলেও তিনি অপ্সরীর গর্ভজাত। পরে পরিত্যক্তা হলে মুনি তাঁকে পেয়েছেন। তিনি যেন একটি নবমল্লিকা ফুল, বৃন্তচ্যুত হয়ে যা অর্কতরুর উপরে পড়ছে।

বিদূষক—(হেসে) খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি হলে (মুখ বদলাবার জন্যে) যেমন তেঁতুল খেতে সাধ হয়, শ্রেষ্ঠ রমণী-সম্ভোগের পর আপনার এই অভিলাষটিও তেমনি।

রাজা—তুমি এঁকে দেখ নি, তাই এ কথা বলছ।

বিদূষক—তা আপনাকে যা অবাক করেছে তা তো সুন্দর বটেই।

রাজা—বয়স্য, বেশি বলব কি? বিধাতার শক্তি এবং এঁর দেহসৌষ্ঠব বিবেচনা করে আমার মনে হয়, আগে ছবিতে এঁকে নিয়ে যেন এঁতে প্রাণ দেওয়া হয়েছে। অথবা সমস্ত সৌন্দর্য একসঙ্গে করে বিধাতা যেন এই অনন্য স্ত্রীরত্ন মনে মনে সৃষ্টি করেছেন।

বিদূষক—যদি তাই হয় তাহলে সমস্ত রূপসীরা এতদিনে পরাস্ত হলেন।

রাজা—আমার এও মনে হয়—তাঁর অকলঙ্ক এই রূপ যেন একটি ফুলের মতো যার ঘ্রাণ এখনো কেউ পায় নি, ইনি যেন এমন একটি পল্লব কোনো আঙুল যাকে ছিঁড়ে নেয় নি, ইনি যেন এমন নতুন-মধু যার রসাস্বাদন এখনো কেউ করে নি। ইনি যেন এমন পুণ্যের ফল যা এখনো অখণ্ডিত। জানি না এই রূপ ভোগ করবার জন্যে বিধাতা কাকে নির্বাচন করবেন।

বিদূষক—তা হলে শিগ্গিরই এঁকে রক্ষা করুন। যাতে ইঙ্গুদীতেলে চকচকে মাথাওয়ালা কোনো মুনির হাতে ইনি না পড়েন।

রাজা—সে তো পরাধীন। তাছাড়া, তাঁর অভিভাবকও এখন (আশ্রমে) অনুপস্থিত।

বিদূষক—আচ্ছা, আপনার দিকে যে দৃষ্টি ইনি দিয়েছেন তাতে অনুরাগের লক্ষণ কতটা প্রকাশিত হয়েছে?

রাজা—মুনিকন্যারা স্বভাবতই সংযতপ্রকৃতি, তবুও আমি সামনে পড়লেই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, হেসেছেন, কিন্তু সে হাসি যেন অন্য কোনো কারণে এমন ভাব দেখিয়েছেন। তাই শিষ্টাচারে সংযত তাঁর অনুরাগ তিনি ঠিক প্রকাশও করেন নি, অথচ গোপন করতেও পারেন নি।

বিদূষক—দেখামাত্রই তো তিনি আপনার কোলে উঠে বসবেন না।

রাজা—পরস্পর বিদায় নেবার সময় শালীনতা সত্ত্বেও তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ কয়েক পা গিয়েই তন্বী অকারণেই থেমে গেলেন, ভান করলেন যেন কুশাঙ্কুর বিঁধেছে তাঁর পায়ে। আর পিছনে মুখ ফিরিয়ে বল্কল ছাড়াতে লাগলেন, যদিও গাছের শাখায় তা জড়িয়ে যায় নি।

বিদূষক—তাহলে (এই প্রেমের পথযাত্রায়) কিছু পাথেয় সংগ্রহ করুন। আপনি তপোবনকে উপবন করে তুললেন দেখছি!

রাজা—তপস্বীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চিনে ফেলেছেন। ভেবে দেখ কোন্ ছুতোয় আবার আশ্রমে যাব।

বিদূষক—আপনারা রাজা, রাজাদের আবার ছুতো কী? বলবেন নীবারধানের ষষ্ঠাংশ দিন।

রাজা—মূর্খ, এই তপস্বীরা আমাদের জন্যে একধরনের কর দেন যার মূল্য রত্নরাশির চেয়ে অনেক বেশি। দেখ—চতুর্বর্ণ থেকে যে ধন রাজারা পান তা নশ্বর, কিন্তু তপোবনবাসীরা তাঁদের তপস্যার যে ষষ্ঠাংশ আমাদের দেন তা অক্ষয়।

(নেপথ্যে)—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা—(কান পেতে শুনে) ধীর ও প্রশান্ত স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে এঁরা তপস্বী।

দৌবারিক—(প্রবেশ করে) জয় হোক মহারাজের! দুজন ঋষিকুমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা—তাহলে তাঁদের ভেতরে ডেকে আনো।

দৌবারিক—ডেকে আনছি। (বেরিয়ে গিয়ে আবার ঋষিকুমারদের নিয়ে প্রবেশ করে) এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।

(দুজনে রাজাকে দেখে)

প্রথমজন—কী আশ্চর্য তেজোদীপ্ত এই রাজার মূর্তি, কিন্তু বিশ্বস্ত চিত্তে (নির্ভয়ে) এঁর কাছে যাওয়া যায়। ঋষিকল্প এই রাজার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

কারণ—

ইনি সর্বভোগ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করেন, ইনিও জনগণের ত্রাণকর্মের সূত্রে প্রতিদিন তপস্যা সঞ্চয় করেন। চারণদের গাওয়া জিতেন্দ্রিয় এঁর স্তুতিগান স্বর্গ স্পর্শ করে। সে গানের বাণী 'ঋষি' এই পবিত্র শব্দ, শুধু তার আগে 'রাজ' এই শব্দটি যুক্ত (অর্থাৎ রাজর্ষি)।

দ্বিতীয়জন—ইনিই ইন্দ্রের সখা দুষ্যন্ত?

প্রথমজন—হাঁ।

দ্বিতীয়জন—তাই—

নগরতোরণের আগলের মতো দীর্ঘ-বাহু ইনি যে সাগরের শ্যামপ্রান্তবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী একাই শাসন করেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। দৈত্যদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে দেবতারা এঁর বাণযুক্ত ধনুতে এবং ইন্দ্রের বজ্রে একইভাবে বিজয়ের আশা করে থাকেন।

দুজনে—(কাছে গিয়ে) রাজন্! জয়যুক্ত হোন।

রাজা—(আসন থেকে উঠে) আপনাদের দুজনকে অভিবাদন করি।

দুজনে—কল্যাণ হোক আপনার।

রাজা—(প্রণাম করে আশীর্বাণী গ্রহণ করে) আজ্ঞা করুন।

দুজনে—আপনি যে এখানে আশ্রমবাসীরা তা জানেন। তাঁরা আপনার কাছে প্রার্থনা করেন—

রাজা—কী আজ্ঞা করেন তারা?

দুজনে—মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির দরুন রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞকাজের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাই সারথিকে সঙ্গে নিয়ে আপনি কয়েকটি রাত আশ্রমেই থেকে যান এই তাঁদের ইচ্ছা।

রাজা—অনুগৃহীত হলাম।

(স্মিতহাস্যে) রৈবতক, আমার নাম করে সারথিকে গিয়ে বল, 'ধনুর্বাণযুক্ত রথ নিয়ে এস'।

দৌবারিক—মহারাজ যা আদেশ করেন।

দুজনে—(সানন্দে) আপনি পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে চলেছেন, তাই আপনার পক্ষে এ তো খুবই স্বাভাবিক। পুরুবংশীয়েরা বিপন্নদের অভয়যজ্ঞে দীক্ষিত।

রাজা—(প্রণাম করে) আপনারা এগিয়ে যান। আমি এই এলাম বলে।

দুজনে—জয় হোক। (প্রস্থান)

রাজা—মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার কৌতূহল আছে ?

বিদূষক—প্রথমে খুবই ছিল। এখন রাক্ষসের সংবাদ শুনে বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

রাজা—ভয় করো না। আমার কাছেই তো থাকবে।

বিদূষক—এই (বলামাত্রই মনে হচ্ছে) রাক্ষস থেকে বেঁচে গেলাম।

দৌবারিক—(প্রবেশ করে) আপনার বিজয়-অভিযানের জন্যে রথ প্রস্তুত। এদিকে আবার পূজনীয়া রানী-মার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে করভক এসেছে।

রাজা—(সাগ্রহে) কী ! মা পাঠিয়েছেন ?

দৌবারিক—আজ্ঞে, তাই।

রাজা—তাহলে তাকে ডেকে আনো।

দৌবারিক—আজ্ঞে, আনছি। (বেরিয়ে করভককে নিয়ে প্রবেশ করে) এই যে মহারাজ এখানে আছেন। এগিয়ে এসো তুমি।

করভক—জয় হোক মহারাজের ! দেবী আদেশ করেছেন—আগামী চতুর্থ দিনে 'পুত্র-পিণ্ডপালন' নামে উপবাস হবে। সেদিন দীর্ঘজীবী তুমি এসে অবশ্যই আমাদের আনন্দবর্ধন করবে।

রাজা—একদিকে তপস্বীদের কাজ, অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। কোনোটিই তো লঙ্ঘন করা যায় না। কী করি এখন ?

বিদূষক—ত্রিশঙ্কুর মতো মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে থাকুন।

রাজা—আমি সত্যিই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। সামনে পাহাড়ের বাধা পেলে নদীর স্রোত যেমন দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি দুটো কাজ দু'জায়গায় বলে আমার মনও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

(ভেবে) বন্ধু ! আমার মা তোমাকে নিজের ছেলের মতোই মনে করেন। তাই তুমি এখান্ থেকে নগরে গিয়ে আমি তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত আছি এ কথা জানিয়ে আমার প্রতিনিধি হয়ে মায়ের সন্তানের কাজ করতে পারো।

বিদূষক—আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি, তা মনে করবেন না তো ?

রাজা—(একটু হেসে) মহাব্রাহ্মণ। এ কি তোমাতে সম্ভব ?

বিদূষক—তা হলে আমি রাজার ছোটো ভাইয়ের মতোই যাব।

রাজা—নিশ্চয়। তপোবনের অশান্তি দূর করতে হবে, তাই সমস্ত অনুচরদের তোমার সঙ্গেই পাঠাব ভাবছি।

বিদূষক—(সগর্বে) তাহলে তো এখন যুবরাজই বনে গেলাম।

রাজা—(মনে মনে) এই ব্রাহ্মণটি একটু কান-পাতলা। তাই হয়তো-বা আমার এই অভিলাষের কথা অন্তঃপুরে গিয়ে বলে দেবে। যা হোক, এইভাবে বলি—

(বিদূষকের হাত ধরে প্রকাশ্যে) বয়স্য, ঋষিদের কাজের গুরুত্ববোধেই তপোবনে প্রবেশ করেছি, সত্যিই সেই মুনিকন্যার উপর আমার অভিলাষ নেই।
দেখো—কোথায় আমরা (আমাদের মতো নাগরিক) আর কোথায় মৃগশিশুর সঙ্গে বেড়ে-ওঠা কামবিমুখ মানুষ। সখা, আমি যা বলেছি, পরিহাস করেই বলেছি! সত্যি বলে মনে কোরো না যেন।

বিদূষক—আচ্ছা, ঠিক আছে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় অংক সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অঙ্ক

(তারপর যজমানশিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—(কুশ নিয়ে) রাজা দুষ্যন্তের কী বিপুল প্রভাব! তিনি আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের যজ্ঞীয় কাজকর্মের বাধা দূর হল। ধনুকে বাণ যোজনার তো কথাই ওঠে না, দূর থেকে শুধু ধনুকের টঙ্কারেই যে তিনি সব বাধা দূর করেন। যাক, যজ্ঞবেদীতে বিছানোর জন্যে এই কুশগুলো ঋত্বিকদের দিইগে এখন।

(চারদিক ঘুরে এবং তাকিয়ে শূন্যের উদ্দেশে)

প্রিয়ংবদা, কার জন্যে এই বেনা-মূলের প্রলেপ আর নালশুদ্ধ পদ্মপাতা নিয়ে যাচ্ছ?

(যেন শুনতে পেয়েছেন এই রকম অভিনয় করে)

কী বললে? গ্রীষ্মের তাপে শকুন্তলা খুব অসুস্থ বোধ করছেন? তাঁর শরীর শীতল করার জন্যে? তাহলে প্রিয়ংবদা, সযত্নে তাঁর পরিচর্যা কর। তিনি মাননীয় কণ্বের প্রাণস্বরূপা। আমিও এদিকে গৌতমীর হাত দিয়ে যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠাচ্ছি। (এই বলে চলে গেলেন)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(তারপর কামার্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) তপস্যার প্রভাব কতখানি তা আমি জানি। আর এই বালিকাও পরাধীনা তা জানি। তবু এঁর থেকে মনকে সরিয়ে নিতে পারছি না।

(প্রণয়-পীড়ার অভিনয় করে)

ভগবান পুষ্পধনু, কামার্তেরা তোমাকে আর চাঁদকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়ে থাকে। তোমার পুষ্পবাণ থাকা আর চাঁদের শীতল কিরণ থাকা দুটোই আমার মতো লোকের পক্ষে মিথ্যে দেখছি। কারণ চাঁদ ঐ হিমকরণ দিয়েই অগ্নিবর্ষণ করছেন আর তুমিও তোমার পুষ্পবাণগুলোকে বজ্রের মতো কঠিন করে তুলছ।
(বিষণ্ণভাবে পায়চারি করে) যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হয়েছে, পুরোহিতরাও আমাকে বিদায় দিয়েছেন, এখন কোথায় আমি আমার বিষণ্ণ মনকে সান্ত্বনা দিই।
(নিঃশ্বাস ফেলে) এখন প্রিয়াদর্শন ভিন্ন অন্য কোনো অবলম্ব নেই। যাই তাঁকেই অন্বেষণ করি। (সূর্য দেখে) এ রকম দারুণ রোদের সময় শকুন্তলা

প্রায়ই তাঁর সখীদের নিয়ে লতাকুঞ্জমণ্ডিত মালিনীতীরে আসেন। আমি সেখানেই যাই তাহলে।

(পরিক্রমা করে তাকিয়ে) তন্বী (শকুন্তলা) কিছুক্ষণ আগেই এই তরুণ তরুবীথির পথেই গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ—তিনি যে বৃন্তকোষগুলো থেকে ফুল তুলেছেন সেগুলো এখনও সংকুচিত হয় নি এবং যেখান থেকে তিনি নবকিশলয় ছিন্ন করেছেন সেই জায়গাগুলোও রসে-ভেজা দেখছি।

(বায়ুস্পর্শের অভিনয় করে) মিষ্টি হাওয়ায় জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। মালিনী নদীর তরঙ্গকণাবাহী পদ্মগন্ধি এই বায়ুকে কামতপ্ত দেহে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে পারা যায়। (পরিক্রমা করে, তাকিয়ে) এই বেতসলতায় ঘেরা নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারে পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে নতুন পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যার আগের দিকটা উঁচু আর পিছনের দিকটা নিতম্বের ভারবশত গভীর। যাক, ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখি। (পরিক্রমা করে, ঐরকমভাবে থেকে সানন্দে) কী আশ্চর্য ! নয়নের পরম শান্তিকে পেয়ে গেছি। আমার প্রাণপ্রতিমা দেখছি ফুলবিছানো পাথরের ফলকে শুয়ে আছেন, দুই সখী তাঁর পরিচর্যা করছেন। যাক, এখন শুনি এদের মন-খোলা কথা। (এই ভেবে চেয়ে রইলেন)

(তারপর দুই সখীকে নিয়ে যথাবর্ণিত শকুন্তলার প্রবেশ)

দুই সখী—(সস্নেহে হাওয়া করে) ওলো শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়া ভালো লাগছে তো ?

শকুন্তলা—(সখেদে) তোরা আমাকে হাওয়া করছিস নাকি ?

(সখীরা বিষাদ অভিনয় করে একে অন্যের দিকে চাইল)

রাজা—শকুন্তলা খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। (সন্দিগ্ধভাবে) তাহলে কী এটা বেশি রোদের জন্যেই, না কি মনে মনে যা ভাবছি তাই ?

(আশংকা নিয়ে দেখে) তবে মনে হচ্ছে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

স্তনদুটিতে উশীরের অনুলেপন, মৃণালের একটি বলয়, তাও শিথিল। এত সন্তাপেও প্রিয়ার তাপিত দেহ কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কাম ও গ্রীষ্ম এ দুটির তাপের আধিক্য যদিও সমান বলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের প্রকোপ এমন মধুর হয়ে দেখা দেয় না।

প্রিয়ংবদা—(আড়ালে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষির সঙ্গে প্রথম যে দেখা হল তারপর থেকেই শকুন্তলাকে কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। এই জন্যেই কি শকুন্তলার এই অস্বস্তি ?

অনসূয়া—সখী, আমিও মনে মনে এই আশংকাই করছি। যাক। ওকেই জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) সখী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তোর অসুখটা সত্যিই বড়ো রকমের।

শকুন্তলা—(শরীরের পূর্বার্ধ দিয়ে শয্যা থেকে উঠে) সখী, কী বলতে চাস বল তো ?

অনসূয়া—সখী শকুন্তলা, প্রণয়ঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু ইতিহাস বা নিবন্ধাদিতে কাম-সন্তপ্তদের যে অবস্থার কথা শোনা যায় তোরও তাই হয়েছে দেখছি। বল তো তোর সন্তাপের কারণটা কী ? রোগের কারণটা না জেনে তো তার প্রতিকার করা যায় না।

রাজা—অনসূয়াও দেখছি ঠিক আমারই মতো সন্দেহ করছে। তাহলে আমি নিজের

মনের ইচ্ছে অনুসারেই বিষয়টাকে দেখছি না।

শকুন্তলা—(মনে মনে) আমার অস্বস্তিটা খুবই বেশি। তবু এখনও হঠাৎ এদের দুজনকে সব খুলে বলতে পারছি না।

প্রিয়ংবদা—সখী, ও ঠিকই বলেছে। তুই নিজের মনের উদ্বেগটাকে এমন করে অবহেলা করছিস কেন? দিন দিন তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস? শুধু লাবণ্যময়ী ছায়াটি তোকে ছেড়ে যায় নি।

রাজা—প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছেন। কারণ মুখমণ্ডলে গাল দুটি খুবই শুকিয়ে গেছে, বুকে স্তন দুটির কাঠিন্য হয়েছে শিথিল, কোমরটি দেখছি খুবই ক্ষীণ আর কাঁধ দুটি পড়েছে নুয়ে। দেহকান্তি পাণ্ডুর। কামসন্তপ্তা শকুন্তলার অবস্থা শোচনীয় অথচ মনোরম, পাতার রস শুষে নেওয়ায় গ্রীষ্মের বায়ুর স্পর্শে মাধবীলতার যেমন হয় ঠিক তেমনি।

শকুন্তলা—(নিঃশ্বাস ফেলে) সখী, আর কাকেই বা বলব? এখন বললে শুধু তোদের দুঃখের কারণই হবে।

সখীরা—তাই তো পীড়াপীড়ি করছি। প্রিয়জনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিলে সে দুঃখ সহ্য করা যায়।

রাজা—সুখে দুঃখে জীবনের চিরসঙ্গিনী সখীরা যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন এ বালিকা নিশ্চয়ই তাঁর মনোবেদনার কারণ না বলে পারবেন না। ইনি ফিরে ফিরে বহুবার আমার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও ঠিক এই সময়টিতে ইনি কী বলেন তা শুনতে গিয়ে আমি বিচলিত বোধ করছি।

শকুন্তলা—সখী, যেদিন সেই তপোবনের রক্ষক রাজর্ষি আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন সেই দিন থেকেই—(অর্ধেকটা বলে লজ্জার অভিনয় করলেন)

দুজনে—বলে যা প্রিয়সখী, বলে যা।

শকুন্তলা—সেদিন থেকে তাঁকেই মনে মনে কামনা করে আমি এই অবস্থায় এসেছি।

রাজা—(সানন্দে) যা শোনার ছিল শুনলাম! গ্রীষ্মের শেষে মেঘাচ্ছন্ন দিন যেমন জীবলোকের তাপের কারণ হয়ে আবার সুখের কারণ হয়, কামদেবও তেমনি আমার সন্তাপের কারণ হয়েছিলেন কিন্তু তিনিই আবার তা দূর করলেন।

শকুন্তলা—তোমরা যদি অনুমোদন কর, তাহলে সেই রাজর্ষির করুণা যাতে পেতে পারি তারই চেষ্টা কর। তা না হলে অবশ্যই আমার জলাঞ্জলির ব্যবস্থা কর।

রাজা—এ কথায় আমার সংশয় কেটে গেল।

প্রিয়ংবদা—(আড়ালে) অনসূয়া, ওর অনুরাগ অনেক দূর এগিয়েছে, আর অপেক্ষা করতে পারবে না। শকুন্তলা যাঁকে মন দিয়েছে তিনি পুরুবংশের অলংকার, তাই ওর আকাঙ্ক্ষা অভিনন্দনযোগ্য।

অনসূয়া—ঠিক বলেছিস।

প্রিয়ংবদা—সখী, ভাগ্যক্রমে তোরই যোগ্য হয়েছে এই আকাঙ্ক্ষা। সাগর ছেড়ে মহানদী আর কোথায় গিয়ে মিশবে? আম্রতরু বিনা কে-ই বা পল্লবিত মাধবীলতার ভার বইবে?

রাজা—বিশাখা নামে দুই তারা যে সব সময় চন্দ্রলেখার অনুসরণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

অনসূয়া—কিন্তু এখন অবিলম্বে এবং গোপনে কিভাবে সখীর মনোবাসনা পূরণ করব আমরা ?

প্রিয়ংবদা—গোপনে কিভাবে করব সেটাই ভাবতে হবে তবে তাড়াতাড়ি করাটা সহজই বলব।

অনসূয়া—কি করে ?

প্রিয়ংবদা—সেই রাজর্ষিও একে দেখেছেন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে, তাতেই ওঁর বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্য করছি এ কয়দিনে রাত জাগায় তিনি কৃশও হয়েছেন।

রাজা—(নিজের দিকে তাকিয়ে) সত্যিই তাই হয়েছি। কারণ রোজ রাতে বাঁ-হাতের উপরে নয়নপ্রান্তটি রেখে বসে থাকার ফলে হৃদয়বেদনার উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়ে হাতের সোনার-বালার মণিগুলোকে মলিন করেছে। (অনবরত রাত জাগায় বাহু হয়েছে কৃশ) তাই মণিবন্ধ থেকে সোনার-বালা নিচে নেমে পড়ছে। আর আমি সেটাকে বারবার তুলে দিচ্ছি। ধনুকের ছিলার আঘাতে বাহুতে যে দাগ পড়েছে বালাটি কিন্তু তা স্পর্শই করছে না।

প্রিয়ংবদা—(চিন্তা করে) সখী, ওঁর উদ্দেশে প্রেম-পত্র লেখা হোক। আমি তা ফুলের ভেতর লুকিয়ে 'এটা নির্মাল্য' এই ছলনায় রাজার হাতে পৌঁছে দেব।

অনসূয়া—হ্যাঁ, এ বুদ্ধিটা আমার ভালো লাগছে। শকুন্তলা কি বলে শুনি ?

শকুন্তলা—তোদের কোন্ কথা আমি মানি নি বল তো ?

প্রিয়ংবদা—তাহলে নিজের মতো কিছু ললিত পদবন্ধন চিন্তা কর দেখি।

শকুন্তলা—সখী, চিন্তা করছি কিন্তু অবজ্ঞার ভয়ে হৃদয় উঠছে কেঁপে।

রাজা—(সহর্ষে) ওগো ভীরু, যার কাছ থেকে তুমি অবজ্ঞা আশঙ্কা করছ, তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সে উৎসুক হয়ে আছে। যে যাচক, শ্রীলাভ তাঁর না-ও হতে পারে, কিন্তু শ্রী স্বয়ং যাকে অনুগৃহীত করতে চান সে কি কখনো দুর্লভ হয় ?

সখীরা—সখী, তুমি নিজের গুণের অবমাননা করছ। শরীর জুড়ানো শরতের জ্যোৎস্নাকে কে আঁচল দিয়ে ঢাকে বল ?

শকুন্তলা—(একটু হেসে) এই লিখছি। (এই বলে উঠে বসে চিন্তা করতে লাগলেন)

রাজা—(মনে মনে) নিমেষ-ভোলা চোখে প্রিয়াকে দেখছি, দেখার মতোই বটে। পদরচনা করছেন ইনি। ওঁর একটি ভ্রূলতা উঠেছে উঁচু দিকে, রোমাঞ্চিত গালটিতে প্রকাশিত হচ্ছে আমার প্রতি এঁর অনুরাগ।

শকুন্তলা—ওগো, আমি গানের বিষয় চিন্তা করছি। কিন্তু লেখবার উপকরণ তো কাছে নেই।

প্রিয়ংবদা—শুকপাখির উদরের মতো স্নিগ্ধ এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তোল।

শকুন্তলা—(তাই করে) ওগো, এবারে শোন তোরা, ঠিক হল কিনা।

দুজনে—মন দিয়ে শুনছি আমরা।

শকুন্তলা—(পড়লেন) হে নিষ্ঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানি না, তবে দিনরাত কামদেব তোমাতে একান্ত অনুগামী আমার অঙ্গগুলোকে অত্যন্ত তাপিত করছেন।

রাজা—(হঠাৎ সামনে এসে) হে তন্বী, কামদেব তোমাকে শুধু তাপিত করছেন, কিন্তু আমাকে যে দগ্ধ করছেন। দিন চাঁদকে যতটা ম্লান করে কুমুদিনীকে ততটা করে না।

সখীরা—(দেখে সানন্দে উঠে) আমাদের অবলম্বিত মনোরথকে স্বাগত জানাই।

(শকুন্তলা উঠতে চাইলেন)

রাজা—না, না, আয়াসের প্রয়োজন নেই। তোমার অঙ্গ অত্যন্ত বেদনায় কাতর, তা কেবল তোমার পুষ্পশয্যায় সংলগ্ন হয়েছে এবং মৃণাল বলয়গুলোকে পিষ্ট করেছে, ও অঙ্গ এখন লোকাচার পালনের যোগ্য নয়।

অনসূয়া—বন্ধু, এইদিকে শিলাখণ্ডের একটি প্রান্তকে অলংকৃত করুন।

(রাজা বসলেন। শকুন্তলা সলজ্জ হয়ে রইলেন)

প্রিয়ংবদা—আপনাদের দুজনের অনুরাগ দুজনের কাছেই প্রত্যক্ষ। তবু আমাদের সখীর প্রতি অনুরাগ আমাকে একটু বেশি বলিয়ে নিতে চায়।

রাজা—ভদ্রে, গোপন করবেন না কিছু। যা বলবার না-বলা রয়ে গেলে দুঃখ হয়।

প্রিয়ংবদা—রাজা, রাজ্যবাসী বিপন্নদের কষ্ট দূর করবেন এই আপনাদের ধর্ম।

রাজা—এর উপরে কিছুই নেই?

প্রিয়ংবদা—তাহলে বলি, আপনাকে উপলক্ষ করেই ভগবান কামদেব আমাদের প্রিয় সখীকে এই অবস্থায় এনেছেন। তাই অনুগ্রহ করে ওর জীবন রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।

রাজা—ভদ্রে, এ প্রার্থনা দুজনের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। আমি সবদিক দিয়ে অনুগৃহীত হলাম।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) ওলো, অন্তঃপুরের বিরহে কাতর রাজাকে এভাবে পীড়াপীড়ি না হয় না-ই করলি?

রাজা—ওগো খঞ্জননয়না, আমার হৃদয়-সন্নিহিতা! অন্যের প্রতি অনাসক্ত আমার হৃদয়কে যদি তুমি অন্য রকম মনে কর, তাহলে মদনবাণে হত আমি আবার হত হলাম।

অনসূয়া—বয়স্য রাজাদের বহু পত্নী থাকে বলে শোনা যায়। তাই আমাদের প্রিয়সখী বন্ধুজনের শোকের বিষয় না হয় তা দেখবেন।

রাজা—ভদ্রে, বেশি বলে কি হবে—বহু স্ত্রী থাকলেও আমার বংশের দুটি মাত্র গৌরব—একটি সাগর-ঘেরা পৃথিবী, অপরটি আপনাদের এই সখী।

দুজনে—নিশ্চিন্ত হলাম।

(শকুন্তলা আনন্দ প্রকাশ করলেন)

প্রিয়ংবদা—(দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) অনসূয়া! এই হরিণশিশুটি এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে উৎকণ্ঠিত হয়ে মাকে খুঁজছে। আয়, ওকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

(দুজনে প্রস্থানোদ্যত)

শকুন্তলা—ওলো, আমি যে অসহায় হয়ে পড়লাম। তোরা কেউ অন্তত, আমার কাছে আয়।

দুজনে—পৃথিবীর যিনি সহায় তিনিই তোর কাছে রইলেন। (প্রস্থান)

শকুন্তলা—তবে চলেই গেল দেখছি।

রাজা—সুন্দরি! উদ্বিগ্ন হোয়ো না। তোমার সখীদের জায়গায় এই সেবক আমি রয়েছি!

বল তো—

হে করোভীরু, ক্লান্তিহরা, জলবিন্দুতে যার বায়ু শীতল সেই পদ্মপাতার পাখায়

হাওয়া দেব ? না, তোমার পদ্মরাঙা চরণদুটি কোলে নিয়ে যেভাবে তোমার ভালো লাগে সেই ভাবে তার পরিচর্যা করব ?

শকুন্তলা–পূজনীয়ের কাছে নিজেকে অপরাধিনী করতে চাই না। (এই বলে উঠে চলে যেতে চাইলেন)

রাজা–(শকুন্তলাকে ধরে) সুন্দরি ! এখনও দিন শেষ হতে বাকি, তোমার শরীরের এই অবস্থা। যে পুষ্পশয্যায় পদ্মপাতা তোমার স্তনের আবরণ হয়েছে, তা ত্যাগ করে বেদনা-কাতর এই কোমল অঙ্গ নিয়ে রোদে যাবে কেমন করে ?

(সবলে এঁকে নিবৃত্ত করলেন)

শকুন্তলা–হে পৌরব ! শিষ্টাচার রক্ষা করুন। কামসন্তপ্তা হলেও আমি নিজেই নিজের প্রভু নই।

রাজা–হে ভীরু ! গুরুজনের ভয় কোরো না। পূজনীয় কুলপতি ধর্মজ্ঞ, তিনি তোমার দোষ নেবেন না। তা ছাড়া–অনেক রাজর্ষি কন্যা গন্ধর্বমতে পরিণীতা হয়েছেন, পরে তাঁদের পিতারাও তা অনুমোদন করেছেন বলে শোনা যায়।

শকুন্তলা–আমাকে ছেড়ে দিন, আবার আমি সখীদের মত নেব।

রাজা–আচ্ছা, ছেড়ে দেব।

শকুন্তলা–কখন ?

রাজা–সুন্দরি !

যেমন করে ভ্রমর নতুন ফুলের মধু আহরণ করে সেইভাবে তৃষ্ণার্ত আমি আগে তোমার অক্ষত কোমল অধরের স্বাদ গ্রহণ করি, তারপর।

(মুখ তুলতে চেষ্টা করলেন রাজা। শকুন্তলা বাধাদানের অভিনয় করলেন)

(নেপথ্যে)–চক্রবাকবধূ ! তোমার সহচরের কাছ থেকে বিদায় নাও। রাত্রি আগত।

শকুন্তলা–(শুনে, সসম্ভ্রমে) পৌরব, আমার শরীরের অবস্থা জানতে নিশ্চয় আর্যা গৌতমী এদিকে আসছেন। আপনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন।

রাজা—তাই যাচ্ছি। (নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন)

(তারপর পাত্র হাতে নিয়ে গৌতমীর প্রবেশ)

সখীরা–এদিকে, এদিকে আসুন আর্যা গৌতমী।

গৌতমী–(শকুন্তলার কাছে এসে) তোমার শরীরের তাপ একটু কমেছে বাছা ?

(এই বলে স্পর্শ করলেন)

শকুন্তলা–আর্যে, একটু কমেছে।

গৌতমী—এই কুশজলে তোমার শরীর নিরাময় হবে।

(এই বলে শকুন্তলার মাথায় জল ছিটোলেন)

বাছা, বেলা পড়ে এল। চল কুটিরে যাই। (এই বলে চলতে লাগলেন)

শকুন্তলা–(স্বগত) হে হৃদয় ! বাঞ্ছিত যখন অনায়াসেই এল, তখন তুমি সংকোচ ত্যাগ করতে পারো নি, এখন সখেদে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার তোমার এই সন্তাপ কেন ? (কয়েক পা গিয়ে প্রকাশ্যে) হে সন্তাপহরা লতাকুঞ্জ, আবার সম্ভোগের জন্যে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

(এই বলে শকুন্তলা বিষণ্ণ হয়ে অন্যদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

রাজা–(আগের জায়গায় এসে) হায়, প্রার্থিত বিষয়ের সিদ্ধি কী বিঘ্নসংকুল ! আঙুল

দিয়ে সে বার বার তার ওষ্ঠ আবৃত করেছিল, নিষেধ করতে গিয়ে যে অক্ষর ('না, না') উচ্চারণ করেছিল তাতে মুখটা ব্যাকুল অথচ সুন্দর হয়েছিল আর কাঁধের দিকে ঘুরেছিল। সুন্দর চোখের পাতা যার তার এমন মুখখানি আমি কোনোভাবে তুলে ধরলেও চুম্বন করতে পারি নি।

এখন কোথায় যাব ? আমার প্রিয়া যা ভোগ করে ত্যাগ করেছে সেই লতামণ্ডপেই কিছুক্ষণ কাটাব।

(চারদিকে চেয়ে) এই যে শিলাখণ্ডের উপর শকুন্তলার দেহপিষ্ট সুখশয্যা রয়েছে। নখ দিয়ে পদ্মপাতায় লেখা মলিন প্রেমপত্রও দেখা যাচ্ছে। শকুন্তলার হাত থেকে পড়ে-যাওয়া মৃণাল-বলয়ও তো আছে দেখছি ! এ সব জিনিসে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এই বেতস-গৃহ শূন্য হলেও এখান থেকে হঠাৎ চলে যেতে পারছি না।

(আকাশে)–হে রাজন। সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞ আরম্ভ হলে, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত বেদীর চারদিকে সান্ধ্য মেঘের মতো পিঙ্গলবর্ণ ভয়ংকর রাক্ষসদের নানারকম ছায়া বিচরণ করছে।

রাজা–(শুনে, সতেজে) হে তপস্বীগণ আপনারা ভীত হবেন না। আমি এই এলাম বলে। (সকলের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অংক সমাপ্ত ॥

চতুর্থ অংক

(তারপর পুষ্পচয়ন অভিনয় করে দুই সখীর প্রবেশ)

অনসূয়া–যদিও গান্ধর্ববিধি মতে শকুন্তলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়ে শকুন্তলা যোগ্য পতিলাভ করেছে বলে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়েছে, তবুও একটা চিন্তা থেকে যাচ্ছে।

প্রিয়ংবদা–কিসের চিন্তা বল্ তো ?

অনসূয়া–যজ্ঞশেষে, ঋষিরা বিদায় দিলে, রাজর্ষি নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করবেন ; অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে মিলিত হলে এখানে যা ঘটল তা তাঁর মনে থাকবে কিনা সেই চিন্তা।

প্রিয়ংবদা–এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত হ। অমন সুন্দর চেহারা যাঁদের তাঁরা গুণহীন হন না। তবে পিতা (কণ্ব) এ ঘটনা শুনে কী করবেন জানি না।

অনসূয়া–আমার মনে হয়, তিনি ব্যাপারটা অনুমোদনই করবেন।

প্রিয়ংবদা–কি করে বুঝলি ?

অনসূয়া–সুপাত্রে কন্যাদান করতে হবে এ হল গুরুজনদের প্রধান সংকল্প। সেটা যদি দৈবই ঘটিয়ে দেয় তাহলে তো গুরুজনেরা বিনা চেষ্টাতেই সফল হলেন বলতে হবে।

প্রিয়ংবদা–(সখীর দিকে চেয়ে) সত্যি তাই, সখী ! পুজোর জন্যে যথেষ্ট ফুল তুলেছি।

অনসূয়া–কিন্তু প্রিয়সখী শকুন্তলার ভাগ্যদেবতাকে তুষ্ট করতে হবে যে।

প্রিয়ংবদা—ঠিক বলেছিস। (অভিনয়ে তাই করতে লাগলেন)

(নেপথ্যে)—ওহে, এই আমি এসেছি।

অনসূয়া—(কান পেতে) সখী! যেন কোনো অতিথির কণ্ঠ মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—কেন কুটিরে তো শকুন্তলাই আছে। (মনে মনে) কিন্তু আজ ওর মন তো ওতে নেই।

অনসূয়া—থাক, এ ফুলেই যথেষ্ট হবে।

(নেপথ্যে)—আঃ, অতিথি অবমাননাকারিণি, অনন্য মনে যার কথা ভাবতে ভাবতে তপস্বী আমার উপস্থিতিও তোর নজরে এলো না, বার বার মনে করিয়ে দিলেও সে তোকে চিনতে পারবে না, পাগল যেমন আগে কী বলেছে তা মনে করতে পারে না, ঠিক তেমনি।

প্রিয়ংবদা—হায় হায়, সর্বনাশ হল। শূন্যমনা শকুন্তলা হয়তো পূজনীয় কারো কাছে অপরাধ করে ফেলেছে।

অনসূয়া—(সামনের দিকে চেয়ে) যে-সে লোকের কাছে নয়। সহজেই যাঁর ক্রোধের উদ্রেক হয় ইনি সেই দুর্বাসা মুনি। ঐ অভিশাপ দিয়ে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে চলে যাচ্ছেন।

প্রিয়ংবদা—আগুন ছাড়া আর দগ্ধ করতে পারে কে? পায়ে পড়ে ফিরাও ওঁকে, এদিকে আমিও ওঁর পাদ্যার্ঘের ব্যবস্থা করি।

অনসূয়া—তাই করছি। (প্রস্থান)

প্রিয়ংবদা—(কয়েক পা গিয়ে, যেন হোঁচট খেলেন এইভাব দেখিয়ে) হায়, মনটা বিচলিত হওয়াতে হোঁচট খাওয়ায় আমার হাতের আঙুল থেকে ফুলের সাজিটা পড়ে গেল। (এই বলে ফুল কুড়োতে লাগলেন)

অনসূয়া—(প্রবেশ করে) সখী, স্বভাবতই যাঁর মন কুটিল তিনি কার অনুনয় শুনবেন? তবু কিছুটা সদয় হয়েছেন।

প্রিয়ংবদা—তাঁর পক্ষে এই যথেষ্ট। বল্ দেখি কি করে প্রসন্ন করলি ওঁকে?

অনসূয়া—যখন কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না, তখন পায়ের উপর পড়ে বললাম, ভগবান, শকুন্তলা আপনার মেয়ের মতো, আপনার তপস্যার প্রভাব জানলে সে কখনও এমন করতে পারত না, তাই এই প্রথম এবং একমাত্র অপরাধ মনে করে আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

প্রিয়ংবদা—তারপর, তারপর?

অনসূয়া—তারপর 'আমার কথা ফলবেই, তবে অভিজ্ঞান হিসেবে কোনো অলঙ্কার দেখালে শাপ কেটে যাবে' এই বলতে বলতে নিজে অন্তর্হিত হলেন।

প্রিয়ংবদা—এখন তবে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যাবে। রাজর্ষি যাবার সময় নিজের নামখোদাইকরা আংটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শকুন্তলার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছেন। তাই প্রতিবিধানের উপায় শকুন্তলার নিজের হাতেই থাকবে।

অনসূয়া—সখী, এসো ওর মঙ্গলের জন্যে পুজো দিই। (এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রিয়ংবদা—(দেখে) দেখ দেখ, বাঁ-হাতে মুখ চেপে ঠিক ছবির মতো বসে আছে প্রিয় সখী। স্বামীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে ওর নিজের দিকেও হুঁশ নেই, অতিথিকে দেখা তো দূরের কথা।

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা, এ ব্যাপারটা শুধু আমাদের দুজনের মনের মধ্যেই থাকুক। স্বভাবকোমল প্রিয়সখীকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।

প্রিয়ংবদা—নবমল্লিকাকে কে আর উষ্ণজলে সেচন করে বল্ ? (দুজনের প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(তারপর সুপ্তোত্থিত শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—প্রবাস থেকে ফেরা পূজনীয় কাশ্যপ (কণ্ব মুনি) আমাকে সময় নিরূপণের আদেশ দিয়েছেন। বাইরে বেরিয়ে দেখি রাতের আর কত বাকি। (পরিক্রমা করে, তাকিয়ে) ওষধিপতি (চাঁদ) এক দিকে অস্ত যাচ্ছেন, আর অন্য দিকে সূর্যদেব অরুণকে সামনে নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন। তেজোময় এই দুটি বস্তুর উদয়াস্ত লোককে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে (জীবনে) অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। আবার, চাঁদ অস্ত যাওয়াতে কুমুদিনীকে দেখেও আর চোখের তৃপ্তি নেই, তার শোভা এখন স্মৃতির বিষয়। প্রিয়-বিচ্ছেদজনিত অবলার দুঃখ সত্যিই অত্যন্ত দুর্বহ। ঊষা বদরীপত্রের উপরে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুকে রঞ্জিত করছে। ঘুম-থেকে-ওঠা ময়ূর কুশতৃণে তৈরি কুটিরের চাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর এই হরিণটি খুরের আঁচড়-লাগা বেদীপ্রান্ত থেকে উঠছে, শরীরটাকে টান করায় তার পিছন দিকটা উঁচু হয়ে উঠছে।

আর, অন্ধকার দূর করে যিনি পর্বতরাজ সুমেরুর শিরে কিরণ ছড়িয়ে বিষ্ণুর মধ্যম ধামটি (আকাশ) অধিকার করেছিলেন এখন তিনি (চন্দ্র) ক্ষীণরশ্মি হয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন। যাঁরা মহৎ তাঁদেরও অত্যুন্নতি পতনের কারণ হয়।

(যবনিকা নাড়িয়ে প্রবেশ করে)

অনসূয়া—যদিও সংসার-বিমুখ বলে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবু রাজা শকুন্তলার উপর ঘোর অবিচার করেছেন (এ কথা বলবই)।

শিষ্য—যাই, হোমের সময় হল এ কথা গুরুকে জানাই।

অনসূয়া—ঘুম থেকে তো উঠেছি, কিন্তু কী করব ? আমার অভ্যস্ত কাজও করতে পারছি না, হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আছে। কামদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সত্যরক্ষায় যাঁর দৃঢ়তা নেই এমন মানুষের দিকে আমাদের সরলমনা সখীকে এগিয়ে দিলেন। (স্মরণ করে) অথবা দুর্বাসার এই শাপই সব অনর্থের মূল। তা না হলে ও রকম বলে গিয়ে এত দিনেও একটা পত্র দিলেন না। (চিন্তা করে) তাই এখান থেকে রাজাকে তাঁর নামাঙ্কিত আংটিটা পাঠাব। কিন্তু দুঃখব্রতী তপস্বীদের মধ্যে কাকে অনুরোধ করব ? সখীর উপরেই দোষ পড়বে, তাই বলব বলে সংকল্প করেও, প্রবাস থেকে ফেরা তাত কণ্বকে বলতে পারছি না যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং আপন্নসত্ত্বা। এ অবস্থায় কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রিয়ংবদা—(প্রবেশ করে, সানন্দে) সখী, শিগ্গির আয়, শিগ্গির। শকুন্তলার যাত্রাকালীন মঙ্গলানুষ্ঠান করতে হবে যে।

অনসূয়া—(সবিস্ময়ে) সখী, বলিস কী ?

প্রিয়ংবদা—শোন, রাতে ভালো ঘুম হল কিনা জানবার জন্যে শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।

অনসূয়া—তারপর, তারপর ?

প্রিয়ংবদা—স্বয়ং তাত কণ্ব ওকে আলিঙ্গন করে এইভাবে অভিনন্দিত করলেন—চোখে ধোঁয়া লাগলেও যজমানের আহুতি সৌভাগ্যক্রমে ঠিক আগুনেই গিয়ে পড়েছে। বাছা, যোগ্য শিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যা যেমন দুঃখের কারণ হয় না, (যোগ্য পাত্রে প্রদত্ত) তোমার জন্যেও তেমনি দুঃখ করতে হবে না। আজই ঋষিদের সঙ্গে তোমাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনসূয়া—কিন্তু কি করে তাত কণ্ব ব্যাপারটা জানলেন !

প্রিয়ংবদা—হোমগৃহে প্রবেশ করবার সময় এক ছন্দোবন্ধ আকাশ-বাণীতে।

অনসূয়া—(সবিস্ময়ে) বল্।

প্রিয়ংবদা—(সংস্কৃত অবলম্বন করে) হে ব্রাহ্মণ, অগ্নিগর্ভ শমীতরুর মতো তোমার কন্যা জগতের কল্যাণের জন্যে দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করছে জেনো।

অনসূয়া—(প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) কী আনন্দ ! কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে আনন্দের সঙ্গে বিষাদ এসে মিশল।

প্রিয়ংবদা—আমরা দুজনে এ বিষাদ কাটিয়ে উঠব যা হোক করে। কিন্তু ও-বেচারী সুখী হোক।

অনসূয়া—তাহলে একটা কাজ কর দেখি, এই যে আমগাছের শাখায় ঝোলানো নারকেলের ঝাঁপিটা আছে ওর মধ্যে শকুন্তলার জন্যে, বেশ কিছুদিন সতেজ থাকবে এমন একটা বকুলফুলের মালা রেখে দিয়েছি। ওটা নিয়ে আয়। আর আমি এদিকে গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূর্বার শিস—এইসব মঙ্গলসজ্জার আয়োজন করি।

প্রিয়ংবদা—তাই কর।

(অনসূয়ার প্রস্থান। প্রিয়ংবদা ফুল তোলার অভিনয় করতে থাকল)

(নেপথ্যে)—গৌতমী, শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্যে শার্ঙ্গরবদের আদেশ কর।

প্রিয়ংবদা—অনসূয়া, শিগগির কর, শিগগির কর !

অনসূয়া—আয় সখী, আমরা যাই। (এই বলে দুজনের পরিক্রমা)

প্রিয়ংবদা—(তাকিয়ে) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবগাহন স্নান করেছে শকুন্তলা। নীবার ধান হাতে নিয়ে স্বস্তিবচন পাঠ করে শকুন্তলাকে অভিনন্দিত করছেন তাপসীরা। চল্ ওর কাছে যাই। (এই বলে দুজনে কাছে গেল)

তাপসীদের একজন—(শকুন্তলাকে) বাছা, স্বামীর বিশেষ সম্মানসূচক 'মহাদেবী' আখ্যা লাভ কর।

দ্বিতীয় জন—বাছা, বীর সন্তানের জননী হও।

তৃতীয় জন—বাছা, স্বামীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী হও।

(আশীর্বাদ দিয়ে গৌতমী ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

সখী দুজন—(সামনে এসে) সখী, এই মঙ্গল-স্নান তোমাকে চিরসুখী করুক।

শকুন্তলা—সখী, তোদের স্বাগত জানাচ্ছি, আয় এখানে বোস।

দুজনে—(মঙ্গলপাত্র নিয়ে বসে) ওলো, ঠিক হয়ে বোস ! এবারে মঙ্গলসাজে সাজাব তোকে।

শকুন্তলা—আজ এইটুকুই আমার কাছে অনেক। সখীদের হাতে সাজা এখন থেকে আমার কাছে দুর্লভ হয়ে উঠবে। (এই বলে চোখের জল ফেললেন)

দুজনে—সখী, শুভ সময়ে কান্না ঠিক নয়।

(এই বলে চোখের জল মুছিয়ে সাজানোর অভিনয় করতে লাগলেন)

প্রিয়ংবদা—(বহুমূল্য) অলংকার পরবার মতোই তোর রূপ। তাই কিনা আমরা আশ্রমে যা জোটে তাই দিয়ে সাজাচ্ছি, এ তোর রূপের অপমান বৈ তো নয়।

(অলঙ্কার হাতে নিয়ে প্রবেশ করে)

দুজন ঋষিকুমার—এই যে অলঙ্কার। আপনারা ওঁকে সাজিয়ে দিন।

গৌতমী—বৎস নারদ, এ কোথা থেকে পেলে ?

প্রথম জন—তাত কণ্বর প্রভাবে।

গৌতমী—এ কি তাঁর মানস সৃষ্টি ?

দ্বিতীয় জন—না। শুনুন। তিনি আমাদের আদেশ দিলেন শকুন্তলার জন্যে গাছ থেকে ফুল আনতে। তারপর, এই তো—

একটি গাছ দিল চাঁদের মতো সাদা মাঙ্গলিক এই রেশমী কাপড়টি, আর একটি গাছ দিল পা-দুটি রাঙানোর মতো আলতা, অন্য গাছগুলো বন-দেবতাদের হাত দিয়ে আমাদের দিল এই অলঙ্কারগুলো। তাদের মণিবন্ধ পর্যন্ত বাড়ানো হাতের তালুগুলো নবকিশলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলার দিকে চেয়ে) ওলো, এই অনুগ্রহ বলে দিচ্ছে স্বামীর ঘরে রাজসুখ ভোগ করতে পারবি।

(শকুন্তলা লজ্জার অভিনয় করলেন)

প্রথম জন—গৌতম, এসো, এসো, আমরা বনস্পতিদের এই সেবার কথা অভিস্নাত কণ্বকে গিয়ে বলি।

দ্বিতীয় জন—চল। (প্রস্থান)

সখী দুজন—ওলো, অলঙ্কার তো কখনও আমরা পরি নি। ছবিতে যেমন দেখেছি তেমনি করে অঙ্গে অলঙ্কার পরাচ্ছি।

শকুন্তলা—তোদের নৈপুণ্য আমি জানি।

(দুজনে অলঙ্করণের অভিনয় করতে লাগল)

(তারপর অভিস্নাত কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব আজ শকুন্তলা চলে যাবে বলে আমার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন। অশ্রু দমন করতে গিয়ে আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ। দৃষ্টি চিন্তায় অসাড়। আশ্চর্য ! যদি স্নেহে অরণ্যবাসী আমাদেরও এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে তাহলে গৃহীরা সদ্য কন্যাবিচ্ছেদের দুঃখে কতই না কষ্ট পায় ! (এই বলে পদচারণা করলেন)

সখী দুজন—ওলো, সাজানো তো শেষ হল। এবারে রেশমী শাড়িজোড়া পর দেখি।

(শকুন্তলা উঠে শাড়ি পরলেন)

গৌতমী—বৎসে, এই যে তোমার পিতা এসেছেন। তাঁর আনন্দে উপচে-পড়া চোখ যেন আলিঙ্গন করছে তোমাকে। আচার পালন কর (অর্থাৎ প্রণাম কর ওঁকে)।

(শকুন্তলা সলজ্জভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন)

কণ্ব—বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির বহু সমাদৃতা ছিলেন তুমিও তেমনি স্বামীর অত্যন্ত

প্রিয়া হও। শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পেয়েছিলেন তুমিও তেমনি সম্রাট-পুত্র লাভ কর।

গৌতমী—ভগবান, এ আশীর্বাদ নয়, এ বরই।

কণ্ব—বৎসে! এই সদ্যোহুত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ কর।

(সকলের পরিক্রমা)

কণ্ব—বৎসে, ঐ যে সমিধযুক্ত অগ্নি বেদীর চারিদিকে যার স্থান নির্দিষ্ট, যার প্রান্তে কুশ বিস্তীর্ণ, হোমগন্ধে যা পাপনাশী, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি তোমাকে পবিত্র করুক।

(শকুন্তলা প্রদক্ষিণ করলেন)

বৎসে, এইবার প্রস্থান কর। (দৃষ্টিপাত করে) শার্ঙ্গরবেরা কোথায়?

শিষ্যেরা—(প্রবেশ করে) ভগবন, এই যে আমরা।

কণ্ব—তোমাদের এই ভগ্নীকে পথ দেখাও।

শার্ঙ্গরব—এদিকে, এদিকে।

(সকলে পরিক্রমা করল)

কণ্ব—হে সন্নিহিত তপোবন তরুগণ, তোমরা পান না করলে যে আগে জলপান করে না, অলঙ্কারপ্রিয় হয়েও তোমাদে ভালোবেসে যে একটি পল্লবও ছেঁড়ে না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় যার আনন্দের সীমা থাকে না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

(যেন কোকিলের ডাক শুনছেন এমন অভিনয় করে)

শকুন্তলার আরণ্যবাসের বন্ধু গাছেরা তাকে (প্রস্থানের) অনুমতি দিয়েছে, কোকিলের মধুর রবকেই তারা তাদের প্রত্যুত্তর হিসেবে ব্যবহার করেছে।

(আকাশে)

(শকুন্তলার) পথে পড়বে পদ্মপাতায় শ্যামল সরোবর। সেখানে রোদের তাপ হবে তরুছায়াতে প্রশমিত। সে-পথ হোক শুভ, সে-পথের ধুলো হোক পদ্ম-পরাগের মতো, তার বাতাস হোক শান্ত সুখকর।

(সকলে সবিস্ময়ে শুনলেন)

গৌতমী—আপনজনের মতো স্নেহশীল বনদেবীরা তোমার প্রস্থানকে অনুমোদন করলেন। এঁদের প্রণাম কর।

শকুন্তলা—(প্রণাম করে পরিক্রমা করলেন। আড়ালে) ওলো প্রিয়ংবদা, আর্যপুত্রকে দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেও আশ্রম ছেড়ে যেতে অত্যন্ত বেদনায় আমার পা উঠছে না।

প্রিয়ংবদা—তুই-ই যে তপোবনবিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনের কি অবস্থা হয়েছে দেখ। হরিণের মুখ থেকে কুশতৃণের গ্রাস গলে পড়ছে, ময়ূরেরা আর নাচছে না, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে লতারা যেন চোখের জল ফেলছে।

শকুন্তলা—আমার লতা-ভগিনী বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে বিদায় নেব।

কণ্ব—বৎসে, তার উপর যে তোমার সহোদরার মতোই স্নেহ তা আমি জানি। তোমার ডান দিকেই আছে সে।

শকুন্তলা—(কাছে এসে আলিঙ্গন করলেন) আম্রতরুর সঙ্গে মিলিত হলেও, তুমি এই-

দিককার শাখা-বাহু দিয়ে আলিঙ্গন কর। আজ থেকে আমি তোমার দূরবর্তিনী হলাম।

কণ্ব–বৎসে, তোমার জন্যে আগেই আমি উপযুক্ত বর মনে মনে চেয়েছিলাম। তোমার পুণ্য ফলেই তুমি তা পেয়েছ। এই নবমল্লিকাও আম্রতরুকে পেয়েছে। এবারে এর জন্যে, আর তোমার জন্যেও আমার চিন্তা নেই। যাক, এখান থেকেই তুমি যাত্রা শুরু কর।

শকুন্তলা–(সখীদের কাছে গিয়ে) সখী, ওকে তোদের হাতে সঁপে যাই।

দুজনে–আমাদের কার কাছে সঁপে যাচ্ছিস বল। (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)

কণ্ব–অনসূয়া, কেঁদো না। শকুন্তলাকে তো তোমরা দুজনেই সান্ত্বনা দেবে।

শকুন্তলা–তাত, গর্ভভার মৃদুগতি যে হরিণবধূটি কুটিরের কাছে বিচরণ করছে, নির্বিঘ্নে তার প্রসব হলে সেই প্রিয় সংবাদটি দিয়ে কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন।

কণ্ব–বৎসে ! এ কথা আমি ভুলব না।

শকুন্তলা–(চলতে গিয়ে যেন বাধা পেলেন এই অভিনয় করে) ওমা ! ওটা যে আমার কাপড়ের সঙ্গে লেগে আছে ? (এই বলে ফিরে তাকালেন)

কণ্ব–বৎসে !

যার মুখ কুশাগ্রে ক্ষত হলে ক্ষত শুকোবার জন্যে তুমি ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দিতে, শ্যামাক ধান্য মুঠোয় করে খাইয়ে যাকে তুমি বড়ো করেছ, তোমার সন্তানের মতো সেই মৃগই তোমার পথ ছাড়ছে না।

শকুন্তলা–বাছা, আমার পিছু পিছু আসছিস কেন ? আমি যে তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। প্রসবের পর তোর মা মারা গেলে (আমার হাতেই) তুই বড়ো হয়েছিস। এখন আমি চলে গেলে তোকে দেখবেন আমার পিতা (কণ্ব)। তাই ফিরে যা।

(এই বলে কাঁদতে কাঁদতে পথ চললেন)

কণ্ব–বৎসে, কেঁদো না। স্থির হও। এদিকে পথের দিকে তাকাও।

তোমার চোখের পাপড়িগুলো উঁচুতে উঠেছে। ধৈর্য ধরে তুমি তোমার চোখের জলের ধারাকে সংযত কর, যা তোমার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে। ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ না বলে উঁচুনিচু পথে তোমার পা ঠিক মতো পড়ছে না।

শার্ঙ্গরব–ভগবন, প্রিয়জনকে কোনো জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই বিধেয়। এটা সরোবরের তীর। তাই এখানেই আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আপনি ফিরে যান।

কণ্ব–তা হলে এসো। এই ক্ষীর-তরুর ছায়ায় দাঁড়াই। (এই বলে সবাই পরিক্রমণ করে সেখানে গেলেন)

কণ্ব–(মনে মনে) দুষ্যন্তকে উপযুক্ত কোন্ বার্তা পাঠানো ঠিক হবে।

(তাই ভাবতে লাগলেন)

শকুন্তলা–(আড়ালে) সখী, দেখ। পদ্মপাতার আড়ালে সহচরকে না দেখে আকুল হয়ে চক্রবাকী বিলাপ করছে। আমি তাহলে কঠিন কাজই করছি বল।

অনসূয়া–সখী, এ কথা বলিস না। এই চক্রবাকীও প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত কাটায়, যে-রাত বিষাদে দীর্ঘায়িত বলে মনে হয়। আশার বন্ধন দুঃসহ বিরহ-বেদনাকেও লাঘব করে।

কণ্ব—শার্ঙ্গরব। শকুন্তলাকে সামনে রেখে তুমি রাজাকে সম্বোধন করে বলবে—

শার্ঙ্গরব—আদেশ করুন।

কণ্ব—সংযমই আমাদের সম্পদ, উচ্চবংশে তোমার জন্ম, তোমার উপর শকুন্তলার যে অনুরাগ বন্ধুজনের অজান্তেই তা ঘটেছে। এইসব ভালো করে বিবেচনা করে, অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে একে সমান দৃষ্টিতেই দেখবে। এরপর যা ওর ভাগ্যে আছে তাই হবে। বধূর স্বজনদের তা না বলাই ভালো।

শার্ঙ্গরব—এই বার্তা রাজাকে জানাবার জন্যে গ্রহণ করলাম।

কণ্ব—(শকুন্তলার দিকে চেয়ে) বৎসে! এবারে তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। বনবাসী হলেও লৌকিক ব্যাপারেও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে।

শার্ঙ্গরব—ভগবন। যাঁরা প্রজ্ঞাবান কোনো কিছুই তাঁদের অজানা থাকে না।

কণ্ব—এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে তুমি গুরুজনদের সেবা করবে, সপত্নীদের প্রিয়-সখীর মতো দেখবে। স্বামী প্রতিকূল আচরণ করলেও ক্রোধে বিরুদ্ধতা কোরো না। দাসদাসীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হবে। ভোগেও গর্বিত হবে না। যুবতীরা এইভাবেই গৃহিণীপদ লাভ করে। যারা বিপরীত আচরণ করে, তারা কুলের পক্ষে পীড়ার মতো।

এ বিষয়ে গৌতমী কী মনে করেন?

গৌতমী—বধূদের তো এই আদর্শ। বাছা, উনি যা বললেন তা মনে রেখো।

কণ্ব—এসো বৎসে, আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকুন্তলা—তাত, এখান থেকেই কি সখীরা ফিরে যাবে?

কণ্ব—বৎসে! এদেরও তো বিয়ে দিতে হবে; তাই এদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাবেন।

শকুন্তলা—(পিতাকে আলিঙ্গন করে) এখন পিতার কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, মলয়তট থেকে উন্মূলিত চন্দনলতার মতো অন্য কোথাও গিয়ে কি করে জীবনধারণ করব?

কণ্ব—বৎসে, তুমি এমন কাতর হচ্ছ কেন? উচ্চকুলে গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাচুর্যের ফলে নানারকম বড়ো কাজে প্রতিমুহূর্ত ব্যস্ত থেকে এবং শিগ্গিরই প্রাচী যেমন সূর্যকে প্রসব করে তেমনি তুমিও পবিত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ ভুলেই থাকবে।

(শকুন্তলা পিতার চরণে প্রণতা হলেন)

বৎসে! যা আমার মনের ইচ্ছা তাই হোক।

শকুন্তলা—(সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, তোরা দুজনে আমাকে একসঙ্গে আলিঙ্গন কর।

সখী দুজন—(তাই করে) সখী, যদি সেই রাজর্ষি তোকে চিনতে দেরি করেন, তাহলে তাঁকে তাঁরই নামাঙ্কিত আংটিটা দেখাস।

শকুন্তলা—এই সংশয়ের কথা শুনে আমি কেঁপে উঠছি।

সখী দুজন—সখী! ভয় করিস না। অত্যধিক স্নেহ অমঙ্গল আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব—(তাকিয়ে) বেলা দ্বিতীয় প্রহর হয়েছে। তাড়াতাড়ি করুন।

শকুন্তলা—(আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে এবং আশ্রমের দিকে তাকিয়ে) তাত! আবার কবে তপোবন দেখতে পাব?

কণ্ব—শোন—

সসাগরা পৃথিবীর দীর্ঘদিন সপত্নী হয়ে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে এবং তার হাতে সমস্ত প্রজাদের ভার দিয়ে স্বামীকে নিয়ে আবার শান্তরসের আধার এই আশ্রমে আসবে।

গৌতমী—বাছা, তোমার যাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে। পিতাকে এবার ফিরে যেতে বল। তা না হলে উনি এইভাবেই বার বার কথা কইবেন।

এইবারে আপনি ফিরে যান ;

শকুন্তলা—(আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে) আপনার শরীর তপশ্চারণায় কৃশ। আমার জন্যে বেশি ভাববেন না।

কণ্ব—বৎসে, কুটিরের দুয়ারে তুমি যে নীবার ধান বুনেছ, তা আজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে কেমন করে আমার শোক কমবে বল? যাও। তোমার পথ শুভ হোক! (শকুন্তলা ও তাঁর সহযোগীদের প্রস্থান)

সখী দুজন—(শকুন্তলাকে অনেকক্ষণ দেখে, করুণভাবে) হায়, হায়, শকুন্তলা গাছের আড়ালে পড়ে গেল। (তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না)

কণ্ব—(নিঃশ্বাস ফেলে) অনসূয়া! তোমাদের সহচারিণী চলে গিয়েছে। শোক দমন করে আমাকে অনুসরণ কর।

সখী দুজন—তাত, শকুন্তলা-ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করছি।

কণ্ব—ভালোবাসার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে। (সবিষাদে পরিক্রমা করে)

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ—

কন্যা পরেরই ধন। তাকে আজ স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার অন্তরের ভার যেন লাঘব হল, মনে হচ্ছে গচ্ছিত ধন যেন অধিকারীর কাছে সমর্পণ করেছি।

(সকলের প্রস্থান)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অঙ্ক

(তারপর আসনস্থ রাজা, বিদূষক ও পদমর্যাদা অনুসারে যতজন সম্ভব ততজন পরিজনের প্রবেশ। নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

বিদূষক—(কান পেতে) বন্ধু! সঙ্গীতশালার ভিতরের দিকে কান দাও। বীণায় স্বরসংযোগ শোনা যাচ্ছে, যার তাল আর লয় বিশুদ্ধ। মনে হয় শ্রদ্ধেয়া হংসপাদিকা স্বরসাধনা করছেন।

(আকাশে গীতধ্বনি)

হে মধুকর, নতুন নতুন মধুতে লুব্ধ তুমি চূতমঞ্জরীকে এইভাবে চুম্বন করে পদ্মে এসে বসামাত্রই পরিতুষ্ট হয়ে, তাকে ভুলে গেলে কী করে?

রাজা—কী আবেগময় সঙ্গীত!

বিদূষক—বন্ধু হে, এই গানের বাণীর অর্থটা বুঝেছ কি?

রাজা—(মৃদু হেসে) একবারই তাঁকে প্রণয় নিবেদন করে বিস্মৃত হয়েছি। তাই,

বসুমতীকে নিয়ে মত্ত হয়ে আছি, এই ইঙ্গিত করে তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। বন্ধু, মাধব্য, হংসপাদিকাকে আমার কথায় বল খুব সুকৌশলেই তিনি আমাকে তিরস্কার করছেন।

বিদূষক—তাই করছি! (উঠে) বন্ধু! সখীদের হাত দিয়ে তিনি আমার শিখাটি ধরিয়ে ঠেঙানি দেওয়াবেন, এ থেকে দেখছি আমার নিস্তার নেই, অপ্সরার হাতে আসক্তিহীন ঋষির যেমন নিস্তার নেই, তেমনি।

রাজা—যাও, রসিকজনের মতো একে সান্ত্বনা দাও।

বিদূষক—কী আর করি, যাই। (এই বলে প্রস্থান)

রাজা—(স্বগত) এ কী হল? গানের বাণী শুনেই, প্রিয়জন থেকে বিযুক্ত না হয়েও দেখছি মনটা অত্যন্ত বিচলিত হচ্ছে। অথবা সুন্দর কিছু দেখে, মধুর শব্দ শুনে, মানুষের যে মন কেমন করে, তাতে মনে হয় নিশ্চয় তার মনে অজান্তেই আসে জন্মান্তরের কোনো প্রিয় স্মৃতি যার মূল মনের অতি গভীরে নিবদ্ধ।

(এই বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন)

(তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—হায়, কী অবস্থায় না এসেছি। রাজার অন্তঃপুরে প্রথা হিসেবে যে বেত্র-দণ্ড হাতে নিয়েছিলাম, দীর্ঘকাল পরে তা-ই কিনা হল আমার (বার্ধক্যের) অবলম্বন, চলতে গিয়ে আমার আজ পা টলে। ধর্মকাজ মহারাজের ফেলে রাখা উচিত নয়, এ কথা মানছি, কিন্তু এই একটু আগেই তিনি বিচারাসন ছেড়ে উঠেছেন। তাই কণ্বমুনির শিষ্যদের আসবার কথা তাঁকে গিয়ে বলতে উৎসাহ পাচ্ছি না, এতে কষ্টই দেওয়া হবে ওঁকে। অথবা, প্রজাশাসনের দায়িত্ব যাদের বিশ্রাম তাদের নেই। কারণ, সূর্য একবারই মাত্র তার (রথে) অশ্বযোজনা করেছেন, বায়ু দিনরাত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অনন্তনাগ সর্বদাই পৃথিবীর ভার বহন করছেন, উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশভোগী রাজার ধর্মও এই।

যাক, কর্তব্য করি। (পরিক্রমা করে দেখে) এই যে মহারাজ—নিজের সন্তানের মতো প্রজাদের শাসন করে শ্রান্ত মনে নির্জনতা উপভোগ করছেন, রোদের তাপে তপ্ত হয়ে গজরাজ যেমন শীতল গুহায় আশ্রয় নেয় তেমনি। (সামনে গিয়ে) জয় হোক মহারাজের! হিমগিরি উপত্যকায় যে অরণ্য আছে সেখানকার অধিবাসী ঋষিরা এসেছেন কাশ্যপের বার্তা নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোকও আছেন। এখন শোনবার পর মহারাজ যা আদেশ করেন।

রাজা—(সবিস্ময়ে) কী বললেন? ঋষিরা কাশ্যপের বার্তা নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও আছেন?

কঞ্চুকী—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

রাজা—তাহলে আমার কথায় উপাধ্যায় সোমরাতকে বলুন তিনি যেন বৈদিক বিধিতে এই আশ্রমবাসীদের সৎকার করে নিজেই তাঁদের নিয়ে আসেন। আমিও তপস্বীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত কোনো জায়গায় ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন।

রাজা—(উঠে) বেত্রবতী, অগ্নিগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে আসুন মহারাজ।

রাজা—(পরিক্রমা করে, রাজকার্যজনিত ক্লান্তি অভিনয় করে) সকলেই অভীষ্টপূরণ হলে সুখী হয়, রাজার চরিতার্থতার পর-পরই আসে নানা বিঘ্ন।

সফলতা শুধু ঔৎসুক্যের অবসান ঘটায়, কিন্তু কষ্ট দেয় প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি। একটা বড়ো ছাতা হাতে নিলে যেমন রোদের চেয়ে ছাতাটা ধরে থাকার কষ্টই হয় বেশি, তেমনি নিজের হাতে রাজদণ্ড ধারণ করলে শ্রম দূর করার চেয়ে (নিত্য নতুন) শ্রমের কারণই হয়ে পড়ে।

বৈতালিক—(নেপথ্যে) জয় হোক মহারাজের !

প্রথম—নিজের সুখে উদাসীন হয়ে আপনি প্রজাদের জন্যে প্রতিদিন ক্লেশ স্বীকার করছেন। অথবা, আপনার বৃত্তিই এইরকম। গাছ মাথায় তীব্র উত্তাপ অনুভব করে, কিন্তু ছায়া দান করে আশ্রিতদের ক্লান্তি দূর করে।

দ্বিতীয়—আপনি রাজদণ্ড ধারণ করে বিপথগামীদের নিয়ন্ত্রিত করছেন, বিবাদ-বিসংবাদ প্রশমিত করছেন, (জনগণের) রক্ষার ব্যবস্থা করছেন। যখন অর্থের প্রাচুর্য থাকে তখন জ্ঞাতিরাও থাকে, তাদের বন্ধুকৃত্য (অর্থাৎ আপদে-বিপদে তাদের সাহায্যদান) কিন্তু আপনিই সম্পাদন করে চলেছেন।

রাজা—(শুনে) আমার মন ক্লান্ত ছিল, কিন্তু আবার নতুন হলাম যেন।

(এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রতিহারী—এই যে অগ্নিগৃহের অলিন্দ। এক্ষুণি পরিষ্কার করায় সুন্দর দেখাচ্ছে, কাছেই হোমধেনুকেও রাখা হয়েছে। আপনি এই অলিন্দে আরোহণ করুন মহারাজ।

রাজা—(আরোহণ করে এবং প্রতিহারীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) বেত্রবতী ! ভগবান কাশ্যপ (কণ্ব) কেন আমার কাছে ঋষিদের পাঠালেন বল তো ?

মুনিরা তপস্যা আরম্ভ করলে কোনো বাধাবিঘ্নে তা পণ্ড হল না তো ? না, তপোবনের প্রাণীর কোনো ক্ষতি করেছে কেউ ? নাকি আমার কোনো কুকর্মের জন্যে লতায় ফুল ফোটা বন্ধ হয়েছে ? এইরকম নানা সন্দিগ্ধ চিন্তায় আমার মনকে অস্থির করে তুলছে অথচ নিশ্চিতভাবে কারণটা নির্ণয়ও করতে পারছি না।

প্রতিহারী—যে আশ্রমে আপনার বাহুবলে (সুশাসনে) শান্তি প্রতিষ্ঠিত সেখানে এ সব হবে কী করে ? আমার মনে হয় ঋষিরা আপনার সুকর্মে আনন্দিত হয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

(তারপর গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে সামনে নিয়ে মুনিদের প্রবেশ।
এঁদের আগে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত।)

কঞ্চুকী—এদিকে, এদিকে আসুন আপনারা।

শার্ঙ্গরব—স্বীকার করছি এই ঋদ্ধিমান রাজা কর্তব্যচ্যুত (কখনো) হন নি, নিম্নবর্ণের কোনো মানুষও কুপথে যায় নি। তবু সর্বদা নির্জনতার সঙ্গে পরিচিত বলে, এই জনবহুল গৃহ দেখে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে চারিদিকে।

শারদ্বত—নগরে প্রবেশ করে যে তোমার এ রকম মনে হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমিও—

স্নাত তৈলাক্তকে যেমন করে দেখে, শুচি অশুচিকে যেমন করে দেখে, জাগ্রত নিদ্রিতকে যেমন করে দেখে, মুক্ত বন্ধকে যেমন করে দেখে এই ভোগে আসক্ত

মানুষদের তেমনি করে দেখছি।

শকুন্তলা—(একটা দুর্লক্ষণ অভিনয় করে) এ কি ! আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন ?

গৌতমী—ষাট, ষাট, ও কিছু নয়, বাছা। তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমাকে সুখ দান করুন। (এই বলে পরিক্রমা করলেন)

পুরোহিত—(রাজাকে দেখিয়ে) হে তপস্বিগণ ! বর্ণাশ্রমের রক্ষক মাননীয় মহারাজ আগেই আসন ছেড়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁকে দর্শন করুন।

শার্ঙ্গরব—হে মহাব্রাহ্মণ ! নিঃসন্দেহে মহারাজের এই বিনয় অভিনন্দনযোগ্য। তবে আমরা এ বিষয়ে উদাসীন। দেখুন না,

ফল এলেই গাছেরা পড়ে নুয়ে, নতুন জলের ভারে মেঘেরা হয় নত, সজ্জনেরা সমৃদ্ধিতে উদ্ধত হয় না। পরোপকারীদের স্বভাবই তো এই।

প্রতিহারী—মহারাজ, ঋষিদের মুখ প্রসন্ন দেখা যাচ্ছে। মনে হয় তাঁরা এমন কোনো কাজের জন্যে এসেছেন যা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে) আর এই মাননীয়া মহিলা—

বিশীর্ণ পাতার মধ্যে কিশলয়ের মতো, ঋষিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে ইনি ? মুখে তাঁর অবগুণ্ঠন, দেহলাবণ্য তেমন করে প্রকাশিত নয়।

প্রতিহারী—মহারাজ ! কৌতূহলে-ভরা নানারকম অনুমান করছি, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। কিন্তু দেখবার মতো এঁর দেহসৌষ্ঠব।

রাজা—হোক। পরস্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়।

শকুন্তলা—(বুকে হাত দিয়ে মনে মনে) হৃদয়, এভাবে কাঁপছ কেন ? আর্যপুত্রের সেই প্রীতিপ্রবাহ স্মরণ করে শান্ত হও।

পুরোহিত—(সম্মুখে গিয়ে) মহারাজের কল্যাণ হোক ! বিধিমতো এই তপস্বীদের সম্মানিত করা হয়েছে। এঁরা উপাধ্যায়ের (কণ্বমুনির) বার্তা এনেছেন। মহারাজ শুনুন।

রাজা—অবহিত হলাম।

ঋষিরা—জয় হোক, মহারাজ !

রাজা—আমি আপনাদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

ঋষিরা—আপনার ইষ্টলাভ হোক !

রাজা—মুনিদের তপস্যা নির্বিঘ্ন তো ?

ঋষিরা—আপনি যেখানে রক্ষক সেখানে তপশ্চর্যায় বিঘ্ন হবে কেন ? সূর্য যখন দীপ্যমান তখন অন্ধকার আসবে কেমন করে ?

রাজা—তাহলে, আমার 'রাজা' এই পদবীটি সার্থক হল। জগতের মঙ্গলের জন্যে ভগবান কাশ্যপ কুশলে আছেন তো ?

শার্ঙ্গরব—মহারাজ ! যাঁরা সিদ্ধপুরুষ কুশল তাঁদের ইচ্ছাধীন। তিনি আপনার কুশল প্রশ্ন করে আপনাকে বলেছেন—

রাজা—কী আদেশ করেছেন তিনি ?

শার্ঙ্গদেব—'পরস্পর অঙ্গীকার করে আমার কন্যাকে আপনি যে বিবাহ করেছেন আমি সন্তুষ্টচিত্তে তা অনুমোদন করছি। কারণ—

আপনাকে আমরা যোগ্যদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করি, আর শকুন্তলাও

মূর্তিমতী পুণ্যক্রিয়া (তপস্যা)। তাই সমগুণের বধূবরকে মিলিত করে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) বহুদিন পরে নিন্দা থেকে মুক্তি পেলেন। অতএব এখন আপন্নসত্ত্বা এই সহধর্মিণীকে গ্রহণ করুন।'

গৌতমী–আর্য, আমি কিছু বলতে চাই, তবে আমারও বলার তেমন অবকাশ নেই। কারণ–

এ-ও (শকুন্তলাও) গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলে নি, আপনিও স্বজনদের কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। নিজেরাই যেখানে নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে অন্যের বলারই বা কি থাকতে পারে ?

শকুন্তলা–(মনে মনে) আর্যপুত্র না জানি কী বলেন (এ কথা শুনে)।

রাজা–(শুনে আশঙ্কিত হয়ে) এ সব কী বলছেন আপনারা !

শকুন্তলা–(মনে মনে) কথা নয়, আগুনই বলব।

শার্ঙ্গদেব–সে কি ! সংসারের রীতি-নীতি আপনারাই ভালো জানেন। যার স্বামী আছে সে যদি স্বজনদের ঘরেই একান্তভাবে বাস করে, সে পতিব্রতা হলেও লোকে তার সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবে। তাই সে স্বামীর প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয়ই হোক, স্বজনেরা তাকে স্বামীর কাছে রাখতে চান।

রাজা–কী বললেন ? ইনি আমার পূর্বপরিণীতা ?

শকুন্তলা–(সখেদে, মনে মনে) হৃদয়, তুমি যা আশংকা করেছিলে তাই হল।

শার্ঙ্গরব–কৃতকার্যের প্রতি বিশেষ ধর্মবিরুদ্ধ কিছু করা কি রাজার উচিত ?

রাজা–এই কল্পনা-প্রসূত অসৎ প্রস্তাবটি কী করে তুলছেন আপনারা ?

শার্ঙ্গরব–যারা ঐশ্বর্যমত্ত তাদের মধ্যে এমন মতিভ্রম প্রায়ই দেখা যায় বটে।

রাজা–এ কথায় আমি বিশেষভাবে তিরস্কৃত হলুম।

গৌতমী–(শকুন্তলাকে) বাছা ! কিছুক্ষণের জন্যে লজ্জা ত্যাগ কর। তোমার অবগুণ্ঠন খুলে দিচ্ছি। তাহলে তোমার স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন।

(তাই করলেন)

রাজা—(শকুন্তলাকে ভালোভাবে দেখে, মনে মনে) তাই অনিন্দ্যরূপ আপনা থেকেই এসেছে ! এঁকে আগে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি, কি করি নি তা বুঝতে পারছি না। প্রভাতে তুষারগর্ভ কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন উপভোগও করতে পারে না, ছেড়েও যেতে পারে না, আমিও তেমনি এঁকে গ্রহণ করতে পারছি না, প্রত্যাখ্যানও করতে পারছি না। (রাজা চিন্তান্বিত হয়ে রইলেন)

প্রতিহারী–(মনে মনে) রাজার কী ধর্মনিষ্ঠা ! আপনা-আপনি এসে-পড়া এমন রূপ দেখে অন্য কে আর এত সব বিচার করে দেখত ?

/শার্ঙ্গরব–মহারাজ ! চুপ করে রইলেন কেন ?

রাজা–হে তপস্বিগণ ! (অনেক) চিন্তা করেও আমি এঁকে গ্রহণ করেছি বলে মনে করতে পারছি না। তাই, গর্ভলক্ষণযুক্ত এঁকে কি করে গ্রহণ করব ? তাহলে তো আমিই পরদারগামী বলে চিহ্নিত হব।

শকুন্তলা–(দর্শকদের দিকে মুখ করে, জনান্তিকে) ধিক্ ! ধিক্ ! আর্যের বিবাহেই সন্দেহ, এখন কোথায় আমার উর্ধ্বচারিণী আশা !

শার্ঙ্গরব- থাক তবে !

যে মুনি তাঁর কন্যার প্রতি আপনার অন্যায় আচরণকে অনুমোদন করেছেন, দস্যুকে দানের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তাঁর অপহৃত নিজের ধন তাকেই যিনি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন সেই মুনি আপনার অবমাননার যোগ্যই বটে।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব! তুমি এখন বিরত হও। শকুন্তলা! আমাদের যা বলার তা বলেছি। ইনি—মাননীয় মহারাজও তাঁর যা বলার বলেছেন। এবারে তুমিই তাঁকে এমন প্রত্যুত্তর দাও যা ওঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

শকুন্তলা—(দর্শকদের দিকে ফিরে) ঐরকম অনুরাগ যখন এই অবস্থায় এসেছে, তখন মনে করিয়ে দিয়েই বা কী লাভ? অথচ নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও তো আমাকে করতে হবে।

(প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র! (বলেই থেমে গেলেন) পরিণয়েই যখন সন্দেহ তখন এ সম্বোধন ঠিক নয়। হে পুরুবংশীয়! এই স্বভাবসরল মানুষটিকে তপোবনে শপথ নিয়ে ঐভাবে প্রতারণা করে এখন এইসব কথা বলে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উপযুক্তই বটে!

রাজা—(কান ঢেকে) ছি! ছি!

কুলপ্লাবী নদী যেমন নির্মল জলকে আবিল করে এবং তটতরুকে ভূপাতিত করে, আপনিও তেমনি নিজের কুলকে কলঙ্কিত করে আমাকেও অধঃপতিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শকুন্তলা—যাক, যদি সত্যিই পরদার-পরিগ্রহের আশঙ্কায় আপনি এই আচরণ করে থাকেন তাহলে এই অভিজ্ঞান দেখিয়ে আপনার আশঙ্কা দূর করব।

রাজা—উত্তম প্রস্তাব।

শকুন্তলা—(আংটির জায়গাটা স্পর্শ করে) হায়, ধিক্! আমার আঙুলে সেই আংটিটি নেই! (এই বলে সখেদে গৌতমীর মুখের দিকে চাইল)

গৌতমী—শক্রাবতারে শচীতীর্থের জলকে যখন তুমি প্রণাম করছিলে সেই সময়েই নিশ্চয় তোমার আংটি খুলে গিয়েছে।

রাজা—ঐ যে বলা হয় স্ত্রী-জাতি প্রত্যুৎপন্নমতি, এ তাই।

শকুন্তলা—এখানেও নিয়তিই তাঁর প্রভুত্ব দেখালেন। আচ্ছা, আমি এবারে অন্য প্রমাণ দিচ্ছি।

রাজা—এবারে শোনবার মতো কিছু শোনা যাবে আশা করি।

শকুন্তলা—একদিন বেতস-লতাকুঞ্জে পদ্মপাতার পাত্রে জল ছিল আপনার হাতে।

রাজা—শুনলাম।

শকুন্তলা—সেই সময়ে আমার পালিত-পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক হরিণশিশু এল। ওই আগে পান করুক এই বলে তাকে আপনি সাধলেন কিন্তু অপরিচয়ের জন্যে সে আপনার হাতের কাছে এল না। তারপর আমি যখন জলটা নিলাম তখন সেই জলেই তার অনুরাগ দেখা গেল। তখন আপনি এইভাবে পরিহাস করে বললেন—স্বজাতিকে সকলেই বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই অরণ্যের প্রাণী কিনা, তাই।

রাজা—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মেয়েরা এই ধরনের নানারকম মিথ্যা-অথচ-মধুর কথা বলে বিষয়াসক্ত মানুষকে আকর্ষণ করে।

গৌতমী—হে ঋদ্ধিমান! এমন কথা বলবেন না। এ তপোবনে পালিত হয়েছে, ছলকপটতা কী তা জানে না।

রাজা—তাপসবৃদ্ধা! মনুষ্যেতর স্ত্রীজাতিরও স্বভাবজাত পটুত্ব দেখা যায়, আর যাদের বুদ্ধি আছে এমন স্ত্রীলোকদের তো কথাই নেই। কোকিলেরা আকাশে ওড়বার আগেই নিজেদের বাচ্চাদের অন্য পাখিদের দিয়ে লালন পালন করিয়ে নেয়।

শকুন্তলা—(সরোষে) অনার্য! নিজের হৃদয়-বোধ দিয়েই সকলকে দেখছেন। আপনার অনুকরণে এমন (নীচ) আচরণ কে করবে, ধর্মের বেশধারণ করে তৃণাচ্ছাদিত গহ্বরের রূপ নেবে?

রাজা—(মনে মনে) এঁর ক্রোধ দেখে মনে হচ্ছে তা কৃত্রিম নয়, আমার মনকেও যেন সন্দিগ্ধ করে তুলছে।

কারণ বিস্মরণের দরুন আমার হৃদয় কঠিন হওয়ায় আমি গোপনে সংঘটিত প্রণয় অস্বীকার করলে উনি অত্যন্ত ক্রোধে আরক্তনয়না হলেন, কুটিল ভ্রূভঙ্গে কামদেবের ধনুটি যেন ভেঙে ফেললেন।

(প্রকাশ্যে) দুষ্যন্তের চরিত্র কেমন তা সবাই জানেন। এমন কি প্রজাদের মধ্যেও পরস্ত্রী-লোলুপতা দেখা যায় না।

শকুন্তলা—খুব ভালোভাবেই আমি এখন স্বৈরিণী প্রতিপন্ন হলাম। হায়! আমি পুরুবংশের প্রতি বিশ্বস্ততায় এমন একজনের হাতে গিয়ে পড়লাম যাঁর মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ। (এই বলে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন)।

শার্ঙ্গরব—যে চপলতা স্বকৃত এবং অনিয়ন্ত্রিত তা এই ভাবেই দগ্ধ করে। এই জন্যেই গোপন মিলন ভেবে-চিন্তেই করতে হয়। যার মন জানা নেই তার সঙ্গে সম্প্রীতি হলেও তা শত্রুতার রূপ নেয়।

রাজা—শুনুন, এঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করে আমাকে এভাবে পুঞ্জীভূত অভিযোগবাণে বিদ্ধ করছেন কেন?

শার্ঙ্গরব—(ব্যঙ্গ করে) আপনারা এঁর জবাবটা শুনলেন তো?

আজন্ম শাঠ্য যে জানলই না তার কথা গ্রাহ্য হল না আর পরকে ঠকানো যাঁদের কাছে বিদ্যা হিসাবে শিখতে হয় তাঁরাই হলেন সত্যবাদী।

রাজা—হে সত্যবাদী! না হয় মানলাম আমরা এ রকমই (প্রতারক), কিন্তু এই মহিলাকে প্রতারণা করে কি লাভ আমার?

শার্ঙ্গরব—নিপাত যাওয়া।

রাজা—এই নিপাত যাওয়াটা পুরুবংশীয়দের কাম্য, এ কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হল না।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব! কথা কাটাকাটি করে আর লাভ কী? আমরা গুরুর আদেশ পালন করেছি, এবারে চল ফিরে যাই।

(রাজার প্রতি) এ আপনার নিজের স্ত্রী। এঁকে আপনি গ্রহণ করবেন, না বর্জন করবেন তা আপনি জানেন। স্ত্রীর উপরে প্রভুত্ব সর্বতোমুখী। গৌতমী, আগে চলুন। (এই বলে প্রস্থান)

শকুন্তলা—একি! এই কপট লোকটি আমাকে প্রতারণা করছে। তোমরাও আমাকে ত্যাগ করছ? (এই বলে তাদের অনুগমন করতে লাগলেন)

গৌতমী—(থেমে থেমে) বৎস শার্ঙ্গরব, করুণভাবে বিলাপ করতে করতে শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ করছে। স্বামী নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, এখন ও বেচারী করবে কী ?

শার্ঙ্গরব—(সক্রোধে পিছনে ফিরে) রে পুরোভাগিনী ! নিজের ইচ্ছে মতো চলছ ?

(শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন)

শার্ঙ্গরব—শকুন্তলা !

যদি মহারাজ যা বলছেন তুমি তাই হও, তাহলে কুলকলঙ্কিনী তোমাকে দিয়ে পিতা কী করবেন ? আর যদি নিজের ব্রতকে পবিত্র বলে জেনে থাক তাহলে পতিকুলে দাসীবৃত্তিও তোমার ভালো। তুমি থাকো, আমরা যাচ্ছি।

রাজা—হে তপস্বী ! এঁকে কেন প্রবঞ্চনা করছেন ? চাঁদ কুমুদিনীকে এবং সূর্য পদ্মিনীকেই প্রস্ফুটিত করে। যাঁরা সংযমী পরদারস্পর্শে তাঁদের প্রবৃত্তি নেই।

শার্ঙ্গরব—মহারাজ ! নানা কাজে বিব্রত থাকতে হয় বলে আপনি আগের ঘটনা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন, সেক্ষেত্রে ধর্মভীরু আপনার পক্ষে পত্নীপরিত্যাগ ব্যাপারটি অসঙ্গত হচ্ছে না কি ?

রাজা—আপনার কাছেই বিষয়টির ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করছি।

আমি মোহগ্রস্ত হতে পারি, ইনিও মিথ্যাভাষিণী হতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দেওয়ায় কোন্‌টা ঠিক হবে—আমি পত্নী ত্যাগ করব, না, পরস্ত্রী স্পর্শে কলংকিত হব ?

পুরোহিত—(বিচার করে) যদি এই করা যায় ?

রাজা—আদেশ করুন আমাকে।

পুরোহিত—ইনি প্রসব পর্যন্ত আমার গৃহেই থাকুন। যদি বলেন এ-কথা বলছি কেন ? তাহলে শুনুন, আপনার সম্বন্ধে ঋষিরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, প্রথমেই চক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন। সেই মুনি-দৌহিত্রে (কণ্বমুনির দৌহিত্রে) যদি ঐ লক্ষণ থাকে তাহলে এঁকে অভিনন্দন জানিয়ে অন্তঃপুরে আনবেন। আর তা যদি না হয় তাহলে এঁকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

রাজা—গুরুদেব যা বলেন।

পুরোহিত—বৎসে, আমাকে অনুসরণ কর।

শকুন্তলা—হে ভগবতী বসুধা ! আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও।

(এই বলে কাঁদতে কাঁদতে পুরোহিত ও তপস্বীদের সঙ্গে প্রস্থান। শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে রাজা শকুন্তলার বিষয়ই চিন্তা করতে লাগলেন)

(নেপথ্যে)—আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

রাজা—(শুনে) কী হল ?

পুরোহিত—(প্রবেশ করে, সবিস্ময়ে) মহারাজ ! অদ্ভুত ঘটনা।

রাজা—কী বলুন তো ?

পুরোহিত—কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করলেই ঐ বালিকা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে হাত তুলে কাঁদতে লাগলেন।

রাজা—তারপর ?

পুরোহিত—তারপর হঠাৎ অপ্সরাতীর্থের কাছে স্ত্রীমূর্তির মতো এক জ্যোতিঃ এসে এঁকে নিয়ে চলে গেল।

(সকলে বিস্ময় অভিনয় করলেন)

রাজা—আর্য! প্রথমেই আমরা এই শকুন্তলা-বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই অনর্থক জল্পনা-কল্পনা করে লাভ কী? আপনি বিশ্রাম করুন।

পুরোহিত—(তাকিয়ে) জয় হোক আপনার! (প্রস্থান)

রাজা—বেত্রবতী, আমি অস্থির বোধ করছি। শয়নগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে আসুন মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা—(পরিক্রমা করে মনে মনে) এ কথা সত্যি যে আমি প্রত্যাখ্যাত ঐ ঋষিকন্যাকে আমার পরিণীতা বলে স্মরণ করতে পারছি না, কিন্তু আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আমাকে যেন বিশ্বাস করতেই বলছে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ পঞ্চম অংক সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ অংক

(তারপর নগররক্ষীদের তত্ত্বাবধায়ক রাজার শ্যালকের প্রবেশ আর তার পিছনে হাতবাঁধা অবস্থায় একজন লোককে নিয়ে দুজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী দুজন—(লোকটাকে মারতে মারতে) ওরে চোর, বল দেখি রাজার নাম-খোদাই করা বহুমূল্য মণিতে জ্বল-জ্বল-করা এই আংটিটা পেলি কোত্থেকে?

পুরুষ—(ভয়ের অভিনয় করে) দোহাই, মশাইরা, আমি একাজ করি নি।

প্রথম—তাহলে সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে মহারাজ তোকে এটা উপহার দিয়েছে বল?

পুরুষ—দয়া করে শুনুন তবে। আমি এক জেলে, আমার বাড়ি শক্রাবতারে।

দ্বিতীয়—ওরে চোর! আমরা কি তোকে তোর কোন্ জাত, কোথায় থাকিস্ তুই, এ সব জিজ্ঞেস করেছি?

শ্যালক—সূচক! পরপর বলে যাক, ওকে কথার মাঝে মাঝে থামিয়ে দিও না।

দুজনে—আপনি যা আজ্ঞা করেন। বল রে।

পুরুষ—জাল, বড়শি—এ সব মাছধরার নানা কৌশলে পরিবার প্রতিপালন করি।

শ্যালক—(হেসে) বিশুদ্ধ জীবিকাই বলতে হবে!

পুরুষ—কর্তা, ও কথা বলবেন না। যে বৃত্তি জন্মগত, নিন্দিত হলেও তা ছাড়া উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করুণানম্র হলেও যজ্ঞীয় পশুবধে নিষ্ঠুর।

শ্যালক—তারপর, তারপর?

পুরুষ—একদিন একটা রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম। তার পেটের ভিতরটা দেখতেই চোখে পড়ল মহামণিতে জ্বল-জ্বলে এই আংটিটা। তারপর এটা বিক্রির জন্যে দেখাতেই আপনারা আমাকে ধরলেন। আপনারা মারুন, কাটুন, যাই করুন, কী করে এটা পেলাম এই হল তার গোপন বৃত্তান্ত।

শ্যালক—(আংটিটা শুঁকে) আরে কাঁচা মাংসের গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে—এ গোসাপখেকো

মেছোই হবে। তবে আংটি-পাবার ব্যাপারটা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে। আমি রাজবাড়িতে যাচ্ছি।

রক্ষী দুজন—আপনি যা আজ্ঞা করেন। চল রে গাঁট-কাটা চল।

(সকলের পরিক্রমা)

শ্যালক—সূচক, আমি এই আংটিটা যেভাবে পাওয়া গেল তা প্রভুকে জানিয়ে যতক্ষণ তাঁর আদেশ না নিয়ে আসছি ততক্ষণ তোমরা এই পুরদ্বারে অপেক্ষা কর।

দুজনে—প্রভুর অনুগ্রহ-লাভের জন্যে প্রবেশ করুন, কর্তা।

(শ্যালকের প্রস্থান)

সূচক—জানুক, আমাদের কর্তা কিন্তু সত্যিই দেরি করছেন।

জানুক—তা তো হবেই, ঠিক অবসর বুঝেই তো রাজাদের কাছে যেতে হয়।

সূচক—জানুক, আমার হাতের আগের অংশটুকু ওর বধের মালাটি পরাবার জন্যে নিস্‌পিস্‌ করছে। (এই বলে লোকটার দিকে দেখাল)

পুরুষ—আজ্ঞে, হুজুর, অকারণে বধ করাটা আপনার উচিত হবে না।

জানুক—এই তো আমাদের কর্তা, হাতে তাঁর পত্র। রাজার আদেশ নিয়ে এই দিকেই আসছেন তিনি।

এখন তুই হয় শকুনের মুখ দেখবি, না হয় তো কুকুরের মুখ দেখবি।

শ্যালক—(প্রবেশ করে) শিগ্‌গির, শিগ্‌গির, এই—(এইটুকু বলতেই)

পুরুষ—হায়, আমি মারা পড়লাম। (বিষাদের অভিনয় করল)

শ্যালক—সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও। ওর আংটি-পাবার ব্যাপারটা অমূলক নয়।

সূচক—যে আজ্ঞে হুজুর।

এ যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল দেখছি!

(এই বলে লোকটিকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন)

পুরুষ—প্রভু, আমার (আজকের) জীবিকাটা তাহলে কী হবে? (এই বলে পায়ে পড়ল)

শ্যালক—ওঠ, এই যে প্রভু আংটির দামের সমান উপহার দিয়েছেন; এই নে।

(এই বলে লোকটিকে অর্থ দিল)

পুরুষ—(সানন্দে প্রণাম করে তা নিয়ে) আমি অনুগৃহীত হলাম, প্রভু।

সূচক—এ এমন অনুগ্রহ যে শূল থেকে নামিয়ে হাতির পিঠে চড়ানো হল তোকে।

জানুক—প্রভু, এই উপহারই বলে দিচ্ছে ঐ আংটিটা প্রভুর খুব আদরের জিনিস।

শ্যালক—মনে হয়, ওতে যে মহামূল্য রত্ন আছে তার জন্যেই আংটিটা তাঁর কাছে মূল্যবান নয়, ওটা দেখে কোনো প্রিয়জনকে তাঁর মনে পড়ে গেল। কারণ স্বভাবত গম্ভীর হলেও তখন তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

সূচক—তাহলে হুজুর তাঁর সেবাই করলেন বলতে হয়।

জানুক—বরং বল, এই জেলের জন্যে—(এই বলে লোকটিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখল)

পুরুষ—এর অর্ধেকটা আপনাদের সুরার দাম হোক।

জানুক—তাই তো হওয়া উচিত।

শ্যালক—ধীবর, তুমি এখন আমার মস্তবড়ো বন্ধু হলে। আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব মদিরাকে সাক্ষী রেখেই পাকা হোক। (তাহলে শুঁড়িখানাতেই যাওয়া যাক)

সকলে—তাই যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(তারপর আকাশ-গতিতে সানুমতী নামে এক অপ্সরার প্রবেশ)

সানুমতী—সাধুদের স্নানের সময় আমাদের যে পালা করতে অপ্সরা-তীর্থের কাছে থাকতে হয় সে কাজ শেষ হয়েছে, তাই এখন রাজার ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখি। মেনকার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের দরুন শকুন্তলা আমার শরীরেরই অংশের মতো। মেনকা আমাকে আগে থেকেই সখীর বিষয়ে বলে রেখেছেন।

(চারদিকে চেয়ে)

ব্যাপার কী? ঋতু-উৎসবেও রাজবাড়িকে যেন দেখছি নিরুৎসবের মতোই। আমার উপর দায়িত্ব সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখা। কিন্তু সখীর মর্যাদা আমাকে মানতে হবে। যা হোক তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে উদ্যানপালিকা দুজনের পাশে থেকে (রাজবাড়ির) সবকিছু জেনে নিই।

(অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়িয়ে রইলেন)

(তারপর আমের মুকুলের দিকে দৃষ্টি দিতে দিতে চেটী প্রবেশ করল, তার পিছন এল আর একজন।)

প্রথমা—হে তাম্রাভ ও হরিৎ-পাণ্ডুর! হে বসন্তমাসের প্রাণস্বরূপ! হে ঋতুমঙ্গল! তোমার আম-গাছে ধরেছে বোল, আমি তোমাকে প্রসন্ন করছি।

দ্বিতীয়—পরভৃতিকা, একা-একা কী বলছিস?

প্রথমা—মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখে পরভৃতিকা উন্মত্ত হয়েছে—

দ্বিতীয়া—(সহর্ষে এগিয়ে এসে) কী? বসন্ত কি এসে গেছে?

প্রথমা—মধুকরিকা (মৌমাছি)। এই তোর সময়, মত্ততায় প্রেমগীতি তুই গাইতে পারিস।

দ্বিতীয়া—সখী, আমাকে ধরে থাক যতক্ষণ না আমি পায়ের পাতায় ভর করে আমের মুকুল নিয়ে কামদেবতাকে পুজো করি।

প্রথমা—আমিও যেন পুজোর অর্ধেক ফল পাই।

দ্বিতীয়া—না বললেও পাবি। কারণ আমাদের একটাই জীবন, যদিও শরীরটা পৃথক। (সখীকে অবলম্বন করে আমের মুকুল নিয়ে) ওলো, সম্পূর্ণ না ফুটলেও ছেঁড়ামাত্রই গন্ধ বেরোচ্ছে। (পত্রপুট রচিত হয় এইভাবে হাতজোড় করে) হে আমের মুকুল, আমি তোমাকে ধৃত-ধনু কামদেবকে দান করলাম। প্রোষিত-ভর্তৃকাদের লক্ষ্য করে যে পাঁচটি বাণ তিনি নিক্ষেপ করেন তার মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ বাণ হও। (এই বলে আমের মুকুল ছুঁড়ে দিল)

(যবনিকা ছেড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশ করে)

কঞ্চুকী—ওরে আত্মবিস্মৃতা, ও কি করছিস? প্রভু বসন্তোৎসব করতে নিষেধ করেছেন, আর তুই কিনা আমের মুকুল তুলছিস?

দুজনে—প্রসন্ন হোন আর্য, আমরা ঠিক জানতাম না।

কঞ্চুকী—তোরা কি শুনিস নি বসন্তের তরুরা এবং তাদের আশ্রিত পাখিরাও মহারাজের আদেশ মানেন? চেয়ে দেখ—

আমের মুকুল অনেক আগে নির্গত হলেও তাতে পরাগ দেখা দিচ্ছে না, কুরচি ফুল উদ্গত হলেও কুঁড়ি হয়েই রয়ে গেল। শীত চলে গেলেও কোকিলদের

কুহ্রব কণ্ঠে স্খলিত হচ্ছে। মনে হয় কামদেবও ভীত হয়ে তূণ থেকে অর্ধেক তোলা বাণ তূণেই রেখে দিচ্ছেন।

সানুমতী—এতে সন্দেহ নেই। প্রবল প্রভাব এই রাজর্ষির।

প্রথমা—মাত্র কয়েকদিন আগে মহারাজের শ্যালক মিত্রাবসু আমাদের দুজনকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এখানে প্রমোদবনের দেখাশোনার ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। নতুন এসেছি বলে আমরা এ ব্যাপারটা শুনি নি।

কণ্ডুকী—ঠিক আছে। আর এমন করিস না।

দুজনে—আর্য, আমাদের কৌতূহল হচ্ছে, যদি আমাদের সেকথা শোনবার যোগ্য মনে করেন, তবে বলুন, কেন মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করেছেন।

কণ্ডুকী—ব্যাপারটা সবারই কানে গিয়েছে, তাই বলতে বাধা নেই। তোরা দুজনে কি শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা শুনিস নি?

দুজনে—আর্য, মহারাজের শ্যালকের কাছে আংটি দেখার ঘটনা পর্যন্ত শুনেছি।

কণ্ডুকী—তাহলে অল্পই বলার আছে। যখনই নিজের আংটি দেখে প্রভুর মনে পড়ল সত্যই তিনি শকুন্তলাকে আগে গোপনে বিবাহ করেছেন এবং মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন থেকেই অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হচ্ছেন তিনি। সেই থেকেই রমণীয় বিষয়েও তাঁর ঘোর বিতৃষ্ণা এল, সচিবরাও তাঁর সঙ্গ আর পাচ্ছেন না, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করে সারা-রাত বিনিদ্রভাবেই কাটাচ্ছেন। সৌজন্যবশতঃ অন্তঃপুরিকাদের কোনো কথায় যথাযথ উত্তর দিতে গিয়ে তাদের নাম ভুলে গিয়ে লজ্জায় বেশ কিছুক্ষণ অবনত হয়ে থাকছেন!

সানুমতী—সুখের বিষয়, সত্যি, (আমার কাছে) এটা সুখের বিষয়।

কণ্ডুকী—এই অসহ্য মনস্তাপের জন্যেই উৎসব নিষিদ্ধ করেছেন।

দুজনে—ঠিকই করেছেন।

নেপথ্যে—আসুন, আসুন প্রভু।

কণ্ডুকী—(কান দিয়ে) প্রভু এদিকেই আসছেন। তোরা নিজেদের কাজে যা।

দুজনে—তাই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(তারপর অনুতাপের উপযুক্ত বেশে রাজা এবং সেই সঙ্গে বিদূষক ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

কণ্ডুকী—(রাজাকে দেখে) যারা সুন্দর সব অবস্থাতেই তাঁরা সুন্দর। তাই উদ্বিগ্ন হলেও প্রভু সুদর্শন, কারণ—

বিশেষ অলংকার পরিত্যাগ করে তিনি এখন বাম প্রকোষ্ঠে একখানি স্বর্ণবলয় ধারণ করেছেন, উষ্ণ নিশ্বাসে অধর রক্তিম হয়ে উঠেছে, চিন্তাজনিত অনিদ্রায় তাঁর নয়ন ঈষৎ তাম্রাভ। তবু নিজের তেজোগুণে শাণযন্ত্রে উৎকীর্ণ মণির মতো তিনি ক্ষীণতনু হলেও দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সানুমতী—(রাজাকে দেখে) প্রত্যাখ্যানে অপমানিতা হয়েও শকুন্তলা এঁর জন্যে যে কষ্ট ভোগ করেছেন তা উপযুক্তই বটে।

রাজা—(চিন্তামগ্ন হয়ে ধীর পদক্ষেপে পরিক্রমা করে) প্রথমে মৃগনয়না প্রিয়া সুপ্ত এ পোড়া হৃদয়কে জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তা জাগ্রত হয়েছে শুধু অনুতাপের দুঃখ ভোগের জন্যে।

সানুমতী—হতভাগীর অদৃষ্ট এমনি বটে।

বিদূষক—(জনান্তিকে) হুঁ, আবার ইনি শকুন্তলাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। কিভাবে এঁর চিকিৎসা হবে বুঝতে পারছি না।

কঞ্চুকী—(সামনে এসে) জয় হোক মহারাজের ! মহারাজ প্রমোদবনের ভূমি পরিমার্জিত হয়েছে।

আপনি ইচ্ছে-মতো বিনোদস্থানে উপবেশন করুন।

রাজা—বেত্রবতী, তুমি শ্রদ্ধেও পিশুনকে আমার কথায় বলো—বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় আমি আজ বিচারাসানে বসতে পারি নি। তিনি পুরজনের যে সব অভিযোগ বা সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলো পত্রে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রতিহারী—প্রভু যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

রাজা—বাতায়ন ! তুমিও নিজের কাজে যাও।

কঞ্চুকী—প্রভুর যা আদেশ। (প্রস্থান)

বিদূষক—আপনি শেষ মাছিটাও তাড়ালেন দেখছি। এখন বেশি শৈত্য বা বেশি তাপ নেই বলে উপভোগ্য এই প্রমোদবনে আরাম করুন।

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) বয়স্য ! এই যে বলা হয় ছিদ্রপথে অনর্থ সদলে আসে কথাটা ঠিকই। দেখ—

যে মোহ মুনিকন্যার স্মৃতিকে রোধ করেছিল তা থেকে আমার মন মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বন্ধু কামদেব সঙ্গে-সঙ্গেই আমাকে বিদ্ধ করবার জন্যে তাঁর ধনুকে চূতশর যোজনা করেছেন।

বিদূষক—বয়স্য ! দাঁড়ান। আমি এই লাঠি দিয়ে কামদেবের বাণটি নষ্ট করছি।

(এই বলে লাঠি উঁচু করে আমের মুকুল পাড়তে গেলেন)

রাজা—(মৃদু হেসে) খুব হয়েছে। ব্রহ্মতেজ দেখলাম। বন্ধু, কোথায় বসে লতায় চোখ বুলিয়ে একটু আরাম পাই—যে-লতা আমার প্রিয়ার কিছুটা অনুরূপ ?

বিদূষক—কেন আপনিই তো আপনার সান্নিধ্যচারিণী পরিচারিকা চতুরিকাকে আদেশ দিয়েছেন—'এই বেলা আমি মাধবীলতামণ্ডপে কাটাব। সেখানে আমার নিজে হাতে চিত্রফলকে আঁকা প্রিয়া শকুন্তলার প্রতিকৃতি নিয়ে আসবে।'

রাজা—এখন এইভাবেই চিত্তবিনোদন করতে হবে। তুমিই তাহলে পথ বলে দাও।

বিদূষক—এই দিকে, এই দিকে আসুন।

(দুজনে পরিক্রমা করলেন, সানুমতী অনুসরণ করলেন)

বিদূষক—মণিময় শিলাসনযুক্ত পুষ্পোপচারে রমণীয় এই মাধবীমণ্ডপ যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করুন এখানে।

(দুজনের প্রবেশ ও উপবেশন)

সানুমতী—লতাসংলগ্ন হয়ে প্রিয়সখীর প্রতিকৃতি দেখি। তারপর তাকে স্বামীর বহুমুখী অনুরাগের কথা বলব গিয়ে।

(সেইভাবে অবস্থান)

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) এখন শকুন্তলার ব্যাপারে আগেকার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ছে। তোমাকেও বলেছিলাম। তুমি তো প্রত্যাখানের সময় আমার কাছে ছিলে না।

কিন্তু আগেও তো তুমি কখনো তার নাম উচ্চারণ কর নি। তুমি আমার মতোই তাঁকে ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক—না, ভুলি নি। কিন্তু সমস্ত বলার পর আপনি যে বলেছিলেন এ সব পরিহাস করে বলা, সত্য নয়। মাটির ঢেলার মতো বুদ্ধি আমার, আমি তাই মেনে নিয়েছিলাম। অথবা নিয়তিই এখানে প্রভুত্ব করেছে বলতে হবে।

সানুমতী—সত্যিই তাই।

রাজা—(কিছুক্ষণ চিন্তা করে) রক্ষা কর আমাকে।

বিদূষক—এ কি বলছেন? আপনার তো এটা সাজে না। বীরেরা তো কখনো শোকের শিকার হয় না। প্রচণ্ড ঝড়েও পর্বত তো অকম্পিতই থাকে।

রাজা—বয়স্য, প্রত্যাখ্যানে বিচলিত প্রিয়ার অবস্থা স্মরণ করে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। আমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি যখন স্বজনের অনুগমন করতে চাইলেন তখন পিতৃ-সম গুরু-শিষ্যের উচ্চকণ্ঠে 'থাকো'—এ-কথা বলায় তিনি দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণে কলুষ দৃষ্টি আবার নিষ্ঠুর-আমার প্রতি দিলেন, তা এখন বিষাক্ত শল্যের মতো আমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে।

সানুমতী—ইস্, নিজের স্বার্থ-চিন্তা এমনি! এঁর সন্তাপে আমি আনন্দিত।

বিদূষক—দেখুন, আমার তো মনে হয় কোনো এক আকাশচারী তাঁকে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—বয়স্য, স্বামীই যাঁর দেবতা তাঁকে অন্য কে আর স্পর্শ করতে সাহস পাবে। শুনেছিলাম তোমার সখীর জন্মদাত্রী জননী মেনকা। তিনি অথবা তাঁর সহচারিণীরা তোমার এই সখীকে অপহরণ করেছেন এই আমার ধারণা।

সানুমতী—তাঁর ভুলে যাওয়াটাই বিস্ময়ের, মনে পড়াটা নয়।

বিদূষক—যদি তাই হয় আপনি নিশ্চিন্ত হোন। একদিন তাঁর সঙ্গে আবার মিলন হবেই।

রাজা—কেমন করে?

বিদূষক—প্রতিবিচ্ছেদে দুঃখিতা কন্যাকে মা-বাবা বেশিদিন দেখতে পারেন না।

রাজা—বয়স্য,

সে কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম, না-কি সেইটুকু ফল দান করে পুণ্য নিঃশেষিত হল? যাই হোক, তা একেবারেই গিয়েছে, আর ফিরবে না। এইসব আশা হল নদীর পাড়-ভাঙা ধস।

বিদূষক—ও-কথা বলবেন না। আংটিটাই এখানে নিদর্শন। যা অবশ্যই হবে তা অপ্রত্যাশিতভাবেই হবে।

রাজা—(আংটি দেখে) দুর্লভ স্থান থেকে ভ্রষ্ট এই আংটিটি এখন শোকের বিষয়। হে অঙ্গুরীয়, ফল দেখেই বুঝতে পারছি তোমার পুণ্য খুবই ক্ষীণ। তাই রক্তিমনখে মনোরম অঙ্গুলিতে স্থান পেয়েও তুমি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছ।

সানুমতী—যদি অন্য হাতে গিয়ে পড়ত তাহলে সত্যিই অনুশোচনার বিষয় হত।

বিদূষক—বলুন তো, আপনার নাম-মুদ্রা কী উদ্দেশ্যে আপনি তাঁর হাতে পরিয়েছিলেন?

সানুমতী—আমার কৌতূহলটিই ওঁর কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

রাজা—বয়স্য, শোন। স্ব-নগরে প্রস্থানের সময় প্রিয়া সাশ্রুনয়নে বললেন,—আর্যপুত্র, কতদিন পরে আমাকে স্মরণ করবেন?

বিদূষক—তারপর, তারপর?

রাজা—তারপর এই মুদ্রাঙ্কিত আংটিটি তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে আমি তাঁকে উত্তর দিলাম—

প্রিয়ে, আমার নামের এক একটি করে অক্ষর প্রতিদিন গুণবে, গোণা শেষ হলেই আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ তোমার কাছে আসবে।

সানুমতী—একটি সুন্দর আয়োজন নিয়তি ব্যর্থ করে দিল।

বিদূষক—কেমন করে (আংটিটি) জেলের কাটা রুইমাছের পেটের ভিতরে গেল ?

রাজা—শচীতীর্থকে বন্দনা করবার সময় তোমার সখীর হাত থেকে গঙ্গার স্রোতে খুলে পড়েছিল।

বিদূষক—তা সম্ভব বটে।

সানুমতী—তাই তো শকুন্তলার সঙ্গে অধর্ম-ভীরু রাজার পরিণয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তা না হলে এমন গভীর অনুরাগ কি অভিজ্ঞানের অপেক্ষায় থাকে ?

রাজা—এখন আমি এই আংটিটিকে ভর্ৎসনা করব।

বিদূষক—(মনে মনে) ইনি দেখি পাগলের পথ ধরলেন।

রাজা—হে অঙ্গুরী, যে-হাতে কান্ত-কোমল-অঙ্গুলি সেই হাত ত্যাগ করে তুমি জলে নিমগ্ন হলে কেন ?

অথবা—যা অচেতন তা গুণযুক্তকে চোখে দেখে না। কিন্তু আমি (চেতন হয়েও) কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছি ?

বিদূষক—(মনে মনে) ক্ষুধা আমাকে খেয়েই ফেলবে নাকি ?

রাজা—হে অকারণ-পরিত্যক্তা। অনুতাপে যাঁর হৃদয় তপ্ত সেই মানুষটিকে তুমি আবার দর্শন দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত কর।

(যবনিকা নাড়িয়ে, চিত্রফলক হাতে নিয়ে)

চতুরিকা—প্রভু ! এই যে চিত্রগতা ভট্টিনী। (এই বলে চিত্রফলক দেখাল)

বিদূষক—(দেখে) চমৎকার, হে বয়স্য ! মনোজ্ঞ চিত্রণের দরুন ভাবব্যঞ্জনা সত্যি সুন্দর ফুটেছে। উঁচুনিচু জায়গাগুলোতে আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হচ্ছে। বেশি বলব কি, প্রাণবন্ত মনে হওয়ায় আমার আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছে।

সানুমতী—সত্যি, আশ্চর্য রাজর্ষির নৈপুণ্য ! মনে হচ্ছে প্রিয়সখী যেন আমার সামনেই আছে।

রাজা—চিত্রে যা ঠিকমতো হয় নি তা আবার অন্যরকম করে দিচ্ছি। তবুও তার লাবণ্যের খুব সামান্য অংশই রূপায়িত হয়েছে।

সানুমতী—এ-কথা তাঁর অনুরাগের যোগ্য, যা অনুতাপে এবং নিরহঙ্কারে গভীরতর।

বিদূষক—এই যে, এখানে তিনজনকে দেখা যাচ্ছে, সকলেই রূপবতী। এর মধ্যে কোনটি শ্রদ্ধেয়া শকুন্তলা ?

সানুমতী—এমন রূপ দেখে যিনি বোঝেন না তাঁর দৃষ্টিই নেই বুঝতে হবে।

রাজা—তোমার মনে হয় কে ?

বিদূষক—(ভালো করে দেখে) যাঁর শিথিল কবরী থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, যাঁর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, বাহু-দুটি পড়েছে এলিয়ে, জলসেচের পর সিক্ত ও সতেজ পল্লবযুক্ত আমগাছের পাশে যাঁকে ঈষৎ পরিশ্রান্তভাবে আঁকা হয়েছে ইনি পূজনীয়া শকুন্তলা, আর দুজন সখী।

রাজা—তুমি সত্যিই নিপুণ। এতে আমার মনের আবেগও চিহ্নিত হয়েছে।
চিত্ররেখার প্রান্তে আমার ঘর্মাক্ত আঙুলের ছাপটিকে কালো দেখাচ্ছে আর তাঁর কপোলে আমার যে অশ্রু ঝরে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে বর্ণস্ফীতি থেকে।
(চেটীকে) চতুরিকা, আনন্দের এই উপকরণটি অর্ধ-অঙ্কিত। তাই গিয়ে তুলি নিয়ে এসো।

চতুরিকা—আর্য মাধব্য, আমি যতক্ষণ না আসি আপনি এই চিত্রফলকটি ধরে থাকুন।

রাজা—আমিই ধরে থাকছি। (তাই করলেন, চেটীর প্রস্থান)

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) বন্ধু, সমাগতা সাক্ষাৎ প্রিয়াকে প্রথমে পরিত্যাগ করে, এখন এই চিত্রাঙ্কিতাকে বহু সম্মান করছি। পথে গভীর স্রোতস্বিনীকে ছেড়ে এসে আমি যেন মরীচিকার অনুরাগী হয়েছি।

বিদূষক—(মনে মনে) ইনি সত্যিই নদী পার হয়ে মরীচিকাকে আশ্রয় করেছেন।
(প্রকাশ্যে) আর কী কী আঁকতে হবে এতে ?

সানুমতী—প্রিয়সখীর অভিমত স্থানগুলিই বোধহয় আঁকা হবে।

রাজা—বন্ধু, শোন—
মালিনী নদী আঁকতে হবে যার তটভূমিতে হংসমিথুন লীন হয়ে আছে, এর সামনেই যেখানে হরিণগুলো বসে ছিল সেই প্রকাণ্ড পর্বতগুলোও আঁকতে হবে। এমন একটা গাছ আঁকতে চাই যার শাখায় ঋষিদের বল্কল প্রলম্বিত, আর তারই নিচে আঁকতে হবে এমন একটি মৃগী যে বাম-নয়ন কণ্ডূয়ন করছে একটি কৃষ্ণমৃগের শিঙে।

বিদূষক—(মনে মনে) আমি যা দেখছি তাতে মনে হয় ইনি চিত্রফলকটিকে দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষিদের দিয়ে ভরে দেবেন।

রাজা—বন্ধু, শকুন্তলার প্রিয় আর-একটি আভরণ (আঁকতে হবে) যা আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বিদূষক—সেটা কী ?

সানুমতী—হয়তো এমন কিছু যা বনবাস এবং সৌকুমার্যের উপযুক্ত।

রাজা—বন্ধু, শিরীষফুলটি আঁকা হয় নি, যার বৃন্তটি তাঁর কানে গোঁজা আর যার কেশরটি গাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দুই স্তনের মাঝখানে শরৎকালের চন্দ্রকিরণের মতো কোমল মৃণালসূত্রও আঁকা হয় নি।

বিদূষক—আচ্ছা! ইনি রক্তকমলের মতো করতলে মুখ ঢেকে ভীত হয়ে রয়েছেন কেন ?
আঃ ফুলের মধুচোর এই হতচ্ছাড়া মৌমাছিটা এঁর মুখপদ্মের দিকে ছুটে আসছে যে !

রাজা—এই বেহায়াটাকে নিষেধ কর তো।

বিদূষক—আপনি নিজেই যখন দুর্বিনীতের শাসক, তখন আপনিই পারবেন ওকে নিষেধ করতে।

রাজা—ঠিক বলেছ।
ওগো কুসুমলতার প্রিয় অতিথি, এখানে ঘুরে কেন অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ, দেখ—তোমার অনুরাগিণী সখী মধুকরী ফুলে বসে আছে, তৃষ্ণার্ত হয়েও অপেক্ষা করছে, তুমি ছাড়া (একাকিনী) সে মধুপান করবে না।

সানুমতী—আর্য, একে খুব ভদ্রভাবে নিষেধ করা হল।
বিদূষক—নিষেধ করলেও শুনছে না, এর জাতটাই অন্য ধরনের।
রাজা—তাই তো দেখছি। আমার আদেশ শুনছিস না? তবে শোন্—অম্লান নব-কিশলয়ের মতো প্রিয়ার যে লোভনীয় বিম্বাধর সুরতোৎসবে আমি পান করেছি হে ভ্রমর! তুই যদি তা স্পর্শ করিস তাহলে তোকে পদ্মোদরে বন্ধ করে রাখব।
বিদূষক—এমন সাংঘাতিক দণ্ডকেও তুই ভয় করলি না? (হেসে, মনে মনে) ইনি উন্মত্তই হয়েছেন বলতে হবে। এঁদের সঙ্গে আমারও সেই দশা।
(প্রকাশ্যে) বলি শুনছেন? এ শুধু ছবি।
রাজা—কী ছবি!
সানুমতী—আমিও এইমাত্র বুঝলাম, সে শুধু ছবি। এঁর কথা আর কী বলব? ইনি যা আঁকছেন শুধু তাই ভাবছেন।
রাজা—বয়স্য, তুমি কেন এই সর্বনাশটা করলে? তন্ময় হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষ দেখছি। এইভাবে তাঁর দর্শন-সুখ অনুভব করছিলাম। তুমি মনে করিয়ে দিয়ে আমার প্রিয়াকে আবার ছবিতেই পরিণত করলে। (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)
সানুমতী—পূর্বাপরবিরোধী এই বিচ্ছেদ ব্যাপারটি সত্যিই অপূর্ব।
রাজা—বয়স্য, এই অবিশ্রান্ত দুঃখ আর কেমন করে সহ্য করব? রাতে ঘুম না হওয়ায় স্বপ্নেও তাঁর সঙ্গে মিলনের পথ বন্ধ, এদিকে চিত্রাঙ্কিতাকেও দেখতে পারছি না, অশ্রু এসে বাধা দিচ্ছে।
সানুমতি—শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দুঃখ আপনি সম্পূর্ণ দূর করলেন।
চতুরিকা—(প্রবেশ করে) জয় হোক প্রভুর! তুলির পেটিকা নিয়ে আমি এই দিকেই আসছিলাম—
রাজা—কী হল?
চতুরিকা—'আমি নিজেই ওটা প্রভুকে দেব।' এ-কথা বলে মহিষী বসুমতী জোর করে তা নিয়ে নিলেন, ওর সঙ্গে ছিল তরলিকা।
বিদূষক—ভাগ্যিস্ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।
চতুরিকা—দেবীর গাছের শাখায় জড়িয়ে-যাওয়া চেটীর ওড়না তরলিকা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল, সেই সুযোগে আমি নিজেকে মুক্ত করেছি।
রাজা—বয়স্য, বহুমানগর্বিতা দেবী এসে পড়েছেন। এই প্রতিকৃতিটি তুমি রক্ষা কর।
বিদূষক—'নিজেকেই রক্ষা কর'। বরং তাই বলুন। (চিত্রফলকটি নিয়ে উঠে)
যদি অন্তঃপুরের জটিল জাল থেকে মুক্তি পান তাহলে আমাকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদে ডাকবেন। এটা ঐখানে লুকিয়ে রাখব, যেখানে পায়রা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ-পথ পাবে না। (এই বলে দ্রুতপদে প্রস্থান)
সানুমতী—এখন অনুরাগ কমে গেলেও ইনি আগেকার সম্মান বজায় রাখছেন, যদিও তাঁর অনুরাগ এখন অন্যত্র সংক্রমিত।

(পত্র নিয়ে প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—জয় হোক, জয় হোক মহারাজের!
রাজা—বেত্রবতী। তুমি দেবীকে মাঝপথে দেখ নি তো?
প্রতিহারী—হাঁ, তিনি পত্র হাতে আমাকে দেখে ফিরে গেলেন।

রাজা—কাজের মূল্য জানেন দেবী, তাই কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না।

প্রতিহারী—প্রভু, অমাত্য জানাচ্ছেন আজ বেশ কিছু অর্থের হিসাবপত্র করতে হল বলে শুধু একটা পৌরকাজ দেখা গেল। সেটাই এ-পত্রে লেখা আছে, আপনি দেখুন প্রভু।

রাজা—এদিকে এস, পত্র দেখাও।

(প্রতিহারী পত্র আনল)

রাজা—(পড়ে) কী? সমুদ্রপথে ব্যবসায়রত ধনমিত্র নামে এক বণিক নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছেন। হতভাগ্য লোকটি নিঃসন্তান বলে তার সঞ্চিত ধন রাজার প্রাপ্য। এ-কথাই অমাত্য লিখেছেন। নিঃসন্তানতা পরিতাপের বিষয়। বেত্রবতী, বহু অর্থ ছিল তাঁর তাই বহু পত্নী থাকা সম্ভব। তাঁর পত্নীদের মধ্যে কেউ আপন্নসত্ত্বা কিনা তা খোঁজ করা দরকার।

প্রতিহারী—এইমাত্র শোনা গেল সাকেতের বণিকদুহিতা তাঁর স্ত্রী। সম্প্রতি তাঁর পুংসবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

রাজা—গর্ভের সন্তানই তাহলে পিতার সম্পত্তি পাবে। অমাত্যকে তাই বল গিয়ে।

প্রতিহারী—প্রভু যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

রাজা—শোন—

প্রতিহারী—(ফিরে এসে) এই যে প্রভু।

রাজা—সন্তান থাকুক, বা নাই থাকুক, কী এসে গেল।

এ-কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর—প্রজাদের যারা যে-প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ হবে, সে যদি পাপী না হয়, দুষ্যন্ত তার সেই প্রিয়জন হবে।

প্রতিহারী—তাই ঘোষিত হবে। (নিষ্ক্রমণ করে আবার প্রবেশ)

যথাসময়ে বৃষ্টির মতো প্রভুর আদেশকে অভিনন্দিত করেছেন (সবাই)।

রাজা—দীর্ঘ ও উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্তান না থাকলে বংশের মূল পুরুষের মৃত্যু হলে সম্পদ নিরবলম্বন হয়ে পরকে আশ্রয় করে। আমার মৃত্যুর পরও পুরুবংশের সম্পদের এই দশাই হবে।

প্রতিহারী—এ-অমঙ্গল দূর হোক!

রাজা—আপনা থেকেই যে-মঙ্গল এসেছিল আমি তা অবহেলা করেছি, আমাকে ধিক্।

সানুমতী—নিশ্চয় প্রিয়সখীর কথা মনে করেই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন ইনি।

রাজা—সময়-মতো বীজ বোনায় ভবিষ্যতে প্রচুর শস্য সম্ভাবনাময় ভূমিতে আমি স্বয়ং নিহিত হলেও (শকুন্তলার গর্ভে) বংশের প্রতিষ্ঠাস্বরূপা ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। এ যেন সময়-মতো বীজ-বোনা প্রচুর-শস্যসম্ভাবনাময় ভূমিকে ত্যাগ করার মতো।

সানুমতী—তিনি (দীর্ঘদিন) পরিত্যক্তা রইবেন না।

চতুরিকা—(জনান্তিকে) এই বণিকদলের ঘটনায় প্রভুর গ্লানি দ্বিগুণ হয়েছে। এঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ থেকে আর্য মাধব্যকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—এক্ষুনি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

রাজা—হায়! দুষ্যন্তের পিণ্ডভাজনেরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন। কারণ—

আমার পরে আমাদের বংশে বেদবিধিমতে উপকল্পিত নিবপন আর কে করবে?

সন্তানহীন আমি যে জলদান করব, চোখের জল ধুয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই পান করবেন পিতৃ-পুরুষেরা। (সংজ্ঞা হারালেন)

চতুরিকা—(সসম্ভ্রমে রাজাকে ধারণ করে) আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন প্রভু।

সানুমতী—হায় ধিক, হায় ধিক। প্রদীপ থাকতেও ব্যবধানের দরুন ইনি অন্ধকারের বাধা অনুভব করছেন। আমি এক্ষুনি তাঁকে চিন্তামুক্ত করব। না থাক। শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দানে রতা ইন্দ্রজননীর কাছে শুনেছি যজ্ঞভাগ পেতে উৎসুক দেবতারা এমন আয়োজন করবেন যাতে শীগগিরই স্বামী (দুষ্যন্ত) ধর্মপত্নীকে অভিনন্দিত করবেন। তাই সে সময়টুকু অপেক্ষা করাই উচিত। এখন বরং এই সংবাদে প্রিয়সখীকে আশ্বস্ত করি। (উদ্‌ভ্রান্তক নৃত্য করতে করতে প্রস্থান)

নেপথ্যে—ঘোর অন্যায়! ঘোর অন্যায়!

রাজা—(সংজ্ঞালাভ করে, শুনে) সে কি! এ যে মাধব্যেরই আর্তনাদ। কে আছ এখানে?

প্রতিহারী—(প্রবেশ করে সসম্ভ্রমে) বিপন্ন বয়স্যকে রক্ষা করুন।

রাজা—বেচারীর এমন দশা করল কে?

প্রতিহারী—অদৃশ্য কোনো প্রাণী তাঁকে ধরে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—(হঠাৎ উঠে) এ হতে পারে না। আমার গৃহে হানা দিচ্ছে ভৌতিক সত্তা। অথবা—অনবধানতার দরুন প্রতিদিন আমারই যে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে তা জানতে পারছি না, তাই প্রজাদের মধ্যে কে কোন্ পথে চলছে তা সম্পূর্ণ জানবার সামর্থ কোথায়?

নেপথ্যে—হায়! বন্ধু, আমি গেলাম।

রাজা—(শুনে গতিবেগ অভিনয় করে) বন্ধু, ভয় নেই, ভয় নেই।

নেপথ্যে—(ঐ কথার পুনরুক্তি করে) কেন, এতে ভয় পাবো না। এ যে পিছন দিকে ঘাড় মটকে আমাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো ত্রিভঙ্গ করে ফেলছে।

রাজা—(চারদিক দেখে) ধনুক, ধনুক।

যবনী—(ধনুক হাতে প্রবেশ করে) জয় হোক, জয় হোক প্রভুর! এই সে ধনুর্বাণ আর হস্তাবরক।

(রাজার ধনুর্বাণ গ্রহণ)

নেপথ্যে—গলার টাটকা রক্ত পান করতে চেয়ে বাঘ যেমন ছট-ফট করা জানোয়ারকে মারে আমিও তোমাকে তাই করব। আর্তদের ভয় দূর করতে যিনি ধনুক ধারণ করেন সেই দুষ্যন্ত যদি পারেন তোমাকে রক্ষা করুন দেখি।

রাজা—(সরোষে) কী? আমাকে ইঙ্গিত করে কথা বলছে দেখছি। দাঁড়া, দাঁড়া, মড়া-খেকো, তোকে শেষ করছি। (ধনুকে বাণ যোজনা করে) বেত্রবতী! সিঁড়ি পথটা বলে দাও তো আমাকে।

প্রতিহারী—এদিকে, এদিকে আসুন প্রভু।

(সকলে দ্রুত এগিয়ে গেল)

রাজা—(চারদিকে তাকিয়ে) এ কী! সব শূন্য দেখছি যে!

নেপথ্যে—গেলাম, গেলাম। আমি আপনাকে দেখছি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। বিড়ালে-ধরা ইঁদুরের মতো আমি জীবনের আশা ত্যাগ করছি।

রাজা—রে তিরস্করিণী-বিদ্যা-গর্বিত ! আমার অস্ত্র তোমাকে ঠিক দেখতে পাবে। এই আমি সেই বাণ যোজনা করলাম—

যা বধ্য তোমাকে বধ করবে, রক্ষণীয় ব্রাহ্মণকে রক্ষা করবে। হাঁস শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে, দুধে-মেশানো জলটুকু বর্জন করে। (অস্ত্র ধারণ করলেন)

(তারপর মাতলি এবং বিদূষকের প্রবেশ)

মাতলি—আয়ুষ্মন্ !

ইন্দ্র দানবদের আপনার বাণের লক্ষ্যস্থল করেছেন। তাই তাদের দিকেই আপনার ধনুক আকর্ষণ করুন। যাঁরা সজ্জন সুহৃদদের উপর তাঁদের প্রসাদমধুর দৃষ্টিই পড়ে, দারুণ বাণ এসে পড়ে না।

রাজা—(সসম্ভ্রমে অস্ত্র সংবরণ করে) একি মাতলি যে ! মহেন্দ্রসারথি, আপনার শুভাগমন হোক।

বিদূষক—আমাকে যিনি যজ্ঞের পশুর মতো মেরেই ফেলছিলেন তাঁকেই কিনা ইনি জানাচ্ছেন স্বাগত সম্ভাষণ।

মাতলি—(সহাস্যে) আয়ুষ্মন্, শুনুন যেজন্যে ইন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রাজা—শুনছি বলুন।

মাতলি—কালনেমির বংশে জাত 'দুর্জয়' নামে এক দানব-দল আছে।

রাজা—তা আছে। আমি আগে নারদের কাছে শুনেছি।

মাতলি—আপনার সখা ইন্দ্র তাদের জয় করতে পারছেন না, তাই তিনি আপনাকে তাদের নিহন্তারূপে স্মরণ করেছেন সংগ্রামের সম্মুখভাগে। সূর্য যা উচ্ছেদ করতে পারে না রাত্রির সেই অন্ধকারকে দূর করে চন্দ্র। তাই আপনি এখন অস্ত্রগ্রহণ করে ইন্দ্ররথে আরোহণ করে বিজয়যাত্রা করুন।

রাজা—ইন্দ্রের এই সম্মাননায় আমি অনুগৃহীত হলাম। কিন্তু মাধব্যের উপরে আপনার এই আচরণ কেন শুনি ?

মাতলি—(সহাস্যে) তাও বলছি। কোনো কারণে মনস্তাপে আপনাকে অবসন্ন দেখলাম। তাই আপনাকে একটু রাগিয়ে তোলবার জন্যেই আমার ঐ আচরণ। কারণ—ইন্ধনকে নাড়া দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, সাপকে খোঁচা দিলে ফণা তোলে, লোকে কোনো ক্রোধ বা ক্ষোভেই নিজের মহিমাকে ফিরে পায়।

রাজা—(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য ! ইন্দ্রের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই যাও, সমস্ত সংবাদ দিয়ে আমার কথায় অমাত্য পিশুনকে বল—এখন শুধু তোমার বুদ্ধি প্রজাপালন করুন, আমার এই ধনুক এখন অন্য কাজে ব্যাপৃত।

বিদূষক—আপনি যে আদেশ করেন। (প্রস্থান)

মাতলি—আয়ুষ্মন্ ? রথে আরোহণ করুন। (রাজা রথারোহণ অভিনয় করলেন)

(সকলের প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত ॥

সপ্তম অংক

(তারপর আকাশ-পথে রথারূঢ় রাজা ও মাতলির প্রবেশ)

রাজা—মাতলি, মহেন্দ্রের নির্দেশ আমি পালন করেছি কিন্তু যে-সম্মান উনি আমাকে দিয়েছেন আমি নিজেকে তার অযোগ্য বলে মনে করি।

মাতলি—(সহাস্যে) আয়ুষ্মন্ ! উভয় ক্ষেত্রেই এই অসন্তোষ জানবেন। কারণ, যে-সম্মান তিনি দেখিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা করে আপনি যেমন মহেন্দ্রের জন্যে আপনার এই শ্রেষ্ঠ উপকারকে তুচ্ছ বলে মনে করেছেন, তেমনি তিনিও আপনার এই অবদানের গুরুত্বে বিস্মিত হয়ে যে-সম্মানটুকু দেখিয়েছেন তাকেও ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না।

রাজা—মাতলি। এ-কথা বলবেন না। বিদায় নেবার সময় তিনি যে-সমাদর দেখিয়েছেন তা আমার কল্পনার অতীত। কারণ, আমাকে দেবতাদের সম্মুখে অর্ধাসনে বসিয়ে, কাছেই-দাঁড়ানো জয়ন্তের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেও একটু হেসে নিজের বুকে-দোলানো হরিচন্দনে-চর্চিত মন্দার-মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে পরিয়ে দিলেন।

মাতলি—সুরপতির কাছে আপনার অপ্রাপ্য কী আছে। দেখুন—

প্রাচীনকালে নৃসিংহের নখ, আর বর্তমানে কুটিল-গ্রন্থি আপনার বাণ—এই দুটোই সুখাসক্ত ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য থেকে দানব-কণ্টক উৎখাত করেছে।

রাজা—এ-ব্যাপারেও মহেন্দ্রের মহিমাই স্তুতির যোগ্য। মহৎকর্মে অনুচরদের যে সাফল্য তাকে নিযোক্তার গুণগ্রাহিতা-গুণ বলেই ধরুন। সহস্ররশ্মি সূর্য যদি অরুণকে সম্মুখে না রাখতেন তাহলে তিনি কি অন্ধকার দূর করতে পারতেন ?

মাতলি—আপনার যোগ্য উত্তরই বটে।

(আর একটু নিচে নেমে) আয়ুষ্মন্, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আপনার যশোভাগ্যকে এদিকে দেখুন। দেবতারা গানের উপযুক্ত পদ রচনা করে সুরসুন্দরীদের অঙ্গরাগের বিশিষ্ট বর্ণ দিয়ে কল্পলতার বসনে আপনার চরিতকথা লিখছেন।

রাজা—মাতলি ! গতকাল অসুর-সংগ্রামে উৎসুক ছিলাম বলে স্বর্গে আরোহণের সময় এই অঞ্চলটি লক্ষ্য করি নি। বলুন তো কোন্ বায়ুস্তরে আমরা এখন আছি ?

মাতলি—যা গগনগতা-গঙ্গাকে ধারণ করেছে, যা রশ্মিধারাকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে জ্যোতিষ্কদের আবর্তিত করছে, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপে পবিত্র রজোহীন এই সেই 'প্রবহ' নামে বায়ু মার্গ।

রাজা—মাতলি, এই জন্যেই বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় সহ আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। (রথের চাকার দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছে আমরা মেঘলোকে অবতীর্ণ হয়েছি।

মাতলি—আয়ুষ্মন্, কী করে বোঝা গেল ?

রাজা—চাকার শলাকাগুলোর ফাঁক দিয়ে চাতকেরা নির্গত হচ্ছে, বিদ্যুৎপ্রভায় রাঙা হয়েছে ঘোড়াগুলো, রথের চাকার পরিধিতে লগ্ন হয়েছে জলকণা এ সব বলে দিচ্ছে এখন জলগর্ভ মেঘের উপর দিয়ে আমরা চলেছি।

মাতলি—হাঁ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি নেমে আসবেন সেই ভূমিতে যার অধিকারী স্বয়ং আপনি।

রাজা—(নিচে তাকিয়ে) মাতলি, বেগে অবতরণ করায় আশ্চর্য দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। দেখুন—পাহাড়গুলো যেন উঁচুর দিকে উঠে আসছে আর তাদের চূড়া থেকে পৃথিবী যেন নিচে নামছে। গাছগুলোর মূল ও কাণ্ড দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তারা যেন পত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর ক্ষীণতার জন্যে যে-সব নদীর জল ছিল অদৃশ্য তা এখন কাছে আসায় আবার বিস্তৃত রূপ নিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন সমগ্র পৃথিবীকে উঁচু দিকে ছুঁড়ে আমার পাশে আনছে।

মাতলি—আয়ুষ্মন্! সুন্দর আপনার পর্যবেক্ষণ। (সপ্রশংসভাবে দেখে) আহা, কী বিপুল এবং কী রমণীয় এই পৃথিবী।

রাজা—মাতলি। ওটা কোন্ পর্বত যা পূর্ব-সাগর থেকে পশ্চিম-সাগরে মগ্ন, যা দেখতে তরল-সোনা-ঝরানো সান্ধ্য-মেঘের প্রাকারের মতো ?

মাতলি—আয়ুষ্মন্! এ হল হেমকূট নামে কিন্নর-পর্বত, তপস্বীদের পরম সিদ্ধিক্ষেত্র। দেখুন, মরীচিপুত্র প্রজাপতি, যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র এবং যিনি স্বয়ং দেব ও দানবের পিতা তিনি এখানে পত্নী (অদিতি)-কে নিয়ে তপস্যায় নিরত।

রাজা—(সাদরে) তাহলে শ্রেয় লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি—আয়ুষ্মন্! উত্তম প্রস্তাব। (দুজনের অবতরণের অভিনয়)

রাজা—(সবিস্ময়ে) মাতলি !

রথের চাকার প্রান্ত কোনো শব্দ তোলে নি, ধুলোও উঠতে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ মাটি স্পর্শ করে নি বলে উদ্ঘাতশূন্য আপনার রথ যে অবতীর্ণ হয়েছে তা যেন বোঝাই যাচ্ছে না।

মাতলি—শতক্রতু আর আপনার মধ্যে শুধু এইটুকুই যা তফাত।

রাজা—মাতলি, কোন্ অংশে মারীচাশ্রম ?

মাতলি—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) দেখুন—

এই যেখানে সেই ঋষি রয়েছেন বল্মীকে যাঁর দেহ অর্ধনিমগ্ন, সর্প-ত্বকে যাঁর বক্ষোদেশ আশ্লিষ্ট, জীর্ণ লতাপত্র-বলয়ে যাঁর কণ্ঠ বেষ্টিত, বিহঙ্গনীড়ে যাঁর স্কন্ধ আকীর্ণ, জটামণ্ডলধারী যিনি স্থাণুর মতো স্থির, সূর্যমণ্ডলে যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

রাজা—(দর্শন করে) এই কৃচ্ছ্রসাধককে নমস্কার।

মাতলি—(রথরশ্মি সংযত করে) এই আমরা দুজন প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করলাম, স্বয়ং অদিতি যেখানে মন্দারতরুকে পরিবর্ধিত করেছেন।

রাজা—সত্যি জায়গাটি স্বর্গের চেয়েও সুখের। অমৃতসাগরে যেন ডুব দিয়েছি।

মাতলি—(রথ থামিয়ে) অবতরণ করুন, আয়ুষ্মন্ !

রাজা—(অবতরণ করে) মাতলি, এখন কী করবেন ?

মাতলি—সংকেত করা মাত্র রথ এখানে থেমেছে। আসুন আমরাও নামি। (অবতরণ করে) এই দিকে আসুন, আয়ুষ্মন্। (পরিক্রমা করে) পূজনীয় ঋষিদের তপোবনভূমি দেখুন।

রাজা—আমি বিস্ময় নিয়ে দেখছি। কারণ—

কল্পতরু বনে এঁরা শুধু বায়ুভক্ষণে জীবন-যাপন করেন, পদ্মরেণু-পিঙ্গল জলে এঁরা পুণ্যস্নান করেন, রত্নশিলাগৃহে এঁরা ধ্যান করেন, সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে

থেকেও এ'রা সংযমী, অন্য মুনি তপোবনে যে-সব চেয়ে থাকেন (তার প্রতি উদাসীন হয়ে) তার মধ্যেই এ'রা তপস্যা করছেন।

মাতলি—মহতের প্রার্থনা ঊর্ধ্বচারিণী। (পরিক্রমা করে, আকাশে) শুনুন, বর্ষীয়ান সাকল্য, পূজ্যপাদ মারীচ এখন কী করছেন ? (যেন শুনতে পেলেন এইভাবে) কী বলছেন ? দাক্ষায়ণী তাঁকে পতিব্রতা-ধর্মবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করায় তিনি তা বলছেন, অন্যান্য মহর্ষিপত্নীরাও তাঁর (দাক্ষায়ণীর) সঙ্গে আছেন।

রাজা—(শুনে) প্রসঙ্গটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মাতলি—(রাজাকে দেখে) আপনি এই অশোকতরুর মূলে অপেক্ষা করুন, ততক্ষণে আমি ইন্দ্রপিতা কশ্যপকে আপনার কথা বলবার সুযোগ খুঁজি।

রাজা—আপনি যা ভালো বোঝেন।

(রাজার অবস্থান। মাতলির প্রস্থান)

রাজা—(লক্ষণ সূচনা করে) এখানে আমার মনোবাসনা পূরণের কোনো অবকাশই নেই। তাই হে বায়ু, এখানে কেন বৃথা স্পন্দিত হচ্ছ। পূবে যে শ্রেয় অবহেলিত হয় তা দুঃখে রূপ নেয়।

(নেপথ্যে)—না, না, দুষ্টুমি করিস না। কী, আবার তুই যে-কে-সেই !

রাজা—(শুনে) এ তো অশিষ্ট আচরণের জায়গাই নয়। এখানে তবে এভাবে কাকে মানা করা হচ্ছে ?

(শব্দ-অনুসরণ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবিস্ময়ে)

কী আশ্চর্য ! কে এই বালক, দুজন তাপসী যার পিছু পিছু আসছে ?
সাধারণ বালকে যা অকল্পনীয় তেমনি এর শক্তি !
মায়ের স্তন অর্ধেকটা পান করছে এমনি-একটা সিংহশিশুকে খেলাচ্ছলে সবলে আকর্ষণ করছে, যার কেশর মর্দিত হওয়াতে বিপর্যস্ত হয়েছে।

(তারপর যথাবর্ণিত বালকের প্রবেশ, সঙ্গে দুজন তাপসী)

বালক—ওরে সিংহের বাচ্চা, হাঁ কর দেখি, তোর দাঁতগুলো গুণব।

প্রথমা—ওরে দুষ্টু ! যাদের আমরা নিজের সন্তানের মতো দেখি সেই জন্তু-জানোয়ারদের উপর অত্যাচার করিস কেন ? ও মা ! তোর দুরন্তপনা যে আরও বাড়ল দেখি ! ঋষিরা যে তোকে 'সর্বদমন' নাম দিয়েছেন, তা ঠিকই দিয়েছেন।

রাজা—এ কি ! এই বালকের উপর আমার মন নিজের ছেলের উপর ঠিক যেমনটি হয়, তেমনি স্নেহে ভরে উঠছে কেন ? আমার অপুত্রকতাই নিশ্চয় আমাকে স্নেহশীল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়া—যদি বাচ্চাটাকে না ছাড়িস এ-সিংহী কিন্তু তোকে আক্রমণ করবে।

বালক—বাব্বা ! খুব ভয় পেয়ে গেছি, যা হোক ! (এই বলে ঠোঁট দেখাল)

রাজা—(সবিস্ময়ে) মনে হচ্ছে বালকটি এক মহাতেজের অঙ্কুর। অগ্নি যেন স্ফুলিঙ্গরূপে ইন্ধনের অপেক্ষায় আছে।

প্রথমা—বাছা ! এই সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দে। তোকে অন্য আরেকটা খেলনা দেব।

বালক—কোথায়। দাও দেখি। (এই বলে হাত বাড়ালো)

(বালকের হাত দেখে)

রাজা—এ কি ! এর হাতে যে চক্রবর্তিলক্ষণ দেখছি।

লোভনীয় বস্তু পাবার আশায় লব্ধ হাত প্রসারিত করেছে, হাতের আঙুলগুলো পরস্পর জালের মতো জড়ানো, দেখে মনে হচ্ছে এ-যেন তরুণ ঊষার প্রস্ফুটিত পদ্ম যার পাপড়ির বিভাগগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয়া—সুপ্রভাত! শুধু কথায় ওকে ভোলানো যাবে না। তুই যা আমার কুটিরে, ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রং-দেওয়া মাটির ময়ূর আছে। ওটা নিয়ে এসে ওকে দে।

প্রথমা—নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

বালক—ততক্ষণ একে নিয়েই খেলব। (এই বলে তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল)

রাজা—এই দুরন্ত বালকটি কিন্তু আমার মন কেড়ে নিয়েছে। (নিঃশ্বাস ফেলে) যাদের দন্তমুকুল অল্প-অল্প দেখা যায়, বিনা কারণেই যারা হাসে, অস্ফুট বর্ণে যাদের কথাগুলো মধুবর্ষণ করে, যারা কোল পেয়ে খুশি এমন সন্তানদের বহন করে, তাদের অঙ্গের ধুলোতে যারা মলিন হয় তারাই ধন্য।

তাপসী—(তর্জনী দেখিয়ে) আমাকে মানছিস না। (পাশে তাকিয়ে) ঋষিকুমারদের মধ্যে কে এখানে আছে? (রাজাকে দেখে) ভদ্রমুখ, আসুন, এই নাছোড়বান্দা ছেলেটার হাত থেকে সিংহশিশুটিকে মুক্ত করে দিন তো। খেলাচ্ছলে ও বেচারাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।

রাজা—(এগিয়ে গিয়ে সহাস্যে) হে মহর্ষিতনয়, শিশু কৃষ্ণসর্প যেমন চন্দনতরুকে দূষিত করে, আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণে তুমি কেন তেমনি তোমার সংযমসাধক সত্ত্বগুণান্বিত পিতাকে কলঙ্কিত করছ?

তাপসী—ভদ্রমুখ! এ ঋষি-কুমার নয়।

রাজা—আকৃতির অনুরূপ আচরণই তা বলে দিচ্ছে। এই স্থানটিকে মনে রেখেই আমি এ রকম ভেবেছিলাম।

(অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে গিয়ে বালকটিকে স্পর্শ করে মনে মনে) অজানা কোনো বংশের এই অঙ্কুরটিকে স্পর্শ করেই যদি আমার দেহে এমন সুখ অনুভূত হয় তাহলে সেই ভাগ্যবান যাঁর অঙ্গ থেকে এ-উদ্ভূত (একে স্পর্শ করলে) তার মন ভরে উঠবে কী গভীর পরিতৃপ্তিতে!

তাপসী—(দুজনকে দেখে) আশ্চর্য! আশ্চর্য!

রাজা—আর্যে! ব্যাপার কী বলুন তো?

তাপসী—হে ভদ্রমুখ! যদিও আপনারা অসম্পর্কিত তবুও আপনার চেহারার সঙ্গে এর চেহারার মিল দেখে বিস্মিত হয়েছি। স্বভাবত দুরন্ত হলেও অপরিচিত আপনার কাছে কিন্তু এ শান্ত হল দেখছি।

রাজা—(বালককে আদর করে) আর্যে! যদি এ মুনি-কুমার না হয়, তাহলে এ কোন্ বংশের?

তাপসী—পুরুবংশের।

রাজা—(মনে মনে) সে কি! আমারই বংশ দেখছি। এইজন্যেই বোধহয় ইনি আমার আকৃতির অনুসারী বলে একে মনে করেছেন।

(প্রকাশ্যে) পুরুবংশীয়দের শেষ বয়সে এই আচারটিই কৌলিক প্রথা।

যারা পৃথিবী রক্ষার জন্যে বিষয়রসে-পূর্ণ সংসারে বাস করে, পরে (পরিণত বয়সে) তরুমূলই তাদের গৃহ হয়ে ওঠে, যেখানে তপশ্চারণের একই ব্রত

কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়।

কিন্তু নিজেদের শক্তিতে মানুষ এই পবিত্র স্থানে আসতে পারে না।

তাপসী—যা বললেন তা ঠিকই। অপ্সরা-সম্বন্ধেই এই বালকের জননী এই দেবগুরুর তপোবনে একে প্রসব করেছেন।

রাজা—(মনে মনে) কী সৌভাগ্য ! এ হল দ্বিতীয় আশার জনক।

(প্রকাশ্যে) কোন্ রাজর্ষির পত্নী ইনি ?

তাপসী—কে সেই ধর্মপত্নী পরিত্যাগীর নাম উচ্চারণ করবে ?

রাজা—(মনে মনে) এ-কথার লক্ষ্যও তো আমি। (চিন্তা করে) আচ্ছা যদি এই শিশুর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি। না, থাক। পরদারের সম্বন্ধে যে-কোনো জিজ্ঞাসাই অভদ্রোচিত।

(মাটির ময়ূর হাতে নিয়ে, প্রবেশ করে)

তাপসী—সর্বদমন, শকুন্তের (পাখির) লাবণ্য দেখ।

বালক—(তাকিয়ে) কোথায় মা ?

(দুজনের হাসি)

প্রথমা—নামসাদৃশ্যে বঞ্চিত হল মাতৃবৎসল বালক।

দ্বিতীয়া—বাছা, এই মাটির ময়ূরের লাবণ্য দেখ এ-কথা বলা হয়েছে তোকে।

রাজা—(মনে মনে) শকুন্তলা কি এর মায়ের নাম ? না কি, নাম তো এক রকম হয়ই। এর নামোল্লেখ ব্যাপারটি মরীচিকার মতো বিপদের কারণ হবে না এমন আশা করব কি ?

বালক—ময়ূরটা আমার ভালো লেগেছে, দিদি। (খেলনা নিল)

প্রথমা—(লক্ষ্য করে সোদ্বেগে) এ কি ! এর মণিবন্ধে রক্ষাকবচটা তো দেখছি না।

রাজা—আর্যে ! চিন্তিত হবেন না। সিংহশিশুকে নিয়ে টানাটানি করার সময় খুলে পড়েছে। (তুলতে গেলেন)

দুজনে—ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। ছুঁলে—! উনি দেখছি তুলে নিয়েছেন ওটি।

(বিস্ময়ে বুকে হাত দিয়ে একে অন্যের দিকে চাইতে লাগল)

রাজা—আমাকে নিষেধ করছেন কেন ?

প্রথমা—শুনুন মহারাজ ! ‘অপরাজিতা’ নামে এই মহাপ্রভাব স্বর্গীয় মহৌষধিটি এই বালকের জাতকর্মের সময়ে ভগবান মারীচ দিয়েছেন। মাটিতে পড়ে গেলে নিজে বা বাবা-মা ছাড়া অন্য কেউ এটা তুলতে পারবে না।

রাজা—যদি তোলে ?

প্রথমা—তাহলে সাপ হয়ে কামড়ায়।

রাজা—আপনারা কখনও ঔষধিটির এই রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন ?

দুজনে—অনেকবার।

রাজা—(সানন্দে মনে মনে) তবে ? এখনও কি আমি আমার পূর্ণ মনোবাসনাকে অভিনন্দন জানাব না ? (এই বলে বালককে আলিঙ্গন করলেন)

দ্বিতীয়া—সুব্রতা ! আয়। এই ঘটনাটা তপশ্চারিণী শকুন্তলাকে গিয়ে বলি। (প্রস্থান)

বালক—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। মার কাছে যাব আমি।

রাজা—পুত্র ! আমার সঙ্গেই তুমি মাকে অভিনন্দন জানাবে।

বালক—আমার বাবা দুষ্যন্ত, তুমি নও।

রাজা—(সহাস্যে মনে মনে) এই বিষাদ আমার প্রত্যয়কে আরও জোরালো করে দিল।

(তারপর একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—(চিন্তিতভাবে) সর্বদমনের ঔষধি বিকার-কালেও অবিকৃত রইল, এ-কথা শুনেও আমি নিজের ভাগ্যের বিষয়ে আশা পোষণ করি নি। অথবা, সানুমতী যা বলছে, তাতে এ সম্ভবও হতে পারে।

(পরিক্রমা করলেন)

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে আনন্দমিশ্রিত দুঃখে) এই সেই শকুন্তলা।

শুদ্ধচরিত্রা যিনি ধূলিমলিন বসন পরিধান করে তপশ্চারণে তীক্ষ্ণমুখী একবেণী ধারণ করে নির্দয় আমার বিরহ-ব্রত উদ্‌যাপন করছেন।

শকুন্তলা—(পশ্চাত্তাপে বিবর্ণ রাজাকে দেখে চিন্তিত হয়ে) ইনি তো আমার আর্যপুত্রের মতো নন। তাহলে কে আমার মঙ্গলকবচে সুরক্ষিত সন্তানকে তাঁর দেহের স্পর্শে কলুষিত করেছেন ?

বালক—(মায়ের কাছে এসে) মা! দেখ তো কে একজন আমাকে পুত্র বলে ডেকে আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করছেন ?

রাজা—আমি তোমার উপর নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি তাও পরিণামে অনুকূল হল। তাই এখন আমি চাই তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ এই স্বীকৃতিটুকু—

শকুন্তলা—(মনে মনে) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আমার নিয়তি আমাকে আঘাত করেছিলেন, এখন তিনি হিংসা পরিত্যাগ করে আমার উপর অনুকম্পা করেছেন। ইনি আর্যপুত্রই বটে।

রাজা—প্রিয়ে, কী সৌভাগ্য! তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ, আর স্মৃতি ঘিরে আমার মোহের অন্ধকার দূর হয়েছে। হে সুন্দরী! গ্রহণের পর রোহিণী (মিলন-প্রার্থনায়) চন্দ্রের কাছে এসেছে।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের জয় হোক!

(এইটুকু বলেই বিরত হলেন, বাষ্পস্তম্ভিত হল তাঁর কণ্ঠ)

রাজা—সুন্দরী! অশ্রু এসে জয় শব্দ উচ্চারণে বাধা দিলেও আমি জয়ী হয়েছি। কারণ, প্রসাধন না থাকলেও রক্তিম তোমার এমন ওষ্ঠপুট আমি দেখতে পেলাম।

বালক—ও কে, মা ?

শকুন্তলা—বাছা, তোর ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)

রাজা—সুতনু! তোমার হৃদয় থেকে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ দূর হোক। সেই সময়ে মনে কী একটা মোহ দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। যারা প্রবল অন্ধকারে গ্রস্ত, শুভ বিষয়ের প্রতি তাদের আচরণ এমনই হয়। মাথায় মালা দিলেও অন্ধ সাপ ভেবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। (এই বলে পায়ে পড়লেন)

শকুন্তলা—উঠুন আর্যপুত্র, উঠুন।

নিশ্চয় শুভপ্রতিবন্ধক আমারই কোনো পূর্বজন্মকৃত পাপ সেইসব দিনগুলিতে পরিণামমুখী হয়েছিল, তাই করুণার্দ্র হয়েও আর্যপুত্র আমার প্রতি ঐ রকম হয়ে গেলেন।

(রাজা উঠলেন)

শকুন্তলা—এই হতভাগীকে আর্যপুত্রের মনে পড়ল কেমন করে ?

রাজা—আমি বিষাদ-শল্য উন্মূলিত করি তারপর বলব।

সুতনু ! সেই সময়ে মোহবশতঃ যে অশ্রুবিন্দু তোমার অধরকে পীড়িত করেছিল তাকে আমি উপেক্ষা করেছিলাম। হে সুন্দরী, আজ তোমার কুঞ্চিত পক্ষ্মলগ্ন সেই অশ্রুবিন্দু মার্জনা করে আমি অনুতাপহীন হব।

(এই বলে তাই করলেন, অর্থাৎ অশ্রুমার্জনা করলেন)

শকুন্তলা—(অশ্রুমার্জনার পর আংটি দেখে) আর্যপুত্র ! এই সেই আংটি।

রাজা—হাঁ, অদ্ভুতভাবে এটি পাওয়ায় আমার স্মৃতি ফিরে এসেছিল।

শকুন্তলা—আর একে বিশ্বাস করি না। আর্যপুত্র এটি ধারণ করুন।

(তারপর মাতলির প্রবেশ)

মাতলি—সৌভাগ্যবশতঃ ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলন এবং পুত্রমুখ দর্শনে আয়ুষ্মন্ অভ্যুদয় লাভ করেছেন।

রাজা—আমার বাসনার স্বাদু ফল ফলেছে। মাতলি ! মহেন্দ্র এ সব বিষয়ের কিছু জানেন না কি ?

মাতলি—(সহাস্যে) যাঁরা সর্বজ্ঞ কোনটি তাঁদের অগোচর। আসুন আয়ুষ্মন্ ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা—প্রিয়ে ! পুত্রকে নাও। তোমাকে সামনে রেখে আমি মহর্ষিকে দর্শন করতে চাই।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের কাছে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

রাজা—শুভ মুহূর্তে এ-আচরণে দোষ নেই, এসো। (সকলের পরিক্রমণ)

(তারপর অদিতির সঙ্গে আসনস্থ মারীচের প্রবেশ)

মারীচ—(রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণী !

তোমার পুত্রের (ইন্দ্রের) সংগ্রামে ইনিই অগ্রগামী, পৃথিবীপতি ইনি দুষ্যন্ত নামে অভিহিত যাঁর ধনুকের শক্তিতে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে বলে ইন্দ্রের তীক্ষ্ণাগ্র বজ্রাস্ত্রটি অলঙ্কার মাত্র হয়ে আছে।

অদিতি—এঁর আকৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইনি প্রভাববান।

মাতলি—আয়ুষ্মন্। দেবতাদের জনক ও জননী দুজনই বাৎসল্যসূচক দৃষ্টিতে আপনার দিকে চেয়ে আছেন। আপনি এগিয়ে আসুন।

রাজা—মাতলি ! এই কি সেই দক্ষ ও মরীচিসম্ভূত দম্পতি, যাঁদের মুনিরা দ্বাদশরূপে অবস্থিত তেজের (সূর্যের) কারণ বলেন, যাঁরা ত্রিভুবনপতি এবং যজ্ঞভাগেশ্বরের (ইন্দ্রের) জন্ম দিয়েছেন, পরম পুরুষ স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু জন্মের জন্যে যাঁদের আশ্রয় করেছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মার থেকে এক পুরুষের ব্যবধানে বর্তমান ?

মাতলি—হাঁ !

রাজা—(প্রণাম করে) আপনাদের দুজনকে মহেন্দ্রের ভৃত্য দুষ্যন্ত প্রণাম করছে।

মারীচ—বৎস ! দীর্ঘজীবী হয়ে পৃথিবী পালন কর।

অদিতি—বৎস ! অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও। (শকুন্তলা পুত্রকে নিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন)

মারীচ—বৎসে ! ইন্দ্রের মতো তোমার স্বামী, জয়ন্তের মতো তোমার পুত্র। অন্য আশীর্বাদ আর কী দেব ? পৌলমীর মতো মঙ্গলময়ী হও।

অদিতি—বৎসে ! স্বামীর বহু সমাদর লাভ কর। আর ঐ সন্তানও উভয় কুলের আনন্দ

বর্ধন করুক এবং দীর্ঘায়ু হোক। বসো তোমরা।

(সবাই প্রজাপতির সামনে উপবেশন করলেন)

মারীচ—(এক এক করে লক্ষ্য করে) সৌভাগ্যক্রমে সাধ্বী শকুন্তলা, এই মহান পুত্র এবং তুমি একত্রিত হয়েছ—এ যেন শ্রদ্ধা, বিত্ত আর বিধি এই তিনের সম্মেলন।

রাজা—ভগবন্ ! প্রথমে অভিপ্রায়-সিদ্ধি, পরে দর্শন, আপনার অনুগ্রহ সত্যিই অপূর্ব। কারণ—

আগে ফুল দেখা দেয়, তারপর ফল ; আগে মেঘসঞ্চার, তারপর বর্ষণ, নিমিত্ত নৈমিত্তিকের এই তো ক্রম, কিন্তু আপনার অনুগ্রহের আগেই (এ-ক্ষেত্রে) সম্পদলাভ হল।

মাতলি—আয়ুষ্মন্ ! এইভাবেই স্রষ্টা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

রাজা—ভগবন্ ! আপনাদের এই আজ্ঞাকারিণীকে (দাসীকে) আমি গান্ধর্ববিধিতে বিবাহ করার কিছুকাল পরে বন্ধুবর্গ-উপনীতা এঁকে (শকুন্তলাকে) স্মৃতি-শৈথিল্যবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে আপনাদের সমগোত্রীয় পূজ্যপাদ কণ্বের কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। পরে অঙ্গুরীয়দর্শনে সমস্ত স্মরণ হওয়ায় এঁকে পূর্ব-পরিণীতা বলে জানলাম। এ-সব আমার কাছে বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে।

যখন হাতিটি চোখের সামনে ছিল তখন সে নেই বলে মনে করলাম, সে চলে যাওয়ার পর সংশয় হল। পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হলাম (তবে সত্যিই হাতিটি এসেছিল)। ঐরকমই আমার মনের বিকার হয়েছিল।

মারীচ—বৎস ! অপরাধ-চিন্তা কোরো না। তোমার মোহ অকারণে আসে নি। শোনো—

রাজা—আমি একাগ্র মনে শুনছি।

মারীচ—অপ্সরা-তীর্থে অবতরণের পর শকুন্তলার দুর্ভাগ্য প্রত্যক্ষ হলে মেনকা যখনই তাকে দাক্ষায়ণীর কাছে নিয়ে এল, তখনই ধ্যানে জানলাম তোমার তপস্বিনী-সহধর্মচারিণীকে তুমি দুর্বাসার শাপেই প্রত্যাখ্যান করেছ, অন্য কারণে নয়। (এবং এও জানলাম) সেই শাপের অবসান ঘটবে অঙ্গুরীয়দর্শনে।

রাজা—(স্বোচ্ছ্বাসে) এইবার আমি নিন্দামুক্ত হলাম।

শকুন্তলা—(মনে মনে) সৌভাগ্যবশতঃ আর্যপুত্র তাহলে অকারণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। আমি কখন অভিশপ্ত হলাম আমার মনে পড়ে না। অথবা, বিরহশূন্য হৃদয়ে আ সে শাপ শুনতেই পাই নি। কারণ সখীরা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিল—'রাজা যদি তোকে স্মরণ করতে না পারেন তবে তাঁকে এই আংটি দেখাবি।'

মারীচ—(শকুন্তলাকে দেখে) বৎসে ! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই এখন তোমার সহধর্মচারীর (স্বামীর) উপর আর ক্ষোভ রেখো না। শাপের জন্যেই স্মৃতিরোধে-রুক্ষ স্বামীর কাছে তুমি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলে। মোহ-অন্ধকার দূর হওয়ায় এখন স্বামীতে তোমারই প্রভুত্ব।

দর্পণ ধূলিমলিন হলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, মালিন্য দূর হলেই তাতে প্রতিবিম্বের অবকাশ।

রাজা—আপনি যথাযথই বলেছেন।

মারীচ—বৎস ! যার জাতকর্মাদি ক্রিয়া আমরা বিধিমতো সম্পন্ন করেছি শকুন্তলাজাত তোমার সেই পুত্রকে তুমি অভিনন্দিত করেছ তো ?

রাজা—ভগবন্ ! ওতেই তো আমার বংশের প্রতিষ্ঠা।

মারীচ—তুমি জেনো, ভবিষ্যতে এ একচ্ছত্র অধিপতিও হবে।

দেখ—

তোমার এই সন্তান প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে অপ্রতিহতভাবে স্থিরগতি রথে অধিরূঢ় হয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে সপ্তদ্বীপা-পৃথিবীকে জয় করবে। এখানে সবলে সমস্ত জন্তুকে দমন করায় 'সর্বদমন', জগতের ভরণ করে আবার 'ভরত' আখ্যা পাবে।

রাজা—ভগবন্ আপনি যখন জাতকর্ম ক্রিয়া করেছেন তখন সবকিছুই ওতে আশা করি।

অদিতি—ভগবন্ ! এই দুহিতার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে সে-সংবাদ বিস্তারিতভাবে কণ্বকে জানানো হোক। কন্যাবৎসলা মেনকা অবশ্য এখানে কাছেই আছে।

মারীচ—তপঃপ্রভাবে তাঁর সমস্তই প্রত্যক্ষ।

রাজা—এই জন্যেই মুনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হন নি।

মারীচ—তবু এই প্রিয়সংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো উচিত।

এখানে কে কে আছে ?

শিষ্য—(প্রবেশ করে) ভগবন্ ! এই যে আমি।

মারীচ—গালব। এখুনি আকাশপথে গিয়ে আমার কথায় মাননীয় কণ্বকে এই প্রিয়সংবাদ দাও যে শাপের নিবৃত্তির পর সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরে পেয়ে দুষ্যন্ত পুত্রবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য—আপনি যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

মারীচ—বৎস ! তুমিও পত্নী ও পুত্র নিয়ে সখা ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে রাজধানীতে প্রবেশ কর।

রাজা—(প্রণাম করে) ভগবন্ যা আদেশ করেন।

মারীচ—আর,

তোমাদের প্রজাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টিদান করুন। তুমি ব্যাপক যজ্ঞসম্পাদনে দেবতাদের তুষ্ট কর। এইভাবে শত যুগ ধরে উভয় লোকের প্রশংসনীয় পারস্পরিক কর্তব্য পালন করে বিজয়ী হও।

রাজা—ভগবন্ ! আমি যথাসাধ্য মঙ্গলাচারণের চেষ্টা করব।

মারীচ—বৎস ! আর কোন্ প্রিয় উপহার দিতে পারি ?

রাজা—(যা পেয়েছি) এর চেয়েও প্রিয়তর কিছু আছে না কি ? (যদি থাকে) তবে যেন তাই হয়।

(ভরতবাক্য)

রাজা প্রজাদের মঙ্গলে প্রবর্তিত হোন, বেদে যাঁরা মহান বলে কীর্তিত তাঁদের বাণী সম্মানিত হোক। আর সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু নীললোহিত সেই দেবতা আমার পুনর্জন্ম নাশ করুন। (সকলের প্রস্থান)

॥ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক সমাপ্ত ॥

মালবিকাগ্নিমিত্র

কুশীলব

অগ্নিমিত্র	—	নায়ক, বিদিশার রাজা
মালবিকা	—	নায়িকা, বিদর্ভের রাজকুমারী
ধারিণী	—	অগ্নিমিত্রের পাটরানী
ইরাবতী	—	অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয়া রানী
পরিব্রাজিকা	—	মাধবসেনের অমাত্য সুমতির ভগিনী
(পণ্ডিতকৌশিকী)	—	(বিদর্ভদেশ থেকে আগতা)
আর্য গৌতম	—	অগ্নিমিত্রের বিদূষক
মৌদ্‌গল্য	—	অগ্নিমিত্রের কঞ্চুকী
বাহতক	—	অগ্নিমিত্রের মন্ত্রী
গণদাস } হরদত্ত }	—	দুই নাট্যাচার্য
জয়সেনা	—	প্রতিহারী
কৌমুদিকা	—	চেটী
বকুলাবলিকা	—	চেটী, মালবিকার সখী
নিপুণিকা	—	ইরাবতীর চেটী
মধুকরিকা	—	প্রমোদবনের উদ্যানপালিকা
সমাভৃতিকা	—	চেটী
মদনিকা	—	চেটী
জ্যোৎস্নিকা	—	চেটী
সারসক	—	ধারিণীর অন্তঃপুরের কুঁজো পরিচারক
সূত্রধার	—	
পারিপার্শ্বিক		

নেপথ্য-চরিত্র

বীরসেন	—	ধারিণীর ভাই
বসুমিত্র	—	অগ্নিমিত্র ও ধারিণীর পুত্র
মাধবসেন	—	বিদর্ভের দাবী রাজা, মালবিকার অগ্রজ
যজ্ঞসেন	—	মাধবসেনের জ্ঞাতিভাই
চন্দ্রিকা	—	নিপুণিকার চেটী
মাধবিকা	—	পাতালগৃহের দ্বারপালিকা
বৈতালিক	—	

প্রথম অঙ্ক

একমাত্র ঐশ্বর্যগুণে স্থির থাকা সত্ত্বেও যিনি প্রণত ব্যক্তিদের বহু ফল ধান করেন, যিনি
চর্মকেই বসন করেছেন, যাঁর দেহ কান্তাসংযুক্ত কিন্তু তা সত্ত্বেও যিনি বিষয়
(ভোগে)-বিমুখ (সংযমী) ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি আটটি মূর্তিতে
নিখিল জগৎকে ধারণ করেও গর্বশূন্য সেই ঈশ্বর তোমাদের মনের
তামসী-বৃত্তিকে দূর করুন, যাতে তোমরা সত্যের পথকে
(পরিষ্কার) দেখতে পাও।

(নান্দীশেষে)

সূত্রধার—(নেপথ্যগৃহের দিকে তাকিয়ে) মারিষ, এদিকে এসো।

(প্রবেশ করে)

পারিপার্শ্বিক—ভাব, এই যে এসেছি।

সূত্রধার—বিদ্বৎপরিষদ আমাকে বলেছেন আজকের বসন্তোৎসবে কালিদাসের রচনা 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের অনুষ্ঠান করতে হবে। সুতরাং সঙ্গীত শুরু হোক।

পারিপার্শ্বিক—না, না। ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল এই এত সব নামী নামী (কবিদের) রচনাকে বাদ দিয়ে সেদিনের কবি কালিদাসের রচনায় পরিষদের এত আদর হল কেন?

সূত্রধার—এ কী! এ যে বিচারবুদ্ধিহীনের কথা। দেখ—পুরনো হয়েছে বলেই যে সব কাব্যই উৎকৃষ্ট তা নয়, আবার নতুন (লেখা) বলেই সে কবিকর্ম ফেলনা হয় না। সজ্জনেরা পরীক্ষা করেই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেন, যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই পরের ধারণা শুনে চলে।

পারিপার্শ্বিক—আপনার মতই (চূড়ান্ত) প্রমাণ।

সূত্রধার—তাহলে তাড়াতাড়ি কর—
পরিষদের যে আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করেছি তাই পালন করতে চাইছি।
যেমনটি রানীমা ধারিণীর সেবায় পটু এই পরিজনটি (করে চলেছে)।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রস্তাবনা সমাপ্ত ॥

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—রানীমা ধারিণী আজ্ঞা করেছেন আচার্য গণদাসকে জিগ্যেস করতে হবে—সদ্য আরব্ধ

হয়েছে ছলিত-নাচের পাঠ, তাতে মালবিকা কেমন করছে। (পরিক্রমা করছে)

(অলঙ্কার হাতে দ্বিতীয়া চেটীর প্রবেশ)

প্রথমা—(দ্বিতীয়াকে দেখে) সই কৌমুদিকা, বলি এত কিসের গভীর ব্যাপার যে পাশ কাটিয়ে গেলেও আমাকে দেখতেই পাচ্ছিস না !

দ্বিতীয়া—ওঃ বকুলাবলিকা যে! সই এই দেখ, রানীমার স্যাকরার কাছ থেকে-আনা সাপের শীলমোহর করা এই আংটির কথা একমনে ভাবতে ভাবতে তোর গাল খেলুম।

বকুলাবলিকা—ঠিক জায়গাতেই তোর চোখ পড়েছে। আংটিটা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে যেন (ফুলের) কেশর। আর মনে হচ্ছে তোর হাতের পাতায় যেন একটা ফুল ফুটে রয়েছে।

কৌমুদিকা—সই, কোথায় যাচ্ছিস ?

বকুলাবলিকা—রানীমার কথামতো আচার্য গণদাসকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছি মালবিকা কেমন পাঠ নিচ্ছে।

কৌমুদিকা—সই, এই সব আয়োজন করে দূরে রাখা সত্ত্বেও (শুনতে পাচ্ছি) রাজামশাই নাকি তাকে দেখেই ফেলেছেন !

বকুলাবলিকা—হুঁ। ছবিতে রানীমার-পাশে-আঁকা তাকে দেখেছেন।

কৌমুদিকা—কী রকম রে ?

বকুলাবলিকা—শোন, রানীমা ছবিঘরে গিয়ে গুরুজীর সদ্যসদ্য-আঁকা, রঙ-পর্যন্ত-শুকোয় নি এমন ছবিগুলো দেখছিলেন ; এমন সময় রাজামশাই হাজির।

কৌমুদিকা—তারপর ? তারপর ?

বকুলাবলিকা—তারপর ঠিকমতো সমাদর জানানোর পরে রানীমার সঙ্গে এক-আসনে বসে, ছবিতে রানীমার লোকজনের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি তাকে (মালবিকাকে) দেখে রাজামশাই জিগ্যেস করলেন—

কৌমুদিকা—কী ? কী ?

বকুলাবলিকা—'মেয়েটি তো চমৎকার, রানীর পাশেই প্রায় আঁকা দেখছি ! এর নাম কী ?'

কৌমুদিকা—সুন্দর রূপেরই আদর হয়। তারপর ? তারপর ?

বকুলাবলিকা—তখন তাঁর কথায় কানই দিচ্ছেন না দেখে (মনে মনে) সন্দেহ নিয়ে রাজামশাই রানীমাকে বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন। তাতেও যখন রানীমা মুখ খুলছেন না তখন কুমারী বসুলক্ষ্মী বলে দিলেন—দাদাভাই, এ হল মালবিকা।

কৌমুদিকা—(মুচকি হেসে) ছেলেমানুষের মতোই কাজ। তারপরে কী বল।

বকুলাবলিকা—কী আর। এখন মালবিকাকে বেশ করে রাজামশাই-এর নজর থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

কৌমুদিকা—সই, যা তোর নিজের কাজ কর। আমিও আংটিটা রানীমার কাছে নিয়ে যাই। (নিষ্ক্রান্ত)

বকুলাবলিকা—(চারিদিক ঘুরে দেখে) এই যে নাট্যাচার্য গণদাস (নাচ) গানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই ওঁর সামনে গিয়ে দেখা দিই। (পরিক্রমা করছে)

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস—এ কথা ঠিক যে সকলের কাছেই তার কুলবিদ্যা বড়ো আদরের জিনিস। আমাদের

নাট্যবিদ্যার সম্পর্কে সেই গৌরবও মিথ্যা নয়। যেহেতু—

মুনি-ঋষিরা বলেন এ হল দেবতাদের চোখে দেখার মতো এক শান্ত যজ্ঞ, মহাদেব নিজের শরীরের মধ্যে পার্বতীর দেহ ধারণ করে তার দুটি বিভাগ (স্পষ্ট) করে দিয়েছেন, এতে তিন গুণ থেকে জন্ম নেয় যে-লৌকিক ক্রিয়াকলাপ তাকে নানান্ রসে পুষ্ট দেখা যায়, মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তবুও নৃত্যাভিনয় অনেক রকমে সকলকেই অনন্য আনন্দ যোগায়।

বকুলাবলিকা—(কাছে গিয়ে) আর্য প্রণাম হই।

গণদাস—ভদ্রে, বেঁচে থাকো।

বকুলাবলিকা—আর্য, রানীমা জিগ্যেস করছেন—পাঠ নিতে গিয়ে মালবিকা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে না তো ?

গণদাস—ভদ্রে, রানীকে জানাবে, সে খুবই মেধাবিনী, অত্যন্ত নিপুণও বটে। বেশি বলব কী—অভিনয়ের বিষয়ে যে যে ভঙ্গী আমি তাকে শেখাই, সেগুলোকেই আরো সুন্দর করে প্রকাশ করে সে যেন আমাকেই ফিরিয়ে শেখায়।

বকুলাবলিকা—(স্বগত) ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) গুরুজন যাকে এমন প্রশংসা করছেন, আপনার সেই শিষ্যা ধন্য।

গণদাস—বাছা, এমন মেয়ে সহজে চোখ পড়ে না, তাই জিগ্যেস করছি, রানীমা তাকে কোথা থেকে এনেছেন ?

বকুলাবলিকা—রানীমায়ের এক ছোটোজাতের ভাই আছে, তার নাম বীরসেন। তাকে রাজামশাই নর্মদা নদীর তীরে সীমানার দুর্গে (দেখাশোনা করতে) রেখেছেন। এই মেয়েটিকে শিল্পকলায় পটু দেখে সে দিদির কাছে উপহার পাঠিয়েছে।

গণদাস—(স্বগত) চেহারার জৌলুসেই (তার প্রতি) আমার বিশ্বাস জন্মেছে, আমার ধারণা এ কখনই সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। (প্রকাশ্যে) বাছা, আমারও নিশ্চয়ই খুব নাম হবে। কারণ,

গুরুজীর শিল্পকলা যোগ্য পাত্রে পড়লে আরও বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন মেঘ থেকে সমুদ্রের শুক্তিতে জল পড়ে তা মুক্তো হয়ে ওঠে।

বকুলাবলিকা—হ্যাঁ, আপনার শিষ্যা কোথায় ?

গণদাস—এখুনি পঞ্চাঙ্গ (নৃত্য) অভিনয় শিখিয়ে আমি তাকে বিশ্রাম করতে বলাতে সে দীঘির দিকের জানলায় বসে খোলা হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

বকুলাবলিকা—তবে অনুমতি দিন গুরুজী, গুরুদেবের সন্তোষের কথা জানিয়ে তার উৎসাহ বাড়িয়ে দিই।

গণদাস—সইকে দেখে এসো। আমিও সময় পেয়েছি, একটু ঘরে যাই।

(দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

(মিশ্রবিষ্কম্ভক শেষ)

(প্রবেশ করছেন রাজা, পরিজন দূরে দাঁড়িয়ে, পাশে বসে মন্ত্রী, হাতে একখানি চিঠি)

রাজা—(মন্ত্রী চিঠিটা পড়ে নেবার পর, তাঁর দিকে তাকিয়ে) বাহতক, বিদর্ভের রাজা কী করতে চাইছে ?

অমাত্য—মহারাজ, নিজেদের ধ্বংস।

রাজা—এখন কী খবর (পাঠিয়েছে) শুনি !

অমাত্য—এখন সে (চিঠির) উত্তরে লিখেছে—মহামান্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন—
'আপনার খুড়তুতো ভাই মাধবসেন বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসার সময়ে মাঝপথে আপনারই সীমানারক্ষীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং (বর্তমানে) বন্দী রয়েছে। আমার সম্মানরক্ষার্থে আপনি তাকে স্ত্রী ও ভগিনীসহ মুক্তি দিন। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে রাজারা সকলেই তাদের অধীন ভূস্বামীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং এই বিষয়ে মহামান্য আপনি নিরপেক্ষ থাকুন—এটাই বাঞ্ছিত। এর ভগিনী আবার বন্দী করার গোলমালের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাকে সন্ধান করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এখন যদি মহামান্য আপনি সত্যিই চান যে, আমি মাধবসেনকে মুক্তি দিই, তাহলে চুক্তি শুনুন—
'যদি মহামান্য আপনি আমার শ্যালক মৌর্য-সচিবকে মুক্তিদান করেন, তাহলে আমিও এই মুহূর্তে মাধবসেনকে মুক্ত করব'।

রাজা—(সরোষে) কী হল ? মূর্খটা আমার সঙ্গে কাজের বদলে কাজ করতে চাইছে ? বাহতক, বিদর্ভের রাজা স্বভাবতঃই আমার শত্রু এবং সব সময় অনিষ্ট করে। সুতরাং ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হলে, আগেকার পরিকল্পনামতো তাকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্যে বীরসেনের নেতৃত্বে সেনা সাজাতে বলুন।

অমাত্য—মহারাজের যেমন আদেশ।

রাজা—অথবা, আপনার কী মত ?

অমাত্য—(দণ্ডনীতির) শাস্ত্র মেনেই আপনি বলেছেন। কেননা—
যে-শত্রু অল্পদিন হল রাজপদ পেয়েছে, সে প্রজাদের মধ্যে তেমন মূলবিস্তার করতে পারে নি ; অতএব তাকে সদ্য-পোঁতা আলগা গাছের মতোই খুব সহজেই উপড়ে ফেলা যায়।

রাজা—তন্ত্রকার ঠিক কথাই বলেছেন। একমাত্র এই কারণেই সেনাপতি উদ্যোগ নিন।

অমাত্য—ঠিক আছে। (নিষ্ক্রান্ত)

(পরিজনেরা যে যার কাজ নিয়ে রাজার সামনে থাকল। বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন—'গৌতম, একটা উপায় বের কর যাতে ছবিতে হঠাৎ-দেখে-ফেলা মালবিকাকে সত্যি চোখে দেখতে পাই'। আমিও সেইমতো কাজ করেছি। যা হোক ওঁকে জানাই। (পরিক্রমা করছে)

রাজা—(বিদূষককে দেখে) এই যে অন্য কাজের মন্ত্রীও আমার কাছে এসে গিয়েছে।

বিদূষক—(কাছে গিয়ে) আপনার বৃদ্ধি হোক।

রাজা—(মাথা নেড়ে) এখানে বোসো।

(বিদূষক বসল)

রাজা—তোমার জ্ঞানদৃষ্টি লক্ষ্যবস্তু (হাতে পাওয়ার) উপায় দেখায় ব্যস্ত ছিল তো !

বিদূষক—উপায়ের সাফল্য জানতে চাও।

রাজা—মানে ?

বিদূষক—(কানে কানে) এই রকম !

রাজা—বাঃ ! বেশ বন্ধু, নিখুঁত কাজ করেছ। এবার কার্যসিদ্ধি অত্যন্ত কঠিন জেনেও এই আরম্ভে আমার বেশ আশা হচ্ছে। কেননা—

সহায় সাথী থাকলেই বাধা সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্তুকে হাতের মুঠোয় আনা যায় ; চোখ থাকলেও প্রদীপ ছাড়া অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

নেপথ্যে—ঢের হয়েছে, আর গর্বে কাজ নেই। মহারাজের সামনেই আমাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো বিচার হবে।

রাজা—(কান পেতে) বন্ধু, তোমার কুট-বুদ্ধির গাছে ফুল ফুটেছে।

বিদূষক—শীগগির ফলও দেখতে পাবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন—প্রভুর আদেশ মতো কাজ হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন হরদত্ত ও গণদাস।

দুজনে অভিনয়বিদ্যার আচার্য; পরস্পরকে হারাতে চাইছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, ঠিক যেন দুটি ভাব-শরীর নিয়ে দেখা দিয়েছে।

রাজা—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী—মহারাজের যেমন আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার তাদের দুজনকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে এই দিকে আসুন আপনারা।

হরদত্ত—(রাজাকে তাকিয়ে দেখে) আহা দুর্লভ রাজমহিমা ! কারণ,

ইনি একেবারে অপরিচিত নন, কাছে যাওয়া যাবে না এমনও মনে হচ্ছে না, তবুও এঁর পাশে যেতে একটু থমকাতে হচ্ছে, বিশাল সমুদ্রের মতো আমার চোখে এঁকে প্রতিমুহূর্তে বারে বারেই নতুন মনে হচ্ছে।

গণদাস—মানুষের শরীরে এ কী বিপুল জ্যোতি ! কারণ,

দেউড়িতে নিযুক্ত (রক্ষী) পুরুষ আমাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিয়েছে, সিংহাসনের-কাছে-থাকা পরিজনের সঙ্গেই এগোচ্ছি ; তবুও কোনো কথা না বলে তেজোরাশি দিয়ে আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত করে (চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ?) ইনি যেন আমাকে নিষেধই করছেন।

কঞ্চুকী—এই যে মহারাজ। আপনারা এগিয়ে যান।

দুজনে—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—আপনাদের স্বাগত জানাই। (পরিজনের দিকে তাকিয়ে) আপনাদের আসন।

(দুজনে পরিজনদের আনা দুটি আসনে বসলেন)

রাজা—কী ব্যাপার ? শিষ্যদের পাঠ দেবার সময়ে একই সঙ্গে দুজন আচার্য উপস্থিত !

গণদাস—মহারাজ, শুনুন তাহলে—আমি খুব বড়ো পণ্ডিতের কাছে অভিনয়বিদ্যা শিখেছি। এ-বিষয়ে আমি শিক্ষকতাও করছি, মহারাজ নিজে এবং রানীমা আমাকে নিয়োগ করেছেন।

রাজা—খুব ভালোমতোই জানি। তারপরে কী ?

গণদাস—সেই-আমাকে সব নামজাদা লোকদের সামনে ঐ হরদত্ত অপমান করে বলছে—'ও আমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নয়' !

হরদত্ত—মহারাজ, ও-ই আমাকে প্রথমে অপমান করেছে। বলেছে ওর আর আমার মধ্যে তফাৎ হল সমুদ্দুর আর ডোবার মধ্যেকার তফাৎ। তাই বলি, আপনিই ওকে এবং আমাকে বিদ্যায় এবং প্রয়োগে বিচার করে দিন। মহরাজ নিজেই আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং বিচারক (হবেন)।

বিদূষক—ঠিক প্রস্তাব।

গণদাস—চমৎকার কথা। মহারাজ মন দিয়ে শুনবেন।

রাজা—একটু দাঁড়ান। মহারানী একে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। সুতরাং পণ্ডিত-কৌশিকীর সঙ্গে তিনি থাকবেন, তাঁর সামনেই বিচার হবে।

বিদূষক—আপনি ঠিক বলেছেন।

দুজন আচার্য—মহারাজের যেমন ইচ্ছে।

রাজা—মৌদ্গল্য, এই প্রস্তাব জানিয়ে পণ্ডিতকৌশিকীর সঙ্গে রানীকে ডেকে আনো।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রমণ করে, পরিব্রাজিকাসহ রানীকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে এই দিকে দেবী।

দেবী—(পরিব্রাজিকার দিকে তাকিয়ে) দেবী, হরদত্ত আর গণদাসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আপনার কী মনে হয় ?

পরিব্রাজিকা—তোমার পক্ষের লোক হেরে যাবে এমন ভয় কোরো না। প্রতিপক্ষের কাছে গণদাস কোনো অংশে কম নয়।

দেবী—তা হলেও রাজার অনুগ্রহ তাকে প্রাধান্য দেবে।

পরিব্রাজিকা—তুমিও তো রানী, সে কথাটাও ভেবে দেখ। দেখ—

সূর্যের দাক্ষিণ্যে আগুন খুব বেশি জ্বলজ্বল হয়ে ওঠে। রাত্রির দাক্ষিণ্যে চাঁদও তার মহিমা পায়।

বিদূষক—দেখ দেখ। পণ্ডিতকৌশিকীকে সামনে নিয়ে দেবী ধারিণী এসে গিয়েছেন।

রাজা—এঁকে দেখছি ! যে কিনা—

সন্ন্যাসিনী কৌশিকীর সঙ্গে থেকে মাঙ্গলিক অলংকারে ভূষিত, দেখাচ্ছে যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে সশরীরে ত্রয়ীবিদ্যা।

পরিব্রাজিকা—(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—ভগবতী, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

পরিব্রাজিকা—আপনি একশ বছর ধরে ধারিণী এবং ধরণীকে (ভূতধারিণী—যে সমস্ত প্রাণীকে ধরে আছে, বাঁচিয়ে রেখেছে) পালন করুন—ধারিণীর পুত্র মহাবলশালী (মহাসার-প্রসব), এ পৃথিবী প্রচুর বৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা (মহা-আসার-প্রসব), এবং দুজনেই ক্ষমাগুণে সমান (সর্বংসহা !) ।

ধারিণী—আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা—দেবীকে স্বাগত। (পরিব্রাজিকার দিকে ফিরে) দেবী আসন গ্রহণ করুন।

(সকলে যথাস্থানে উপবেশন করলেন)

রাজা—ভগবতী, এখানে হরদত্ত আর গণদাসের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির ঝগড়া হয়েছে। তাই এখন আপনাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরিব্রাজিকা—(মৃদু হেসে) ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে কিনা গাঁয়ে এসে রত্ন পরীক্ষা করা।

রাজা—না না, এমন বলবেন না ! আপনি পণ্ডিতকৌশিকী। আমি এবং রানী—আমাদের দুজনেরই ওদের প্রতি পক্ষপাত আছে।

আচার্যদ্বয়—মহারাজ ঠিক বলেছেন। আপনি মধ্যস্থ হয়ে আমাদের দোষগুণ ঠিক ঠিক পরীক্ষা করতে পারবেন।

রাজা—তাহলে তর্ক শুরু হোক।

পরিব্রাজিকা—মহারাজ নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োগই (অভিনয়, নৃত্য) হল আসল। কথায় কাজ কী? রানীই বা কী মনে করেন?

দেবী—যদি আমাকে জিগ্যেস করেন, (তাহলে বলি) এদের এই ঝগড়াই আমার ভালো লাগছে না।

গণদাস—দেবী, সমান-বিদ্যার একজনের কাছে আমি হেরে যাব এমনটা ভাববেন না।

বিদূষক—দেবী, ভেড়ার লড়াই দেখা যাক না! শুধু শুধু মাইনে দেওয়া কেন?

দেবী—ঝগড়াটে কোথাকার!

বিদূষক—না না। দুটো মাতাল হাতি ঝগড়া করতে থাকলে তাদের একটা গো-হারা না হারা-পর্যন্ত শান্তি কোথায়?

রাজা—মনে হয়, দুজনেরই সুন্দর শরীরের ভঙ্গিমা দিয়ে (নৃত্য-) অভিনয় দেবী দেখেছেন।

পরিব্রাজিকা—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে এর পরে এরা কী প্রমাণ দেবে?

পরিব্রাজিকা—তাই বলতে চাইছি।

কারো শিক্ষা সঙ্গতভাবে (অথবা সুন্দরভাবে) তার নিজের (জ্ঞানের) মধ্যেই থাকে, কারো বা অন্যের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাকে; যিনি দুটিকেই সুষ্ঠুভাবে করেন তিনিই শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবেন।

বিদূষক—আচার্যেরা দেবীর কথা শুনলেন। তার সারমর্ম হল গিয়ে শিক্ষার প্রয়োগ দেখে বিচার হবে, এই।

হরদত্ত—আমাদের খুব মত আছে।

গণদাস—দেবী, এই রকমই থাক।

দেবী—যদি আবার বোকা-বুদ্ধির শিষ্যা শিক্ষাকে খাটো করে দেয় তাহলে তো আচার্যের দোষ!

রাজা—দেবী, হ্যাঁ তা হবে। অপদার্থকে (শিষ্য হিসেবে) গ্রহণ করাটাই তো শিক্ষকের কম-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

দেবী—(স্বগত) এখন কী হবে? (গণদাসের দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) আর্যপুত্রের উত্তেজনার খোরাক এই-ইচ্ছে পূরণ করে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) এই অনর্থক চেষ্টা থামান।

বিদূষক—রানীমা ঠিকই বলেছেন। ওহে গণদাস, গানের ছল করে সরস্বতী-ঠাকরুণকে দেওয়া মিষ্টিগুলো তো তুমিই খাও (তোমারই পেটে যায়!); হারবে তো নিশ্চয়ই, ঝগড়ায় কাজ কী?

গণদাস—সত্যি, রানীর কথার এই মানেই হয়। এখনকার উপযোগী এই-কথাটা শোন তাহলে—

যে 'প্রতিষ্ঠা তো পেয়েই গিয়েছি' এই ভেবে তর্কে যেতে চায় না, অন্যে নিন্দে করতে থাকলেও তা সহ্য করে যায়, যার বিদ্যা শুধুমাত্র জীবিকার জন্যে তোলা থাকে তাকে (পণ্ডিতেরা) জ্ঞান-পণ্যের বণিক বলেন।

দেবী—আপনার শিষ্যার বেশি দিন হয় নি। পাঠ দেওয়া শেষ হবার আগেই তাকে প্রকাশ

করে দেওয়া ঠিক নয়।

গণদাস—সেই জন্যেই আমার আগ্রহ।

দেবী—তাহলে দুজনেই ভগবতীর কাছে পাঠ দেখান।

পরিব্রাজিকা—দেবী, এটা উচিত নয়। যিনি সব জানেন তারও একার সিদ্ধান্তে দোষ থাকবে।

দেবী—(স্বগত) মূর্খ, জেগে থাকলেও তুমি কি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছ ?

(রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রাজা তা পরিব্রাজিকাকে দেখালেন)

পরিব্রাজিকা—ওগো চন্দ্রমুখী, অকারণে কেন রাজমশাই-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ? (স্বামীসুহে) প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণ থাকলে তবেই স্বামীর উপরে রাগ করে।

বিদূষক—আহা কারণ আছে বৈ কি ? নিজের পক্ষকে রক্ষা করতে হবে তো ! (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) ভাগ্যে রানীমার রাগের ছলে রক্ষা পেলেন। খুব বিদ্যা শিক্ষা করলেও সকলে অন্যকে পাঠ দিতে পটু হয় না।

গণদাস—দেবী, শুনুন, এইভাবেই লোকে এটাকে দেখছে। সুতরাং এখন—

বিতর্কে নিজের প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে চাইছি আমি, আপনি যদি আমাকে অনুমতি না দেন তাহলে বুঝব আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন।

(আসন ছেড়ে উঠছেন)

দেবী—(স্বগত) কোথায় যাই ? (প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপরে আচার্যের জোর খাটে।

গণদাস—অস্থানে এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলাম। (রাজার দিকে ফিরে) দেবী তো অনুমতি দিলেন। তাহলে মহারাজ আদেশ করুন—অভিনয়ের কোন্ বিষয়ে উপদেশ দেখাব ?

রাজা—ভগবতী যা আদেশ দেবেন।

পরিব্রাজিকা—রানীর মনে কী যেন আছে। তাই ভাবছি…

দেবী—খুলে বলুন। আমার পরিজনের উপরে আমার জোর আছে।

রাজা—আমার উপরেও, (জোর আছে) সেটাও বল !

দেবী—ভগবতী, এখন বলুন।

পরিব্রাজিকা—মহারাজ, চতুষ্পদের চলিত (নৃত্য-) অভিনয় খুব কঠিন বলা হয়। সেই একই বিষয়ে দুজনের শিক্ষা দেখব। তা থেকেই দুজনের শেখানোর তফাৎ বোঝা যাবে।

আচার্যদ্বয়—ভগবতীর যেমন আদেশ।

বিদূষক—তবে দুজনেই প্রেক্ষাগৃহে সংগীতের আয়োজন করে রাজামশাই-এর কাছে দূত পাঠান। অথবা মৃদঙ্গের আওয়াজ শুনে আমরা উঠব।

হরদত্ত—বেশ। (উঠে পড়ল)

(গণদাস রানীকে দেখছে)

দেবী—(গণদাসের দিকে তাকিয়ে) জয়ী হোন ; আমি সত্যি সত্যি আপনার জয়ের পথে বাধা নই। (দুজনের প্রস্থান)

পরিব্রাজিকা—আচার্য, এইদিকে।

উভয়ে—(ঘুরে নিয়ে) এই যে আমরা।

পরিব্রাজিকা—বিচারকের অধিকার নিয়ে বলছি, সমস্ত অঙ্গের সুন্দর ভঙ্গীর প্রকাশের জন্যে সামান্য প্রসাধন করে শিষ্যা-দুজনকে আনবেন।

উভয়ে—সে আর আমাদের শেখাতে হবে না। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী—(রাজার দিকে তাকিয়ে) যদি রাজকার্য চালানোর ব্যাপারেও আর্যপুত্র এমনই নিখুঁত হন তাহলে চমৎকার হয়।

রাজা—এটা অন্যভাবে নিও না। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার চেষ্টায় এটা ঘটছে না। সমান সমান বিদ্যার মানুষ প্রায়ই একে অন্যের নামযশে ঈর্ষা করে।

(নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ। সকলে কান পেতে)

পরিব্রাজিকা—ওঃ! সংগীত শুরু হল। কারণ এই—

মধ্যমতানে বাঁধা, ময়ূরদের প্রিয় 'মায়ূরী' মৃদঙ্গধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মন মাতিয়ে তুলছে। ময়ূরেরা এই আওয়াজকে মেঘের গর্জন মনে ভেবে ঘাড় উঁচু করে পাল্টা সুর তোলে।

রাজা—দেবী, সভাগৃহে যাই।

দেবী—(স্বগত) ইস্ আর্যপুত্রের এত অধীরতা! (সকলে উঠলেন)

বিদূষক—(আড়ালে) ওহে ধীরে চল। রানী ধারিণী যেন কিছু সন্দেহ না করেন।

রাজা—ধৈর্য ধরেছি, তবুও মুরজধ্বনি আমাকে ব্যস্ত করে ফেলছে ; এ শব্দ যেন সাফল্যের-পথে-নামতে-থাকা আমারই মনস্কামনার পদধ্বনি। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সংগীতরচনাশেষে প্রবেশ করছেন বয়স্য-সহ আসনস্থ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, যার যার পদ অনুযায়ী পরিজনবর্গ]

রাজা—ভগবতী, উপস্থিত দুই আচার্যের মধ্যে কার শিক্ষা আমরা প্রথম দেখব ?

পরিব্রাজিকা—বিদ্যাজ্ঞানে দুজনেই সমান হলেও বয়সে বড়ো হওয়ার জন্যে গণদাসেরই প্রথম অধিকার।

রাজা—তাহলে মৌদ্গল্য, আচার্য দুজনকে এই কথা জানিয়ে তুমি নিজের কাজ কর।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস—মহারাজ, শর্মিষ্ঠার কাব্যপ্রকৃতির চারটি অংশ (চতুষ্পদা) এবং তা মধ্যলয়ে বাঁধা। তারই চতুর্থ অংশের নৃত্য-প্রয়োগে আপনি মন দিন।

রাজা—আচার্যকে সম্মান দেখিয়ে আমি মনোনিবেশ করছি। (গণদাস নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—(জনান্তিকে) বন্ধু,

নেপথ্যে-থাকা তাকে দেখার ভীষণ আগ্রহে আমার চোখ যেন অস্থির হয়ে পর্দাটাকেই উঠিয়ে দিতে চাইছে।

বিদূষক—(আড়ালে) ওহে তোমার নয়নমধু মৌমাছিসহ উপস্থিত। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করে এখন দেখ।

(মালবিকার প্রবেশ। আচার্য তার প্রত্যেক অঙ্গের মুদ্রা খুঁটিয়ে দেখছেন)

বিদূষক—(জনান্তিকে) তুমি দেখ। ছবির চেয়ে এর সৌন্দর্য একটুও কম নয়।

রাজা—(জনান্তিকে) বয়স্য,

ছবিতে দেখে এর রূপলাবণ্য-বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল ; এখন মনে হচ্ছে, যে তার ছবি এঁকেছে সে মন দিয়ে আঁকতে পারে নি।

গণদাস—বাছা, ভয় কোরো না, স্বাভাবিক হও।

রাজা—(স্বগত) আহা অঙ্গে অঙ্গে অনিন্দ্য রূপ। দেখছি—

চোখ (জোড়া) টানা টানা, মুখখানি শরৎকালের চাঁদ, কাঁধ থেকে নেমে এসেছে দুটি বাহু, ঘন উন্নত স্তনযুগলে বক্ষোদেশে স্থানাভাব, দুপাশ যেন মাজাঘষা (পালিশ করা), মাঝখানটি হাতের মুঠোয় ধরা যায় (বুঝি), জঘন প্রশস্ত নিতম্বযুক্ত, জোড়া-পায়ে বাঁকা আঙুলগুলো, নৃত্যগুরুর মনের পছন্দ মতো করেই যেন এর শরীরটি বাঁধা।

মালবিকা—(উপগান করে চতুষ্পদার বিষয় গাইছে)

প্রিয়জন দুর্লভ, তাই হে আমার মন, সে-বিষয়ে কোনো আশা রেখো না ; আহা। আমার বাঁ-চোখের প্রান্তে এ কিসের কাঁপন ? বহুদিন পরে এঁর দেখা পেয়েছি, কেমন করে এগিয়ে যাব ? প্রিয় আমার, আমি পরাধীন, তবু জেনো, আমি তোমাকেই চাই।

(তারপরে নানা রস অনুসারে নৃত্যে অভিনয়)

বিদূষক—(জনান্তিকে) ওহে চতুষ্পদার বিষয়কে মাধ্যম করে এ তো তোমার কাছেই আত্মনিবেদন করছে।

রাজা—(জনান্তিকে) বন্ধু, আমার মনের অবস্থাও একই রকম। ও সত্যি সত্যি—'ওগো এই মানুষটা তোমায় ভালোবেসেছে' এই কলিটি গাইবার সময়ে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে অভিনয় করতে গিয়ে আমার সঙ্গেই বিনীত প্রার্থনার ঢঙে কথা বলেছে —ধারিণী কাছেই থাকায় ভালোবাসাকে প্রকাশ করার আর পথ ছিল না যে !

(গান শেষ করে মালবিকা নিষ্ক্রমণে উদ্যত)

বিদূষক–দেবী দাঁড়ান। একটি বিশেষ কাজ যেন আপনি ভুলেছেন। সে-বিষয়ে জিগ্যেস করি।

গণদাস—বাছা দাঁড়াও। তোমার শিক্ষার সুফল শুনে যাবে।

(মালবিকা ফিরে দাঁড়াল)

রাজা—(স্বগত) আহা ! সব ভঙ্গীতেই লাবণ্য শোভা দেয়। যেমন—

ওর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সোজা রেখে দাঁড়ানো ভঙ্গী যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল— মণিবন্ধে বলয় স্থির হয়ে আছে, বাঁ-হাতটি নিতম্বে রাখা, ডান-হাতটি আলগা এলিয়ে শ্যামা-লতার মতো, চোখের দৃষ্টি নামানো মেঝের দিকে যেখানে তারই বুড়ো-আঙুলের ঘষায় ফুলের রাশি পিষে গিয়েছে।

দেবী—আচ্ছা, গৌতমের কথাও কি আর্যপুত্রের মনে ধরছে ?

গণদাস—দেবী, এমন ভাববেন না, প্রভুর সঙ্গে থেকে থেকে গৌতমেরও সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মাতে পারে।

বিদ্বান মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে বোকাসোকা লোকও আর বোকা থাকে না।

পাঁক-পরিষ্কারেরে-ফলের সংযোগে যেমন নোংরা জল (পরিষ্কার হয়)।

বিদূষক—(গণদাসের দিকে তাকিয়ে) বিচারককে জিগ্যেস কর তাহলে। তারপরে আমি যে-কাজের ভুল লক্ষ্য করছি তা বলব।

গণদাস—ভগবতী, কেমন দেখলেন, বলুন। ভালো না খারাপ ?

পরিব্রাজিকা—যেমন দেখলাম সবটাই চমৎকার। কেননা—

শরীরের অভিনয়ে এবং প্রকাশভঙ্গীতে (গানের) অর্থ সুন্দর স্পষ্ট হয়েছে; প্রতিটি পদক্ষেপ লয়-অনুসারে হয়েছে, রস যেন (তার সঙ্গে) একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, হাতের মুদ্রা ছিল সুকুমার; আর পরের পর একটি ভাবকে সরিয়ে অন্যভাব ক্রমশঃই স্থান করে নিচ্ছিল, যদিও মূল ভাবরস ছিল সেই একই।

গণদাস—রাজা কীরকম ভাবছেন ?

রাজা—গণদাস, আমার নিজের পক্ষের (লোকের জন্যে) গর্ব কমে গিয়েছে।

গণদাস—আজ আমি সত্যি নৃত্যাচার্য।

বিজ্ঞজনে শিক্ষকের সেই উপদেশকেই শুদ্ধ বলেন, যা আগুনে-দেওয়া (খাঁটি) সোনার মতোই বিদ্বৎসমাজে পড়ে কালো হয় না।

দেবী—কী ভাগ্য যে আপনি পরীক্ষকের প্রশংসা পাচ্ছেন !

গণদাস—দেবীর অনুগ্রহই আমার সমৃদ্ধির কারণ। (বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) গৌতম, আপনি কি মনে করছিলেন, এখন বলুন।

বিদূষক—প্রথম-শিক্ষা দেখানোর সময়ে আগেই ব্রাহ্মণের পুজো করা উচিত। সেটা আপনারা ভুলেছেন।

পরিব্রাজিকা—আহা রে নাট্যনিপুণ বিচারক !

(সকলের অট্টহাসি, মালবিকাও মৃদু হাসল)

রাজা—(স্বগত) আমার চোখ লক্ষ্যবস্তুর সার গ্রহণ করেছে। কেননা সে—

আয়তাক্ষীর হাসিমুখ দেখেছে, সামান্য দাঁত দেখা যাওয়ায় তা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল—যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল, যার কেশরগুলো এখনো ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

গণদাস—মহাব্রাহ্মণ, নেপথ্যগৃহের এটা প্রথম সঙ্গীত নয়। অন্যথা কেনই বা আপনার মতো পূজনীয় ব্যক্তির পুজো করব না ?

বিদূষক—আমি সত্যিই বোকা চাতকপাখির মতো শুকনো মেঘের আকাশে জল খেতে চেয়েছি।

পরিব্রাজিকা—তাই হয়েছে।

বিদূষক—তাহলে সত্যি, পণ্ডিতের সন্তোষেই মূর্খেরা বিশ্বাস করে। ইনি যেহেতু ভালো বলেছেন, সুতরাং আমি এঁকে এই পুরস্কার দিচ্ছি।

(এই বলে রাজার হাতের বালা ধরে টানল)

দেবী—দাঁড়াও। অন্যজনের গুণের কথা না জেনেই তুমি কেন অলংকার দিচ্ছ ?

বিদূষক—যেহেতু সেটি অন্যের !

দেবী—(আচার্যের দিকে তাকিয়ে) আর্য গণদাস, আপনার শিষ্যার পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে।

গণদাস—বৎসে, এসো আমরা এখন যাই। (আচার্যের সঙ্গে মালবিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—(রাজার দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) তোমার সেবায় আমার এই পর্যন্ত বুদ্ধির দৌড়।

রাজা—(জনান্তিকে) তার এই চলে যাওয়া আমার দুটি চোখের সৌভাগ্যের অন্তস্বরূপ, হৃদয়ের মহোৎসবের অবসানস্বরূপ, আমার দ্বার যেন রুদ্ধ হল।

বিদূষক—(জনান্তিকে) বেশ, তুমি দেখছি দরিদ্র রোগীর মতো চাইছ যে, বদ্যিমশাই ওষুধও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হরদত্ত—প্রভু, এখন আমার প্রয়োগবিদ্যা দেখার জন্যে অনুগ্রহ করুন।

রাজা—(স্বগত) দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। (দাক্ষিণ্য সহকারে প্রকাশ্যে) হরদত্ত আমরা তো উৎসুক হয়েই আছি।

হরদত্ত—অনুগৃহীত হলাম।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক—প্রভুর জয় হোক। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। আর—

দীঘির পদ্মপাতার ছায়াতে হাঁসেরা চোখ বুজে বসে আছে, পারাবতেরা অতিরিক্ত উত্তাপে পরিচিত ঢালু ছাদ ছেড়ে সৌধ আশ্রয় করেছে, উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু পান করার জন্যে ময়ূর ধারাযন্ত্রে গিয়ে বসেছে, সকল নৃপগুণে দীপ্ত আপনারই মতো সূর্য সমস্ত সরল কিরণসমূহে প্রদীপ্ত।

বিদূষক—আহা! আহা! ব্রাহ্মণের খাবার সময় হয়েছে। আপনারও। উচিত-সময় পার হয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দোষ ধরেন। হরদত্ত, আপনি এখন কী বলেন?

হরদত্ত—এখান আমার আর বলার কিছু নেই।

রাজা—(হরদত্তকে দেখে) তাহলে আপনার শিক্ষা আমরা আগামীকাল দেখব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

হরদত্ত—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী—আর্যপুত্র স্নানবিধি সম্পন্ন করুন।

বিদূষক—দেবী, তাড়াতাড়ি পানভোজনের ব্যবস্থা করুন।

পরিব্রাজিকা—(উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার স্বস্তি হোক। (পরিজনসহ দেবীর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—ওহে শুধু রূপে নয়, শিল্পগুণেও মালবিকা অদ্বিতীয়া।

রাজা—অকৃত্রিম সুন্দরী তাকে ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে বিধাতা কামদেবের একটি বিষযুক্ত বাণ সৃষ্টি করেছেন।

আরো কী বলব? আমার কথা তোমার ভাবা উচিত।

বিদূষক—তোমারও আমার কথা ভাবা উচিত। দোকানের চুল্লীর মতো আমার পেট জ্বলছে।

রাজা—এ রকম ভাবেই তুমি বন্ধুর কাজে তাড়া করবে।

বিদূষক—তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু, মেঘমালায়-আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার মতো তাঁর (মালবিকার) দেখা পাওয়া যে পরের অধীন। তুমিও তো কষাইখানার পাখির মতো মাংসলোভী অথচ ভীরু। সুতরাং আমার ইচ্ছা তুমি ধৈর্য না হারিয়ে কার্য সিদ্ধির জন্যে চেষ্টা কর।

রাজা—বন্ধু, ধৈর্য ধরি কীভাবে ?

অন্তঃপুরের অন্য সব রমণীর বিষয়ে আমার হৃদয় নিস্পৃহ, সেই সুনয়নাই এখন আমার সমস্ত প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অঙ্ক

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা—দেবী আদেশ করেছেন, উপহার দেবার জন্যে 'বীজপুরক' নিয়ে এসো। তাহলে যাই প্রমোদবনের রক্ষিণী মধুকরিকাকে খুঁজে দেখি ! (পরিক্রমা করে দেখে) এই যে তপনীয়-অশোকতরুর দিকে চেয়ে আছে মধুকরিকা। যা হোক ওর কাছে যাই।

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

প্রথমা—(এগিয়ে এসে) মধুকরিকা, তোর বাগানের খবর ভালো তো ?

দ্বিতীয়া—আহা সমাভৃতিকা ! সখী, তোকে স্বাগত জানাই।

সমাভৃতিকা—সখী, দেবী আদেশ করেছেন—আমাদের মতো মানুষের শুধু-হাতে দেবীকে (রানীমাকে) দর্শন করা উচিত নয়। সুতরাং 'বীজপুরক' দিয়ে (তাঁর) সেবা করতে চাই।

মধুকরিকা—বীজপুরক তো সামনেই রয়েছে। এবারে বল, পরস্পর রেষারেষি-করা দুই নাট্যাচার্যের প্রয়োগ দেখে দেবী কাকে প্রশংসা করলেন ?

সমাভৃতিকা—দুজনেই তো পণ্ডিত এবং প্রয়োগে নিপুণ। কিন্তু শিষ্যার গুণগরিমায় গণদাস বেশি গুণী।

মধুকরিকা—আর মালবিকাকে নিয়ে কী যেন কানাঘুষা চলছে ?

সমাভৃতিকা—তার প্রতি রাজার জোর দৃষ্টি পড়েছে। শুধু রানীমা ধারিণীর কথা ভেবে তিনি নিজের প্রভুত্ব দেখাচ্ছেন না। এই কদিনে মালবিকাও একবার-গলায়-পরে খুলে-রাখা মালতীমালার মতো ম্লান হয়ে পড়ছে। তারপরে আর কিছু জানি না। এবার যেতে দে।

মধুকরিকা—এই শাখাতে ঝুলে-থাকা বীজপুরকটি নে।

সমাভৃতিকা—(নেবার অভিনয় করে) সখী, তুইও সাধুজনকে সেবা করার আরও মূল্যবান ফল লাভ করবি।

মধুরিকা—সখী, একসঙ্গেই যাই। আমিও এই তপনীয় অশোকতরু দোহদের কথা রানীমাকে জানাই, এর ফুল ফুটতে দেরি হচ্ছে।

সমাভৃতিকা—ঠিক কথা। এ তো তোর করণীয়। (দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

(কামাতুর অবস্থায় রাজা এবং বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(নিজেকে দেখে)—

দয়িতার আলিঙ্গনসুখের অভাবে শরীর ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে, ক্ষণিকের জন্যেও

তাকে দেখা যাচ্ছে না বলে চোখে জল ভরে আসতে পারে ; কিন্তু হে আমার হৃদয়, তুমি তো সেই মৃগনয়নার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হও নি ! চিরপ্রাপ্তিকে লাভ করা সত্ত্বেও তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ ?

বিদূষক—তুমি ধৈর্য হারিয়ে এভাবে বিলাপ কোরো না। আমি দেবী মালবিকার প্রিয়-সখী বকুলাবলিকার দেখা পেয়েছি। তোমার নির্দেশও তাকে শুনিয়েছি।

রাজা—তাতে কী বলেছে সে ?

বিদূষক—'রাজাকে বলবেন, তাঁর এই নিয়োগ পেয়ে আমি অনুগৃহীত কিন্তু বেচারী মালবিকাকে রানীমা কড়া পাহারায় রেখেছেন ; আগলে-রাখা সাপের মণির মতো তাকে পাওয়া সহজ হবে না। তবুও আমি তা করব।'

রাজা—দেব ! মনসিজ ! প্রতিকূল-বিষয়ে আকৃষ্ট করে এই মানুষটাকে কেন এমন পীড়া দিচ্ছ যে, সে কালবিলম্ব সহ্য করতে পারছে না ? (সবিস্ময়ে)

কোথাও চিত্ত-উন্মথিত করা এই বেদনা আর কোথায় তোমার (অতি) বিশ্বাস-যোগ্য (কুসুমময়) আয়ুধ ! মৃদু বস্তু যে অধিক তীক্ষ্ণ, হে মন্মথ, তার প্রমাণ তোমার মধ্যেই পাওয়া যায়।

বিদূষক—বলছি তো তাকে পেতে গেলে যা করার করছি। সুতরাং, একটু শান্ত হও।

রাজা—এখন উচিত-কাজে-বিমুখ এই মন নিয়ে আমি দিনশেষের সময় কোথায় কাটাব ?

বিদূষক—শোন, বসন্তের প্রথম প্রকাশ রক্তাশোক-ফুলের উপহার পাঠিয়ে নতুন বসন্তোৎসবের ছলে ইরাবতী নিপুণিকার মুখে তোমাকে প্রার্থনা জানিয়েছেন—আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলারোহণ করতে চাই। তুমিও তাঁকে কথা দিয়েছ। সুতরাং প্রমোদবনেই যাই চল।

রাজা—তা হয় না।

বিদূষক—কেন ?

রাজা—বন্ধু মেয়েরা স্বভাবতঃ চতুর। আমাকে অন্তরঙ্গভাবে দেখেও কি তোমার সখী লক্ষ্য করবেন না যে আমি মনে মনে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট ? তাই দেখছি—তাঁর অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করাই বরং উচিত হবে, প্রত্যাখ্যানের কারণও তো অনেক আছে। মনস্বিনী নারীদের সঙ্গে—আগের চেয়ে অধিক যত্নের অথচ প্রেমশূন্য এমন ভদ্রতা করা উচিত নয়।

বিদূষক—অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সৌজন্যকে হঠাৎ মুছে ফেলা ঠিক হবে না।

রাজা—(চিন্তা করে) তবে প্রমোদবনের পথ দেখাও।

বিদূষক—এদিকে, এদিকে প্রভু। (উভয়ের পরিক্রমা)

বিদূষক—বাতাসে কম্পিত এই পল্লব-অঙ্গুলি নিয়ে বসন্ত যেন তোমাকে তাড়া দিচ্ছে, 'প্রমোদবনে প্রবেশ কর'।

রাজা—(স্পর্শসুখের অভিনয় করে) বসন্ত সত্যি উদার। বন্ধু, দেখ—

আমত্ত কোকিলের শ্রুতিমধুর কূজনে সে যেন আমার মদন ব্যথা কতটা সহনীয় তা সদয়ভাবে জিগ্যেস করছে ; আম্রমুকুলের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণা বাতাস আমাকে কোমলভাবে স্পর্শ করছে; যেন বসন্ত নিজেই তার কোমল করতল বুলিয়ে দিচ্ছে।

বিদূষক—শান্ত হবার জন্যে প্রবেশ কর। (উভয়ের প্রবেশ)

বিদূষক—বয়স্য, মন দিয়ে দেখ। এ যেন তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যে বসন্তলক্ষ্মী

যুবতীদের সাজসজ্জাকেও হার মানিয়ে এই বসন্তকালের ফুলের সাজ পরেছে।

রাজা—সত্যি অবাক হয়ে দেখছি।

রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, কুরবকের শ্যামল এবং শ্বেত অরুণিমা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণী শোভিত তিলকফলগুলি (সুন্দরীদের মুখের) তিলকক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে, বসন্তশ্রী রমণীদের মুখের প্রসাধনকলাকে অবজ্ঞাভরে হারিয়ে দিয়েছে।

(উভয়ে উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করছেন)

(উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ)

মালবিকা—প্রভুর মনের কথা না জেনেই তাকে চাইছি বলে আমার নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছে। সদয় সখীদের কাছে এ কথা বলার সুযোগ যে কবে হবে? জানি না, কামদেব কতদিন আর আমাকে প্রতিকার-শূন্য এই কষ্ট দেবেন। (কয়েক পা এগিয়ে) কোথায় বা চলেছি? (চিন্তা করে) ও! দেবী আমাকে আদেশ করেছেন, 'গৌতমের চপলতার ফলে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আমার দুটি পায়ে বড়ো ব্যথা। তুমি গিয়ে তপনীয়-অশোকতরুর ইচ্ছাপূরণ কর। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে তাতে ফুল ফোটে তাহলে আমি (দীর্ঘশ্বাস) অভিলাষ-পূর্ণ-করা পুরস্কার দেব'। যাই হোক নির্দিষ্ট স্থানে আগেই যাই। যতক্ষণ পিছনে পিছনে চরণের অলংকার নিয়ে বকুলাবলিকা আসছে, ততক্ষণ আমি নির্জনে একটু বিলাপ করি। (পরিক্রমা করছে)

বিদূষক—(দেখে) হুঁ হুঁ! এ যে একেবারে মাতালের মুখ-বদলানোর মাছের ডিম উপস্থিত।

রাজা—এই, কী হয়েছে?

বিদূষক—এখানে সামান্য সাজে উৎকণ্ঠিতা একাকিনী মালবিকা কাছেই রয়েছেন।

রাজা—কী? মালবিকা?

বিদূষক—হ্যাঁ।

রাজা—এখন জীবন ধারণ করা সম্ভব।

সারসের ক্রেংকার শুনে গাছে-ঢাকা নদীর কথা জেনে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো তোমার মুখে নিকটস্থ প্রিয়ার কথা জেনে আমার ক্লিষ্ট হৃদয় আশ্বস্ত হল।

কই কোথায় সে?

বিদূষক—ইনি তরুরাজির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছেন মনে হয়।

রাজা—(দেখে সানন্দে) বন্ধু, একে দেখছি

নিতম্ব দুটি বিশাল, মধ্যে (কটিদেশ) ক্ষীণ, স্তনযুগল সমুন্নত, চোখ দুটি টানা টানা—আমার প্রাণই বুঝি আসছে।

বন্ধু, আগের চেয়ে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে! কেননা—

এর কপোলদেশ শরকাণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য অলংকার পরিধান করে আছে —মনে হচ্ছে যেন বসন্তকালে পরিণতপত্রসহ সামান্য-কুসুমে-শোভিত কুন্দলতা।

বিদূষক—ইনিও তোমারই মতো প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

রাজা—তোমার বন্ধুত্ব এই রকম দেখছে।

মালবিকা—এই সেই অশোকতরু যে দোহদের আকাংক্ষায় কুসুমসজ্জা গ্রহণ না করে আমার

উৎকণ্ঠিত অবস্থাকেই অনুসরণ করছে। যাই হোক, এর ছায়াশীতল শিলাতলে বসে একটু আশ্বস্ত হই।

বিদূষক—শুনেছ তো? তিনি নিজে বলেছেন, তিনি উৎকণ্ঠিতা।

রাজা—এইটুকুতেই তোমার অনুমান সঠিক বলে মনে করি না। যেহেতু,

কুরবকফুলের রেণু-বয়ে আনা এবং নবকিশলয়-ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয় সমীরণ অকারণ উৎকণ্ঠাও তো জন্মায়।

(মালবিকা বসে আছে)

রাজা—বন্ধু! এদিকে এসো। আমরা লতার আড়ালে যাই।

বিদূষক—মনে হচ্ছে দূরে ইরাবতী আসছেন।

রাজা—কমলিনীকে দেখার পরে গজরাজ আর কুমিরের দিকে যায় না। (এই বলে তাকিয়ে রইলেন)

মালবিকা—হৃদয় আমার! অবলম্বনশূন্য সীমাহীন আশা থেকে ক্ষান্ত হ! কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস!

(বিদূষক রাজার দিকে চাইল)

রাজা—প্রিয়ে, প্রেমের বক্রতা দেখ।

তোমার উৎকণ্ঠার কারণ তুমি বল নি, অনুমানেরও অর্থজ্ঞানরূপ একটিই ফল হয় তা নয়, তবুও হে রম্ভোরু, আমি নিজেকেই এই সমস্ত বিলাপের লক্ষ্য মনে করছি।

বিদূষক—এখুনি তোমার সংশয় দূর হবে। গোপনে যাকে প্রেমের খবর পাঠিয়েছিলাম সেই বকুলাবলিকা আসছে।

রাজা—আমার অনুরোধের কথা কি ওর মনে থাকবে?

বিদূষক—বাঁদীর বেটী তোমার দরকারী খবর ভুলে যাবে নাকি? আমি পর্যন্ত কখনও ভুলি না।

(চরণের অলংকার হাতে প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—সখীর খবর ভালো তো?

মালবিকা—আহা বকুলাবলিকা! সখী, স্বাগত। বস।

বকুলাবলিকা—(উপবেশন করে) সখী, দেবী তোমাকে যোগ্যতার বিচারে নিযুক্ত করেছেন। অতএব একটি পা দাও, আলতা পরিয়ে নূপুর বেঁধে দিই।

মালবিকা—(স্বগত) হৃদয়, এই গৌরবে বেশি সুখী হোস না। কেমন করে নিজেকে এখন মুক্ত করি? অথবা এটাই আমার মরণসাজ হবে।

বকুলাবলিকা—কী ভাবছ? এই তপনীয়-অশোকতরুর ফুল-ফোটা নিয়ে দেবী সত্যি উৎসুক হয়েছেন।

রাজা—কী? অশোকের ইচ্ছাপূরণের জন্যে এই আয়োজন?

বিদূষক—তুমি কি জানো না, দেবী অকারণে একে অন্তপুরের সাজে সাজাবেন না?

মালবিকা—সখী, ক্ষমা কোরো। (পা তুলে দিল)

বকুলাবলিকা—ও এতো আমারই শরীর। (চরণ সংস্কারের অভিনয় করল)

রাজা—বন্ধু, দেখ—প্রিয়ার চরণপ্রান্তে-আঁকা রক্তিম রেখা যেন মহাদেবের (কোপে) দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ।

বিদূষক—সত্যি পায়ের উপযুক্ত দায়িত্বই দেবী দিয়েছেন।

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ—

এই বালিকা নখের দ্যুতি ছড়িয়ে কচি-কিশলয়ের মতো রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে—ইচ্ছাপূরণের জন্যে কুসুমশূন্য অশোকতরুকে, অথবা চরণে-প্রণত সদ্য-অপরাধী দয়িতকে।

বিদূষক—তুমি অপরাধ করেছ, তোমাকে উনি আঘাত করবেন।

রাজা—সিদ্ধিদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের বচন গ্রহণ করলাম।

(প্রমত্তা ইরাবতী ও চেটীর প্রবেশ)

ইরাবতী—হ্যাঁরে নিপুণিকা, শুনেছি প্রচুর মদ্যপান নাকি স্ত্রীলোকের বিশেষ শোভা। এই লোকোক্তি কি সত্যি ?

নিপুণিকা—প্রথমে লোকোক্তি ছিল, আজ সত্যি হল।

ইরাবতী—বাড়াবাড়ি করিস না। কী করে জানলি যে প্রভু এখন দোলাগৃহে গিয়েছেন ?

নিপুণিকা—আপনার প্রতি অখণ্ড স্নেহবশতঃ।

ইরাবতী—মন রাখতে হবে না। সোজাসুজি বল।

নিপুণিকা—বসন্ত-উপহারে-লোভী আর্যগৌতম বলেছেন। দেবী তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরাবতী—(অবস্থা অনুযায়ী চলে) ওরে, আমি মদ্যপানে অবশ, আমাকে হৃদয় তাড়া করেছে আর্যপুত্রকে দেখার জন্যে ; কিন্তু পা-দুটি পথে চলছে না।

নিপুণিকা—যাক্‌ দোলাগৃহে পেঁছে গিয়েছি।

ইরাবতী—নিপুণিকা, আর্যপুত্রকে তো দেখছি না।

নিপুণিকা—আপনি দেখুন, পরিহাস করে রাজামশাই কোথায় লুকিয়ে আছেন। আমরাও প্রিয়ঙ্গুলতায় ছাওয়া অশোকতরুর এই শিলাতলে প্রবেশ করি।

(ইরাবতী তাই করলেন)

নিপুণিকা—(পরিক্রমা করে দেখে) দেখুন রানীমা, আমরা যে-আমের মুকুল খুঁজছি তাতে পিঁপড়ে ধরেছে।

ইরাবতী—সে আবার কী ?

নিপুণিকা—এখানে বকুলাবলিকা অশোকতরুর ছায়াতে বসে মালবিকার চরণ অলংকৃত করছে।

ইরাবতী—(ভয়ের অভিনয় করে) এটা তো মালবিকার জায়গা নয়। (এখানে তো মালবিকার আসার কথা নয়)। এ কথা কেন ভাবছিস ?

নিপুণিকা—মনে হচ্ছে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে দেবী অশোকের দোহদ-পূরণের জন্যে মালবিকাকে নিযুক্ত করেছেন। নয়তো, দেবী নিজের পায়ের নূপুরজোড়া পরিজনকে (পরতে) অনুমতি দেবেন কেন ?

ইরাবতী—এই গৌরব সত্যি অনেক।

নিপুণিকা—কী হল ? রাজাকে খুঁজছেন না ?

ইরাবতী—দেখ, আমার পা চলছে না। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। যা আশঙ্কা করছি তার শেষ পর্যন্ত দেখব। (মালবিকাকে দেখে স্বগত) ঠিক জায়গাতেই আমার মন দুর্বল হয়েছে।

বকুলাবলিকা—(পা-টি দেখিয়ে) কী ? আলতা টানা তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

মালবিকা—সখী, নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি। কার কাছে তুমি প্রসাধনকলা শিখেছিলে ?
বকুলাবলিকা—এ বিষয়ে রাজার শিষ্যা আমি।
বিদূষক—যাও একে গুরুদক্ষিণার জন্যে তাগিদ দাও !
মালবিকা—ভাগ্যিস তোমার গর্ব হয় নি !
বকুলাবলিকা—(বিদ্যা-) প্রয়োগের উপযুক্ত পা-জোড়া পেয়ে আজ গর্ব করব। (স্বগত) আঃ ! আমার দৌত্য শেষ। (রঙ দেখে প্রকাশ্যে) সখী, তোমার এক পায়ে রঙ দেওয়া শেষ হয়েছে। শুধু ফুঁ দিয়ে শুকোতে হবে। অথবা, এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে।
রাজা—বন্ধু, দেখ দেখ—
এখন এর পায়ে কাঁচা আলতা ফুঁ দিয়ে বাতাস করে শুকিয়ে দেবার মতো আমার প্রথম-সেবার সুযোগে এসেছে।
বিদূষক—আর তোমার দুঃখ কী ? যথাকালে এ সুখ তুমি অনেকক্ষণ ভোগ করবে।
বকুলাবলিকা—সখী, তোমার পা-টি রাঙা-পদ্মের মতো দেখাচ্ছে। সর্বদা রাজার অঙ্কশায়িনী হও।

(ইরাবতী নিপুণিকার মুখের দিকে তাকাল)

রাজা—এ আমার আশীর্বাদ।
মালবিকা—সখী, যা বলার নয় তাই বলছ।
বকুলাবলিকা—যা বলার তাই আমি বলেছি।
মালবিকা—তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস।
বকুলাবলিকা—শুধু আমি নই।
মালবিকা—অন্য কে আবার ?
বকুলাবলিকা—গুণগ্রাহী রাজাও।
মালবিকা—মিথ্যে বললে। আমার মধ্যে মোটেই তা (রাজার ভালোবাসা) নেই।
বকুলাবলিকা—সত্যি, তোমার মধ্যে নেই, রাজার কৃশ এবং পাণ্ডুর অঙ্গে-অঙ্গে তা রয়েছে।
নিপুণিকা—হতভাগীর উত্তরটা যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল !
বকুলাবলিকা—'ভালোবাসার পরীক্ষা ভালোবাসাতেই হয়' সজ্জনদের এই কথাকে সত্যি প্রমাণ কর।
মালবিকা—কী নিজের খুশিমতো বলে যাচ্ছ ?
বকুলাবলিকা—না না, এই প্রেমকোমল কথাগুলো রাজার, শুধু আমার মুখে বলা হল।
মালবিকা—সখী, রানীর কথা ভেবে আমার মন মানে না।
বকুলাবলিকা—বোকা মেয়ে ! ভোমরা আছে বলে কি বসন্তের সর্বস্ব আমের মুকুল কানে পরা হবে না ?
মালবিকা—তুমি কিন্তু বিপদের সময়ে সহায় থেকো।
বকুলাবলিকা—আমি সত্যি বকুলাবলিকা, পিষে পিষে যার সুগন্ধ পাওয়া যায়।
রাজা—সাধু ! বকুলাবলিকা সাধু।
ওর মনের কথা জেনে কথা বলে এবং সংশয়ে ঠিকমতো উত্তর দিয়ে একে নিজ

নির্দেশে স্থাপিত করেছ! প্রেমিকের জীবন দূতীর উপরে নির্ভরশীল সে-কথা ঠিক।

ইরাবতী—হ্যাঁরে, দেখ। বকুলাবলিকাই মালবিকাকে এই পথে এনেছে।

নিপুণিকা—রানী! এ উপদেশ উদাসীনকেও উৎসুক করে তোলে।

ইরাবতী—আমি ঠিক জায়গাতেই সন্দেহ করেছিলাম। সব বুঝে নিয়ে এর পরে চিন্তা করব।

বকুলাবলিকা—এই যে অন্য চরণটিকেও সাজানো হয়ে গিয়েছে। এবারে দুটিতে নূপুর পরিয়ে দিই। (নূপুরজোড়া পরানোর অভিনয় করে) ওগো ওঠ। দেবীর দেওয়া অশোকের ফুল ফোটানোর কাজ কর।

(দুজনে উঠল)

ইরাবতী—দেবীর নিয়োগের কথা শুনলাম। তাই হোক এখন।

বকুলাবলিকা—এই যে রাগরঞ্জিত (রক্তবর্ণ অশোকপল্লব, অনুরক্ত রাজা) উপভোগযোগ্য তোমার সামনেই রয়েছে।

মালবিকা—(সানন্দে) কী ? রাজা ?

বকুলাবলিকা—(সস্মিত) না রাজা নয়। এই যে অশোক-শাখায় ঝুলছে পল্লবগুচ্ছ, একে কানে পরে নাও।

বিদূষক—কী ? তুমি শুনেছ তো ?

রাজা—প্রেমিকের পক্ষে এই যথেষ্ট।

আমার কাছে উদাসীন এবং উৎকণ্ঠিতের মিলনেও সম্ভোগের সন্ধি নেই, সমান অনুরাগসম্পন্ন দুজনের পরস্পর-মিলনের অভাবে শরীরনাশও বরং ভালো।

(মালবিকা পল্লবের কর্ণভূষণ পরে লীলাভরে অশোকতরুতে পাদপ্রহার করল)

রাজা—বন্ধু,

এর থেকে কর্ণভূষণ নিয়ে এ (মালবিকা) ওকেই পদাঘাত করছে। ওদের পরস্পর-বিনিময় দেখে নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে।

মালবিকা—আশা করি আমাদের গৌরব সফল হবে।

বকুলাবলিকা—সখী, তোমার দোষ নেই। যদি এ রকম চরণের স্পর্শ পেয়েও ফুল ফুটতে দেরি হয় তবে এই অশোকতরুটিই নির্গুণ।

রাজা—এই সুন্দরী নূপুরমুখরিত তাজা পদ্মের মতো কোমল চরণে (-র স্পর্শে) তোমাকে গৌরব দিয়েছে ; অশোকতরু, যদি তুমি সদ্য-সদ্য কুসুমিত না হও, তবে ললিত প্রেমিকদের মতো বৃথাই তোমার দোহদ।

বন্ধু, কথা বলার সুযোগে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে।

বিদূষক—এসো, ওকে নিয়ে মজা করব।

নিপুণিকা—রানী, রাজা এখানে প্রবেশ করছেন।

ইরাবতী—আমি প্রথমেই এ কথা ভেবেছিলাম।

বিদূষক—(এগিয়ে) দেবী, এঁর প্রিয়বন্ধু এই অশোকতরুকে বাঁ-পায়ে আঘাত করা কি ঠিক হয়েছে ?

উভয়ে—(সসম্ভ্রমে) এ কী রাজা !

বিদূষক—বকুলাবলিকা, তুমি সব জেনেশুনেও কেন এঁকে এই অবিনীত আচরণ থেকে

নিবৃত্ত করলে না ?

(মালবিকা ভয়ের অভিনয় করল)

নিপুণিকা—রানী দেখুন, আর্যগৌতম কী আরম্ভ করেছে !

ইরাবতী—হতভাগা বামুনটা আর কী করবে ?

বকুলাবলিকা—আর্য, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে। এর অন্যথা করতে হলে এ পরাধীন। মহারাজ প্রসন্ন হোন। (এই বলে নিজে এবং মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে প্রণাম করল)

রাজা—যদি তাই হয়, তবে তোমার দোষ নেই। ভদ্রে ওঠ। (হাত ধরে তুললেন)

বিদূষক—ঠিক কথা। এ বিষয়ে রানীর কথা মানা উচিত।

রাজা—(হেসে)—হে বামোরু, (কচি) কিশলয়কোমল চরণে কঠিন পাদপস্কন্ধে আঘাত করে তোমার বামচরণে কষ্ট হয় নি সুন্দরী ?

(মালবিকা লজ্জার অভিনয় করল)

ইরাবতী—(ঈর্ষা নিয়ে) আহা রে ! ননীর মতো কোমল আর্যপুত্রের হৃদয়।

মালবিকা—বকুলাবলিকা, চল দেবীকে জানাই আমরা আদেশ পালন করেছি।

বকুলাবলিকা—তবে মহারাজকে বল বিদায় দিতে।

রাজা—ভদ্রে যাবে। কিন্তু এই অবকাশের উপযুক্ত আমার একটি প্রার্থনা শোন।

বকুলাবলিকা—মন দিয়ে শোন। বলুন মহারাজ।

রাজা—এই মানুষটিতেও দীর্ঘদিন যাবৎ ধৈর্যের ফুল ধরছে না। অন্য কিছুতেই এর রুচি নেই, তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দোহদ পূরণ কর।

ইরাবতী—(হঠাৎ এগিয়ে এসে) পূরণ কর, পূরণ কর। হ্যাঁ, অশোকতরু শুধু ফুল ফোটায়, এ ফুল, ফল দুইই ধরে।

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত)

রাজা—(আড়ালে) বন্ধু, এখন কী করা যায় ?

বিদূষক—কী আর, পায়ের জোর।

ইরাবতী—বকুলাবলিকা, ভালোই শুরু করেছিস। মালবিকা, তুমি তাহলে আর্যপুত্রের প্রার্থনা পূরণ কর।

উভয়ে—রানী, প্রসন্ন হোন। আমরা রাজার প্রণয় পাবার কে ? (দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

ইরাবতী—ইস্। পুরুষেরা কি অবিশ্বস্ত। আমি ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধ হরিণীর মতোই তোমার কথাকে সত্যি ভেবে শঙ্কাশূন্যমনে (এত সব) জানতেই পারি নি !

বিদূষক—(জনান্তিকে) যা হোক কিছু বলে দাও। হাতে-নাতে ধরা পড়লেও চোর বলে থাকে, আমি সিঁধকাটা শিখছি।

রাজা—সুন্দরী, মালবিকার প্রতি আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম।

ইরাবতী—তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত ? আমি জানতাম না, আর্যপুত্র সময় কাটানোর জন্যে এমন একটি (ভোগ্য) বস্তু হাতে পেয়েছেন। নইলে হতভাগিনী আমি এমন কখনোই করতাম না।

বিদূষক—দেবী, আপনি তাঁর সৌজন্যের দোষ দেখবেন না। কার্যগতিকে দেখা হয়ে

গেলে রানীর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলাও যদি অপরাধ হয়, তবে এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে।

ইরাবতী—এর নাম কথাবার্তা? আমার তাতে কী আসে যায়? (সরোষে প্রস্থান)

রাজা—(অনুসরণ করে) ওগো প্রসন্ন হও!

(ইরাবতী রশনাজড়িত চরণে চলেছেনই)

রাজা—সুন্দরী, প্রেমিকের প্রতি এই উদাসীনতা ঠিক নয়।

ইরাবতী—শঠ! তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী।

রাজা—প্রিয়ে, আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমাকে শঠ বলে নিন্দা কর, সেও ভালো কিন্তু ওগো চণ্ডী, তোমার পায়ে পড়ি মেখলা নিয়ে ক্ষমা চাইলেও সেটুকু (ক্রোধটুকু) বিসর্জন দিও না।

ইরাবতী—এই হতভাগীও তোমারই মতো। (মেখলা তুলে রাজাকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন)

রাজা—এই—

অশ্রুবর্ষিণী রণচণ্ডী (ইরাবতী) অবহেলায় নিতম্ব-থেকে-খসে-পড়া সোনার মেখলাদাম নিয়ে আমাকে সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন মেঘরাজি বিদ্যুৎ-ঝলকে বিন্ধ্যপর্বতকে (ঝলসে দিচ্ছে)।

ইরাবতী—কী? আমাকে কেন বারবার অপরাধী করছ? (রশনাসহ হাতটি ধরলেন)

রাজা—কোঁকড়াচুলের সুন্দরী! আমি অপরাধ করেছি, আমার থেকে তুমি দণ্ড তুলে নিচ্ছ কেন? তুমি আমার কামনা বাড়িয়ে তুলছ, আবার এই দাসের প্রতি ক্রুদ্ধও হচ্ছ কেন?

এতে নিশ্চয়ই তোমার অনুমতি আছে। (পায়ে পড়লেন)

ইরাবতী—এ দুটো তোমার মালবিকার চরণ নয়, যারা তোমার স্পর্শের কামনা পূরণ করবে! (চেটীসহ নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—ওঠ প্রসাদ লাভ করেছ।

রাজা—(উঠে ইরাবতীকে না দেখে) একী! প্রিয়া চলে গিয়েছে?

বিদূষক—ভালোই হয়েছে যে তিনি এই অবিনয়ে রাগ করে চলে গিয়েছেন। সুতরাং আমরাও তাড়াতাড়ি পালাই যাতে তিনি মঙ্গলরাশির মতো আবার ঘুরে বক্রীর দিকে না আসতে পারেন।

রাজা—আহা! প্রেমের কী বৈপরীত্য!

প্রেয়সীতে (মালবিকাতে) আকৃষ্ট হৃদয়ে আমি তার (ইয়াবতীর) প্রণিপাতকে উপেক্ষা করাকেও সেবাই মনে করছি; এই ভাবেই আমি কুপিত অথচ প্রণয়বতী তাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হব। (বন্ধুর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

চতুর্থ অঙ্ক

(উৎকণ্ঠিত রাজা এবং প্রতিহারীর প্রবেশ)

রাজা—(স্বগত) তার কথা কানে শুনেই আশায় আশায় মূল সৃষ্টি হয়েছিল, চোখে দেখার পরে তাতে আরক্ত কিশলয় দেখা দিল, হস্তস্পর্শ করাতে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে ফুল ফুটেছিল, (কামনার) এই মনসিজ তরু আমাকে নিশ্চয়ই ফলের রসও গ্রহণ করাবে!

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম!

প্রতিহারী—রাজার জয় হোক। গৌতম এখানে নেই।

রাজা—(স্বগত) তাই তো! তাকে মালবিকার খবর নিতে পাঠিয়েছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

রাজা—জয়সেনা, জেনে এসো, দেবী ধারিণী কোথায় এবং পায়ের ব্যথা নিয়ে তিনি কিভাবে চিত্তবিনোদন করছেন।

প্রতিহারী—মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বন্ধু, তোমার সখীর কী খবর?

বিদূষক—বেড়ালের হাতে পড়া পরভৃতিকার মতো।

রাজা—(বিষণ্ণভাবে) কী রকম?

বিদূষক—সে বেচারীকে পিঙ্গলাক্ষী (ধারিণী) মাটির নিচে মৃত্যুমুখের মতো সারভাণ্ড-গৃহে আটকে রেখেছেন।

রাজা—আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে কি?

বিদূষক—হ্যাঁ।

রাজা—কে এমন শত্রু আছে যে দেবীকে চটিয়েছে?

বিদূষক—শোন, পরিব্রাজিকা আমাকে বলেছেন। গতকাল দেবী ইরাবতী দেবীকে পায়ের যন্ত্রণার কথা জিগ্যেস করতে এসেছিলেন।

রাজা—তারপর? তারপর?

বিদূষক—তখন তাকে রানী জিগ্যেস করেন—প্রিয়জনকে দেখেছ তো? তিনি বলেন—তোমার শিষ্টাচার ঠিক হল না, তুমি তো জানো না যে প্রিয়জন এখন পরিজনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন!

রাজা—ভেঙে না বললেও এ কথা মালবিকারই ইঙ্গিত দেয়।

বিদূষক—তখন তাঁর অনুরোধে তোমার অবিনয়ের কথা সবই তিনি রানীকে ভালোমতোই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাজা—আহা রানীর রাগ কী দীর্ঘস্থায়ী! তারপরে কী বল।

বিদূষক—তারপরে আর কী? মালবিকা এবং বকুলাবলিকা পায়ে শেকল নিয়ে দুই নাগকন্যার মতোই সূর্যকিরণশূন্য পাতালবাস করছে।

রাজা—সত্যি বড়ো কষ্টের।

মধুকণ্ঠী কোকিলবধূ এবং ভ্রমরী প্রফুল্ল সহকারবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ বৃষ্টিপাতের ফলে তারা কোটরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এর বিহিত করার কোনো উপায় হয় কি ?

বিদূষক—কী করে হবে ? কারণ, সারভাণ্ডগৃহের রক্ষিণী মাধবিকাকে রানী নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমার মুদ্রাঙ্কিত আংটি না দেখে হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে তুমি মুক্তি দেবে না।'

রাজা—(দীর্ঘশ্বাস। চিন্তা করে) বন্ধু এখন কী করা যায় ?

বিদূষক—(চিন্তা করে) একটা উপায় আছে।

রাজা—কী রকম ?

বিদূষক—(তাকিয়ে দেখে) অদৃষ্ট কেউ শুনে ফেলবে। তোমার কানে কানে বলি। (কানের কাছে মুখ নিয়ে) এই রকম।

রাজা—(সানন্দে) ভালোই ভেবেছ ! সিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ কর।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—মহারাজ, রানীমা খোলা হাওয়ায় বসে আছেন, রক্তচন্দন নিয়ে পরিজনেরা তাঁর পা-টি ধরে রেখেছে, ভগবতীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিশ্রাম করছেন তিনি।

রাজা—তাহলে আমাদের যাওয়ার পক্ষে এই উপযুক্ত সময়।

বিদূষক—তুমি তবে যাও। আমিও দেবীকে দেখার জন্যে হাতে একটা কিছু নিই।

রাজা—জয়সেনাকে জানিয়ে যেও কিন্তু।

বিদূষক—তাই হবে। (কানে কানে) এই রকম হবে। (ডেকে প্রস্থান)

রাজা—জয়সেনা, সেই প্রবাতশয়নের পথ বলে দাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে প্রভু।

(শায়িতা দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পদ অনুসারে বিভিন্ন পরিচারিকা)

দেবী—ভগবতী, গল্পটি ভারি চমৎকার। তারপরে ?

পরিব্রাজিকা—(তাকিয়ে দেখে) দেবী, এর পরে আবার বলব। বিদিশার রাজা স্বয়ং উপস্থিত।

দেবী—এ কী ! আর্যপুত্র ! (উঠবার চেষ্টা করলেন)

রাজা—থাক থাক। ভদ্রতা করে যন্ত্রণা পেতে হবে না। হে কলভাষিণী, নূপুরশূন্য, অনভ্যস্ত এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরণটি সোনার পাদপীঠে রেখে তাকে ও আমাকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই।

ধারিণী—আর্যপুত্রের জয় হোক।

পরিব্রাজিকা—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন) দেবী, তোমার যন্ত্রণা এখন সহ্যের মধ্যে এসেছে তো ?

ধারিণী—আমি এখন ভালো আছি।

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—বাঁচাও—বাঁচাও তুমি। আমাকে সাপে কামড়েছে।

(সকলে বিষণ্ণ)

রাজা—কী কষ্ট ! কী কষ্ট ! কোথায় ঘুরছিলে তুমি ?

বিদূষক—দেবীকে দর্শন করব বলে প্রমোদবনে গিয়েছিলাম ফুল তুলতে।

দেবী—হায় হায় ! আমিই ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয়ের নিমিত্ত হলাম।

বিদূষক—সেখানে অশোকগুচ্ছে হাত বাড়ালে কোটর থেকে মৃত্যু বেরিয়ে এসে আমাকে দংশন করে। এই যে দুটি দাঁতের চিহ্ন। (দেখালেন)

পরিব্রাজিকা—দষ্ট অংশের ছেদই প্রথম করণীয় এইরকম শোনা যায়। এর তাই করা হোক। দষ্ট অংশের ছেদন অথবা দাহ অথবা রক্তমোচন—দংশন মাত্রেই প্রাণ বাঁচানোর এই উপায়গুলোই আছে।

রাজা—এ তো এখন বিষবৈদ্যের কাজ। জয়সেনা, ধ্রুবসিদ্ধিকে তাড়াতাড়ি ডাকো।

প্রতিহারী—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—হায় ! কালমৃত্যু আমাকে গ্রাস করল।

রাজা—কাতর হয়ো না। বিষহীন দংশনও তো কখনো হয়।

বিদূষক—কেন ভয় পাব না ? আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। (বিষক্রিয়ার অভিনয়)

দেবী—হায় ! এই বিকার অমঙ্গলসূচক দেখাচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণকে ধর।

(পরিজনেরা ত্রস্তেব্যস্তে তাকে ধরল)

বিদূষক—ওহে ছোটোবেলা থেকে আমি তোমার প্রিয়বন্ধু। সেই কথা মনে রেখে একটি-মাত্র-পুত্রের-জননী আমার মায়ের দেখাশোনা কোরো।

রাজা—ভয় পেয়ো না। স্থির হও। বৈদ্য শীগ্‌গির তোমার চিকিৎসা করবেন

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—প্রভু ! ধ্রুবসিদ্ধিকে আজ্ঞা জানালে তিনি বললেন, গৌতমকে নিয়ে এসো।

রাজা—তাহলে বর্ষবরেদের দিয়ে ধরে ধরে একে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

জয়সেনা—তাই হবে।

বিদূষক—(দেবীর দিকে তাকিয়ে) দেবী, আমি হয়তো বাঁচব না, এঁকে (রাজাকে) সেবা করতে গিয়ে যদি আপনার কাছে অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।

দেবী—দীর্ঘায়ু হও। (বিদূষক এবং প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বেচারা স্বভাবতঃ (বড়ো) ভীরু। যথার্থনামা ধ্রুবসিদ্ধির সিদ্ধিতেও বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—প্রভুর জয় হোক। ধ্রুবসিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'জলকুম্ভ করার জন্যে সর্পমুদ্রিত কোনো বস্তু চাই। তা খুঁজে দেখা হোক।'

দেবী—এই যে সর্পমুদ্রিত অঙ্গুরীয়ক। পরে (আবার) আমার হাতে দিয়ে যাবে। (দিলেন। সেটি নিয়ে প্রতিহারীর প্রস্থান)

রাজা—জয়সেনা, কার্যসিদ্ধি হলে সংবাদটি নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

পরিব্রাজিকা—আমার মন বলছে গৌতমের বিষ লাগে নি।

রাজা—তাই হোক।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—মহারাজের জয় হোক। বিষমোক্ষণ করে গৌতম মুহূর্তের মধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

দেবী—ভাগ্য ভালো, আমি নিন্দে থেকে মুক্তি পেলাম।

প্রতিহারী—অমাত্য বাহুতক সংবাদ পাঠিয়েছেন, 'রাজকার্য-বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। সুতরাং একবার দর্শনের অনুগ্রহ ইচ্ছা করি।'

দেবী—আর্যপুত্র কার্যসিদ্ধির জন্যে যান।

রাজা—এ স্থানে বড়ো রোদ এসে পড়েছে। এই বেদনার পক্ষে শীতলতা প্রয়োজন। সুতরাং শয্যাটি অন্যত্র নিয়ে যাও।

দেবী—মেয়েরা, আর্যপুত্রের কথা শোনো।

পরিজন—বেশ। (দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পরিজন নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—জয়সেনা, গোপনপথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চলো।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে প্রভু।

রাজা—জয়সেনা, সত্যি, গৌতম তার কাজ শেষ করেছে।

প্রতিহারী—হ্যাঁ।

রাজা—ইষ্টপ্রাপ্তির জন্যে একান্ত সঙ্গত পরিকল্পনার কথা জানা সত্ত্বেও সিদ্ধির বিষয়ে সন্দিগ্ধ আমার দুর্বল চিত্ত আশঙ্কা করছে।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তোমার সব মঙ্গলকর্ম সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা—জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজ করো।

প্রতিহারী—প্রভুর যেমন আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—বন্ধু, মাধবিকা বড়ো কুটিল। সেও কিছুই বলে নি?

বিদূষক—রানীর মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখার পরে কী করে কিছু বলবে?

রাজা—মুদ্রা নিয়ে বলছি না। 'বন্দী দুজনকে কেন মুক্তি দেওয়া হচ্ছে?' 'রানীর পরিচারিকাদের বাদ দিয়ে তোমাকে কেন বলা হল' সে এইসব প্রশ্ন করতে পারত।

বিদূষক—সে-কথা জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু (আমি) বোকা হলেও তখন উপস্থিতবুদ্ধি জুগিয়েছিল।

রাজা—বলো—

বিদূষক—আমি বললাম—জ্যোতিষীরা রাজাকে জানিয়েছেন, 'একটি নক্ষত্রের কুদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপরে, সকল বন্দীকে মুক্তি দিন।'

রাজা—(সানন্দে) তারপরে? তারপরে?

বিদূষক—তাই শুনে সে ভেবেছে, 'রানী-ইরাবতীর মন রাখতে চেয়ে রাজা আমাকে আদেশ করেছেন—এই রকমই দেখাতে চেয়েছেন, সুতরাং আমাকে পাঠানোই সঙ্গত হয়েছে।'

রাজা—(বিদূষককে আলিঙ্গন করে) সখা, তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস।

সুহৃদজনের বুদ্ধিবলেই শুধু লক্ষ্যবিষয় লাভ হয় তা নয়, কার্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম (কঠিন) উপায় স্নেহবশেও পাওয়া যায়।

বিদূষক—তাড়াতাড়ি করো। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে সমুদ্রগৃহে বসিয়ে রেখে তোমার কাছে এসেছি।

রাজা—আমি তাকে মর্যাদা দেব। তুমি এগিয়ে যাও।

বিদূষক—এসো। (পরিক্রমা করে) এই যে সমুদ্রগৃহ।

রাজা–(সশঙ্কোচে) বন্ধু এই যে তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা ব্যস্তহাতে কুসুমচয়নে রত হয়ে এদিকে আসছে। আমরা তাহলে এখানে দেয়ালের আড়ালে যাই।

বিদূষক–আহা চোরেদের এবং কামুকদের উচিত চন্দ্রিকা পরিহার করা।

(দুজনে যেমন বলা তাই করলেন)

রাজা–গৌতম, তোমার সখী কীভাবে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? এসো গবাক্ষ-পথে তাকে দেখি।

বিদূষক–তাই হবে। (উভয়ে দেখতে লাগলেন)

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—সখী, প্রভুকে প্রণাম করো।

রাজা–মনে হয় আমার প্রতিকৃতি দেখাচ্ছে

মালবিকা—(সানন্দে) তোমাকে প্রণাম। (দুয়ারপানে চেয়ে বিষণ্ণভাবে) সখী, আমাকে প্রতারণা করছ!

রাজা–বন্ধু, এর আনন্দ এবং বিষাদ দেখে আমি প্রীত। সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে পদ্মফুলের যে-অবস্থা হয় এক মুহূর্তে সুন্দরীর মুখে সেই অবস্থা দেখা গেল।

বকুলাবলিকা–আহা এই যে চিত্রাঙ্কিত প্রভু।

উভয়ে–(প্রণাম করে) প্রভুর জয় হোক!

মালবিকা–সখী, সেদিন সামনা-সামনি প্রভুর রূপ দেখে তেমন তৃপ্তি পাই নি, যেমনটি আজ হল; (আজ) আমি মন দিয়ে চিত্রে প্রভুকে দেখলাম।

বিদূষক–শুনলে তো! ইনি বলছেন, ছবিতে যেমন দেখতে আসলে তোমাকে তেমন দেখায় না। রত্নপূর্ণ পেটিকার মতো তুমি বৃথাই যৌবনের গর্ব কর।

রাজা–বন্ধু কৌতূহল থাকলেও স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হয়। দেখো–

আয়তলোচনারা প্রথমমিলনে প্রিয়তমের রূপ পরিপূর্ণভাবে দেখতে ইচ্ছা করলেও তারা পূর্ণদৃষ্টিপাত করতে পারে না।

মালবিকা–সখী, সামান্য মুখ ফিরিয়ে ইনি কে, যাকে প্রভু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন?

বকুলাবলিকা–পাশে ইনি ইরাবতী।

মালবিকা–সখী, প্রভুর সৌজন্য নেই মনে হচ্ছে, তিনি সব রানীকে ছেড়ে একজনের মুখের পানে (এভাবে) চেয়ে আছেন।

বকুলাবলিকা–(স্বগত) চিত্রিত প্রভুকে সত্যি ভেবে ঈর্ষা করছে। ঠিক আছে। এর সঙ্গে একটু খেলা করা যাক। (প্রকাশ্যে) সখী, প্রভুর বড়ো প্রিয় ইনি।

মালবিকা–তাহলে আমি কেন এখন এত কষ্ট করছি! (ঈর্ষাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল

রাজা–সখা, দেখো–

ভ্রূভঙ্গে তিলক ভিন্ন, অধরোষ্ঠ স্ফুরিত, অসূয়া নিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে এ অপরাধী প্রেমিকের প্রতি শিক্ষকের ললিত-অভিনয়ের শিক্ষাই দেখিয়েছে যেন।

বিদূষক–অনুনয় করার জন্যে প্রস্তুত হও।

মালবিকা–আর্য গৌতমও এখানে এঁকেই সেবা করছেন।

(পুনরায় অন্যস্থানে যেতে উদ্যত)

বকুলাবলিকা–(মালবিকাকে রুদ্ধ করে) এখন তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি।

মালবিকা–যদি মনে কর আমি অনেকক্ষণ কুপিত হয়েছি তবে এই ক্রোধ সংবরণ করছি।

রাজা–(সামনে এসে)

কমলনয়নে, চিত্রে-অঙ্কিত আমার ব্যবহারে তুমি কেন কুপিত হচ্ছ ? সত্যি বলছি, আমি তোমার সামনে এখন অনন্যসাধারণ দাস।

বকুলাবলিকা–প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা–আমি কি চিত্রে অঙ্কিত প্রভুর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করছি !

(লজ্জিতমুখে কৃতাঞ্জলি হলেন। রাজার কাম-দুর্বলতা প্রকাশ)

বিদূষক–তুমি (হঠাৎ) উদাসীন হয়ে গেলে কেন ?

রাজা–তোমার সখীর অবিশ্বাস্যতার জন্যে।

বিদূষক–এঁর প্রতিও তোমার অবিশ্বাস !

রাজা–শোনো–

স্বপ্নে দৃষ্টিপথে এসেও তোমার সখী মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়, দুই বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েও হঠাৎ সে দ্রুত (অন্যত্র) চলে যায়, বন্ধু, মদনযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে এই রকম মিলনের মায়া দেখলে এর প্রতি আমার মন কীভাবে বিশ্বাস রাখবে।

বকুলাবলিকা–সখী, প্রভুকে নানাভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। এবারে নিজের বিশ্বাস অর্জন করো।

মালবিকা–আমার মন্দভাগ্যে তো প্রভুর সঙ্গে স্বপ্নে মিলনও দুর্লভ ছিল।

বকুলাবলিকা–প্রভু, এর উত্তর দিন।

রাজা–উত্তর দেবার কী আছে, পঞ্চবাণের অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি নিজেকেই তো তোমার সখীর কাছে অর্পণ করেছি, আমাকে সেবা করতে হবে না, আমিই (তাকে) গোপনে সেবা করতে চাই।

বকুলাবলিকা–আমরা অনুগৃহীতা হলাম।

বিদূষক–(পরিক্রমা করে সভয়ে) বকুলাবলিকা, এই বালাশোকের পল্লবগুলোকে একটি হরিণ খেতে চেষ্টা করছে। এসো আমরা একে নিবৃত্ত করি।

বকুলাবলিকা–ঠিক আছে। (প্রস্থান)

রাজা–বন্ধু, এভাবেই এই বিশেষমুহূর্তে আমাদের রক্ষা করা তোমার উচিত।

বিদূষক–গৌতমকেও কি সে কথা বলতে হবে ?

বকুলাবলিকা–(পরিক্রমা করে) আর্য গৌতম, আমি আড়ালে থাকি, আপনি দ্বার রক্ষা করুন।

বিদূষক–ঠিক কথা। (বকুলাবলিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক–তাহলে এই স্ফটিক-বাঁধানো চত্বরে বসি। (তেমন করে) আহা এই বিশেষ শিলার স্পর্শ কী সুখকর ! (নিদ্রিত)

(মালবিকার সভয়ে অবস্থান)

রাজা–সুন্দরী, মিলনের আশঙ্কা ত্যাগ করো। দীর্ঘকাল তোমার প্রণয়ে উন্মুখ সহকার-তরুসদৃশ আমার প্রতি অতিমুক্তলতার মতো শোভিত হও।

মালবিকা–দেবীর ভয়ে নিজের পছন্দমতো কাজ করতে পারছি না।

রাজা—ওগো, ভয় নেই।

মালবিকা—(ব্যঙ্গের স্বরে) প্রভু যে ভয় পান না তা তো আমি ঠাকরুণের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে দেখেছি।

রাজা—বিম্বোষ্ঠী, নাগরকদের (অথবা বিম্বিকের বংশধরদের) কুলব্রত হল দাক্ষিণ্য। আয়তনয়না, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই আবদ্ধ।
সুতরাং বহুদিন ধরে তোমাতে অনুরক্ত এই মানুষকে অনুগ্রহ করো।

(রাজার আলিঙ্গনের অভিনয়। মালবিকা পরিহারের অভিনয় করল)

রাজা—(স্বগত) যুবতী-অঙ্গনাদের কামকলার ক্রিয়া সত্যি রমণীয়।
কম্পিত শরীরে সে আমার মেখলা-উম্মোচনে-ব্যস্ত-আঙুলের হাতকে রুদ্ধ করছে, জোর করে আলিঙ্গন করলে নিজের দুটি হাতে স্তনাবরণ করছে, মুখটি তুলে (অধরসুধা) পান করতে গেলে সুন্দর পক্ষ্মের চোখ নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—আমাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও সে আমাকে অভিলাষপূরণের সুখই দিচ্ছে।

(ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরাবতী—হ্যাঁরে নিপুণিকা, সত্যি তোকে চন্দ্রিকা বলেছে যে সমুদ্রগৃহের অলিন্দে আর্য গৌতমকে একাকী শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ?

নিপুণিকা—না হলে ঠাকরুণকে বলব কেন ?

ইরাবতী—তা হলে বিপদ-থেকে-মুক্ত আর্যপুত্রের প্রিয়বয়স্যকে জিগ্যেস করতে সেখানেই যাব।

নিপুণিকা—ঠাকরুন যেন আরো কি বলতে চান !

ইরাবতী—চিত্রাঙ্কিত আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতেও যাব।

নিপুণিকা—তাহলে এখন প্রভুকেই কেন প্রসন্ন করছেন না।

ইরাবতী—বোকা মেয়ে ! যেমন চিত্রে অর্পিত তেমনিই অন্যের মধ্যে আর্যপুত্রের হৃদয় অর্পিত। নষ্ট সৌজন্যের রক্ষার জন্যেই এই ব্যবহার।

নিপুণিকা—এই দিকে, এই দিকে ঠাকরুণ। (উভয়ের পরিক্রমা)

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—ঠাকরুনের জয় হোক। রানীমা বললেন, 'আমার এখন ঈর্ষা করার সময় নয়। তোমার মান রাখতে সখীর সঙ্গে মালবিকাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছি। তুমি অনুমতি দিলে আর্যপুত্রের মনমতো কিছু করি ! তোমার যা ইচ্ছা জানাও'।

ইরাবতী—নাগরিকা, রানীকে জানাও, ঠাকরুনকে নির্দেশ দেবার আমরা কে ? পরিজনকে শৃঙ্খলিত করে, আমাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে। অন্য কাকে প্রসন্ন করে এই মানুষের (আমার) শ্রীবৃদ্ধি হবে ?

চেটী—তাই হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

নিপুণিকা—(পরিক্রমা করে দেখে) ঠাকরুন, এই যে সমুদ্রগৃহের দরজায় দোকানের ষাঁড়ের মতো আর্য গৌতম বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন।

ইরাবতী—কী সর্বনাশ ! আশা করি বিষের বিকার আর নেই।

নিপুণিকা—মুখের ভাব তো প্রসন্নই দেখছি। এমন কি ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করছেন। সুতরাং অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।

বিদূষক—(ঘুমের ঘোরে কথা বলছে) দেবী, মালবিকা—

নিপুণিকা—শুনলেন তো ঠাকরুন ! এ হতভাগা ঠকটা যে কার ছেলে ! সব সময় স্বস্তিবাচন পড়ে এখান থেকে পেট পুরে মিষ্টি খেয়ে এখন ঘুমের ঘোরে মালবিকাকে ডাকা হচ্ছে।

বিদূষক—ইরাবতীকে হারিয়ে দাও।

নিপুণিকা—এ কী কাণ্ড ! সাপের ভয়ে ভীত এই বামুনপোকে আমি সাপের মতো কুটিল (বাঁকাচোরা) এই লাঠি দিয়ে থামের আড়াল থেকে ভয় দেখাই।

ইরাবতী—এ কৃতঘ্নের এই অত্যাচারই প্রাপ্য।

(নিপুণিকা বিদূষককে দণ্ডের আঘাত করল)

বিদূষক—(হঠাৎ জেগে উঠে) ছি ! ছি ! ওহে বন্ধু, আমায় উপরে সাপ এসে পড়েছে।

রাজা—(হটাৎ এগিয়ে এসে) সখা, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।

মালবিকা—(অনুসরণ করে) প্রভু, হঠাৎ বেরিয়ে যাবেন না, সাপের কথা বলছেন ইনি।

ইরাবতী—হায় হায় ! ছি ছি ! প্রভু এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিদূষক—(জোরে হেসে) ওঃ ! এ তো একটা লাঠি ! আমি কিন্তু ভাবলাম, আমি যে কেতকীকণ্টকে সর্পের মতো দংশন করেছিলাম, তারই ফল ফলেছে।

(পর্দা ঝাঁকিয়ে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা—না না ! প্রভু যাবেন না। এখানে কুটিলগতি সাপের মতো কী দেখা যাচ্ছে।

ইরাবতী—(থামের আড়াল থেকে রাজার সামনে এসে) মিলনের দিবা-সংকেতের মনোরথ নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়েছে তো ?

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত)

রাজা—প্রিয়ে, তোমর এই সৌজন্য অপূর্ব।

ইরাবতী—বকুলাবলিকা, ভালো, যে তোর দূতীর প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে।

বকুলাবলিকা—ঠাকরুন, প্রসন্ন হোন। ব্যাঙের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীকে বিস্মৃত হন ?

বিদূষক—তা নয়। আপনাকে দেখামাত্র ইনি (সেদিনের) প্রণিপাতের (পরেও) অবমাননার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দেবী তো আজও প্রসন্ন হচ্ছেন না।

ইরাবতী—রাগ করেই বা এখন কী করব ?

রাজা—অস্থানে রাগ প্রকাশ তোমার অনুপযুক্ত কাজ। কারণ,

সুন্দরী, কবে বিনা কারণে তোমার মুখ ক্ষণেকের জন্যেও কুপিত হয়েছে ? পূর্ণিমা ছাড়া রাতের চন্দ্রমণ্ডল কীভাবে রাহুগ্রস্থ হবে, বলো ?

ইরাবতী—আর্যপুত্র ঠিকই বলেছেন, অস্থানে। আমার সৌভাগ্য যখন অন্যের হস্তগত হয়েছেই, তখন রাগ করলে হাস্যাস্পদ হব।

রাজা—তুমি অন্যভাবে নিচ্ছ। আমি কিন্তু সত্যি রাগের মতো কিছু দেখছি না। কেননা, অপরাধ করলেও উৎসবের দিনে পরিজনদের বন্দী করে রাখা উচিত নয়। ফলে মুক্তি পেয়ে এরা দুজনে আমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

ইরাবতী—নিপুণিকা, যা, দেবীকে বল্—আজ আপনার পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়েছে।

নিপুণিকা—তাই হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক—(স্বগত) উঃ, কী অনর্থ এসে পড়ল ! বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত এসে চিলের মুখে পড়ল।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপুণিকা—(আড়ালে) ঠাকরুন, হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বলল—এইরকমভাবে এটা হয়েছে। (কানে কানে বলল)

ইরাবতী—(স্বগত) বুঝেছি। সত্যি এ ব্যাপারে বামুনপোরই সব কাজ। কামতন্ত্রের মন্ত্রীর (কুটিল) নীতি (কারসাজি)।

বিদূষক—দেবী, যদি নীতির এক অক্ষরও আমি পড়তাম তাহলে গায়ত্রীই ভুলে যেতাম।

রাজা—(স্বগত) এই সংকট থেকে কী করে নিজেকে মুক্ত করি?

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা—(উত্তেজিতভাবে) প্রভু, কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকের পিছনে দৌড়তে থাকলে একটি পিঙ্গল বানর দেখে ভয় পেয়ে রানীমার কোলে শুয়েও বাত্যাহত কিশলয়ের মতো কাঁপছেন কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন না।

রাজা—আহা! ছেলেমানুষের দুর্বলতা।

ইরাবতী—(উত্তেজিতভাবে) আর্যপুত্র সত্বর তাকে আশ্বস্ত করুন, তার সন্ত্রাসজনিত বিকার যেন বৃদ্ধি না পায়!

রাজা—আমি তাকে আশ্বস্ত করতে যাচ্ছি। (দ্রুত পরিক্রমা)

বিদূষক—(স্বগত) ওরে পিঙ্গল বানর, সাধু সাধু! তোর দ্বারাই স্বপক্ষ সংকট থেকে রক্ষা পেল।

(বয়স্যকে নিয়ে রাজা, ইরাবতী এবং নিপুণিকা, এবং প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

মালবিকা—সখী, দেবীর কথা ভেবে আমার বুক কাঁপছে। জানি না, এর পরে কী দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য, আশ্চর্য! পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হবার আগেই দোহদের মুকুলে তপনীয়-অশোকতরু আচ্ছন্ন হয়েছে। যাই হোক, রানীমাকে নিবেদন করি।

(শুনে সানন্দে)

বকুলাবলিকা—সখী, আশ্বস্ত হও। রানী সত্যপ্রতিজ্ঞ।

মালবিকা—তাহলে প্রমোদবনের রক্ষিণীর আড়ালে থাকি।

বকুলাবলিকা—তাই হোক। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অংক

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা—তপনীয়-অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করে দিয়েছি। আমি কর্তব্যকর্ম শেষ করেছি, দেবীকে সে-কথা জানাই। (পরিক্রমা করে) আহা! মালবিকা সত্যি অদৃষ্টের অনুকম্পার যোগ্য। তার প্রতি ক্রুদ্ধ দেবী অশোককুসুমের বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। দেবী কোথায় থাকতে পারেন! (দেখে নিয়ে) আহা! এই তো রানীমার পরিজনদের মধ্যে কুঁজো সারসক গালার শীলমোহর করা পেটিকা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। একেই জিজ্ঞেস করি।

(যেমনটি বলা হল তেমন কুব্জের প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা—(এগিয়ে এসে) সারসক, কোথায় যাচ্ছ ?

সারসক—মধুকরিকা, বিদ্বান ব্রাহ্মণদের নিয়মিত দক্ষিণা দেওয়া হয়। আর্য পুরোহিতের হাতে তাই দিতে চলেছি।

মধুকরিকা—কেন ?

সারসক—যে-দিন থেকে রাজপুত্র বসুমিত্রকে সেনাপতি যজ্ঞাশ্ব-রক্ষার ভার দিয়েছেন সেই-দিন থেকে তার আয়ুষ্কামনায় রানী যোগ্য মানুষকে অষ্টাদশ সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দান করেন।

মধুকরিকা—ঠিকই তো ! এখন রানীমা কোথায় ? আর কী করছেন ?

সারসক—মঙ্গলগৃহে আসনে বসে বিদর্ভদেশ থেকে ভাই বীরসেনের পাঠানো চিঠি লেখকদের মুখে শুনছেন।

মধুকরিকা—বিদর্ভরাজের কী সংবাদ ?

সারসক—বীরসেনপ্রমুখের হাতে রাজার বিজয়সেনার কাছে বিদর্ভরাজ বশীভূত হয়েছেন। রাজার আত্মীয় মাধবসেনও মুক্ত হয়েছেন। তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দিয়ে এবং শিল্পকর্মে নিপুণা বহু পরিচারিকা উপহার দিয়ে রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আগামীকাল তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মধুকরিকা—যাও নিজের কাজ করো। আমি দেবীর সঙ্গে দেখা করব।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—অশোকতরুর সৎকারে ব্যস্ত দেবী আদেশ করেছেন, 'আর্যপুত্রকে নিবেদন করো, আমি আর্যপুত্রের সঙ্গে অশোকতরুর কুসুমশোভা দেখতে চাই।' তাই বিচারালয়ে গিয়ে রাজার অপেক্ষা করি। (পরিক্রমা করছে)

(নেপথ্যে দুজন বৈতালিক)

সৌভাগ্যক্রমে রাজা সৈন্য নিয়ে শত্রুর মাথায় উঠেছেন।

প্রথম—কোকিলের কলকূজনে আনন্দ করে আপনি অঙ্গযুক্ত অনঙ্গের মতো বিদিশার তীরে উদ্যানে উদ্যানে বসন্ত উদ্‌যাপন করছেন, হে বরদ, আপনি প্রবল, বরদা-নদীর তটস্থ বৃক্ষগুলি আপনার বিজয়হস্তীদের বন্ধনস্তম্ভ হয়েছিল, তাদেরই সঙ্গে আপনার শত্রুও অবনত হয়েছে।

দ্বিতীয়—হে দেবোপম, ক্রথকৈশিকদের বিষয়ে আপনাদের উভয়ের কীর্তির বিষয়ে কবিরা বীরপ্রীতিবশতঃ পদ রচনা করেছেন—আপনি চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বিদর্ভরাজের শ্রীসম্পদ হরণ করেছেন, আর যুগদণ্ডের মতো (চার) বাহুতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন।

প্রতিহারী—এই যে জয়-শব্দের লক্ষ্য রাজা এদিকেই আসছেন। আমিও তবে সামনে থেকে একটু সরে এসে এই অলিন্দের তোরণে দাঁড়াই। (একপাশে দাঁড়াল)

(বয়স্যকে নিয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—যার সঙ্গে মিলন অতি দুর্লভ সেই-প্রিয়ার কথা ভেবে এবং সৈন্যবলে বিদর্ভরাজ

পরাজিত হয়েছে শুনে আমার হৃদয় রৌদ্রতপ্ত দিনে বৃষ্টিধারায় সিক্ত পদ্মের মতো দুঃখ ও সুখ দুই-ই অনুভব করছে।

বিদূষক—আমি যেমনটি দেখছি তাতে তুমি সুখীই হবে।

রাজা—কেমন করে?

বিদূষক—আজ দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বলেছেন, 'ভগবতী, আপনি যে প্রসাধনকলার গর্ব করেন, আজ তা মালবিকার অঙ্গে বিবাহ-সজ্জায় প্রদর্শন করুন।' তিনিও বিশেষভাবে মালবিকাকে অলংকৃত করেছেন। তিনি হয়তো আপনার মনোরথও পূর্ণ করবেন।

রাজা—বন্ধু, আমার বিষয়ে ঈর্ষাশূন্য ধারিণীর পূর্বের আচরণের ফলে এ হয়তো সম্ভব।

প্রতিহারী—(কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। দেবী নিবেদন করছেন, 'তপনীয়-অশোকতরুর কুসুমসম্ভার দর্শনে আমার উদ্যোগ সফল করো।'

রাজা—দেবী কি সেখানেই আছেন?

প্রতিহারী—হ্যাঁ। মর্যাদা-অনুযায়ী-সম্মানে সুখী অন্তঃপুর ছেড়ে দেবী মালবিকাকে সামনে রেখে সব পরিজনদের নিয়ে প্রভুর অপেক্ষা করছেন।

রাজা—(সানন্দে বিদূষককে দেখে) জয়সেনা, এগিয়ে যাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে প্রভু। (সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক—(দেখে) বন্ধু, প্রমোদবনে বসন্ত যেন যৌবন সামান্য অতিক্রম করেছে।

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ। সামনে কুরবক ফুল ছড়ানো, সহকারতরুতে ফলসম্ভারের জাল বিস্তীর্ণ, বসন্তঋতুর প্রায় পরিণত যৌবন চিত্তকে উৎসুক করছে।

বিদূষক—ওহে, এই যে পুষ্পস্তবকের ভারে যেন (বসন)-সজ্জিত তপনীয়-অশোকতরু। তুমি চেয়ে দেখো।

রাজা—যুক্তিপূর্ণভাবেই এ কুসুমপ্রকাশে মন্থর হয়েছিল। এখন যে এই অনন্যসাধারণ শোভা ধরেছে! দেখো—

মনে হচ্ছে এর দোহদ পূরণ করাতে, অন্য সমস্ত অশোকতরুর পুষ্পরাশি, যারা প্রথমে বসন্তের সূচনা করেছিল, এসে একেই আশ্রয় করেছে।

বিদূষক—ওহে থামো। আমরা কাছে এলেও ধারিণী মালবিকাকে তাঁর পাশে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাজা—(সানন্দে) বন্ধু দেখো,

আমাকে দেখে দেবী প্রিয়াকে নিয়ে বিনয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, যেন বসুমতী রাজশ্রীকে নিয়ে উঠে আসছেন, শুধু তাঁর (রাজশ্রীর) হাতে পদ্মটি নেই।

(ধারিণী, পরিব্রাজিকা, মালবিকা এবং পদ অনুযায়ী পরিজনদের প্রবেশ)

মালবিকা—(স্বগত) বিয়ের অলঙ্কারের কারণ আমি জানি। তবুও পদ্মপাতার উপরে জলের মতো আমার বুক কাঁপছে। আবার আমার বাঁ-চোখটিও বারবার স্ফুরিত হচ্ছে।

বিদূষক—ওহে বন্ধু, বিয়ের সাজে মালবিকাদেবীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাজা—একে দেখছি। যাকে—

অনতিলম্বিত দুকূলবাসে এবং বহু অলংকারে সজ্জিতা দেখে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রমাসের নক্ষত্রশোভিত, হিমমুক্ত রাত্রি, যখন জ্যোৎস্না সবেমাত্র দেখা দিয়েছে।

দেবী—(এগিয়ে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।
বিদূষক—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক।
পরিব্রাজিকা—মহারাজের জয় হোক।
রাজা—ভগবতী, অভিবাদন করি।
পরিব্রাজিকা—(আপনার) অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক।
দেবী—(সস্মিত) আর্যপুত্র, আমরা এই অশোকতরুটিকে তরুণীজনপরিবৃত তোমার সংকেতগৃহ স্থির করেছি।
বিদূষক—ওহে, তোমাকে সেবা করা হচ্ছে।
রাজা—(সলজ্জভাবে অশোকতরুকে পরিক্রমা করছেন) এই অশোকতরু দেবীর এ রকম সংকারের যোগ্য ছিল না, তা নয়; (তবুও) সে বসন্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা করে এখন তোমারই প্রয়াসের সমাদর করে পুষ্প-সজ্জা করেছে।
বিদূষক—ওহে তুমি শান্তভাবে যৌবনবতী একে দেখো।
দেবী—কাকে?
বিদূষক—দেবী, তপনীয়-অশোকতরুর কুসুমশোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা—(মালবিকাকে দেখে স্বগত) কাছে থেকেও বিচ্ছেদ বড়ো কষ্টের। আমি যেন এক চক্রবাক, প্রিয়া আমার সহচরী চক্রবাকী, আমাদের সম্পর্ককে অনুমতি না দিয়ে ধারিণী যেন রজনী।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—প্রভুর জয় হোক। প্রভু, অমাত্য নিবেদন করছেন, বিদর্ভদেশের উপঢৌকনের মধ্যে দুটি শিল্পনিপুণা কন্যা ছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকার দরুন তাদের পূর্বে আনা হয় নি। এখন প্রভুর কাছে তাদের আনা সম্ভব। সুতরাং প্রভু আদেশ দিতে পারেন।
রাজা—তাদের নিয়ে এসো।
কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রমণ, তাদের নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) এই দিকে দেবী।
প্রথমা—(জনান্তিকে) সখী মদনিকা, আগে না দেখলেও এই রাজবাড়িতে প্রবেশ করে আমার বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।
দ্বিতীয়া—জ্যোৎস্নিকা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকপ্রবাদ আছে, হৃদয়ের অবস্থাই ভাবী সুখ ও দুঃখের কথা জানিয়ে দেয়।
প্রথমা—তা এখন সত্যি হোক।
কঞ্চুকী—এই যে দেবীর সঙ্গে রাজা রয়েছেন। তোমরা এগিয়ে যাও।

(উভয়ে এগিয়ে গেল)

(মালবিকা এবং পরিব্রাজিকা দুই চেটীকে দেখে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন)

উভয়ে—(প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক। মহারানীর জয় হোক।

(রাজার আদেশ পেয়ে উভয়ের উপবেশন)

রাজা—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যা শিক্ষা করেছ?

উভয়ে–প্রভু, আমরা সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ।

রাজা–দেবী, এদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করো।

দেবী–মালবিকা, এই দিকে দেখো। কোন্‌জনকে তোমার সঙ্গীতের সহকারিণী হিসেবে পছন্দ ?

উভয়ে–(মালবিকাকে দেখে) এ কী ! রাজকুমারী ! (প্রণাম করে) জয় হোক ! জয় হোক রাজকুমারীর। (তাঁর সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ)

(সকলের সবিস্ময়ে অবলোকন)

রাজা–তোমরা কে ? ইনিই বা কে ?

উভয়ে–প্রভু, ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা–সে কী রকম ?

উভয়ে–রাজমশাই শুনুন–প্রভুর বিজয়সৈন্য বিদর্ভরাজকে বশীভূত করে যাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, ইনি সেই মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী. এঁর নাম মালবিকা।

দেবী–কী ! ইনি রাজপুত্রী ! আমি চন্দনকে পাদুকা করে দূষিত করেছি।

রাজা–এখন–ইনি কী করে এই অবস্থায় এলেন ?

মালবিকা–(দীর্ঘশ্বাস–স্বগত) অদৃষ্টবশে।

দ্বিতীয়া–প্রভু শুনুন, আমাদের রাজকুমার মাধবসেন জ্ঞাতিদের অধীন হয়ে পড়লে তাঁর অমাত্য আর্য সুমতি আমাদের মতো পরিজনদের ত্যাগ করে গোপনে এঁকে নিয়ে আসেন।

রাজা–এ আমি পূর্বে শুনেছি। তারপর ?

দ্বিতীয়া–এই পর্যন্তই। তারপরে আর আমরা জানি না।

পরিব্রাজিকা–এর পরের কথা মন্দভাগিনী আমি বলছি।

উভয়ে–রাজকুমারী, আর্যা কৌশিকীর মতো কণ্ঠস্বর !

মালবিকা–তিনিই তো !

উভয়ে–সন্ন্যাসিনীর বেশে আর্যা কৌশিকীকে চেনা কষ্ট। ভগবতী, প্রণাম হই।

পরিব্রাজিকা–তোমাদের মঙ্গল হোক।

রাজা–এ কী ! ভগবতী এদের চেনেন ?

পরিব্রাজিকা–তাই।

বিদূষক–তাহলে ভগবতী, এর বৃত্তান্তের শেষটুকু বলে দিন।

পরিব্রাজিকা–(আবেগসহ) শুনুন তাহলে। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা–বুঝলাম। তারপর ?

পরিব্রাজিকা–ভাই ওই রকম চলে যাওয়াতে তিনি তখন একে এবং আমাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছায় বিদিশাগামী একদল পথিকের সঙ্গে যুক্ত হন।

রাজা–তারপর ?

পরিব্রাজিকা–কিছুদূর গিয়ে বণিকেরা বনপ্রান্তে বিশ্রাম করা স্থির করেন।

রাজা–তারপর ?

পরিব্রাজিকা–তারপর,

হঠাৎ একদল (শত্রু-) সৈন্য পথ অবরোধ করে সেখানে আবির্ভূত হল ; তাদের দিকে তাকানো যায় না, তাদের দুই বাহুর মধ্যে বিশাল তূণীর, তার মধ্যে

সুতীক্ষ্ণবাণ, তাদের পুংখরূপী ময়ূরপুচ্ছ কান-পর্যন্ত কলাপ মেলেছে (যেন), তাদের হাতে ধনুক এবং তারা প্রচণ্ড গর্জন করছিল।

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

বিদূষক—দেবী, ভয় পাবেন না। ভগবতী পুরনো কথা বলছেন।

রাজা—তারপর ?

পরিব্রাজিকা—তারপর বণিক-যোদ্ধারা অল্পক্ষণের জন্যে যুদ্ধ করে দস্যুদের হাতে পরাজিত হল।

রাজা—এর পরে আর শোনা কষ্টকর।

পরিব্রাজিকা—তখন আমার ভাই—

শত্রুর হাতে অত্যাচারের ভয়ে কাতর এই মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রভুভক্তিতে প্রিয় প্রাণ দিয়ে প্রভুর ঋণ শোধ করল।

প্রথমা—হায় ! সুমতি মৃত !

দ্বিতীয়া—সেই জন্যেই রাজকুমারীর এই দশা হয়েছে।

(পরিব্রাজিকার অশ্রু বিসর্জন)

রাজা—ভগবতী, শরীরধারীদের এই লোকযাত্রা। যিনি প্রভুর ঋণ সার্থক করেছেন তাঁর জন্যে শোক করা উচিত নয়। তারপর ?

পরিব্রাজিকা—তারপর আমি মূর্ছা গেলে যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন আর একে দেখতে পেলাম না।

রাজা—আপনি বড়ো কষ্ট পেয়েছেন।

পরিব্রাজিকা—তারপরে ভাই-এর দেহের অগ্নিসংস্কার করে আবারও বৈধব্যদুঃখ নতুন করে ভোগ করে আপনার দেশে এসে আমি এই কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেছি।

রাজা—সজ্জনের এই পথই উপযুক্ত। তারপর ?

পরিব্রাজিকা—তারপরে এও বনচরদের হাত থেকে বীরসেনের কাছে, এবং বীরসেনের কাছ থেকে দেবীর কাছে এসেছে, দেবীর গৃহে প্রবেশ করে আমি একে দেখতে পেলাম। এখানেই গল্প শেষ।

মালবিকা—(স্বগত) এখন রাজা না জানি কী বলবেন।

রাজা—আহা বিপদ (মানুষের) কী অপমান করে ! কেননা,

দেবী-শব্দযোগ্যা এঁকে দাসীভাবে গ্রহণ করে রেশমী বস্ত্রকে স্নানের বস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

দেবী—ভগবতী, মালবিকা যে অভিজাতকুলোৎপন্না এ কথা প্রকাশ না করে আপনি ভালো করেন নি।

পরিব্রাজিকা—ছি ! ছি ! কারণ ছিল বলেই আমি গোপনতা অবলম্বন করেছিলাম।

দেবী—কী সেই কারণ ?

রাজা—যদি বলার মতো হয় তবে বলুন।

পরিব্রাজিকা—শুনুন। এর পিতা জীবিত থাকাকালীন লোকযাত্রার্থে আগত সিদ্ধপুরুষ এক সাধু আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এক বৎসর মাত্র দাসীরূপে থেকে তারপরে এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে। সুতরাং তোমার পদসেবা করে

এর অবশ্যম্ভাবী আদেশ পরিণত হচ্ছে দেখে আমি কালপ্রতীক্ষা করে ভালোই করেছি দেখছি।

রাজা—প্রতীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

কঞ্চুকী—প্রভু, কথায় কথায় ভুল হয়ে গিয়েছে। অমাত্য জানাচ্ছেন, 'বিদর্ভের বিষয়ে যা করণীয় তা আমরা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করেছি। এখন আমরা মহারাজের অভিপ্রায় কী তা শুনতে চাই।'

রাজা—মৌদ্‌গল্য, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভ্রাতাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাঁরা দুজনে বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে বিভক্ত হয়ে রাত্রিদিনের শীতল ও উষ্ণ কিরণের মতো শাসন করুন।

কঞ্চুকী—প্রভু, এই কথাই অমাত্য পরিষদে জানাই।

(রাজা অঙ্গুলিনির্দেশে অনুমোদন করলেন। কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত)

প্রথমা—(জনান্তিকে) রাজকুমারী, সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার অর্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাবেন।

মালবিকা—প্রাণসংশয় থেকে সে মুক্ত হয়েছে এই অনেক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—প্রভুর জয় হোক। প্রভু, অমাত্য নিবেদন করেছেন, প্রভুর বুদ্ধি শুভ। মন্ত্রি-পরিষদেরও একই মত। কেননা,

রথের দুটি ঘোড়া যেমন লাগাম টেনে রথীর ইচ্ছানুসারে চলে তেমনি এই দুই রাজাও বিভক্তভাবে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করে, পরস্পর-নিয়ন্ত্রণে নির্বিকারভাবে অবস্থান করবে এবং আপনারই অধীন থাকবে।

রাজা—তাহলে মন্ত্রিপরিষদকে বলো, সেনাপতি বীরসেনকে এই রকম ব্যবস্থা করতে লেখা হোক।

কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত, উপহারসহ পত্র নিয়ে পুনঃপ্রবেশ) প্রভুর আদেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই যে সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে উপহারসহ এই পত্রটি এসেছে। প্রভু এটি দেখুন।

(রাজা তাড়াতাড়ি উঠে উপাচার নিয়ে উপহারটি পরিজনদের দিলেন এবং পত্রটি খোলার অভিনয় করলেন)

দেবী—(স্বগত) আমারা ঐদিকেই উন্মুখ হয়ে আছি। গুরুজনদের কুশলসংবাদের পরে আমি বসুমিত্রের সংবাদ শুনব। সেনাপতি আমার পুত্রকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন।

রাজা—(বসে পড়েছেন) 'স্বস্তি। যজ্ঞগৃহ থেকে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশাস্থিত দীর্ঘায়ু পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করে নিবেদন করেছেন যে, তুমি জেনে রাখো যে, রাজযজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে একশত রাজপুত্রে পরিবৃত করে কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষার দায়িত্ব দিই। সংবৎসরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে (এই আদেশ দিয়ে) যজ্ঞাশ্বকে মুক্ত করে দিলে সেই অশ্বটি সিন্ধু নদের দক্ষিণদিকের তীরভূমিতে বিচরণ করতে থাকে, তখন অশ্বারোহী যবনসেনারা তাকে আক্রমণ করে। তখন উভয় সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়।' (দেবী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন)

রাজা—উঃ এই রকম ঘটেছে! (শেষাংশ পড়লেন) 'তারপর ধনুর্ধারী বসুমিত্র শত্রুগণকে পরাজিত করে সবলে আমাদের ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরে এসেছেন।'

দেবী—এতে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হল।

রাজা—(পত্রের শেষাংশ পড়ছেন) 'সগরের পৌত্র অংশুমানের মতো আমি এখন অশ্বটিকে ফিরে পেয়ে যজ্ঞ করছি। সুতরাং কালক্ষয় না করে রোষশূন্যমনে তুমি বধূগণকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞসেবা করার জন্যে এখানে উপস্থিত হও।

রাজা—অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা—কী আনন্দ! পুত্রের বিজয়ে (রাজ-) দম্পতীর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

(দেবীকে দেখে)

তোমার স্বামী তোমাকে শ্লাঘ্য বীরপত্নীদের অগ্রগণ্যা করে রেখেছেন, আজ পুত্রের গুণে তোমার সঙ্গে 'বীরপ্রসবিনী' শব্দটি যুক্ত হল।

বিদূষক—দেবী, আমি খুশি হয়েছি যে পুত্র পিতার মতোই হয়েছে।

পরিব্রাজিকা—বাচ্চা হাতিও যূথপতিকেই অনুকরণ করে।

কঞ্চুকী—প্রভু, এই কুমার—

এ সকল বীরকর্মে আমাদের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করছেন না, (কারণ) তার অপ্রতিহত উৎস আপনি, যেমন দুরন্ত বাড়বানলের উৎস মহর্ষি ঔর্ব। (অর্থাৎ আপনার পুত্রের এই বিজয় তো অস্বাভাবিক কিছু নয়)

রাজা—যজ্ঞসেনের শ্যালকসুদ্ধ সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক।

কঞ্চুকী—প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী—জয়সেনা, যাও, ইরাবতী ও অন্যান্য সব অন্তঃপুরিকাকে পুত্রের বিজয়বার্তা জানাও।

প্রতিহারী—বেশ। (প্রস্থান)

দেবী—এসো, তবে—

প্রতিহারী—(ঘুরে এসে) এই যে আমি।

দেবী—(জনান্তিকে) অশোকতরুর দোহদ-পূরণের জন্যে মালবিকাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে-কথা এবং এর অভিজাত বংশের কথা জানিয়ে ইরাবতীকে অনুনয় করে আমার কথা বলো—'তুমি আমাকে সত্যভ্রষ্ট কোরো না।'

প্রতিহারী—দেবীর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত। পুনরায় প্রবেশ)

রানীমা, পুত্রের বিজয়ের আনন্দে আমি অন্তঃপুরের আভরণের পেটিকা হয়ে পড়েছি।

দেবী—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! তাদের এবং আমার পক্ষে এ তো সমান আনন্দ।

প্রতিহারী—(জনান্তিকে) রানীমা, ইরাবতী জানিয়েছেন, ক্ষমতাশালিনী দেবীর উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির অন্যথা করা উচিত নয়।

দেবী—ভগবতী, আপনার অনুমতী পেলে আর্য সুমতির প্রথম-সংকল্পিত মালবিকাকে আর্যপুত্রের হাতে সমর্পণ করতে চাই।

পরিব্রাজিকা—এখানেও ওর উপরে তোমারই প্রভুত্ব।

দেবী—(মালবিকার হাত ধরে) আর্যপুত্র, প্রিয়নিবেদনের উপযুক্ত এই পারিতোষিকটি গ্রহণ করো। (রাজা সলজ্জভাবে নিরুত্তর রইলেন)

দেবী—(সস্মিত) আর্যপুত্র কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ?

বিদূষক—দেবী, এটাই লোকব্যবহার, নতুন বরমাত্রেই লজ্জা পেয়ে থাকে। (রাজা বিদূষকের দিকে তাকালেন)

বিদূষক—অথবা, দেবীর বিশেষ-স্নেহের-পাত্র দেবীশব্দযোগ্যা মালবিকাকে ইনি গ্রহণ করতে চাইছেন।

দেবী—এই রাজকুমারী তার কুলগৌরবেই 'দেবী' নাম পেয়েছে। পুনরুক্তির কী প্রয়োজন ?

পরিব্রাজিকা—না না, এ রকম নয়।

হে কল্যাণী, খনি-থেকে-ওঠা মণিও যদি সংস্কৃত না হয় তবে তো সোনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। (অসংস্কৃত মণিকে সোনায় বাঁধানো যায় না)

দেবী—(স্মরণ করে) ভগবতী, ক্ষমা করুন। জয়সেনা যাও, একটি পরিষ্কার রেশমীবস্ত্র নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—দেবীর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত। রেশমীবস্ত্র নিয়ে পুনঃপ্রবেশ) দেবী, এই যে।

দেবী—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করে) আর্যপুত্র, এখন একে গ্রহণ করো।

রাজা—তোমার শাসনে আমাদের কিছু বলার নেই।

পরিব্রাজিকা—আঃ ! গ্রহণ করেছেন।

বিদূষক—আহা, তোমার প্রতি দেবী কত সদয়। (দেবী পরিজনদের দেখছেন)

পরিজন—(মালবিকার কাছে এসে) মহারানীর জয় হোক। (দেবী পরিব্রাজিকাকে দেখছেন)

পরিব্রাজিকা—তোমার পক্ষে এ আশ্চর্য নয়।

স্বামীকে ভালোবেসে সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রতিপক্ষকে (সপত্নীকে) দিয়েও পতিসেবা করে থাকে ; সমুদ্রগামিনী নদীরা অন্য শত শত নদীকেও সাগরে পৌঁছে দেয়।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপুণিকা—মহারাজের জয় হোক। ইরাবতী জানিয়েছেন, 'স্বামীর সৌজন্য অবহেলা করে অপরাধ করেছি, তাই আমি নিজেই তাঁর অনুকূল আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।'

দেবী—নিপুণিকা, রাজা নিশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন।

নিপুণিকা—অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা—প্রভু যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত-হওয়াতে-প্রীত মাধবসেনকে সম্মান প্রদর্শন করতে চাই।

দেবী—ভগবতী, আমাদের পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না।

রাজা—ভগবতী, আমাদের পত্রে আমি আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান জানাব। (আক্ষরিক সম্মানসূচক অক্ষর লিপিবদ্ধ করব)

পরিব্রাজিকা—আপনার স্নেহে আমি পরাধীন।

দেবী—আর্যপুত্র, বলো, আরো কী প্রিয় কাজ করতে পারি ?

রাজা—এর পরে আর কী প্রিয় আছে ? তবুও এমন হোক—

দেবী, আমি মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি আমার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকো।

(ভরত বাক্য)

আমি আশ্বাস দিচ্ছি, অগ্নিমিত্র রাজা থাকতে প্রজাদের অনর্থ-দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক সমাপ্ত ॥

বিক্রমোর্বশী

কুশীলব

সূত্রধার	...	
পারিপার্শ্বিক	...	
পুরূরবা	...	নায়ক, প্রতিষ্ঠানের রাজা
মাণবক	...	বিদূষক
আয়ু	...	পুরূরবার পুত্র
নারদ	...	দেবর্ষি
চিত্ররথ	...	গন্ধর্বরাজ
কঞ্চুকী	...	অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
পল্লব, গালব	...	ঋষি ভরতের দুই শিষ্য
উর্বশী	...	স্বর্গের অপ্সরা, নাটকের নায়িকা
চিত্রলেখা	...	উর্বশীর সখী, একজন অপ্সরা
সহজন্যা, রম্ভা; অন্যান্য অপ্সরা	...	স্বর্গের অপ্সরা
দেবী	...	পুরূরবার মহিষী, কাশীরাজকন্যা ঔশীনরী
নিপুণিকা	...	রানীর পরিচারিকা
তাপসী	...	আয়ুর পালিকা
পরিজন	...	রানীর পরিচারক দল
যবনী	...	রাজার পরিচারিকা

নেপথ্য-চরিত্র

ইন্দ্র	...	স্বর্গের দেবরাজ
কেশী	...	এক দৈত্য
ভরত	...	নাট্যশাস্ত্ররচয়িতা মুনি

যিনি স্বর্গমর্ত্য ব্যাপ্ত করে আছেন, যাঁকে বেদান্তে এক-পুরুষ বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর' এই শব্দটি অন্য কাউকে না বুঝিয়ে যাঁকে একান্ত সার্থকভাবে বোঝায়, প্রাণাদিবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে মুমুক্ষুরা যাঁকে হৃদয়ে অন্বেষণ করেন, যিনি অচঞ্চল ভক্তিযোগে লভ্য, সেই মহেশ্বর —আপনাদের মঙ্গল করুন।

(নান্দীর পর)

সূত্রধার—বেশি কথায় কাজ নেই। (সাজঘরের দিকে চেয়ে) মারিষ এদিকে এসো তো!

পারিপার্শ্বিক—ভদ্র! এই যে আমি।

সূত্রধার—এই পরিষদ পূর্বতন কবিদের অনেক নাটক দেখেছেন। আজ আমি তাই বিক্রমোর্বশীয়-নামে একটি নাটক প্রদর্শনের আয়োজন করছি। তাই, অভিনেতাদের বলো তারা যেন যার যার অভিনয়-অংশ ভালো করে বুঝে নেন।

পারিপার্শ্বিক—আজ্ঞে তাই বলে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

সূত্রধার—এখন—তাহলে শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাই। (প্রণাম করে) আপনাদের সেবক আমাদের (এই নাট্যগোষ্ঠীর) প্রতি অনুকূল মনোভাব নিয়ে হোক আর এই রম্য নাটকের নায়কের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই হোক, আপনারা নিবিষ্ট চিত্তে কালিদাসের এই রচনাটি শুনুন।

(নেপথ্যে)

রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—এমন কেউ আমাদের রক্ষা করুন যিনি দেবতাদের বন্ধু অথবা যিনি আকাশপথে চলতে অভ্যস্ত।

সূত্রধার—(কান দিয়ে) আমার আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে কিসের যেন শব্দ শুনছি—মনে হচ্ছে যেন ক্রৌঞ্চীর আর্তরব। (চিন্তা করে) ও বুঝেছি। নরসুহৃৎ নারায়ণ-মুনির ঊরুজাত সুরনারী (উর্বশী) কৈলাসপতি কুবেরকে সেবা করে (নৃত্য প্রদর্শন করে) যখন ফিরছিল তখন মাঝপথে সুরবিদ্বেষীরা তাকে বন্দী করেছে। সেই জন্যে তার সহচরী অপ্সরা কাঁদছে। (প্রস্থান)

॥ প্রস্তাবনা সমাপ্ত ॥

(অপ্সরাদের প্রবেশ)

অপ্সরাদল—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—এমন কেউ আমাদের রক্ষা করুন যিনি দেবতাদের বন্ধু অথবা যিনি আকাশপথে চলতে অভ্যস্ত।

(হঠাৎ রথে চড়ে রাজা পুরূরবা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা—কাঁদবেন না। আমি পুরূরবা। সূর্য-উপাসনা করে ফিরছি। আমার কাছে এসে বলুন আপনাদের কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে?

রম্ভা—অসুরের হাত থেকে।

রাজা—কিন্তু আপনাদের উপরে অসুরেরা কী অন্যায় করেছে?

রম্ভা—শুনুন মহারাজ! যে বিশেষ-তপস্যায় শঙ্কিত ইন্দ্রের সুকুমার অস্ত্র, রূপগর্বিত লক্ষ্মীকে যে লজ্জা দিয়েছে, যে স্বর্গের অলংকারস্বরূপ, আমাদের প্রিয়সখী সেই উর্বশী যখন কুবেরের বাড়ি থেকে ফিরছিল সেই সময়—মাঝপথে তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে হিরণ্যপুরবাসী কেশী-নামে এক দৈত্য সঙ্গিনী চিত্রলেখাসহ তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—সেই পাষণ্ড কোন্ দিকে গিয়েছে বলতে পারেন ?

সহজন্যা—ঈশান কোণের দিকে।

রাজা—তাহলে ভেঙে পড়বেন না। আপনাদের সখীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি।

সকলে—চন্দ্রদেবের পৌত্রের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

রাজা—আমার জন্যে আপনারা কোথায় অপেক্ষা করে রইবেন ?

অপ্সরাদল—এই হেমকূটের চূড়ায়।

রাজা—সারথি ! ঈশানকোণের দিকে দ্রুতগতিতে রথ চালাও।

সূত—যে আজ্ঞে মহারাজ !

রাজা—(রথবেগ দেখে) চমৎকার ! রথের এই বেগ দেখে মনে হচ্ছে গরুড়ও যদি আগে গিয়ে থাকে তবে তাকেও ধরতে পারব, আর ইন্দ্রবিদ্বেষীর কথা কী বলব ! মেঘ চূর্ণ করে রথের ধুলোর মতো ঐ আগে আগে যাচ্ছে, চাকা এত জোরে ঘুরছে যে শলাকাগুলোর মধ্যে আরও-এক-প্রস্থ শলাকা যেন দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার মাথায় দীর্ঘ চামর স্থির হয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবিতে আঁকা। দণ্ডের চূড়া এবং নিজের পরিধি প্রান্ত পর্যন্ত পতাকাও টানটান হয়ে আছে জোর-বাতাসে। (রথ নিয়ে রাজা ও সারথির প্রস্থান)

রম্ভা—ওলো, রাজা তো গেলেন, চল্ আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াই গিয়ে।

অন্য সবাই—তাই চল্। (সবাই নির্দিষ্ট পাহাড়ী অঞ্চলে অপেক্ষা করে।)

রম্ভা—মহারাজা কি আমাদের হৃদয়ে-বেঁধা শূল উপড়ে ফেলতে পারবেন ?

মেনকা—ওলো, ভয় পাস নে, পারবেন বৈ কি। যুদ্ধ বাধলে ইন্দ্রও তাঁকে মর্ত্য থেকে সাদরে আনিয়ে তাঁকেই সেনাপতিপদে বরণ করেন। আর সে-যুদ্ধে জয় তো হাতের মুঠোয়।

রম্ভা—নিঃশেষে জয়ী হোন তিনি। (একটু থেমে) ওলো, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ। ঐ সেই রাজার সোমদত্ত-রথ দেখা যাচ্ছে, তার হরিণ-আঁকা নিশান উড়ছে দেখ্। ব্যর্থ হয়ে ফিরবেন, তা হতেই পারে না।

(সকলে চোখ মেলে চায়)

(রথে চড়ে রাজা, সারথি এবং চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ভয়ে-চোখ-বোজা উর্বশীর প্রবেশ)

চিত্রলেখা—ভয় পাস নে, ভয় পাস নে, প্রিয়সখী।

রাজা—আশস্ত হও সুন্দরী।

দানবের ভয় আর নেই, হে ভয়শীলা, বজ্রপাণির মহিমা যে ত্রিভুবনরক্ষায় রত ! তাই তোমার এই আয়তনয়ন মেলো, পদ্মলতা যেমন ভোরের পদ্মটি মেলে ধরে তেমনি।

চিত্রলেখা—এখনও তো জ্ঞান ফিরে পেল না, জীবনের লক্ষণটি শুধু নিঃশ্বাসটুকুতে ধরা আছে।

রাজা—খুবই ভয় পেয়েছেন ইনি।

দেখো, পুষ্পবৃন্তের মতো কোমল হৃদয়টিতে কম্পন যে এখনও থামে নি স্তন-দুটির মধ্যে হরিচন্দনের স্পন্দন তা বলে দিচ্ছে।

চিত্রলেখা—সখী উর্বশী, নিজেকে একটু সামলে নে। তোর ভাব দেখে কিন্তু অপ্সরা বলে মনে হচ্ছে না।

(উর্বশী চেতনা লাভ করে)

রাজা—(সহর্ষে) তোমাদের প্রিয়সখী চেতনা লাভ করেছেন। দেখো—

চাঁদ উঠলে রাত্রি যেমন অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে লাবণ্যময়ী হতে থাকে, রাত্রির অগ্নিশিখা যেমন ধূমমুক্ত হয়ে উজ্জ্বলতর হতে থাকে পাড় ভেঙে পড়ায় গঙ্গা যেন ক্রমশ নির্মলতা ফিরে পায়, অন্তর্মোহে আবিষ্ট এই বরদাত্রীও তেমনি ক্রমশ কান্তিময়ী হয়ে উঠেছেন।

চিত্রলেখা—সখী নিশ্চিন্ত হ ! দেবতাদের ওই হতভাগা শত্তুরের দল একসঙ্গে কুপোকাৎ।

উর্বশী—(চোখ মেলে) দিব্য শক্তিতে যিনি সব দেখতে পান সেই ইন্দ্রই বুঝি বিজেতা ?

চিত্রলেখা—না, ইন্দ্র নন। তবে ইন্দ্রের মতো শক্তিমান এই রাজর্ষি পুরূরবা।

উর্বশী—(রাজাকে দেখে মনে মনে) দানবেরা উপকারই করেছে !

রাজা—(প্রকৃতিস্থা উর্বশীকে দেখে মনে মনে) ঋষি নারায়ণকে প্রলুব্ধ করতে যে-সব অপ্সরা গিয়েছিল, তারা তাঁরই ঊরুসম্ভূতা এঁকে দেখে লজ্জা পেয়েছে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। অথবা, ইনি তপস্বীর সৃষ্টি নন।

এঁকে সৃষ্টি করতে রম্যরশ্মি চন্দ্রই কি প্রজাপতির ভূমিকা নিলেন ? না শৃঙ্গারসর্বস্ব কামদেবই এঁর স্রষ্টা ? না পুষ্পময় মধুমাসই এঁর জনয়িতা ? না হলে বেদচর্চা করতে করতে যিনি জড়বুদ্ধি হয়েছেন এবং পার্থিব বিষয় থেকে যিনি সমস্ত কৌতূহলকে নিবৃত্ত করেছেন, সেই পুরাতন ঋষি কী করে এই মনোহর বপু নির্মাণ করতে সমর্থ হবেন ?

উর্বশী—সখী, এ সময়ে আমাদের অন্যান্য বান্ধবীরা সব কোথায় ?

চিত্রলেখা—অভয়দাতা মহারাজই তা জানেন।

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) তাঁরা সবাই অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছে। দেখো—

হে সুন্দরী ! তোমার সার্থক চোখদুটির পথে যে একবারও পড়েছে, তোমাকে ছাড়া সে-ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে আর তোমার জন্যে যাদের প্রেম উদ্বেলিত তোমার (সেই) সখীদের কথা আর কী বলব ?

উর্বশী—(মনে মনে) এঁর কথা সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। অথবা চন্দ্র থেকে যে অমৃতই বর্ষিত হবে এতে আর আশ্চর্য কী ? (প্রকাশ্যে) সেই জন্যেই তাদের দেখবার জন্যে আমার মন উৎকণ্ঠিত।

রাজা—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) হে সুন্দরী ! তোমার সখীরা হেমকূটে দাঁড়িয়ে রাহুগ্রাসমুক্ত চাঁদের মতো তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

চিত্রলেখা—সখী দেখ্।

উর্বশী—(রাজাকে সাভিলাষ দৃষ্টিতে দেখে) সমবেদনায় চোখ দিয়ে পান করছে আমাকে।

চিত্রলেখা—(অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে) কে বল্ তো ?

উর্বশী—সখীরা, আবার কে ?

রম্ভা—(সহর্ষে) এই যে প্রিয়সখী চিত্রলেখাসহ উর্বশীকে নিয়ে রাজর্ষি উপস্থিত হয়েছেন, মনে হচ্ছে বিশাখার কাছে এসেছেন স্বয়ং চন্দ্রদেব।

মেনকা—(দেখে) দুটো মনের মতো জিনিসই আমরা পেয়েছি—উদ্ধার করে আনা এই প্রিয়সখী আর অক্ষতদেহ এই রাজর্ষি।

সহজন্যা—সখী, ঠিকই বলেছিস। দানবদের জয় করা সত্যি কঠিন।

রাজা—সারথি, এই সেই শৈলশিখর। রথ নামাও

সূত—যে-আজ্ঞে মহারাজ। (তাই করল)

রাজা—(যেন ঝাঁকি লাগল এমন ভাব দেখিয়ে মনে মনে) উঁচুনিচু জায়গায় নামাতে আমার লাভই হয়েছে !

রথের ঝাঁকুনিতে এই আয়তাক্ষীর অঙ্গ আমার অঙ্গ স্পর্শ করায় রোমাঞ্চ হল।

উর্বশী—(সলজ্জভাবে) সখী, একটু সরে বোস দেখি।

চিত্রলেখা—পারছি না।

রম্ভা—আয় ভাই, সকলে আমাদের প্রিয়কারী এই রাজর্ষিকে সম্মান জানাই।

রাজা—সারথি ! রথ থামাও।

উৎকণ্ঠিতা এই সুন্দরী আরও-উৎকণ্ঠিতা সখীদের সঙ্গে মিলিত হোন, ঋতুশ্রী যেমন লতাদের সঙ্গে মেলে তেমনি।

(সূত তাই করল)

অপ্সরাদল—মহারাজ সুখী হোন এই জয়গৌরবে।

রাজা—তোমরাও সুখী হও সখীসমাগমের আনন্দে।

উর্বশী—(চিত্রলেখার হাতে হাত দিয়ে রথ থেকে নেমে) সখী, তোরা সবাই পীড়িত-আমাকে আলিঙ্গন কর। (আবার যে সখীদের দেখতে পাব সে-আশা ছিল না রে।

(সখীরা দ্রুত আলিঙ্গন করল)

রম্ভা—মহারাজ ! নিরঙ্কুশভাবে শত শত কল্প পৃথিবী পালন করুন।

সূত—আয়ুষ্মন ! সবেগে কোনো রথ ছুটে আসছে, শব্দটা পূব দিক থেকে আসছে।

তপ্ত সুবর্ণের মতো অঙ্গদ ধারণ করে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো আকাশ থেকে কে যেন পর্বতচূড়ায় অবতীর্ণ হলেন।

(অপ্সরারা দেখতে লাগল)

সকলে—ও, এ যে দেখি চিত্ররথ !

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ—(রাজাকে দেখে সসম্মানে) অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার বীরত্বগৌরবের জন্যে, যা ইন্দ্রের উপকারেও সমর্থ।

রাজা—এ কী ! গন্ধর্বরাজ যে ! প্রিয় বন্ধু ! স্বাগত !

চিত্ররথ—বন্ধু, কেশী উর্বশীকে হরণ করেছে, নারদের কাছে এ কথা শুনে দেবরাজ গন্ধর্বসেনাকে আদেশ দিলেন (প্রতিবিধানের জন্যে)। আমরা মাঝপথে চারণদের মুখে তোমার জয়গাথা শুনে এখানে তোমার কাছে চলে এলাম। তোমার উচিত এঁকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা। তুমি মহান দেবরাজের পরম অভিপ্রেত সাধনা করেছে। দেখো—

একদিন নারায়ণ এঁকে (উর্বশীকে) ইন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, এখন তাঁর বন্ধু তুমি দানবের হাত থেকে উদ্ধার করে এঁকে আবার তাঁরই হাতে সমর্পণ করলে।

রাজা—না, তা নয়।

তাঁর বন্ধুরা যে তাঁর প্রতিপক্ষকে জয় করেন এ নিঃসন্দেহে সেই বজ্রপাণিরই শক্তি। পাহাড়ের গুহা থেকে ছড়িয়ে-পড়া সিংহগর্জনের প্রতিধ্বনিও হাতিদের ভয়ার্ত করে তোলে।

চিত্ররথ—এই তো উচিত। বিনয়ই সৌন্দর্যের অলংকার।

রাজা—শতক্রতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তো হবে না ভাই। তুমিই বরং এঁকে প্রভুর কাছে নিয়ে যাও।

চিত্ররথ—তুমি যা বল। এদিকে, আপনারা এদিকে আসুন। (অপ্সরাদের প্রস্থান)

উর্বশী—(আড়ালে) সখী চিত্রলেখা, পরম উপকার করলেও এই রাজর্ষিকে আমি বিদায়-সম্ভাষণ করতে পারছি না। তুই আমার প্রতিনিধি হ।

চিত্রলেখা—(রাজার কাছে এসে) মহারাজ ! উর্বশী জানাচ্ছে—মহারাজের অনুমতি পেলে প্রিয়সখীর মতো মহারাজের কীর্তিকে সুরলোকে নিয়ে যেতে চাই।

রাজা—এসো, আবার যেন দেখা হয়।

(গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরারা আকাশে ওড়ার অভিনয় করল)

উর্বশী—(ওড়ার ভঙ্গী করে) এ কী ? আমার দীর্ঘ রত্নহার লতাগুচ্ছে আটকে গেল। (ছলনার আশ্রয় নিয়ে পিছু ফিরে রাজাকে দেখতে দেখতে) চিত্রলেখা, এটা ছাড়িয়ে দে তো।

চিত্রলেখা—(সহাস্যে) হ্যাঁ বেশ ভালোভাবেই আটকে গেছে দেখছি ! মনে হচ্ছে ছাড়ানো যাবে না। তবু চেষ্টা করে দেখছি।

উর্বশী—(হেসে) সখী যা বললি মনে রাখিস কিন্তু।

(চিত্রলেখা রত্নহার ছাড়াবার অভিনয় করে)

রাজা—(স্বগত) লতা ! এঁর যাওয়ার পথে ক্ষণিক বাধা সৃষ্টি করে তুমি আমার প্রিয় কাজ করেছ। কারণ, এঁকে আমি আর-একবার দেখতে পেলাম,—মুখটা আমার দিকে অর্ধেকটা ফিরিয়ে সে দৃষ্টি হেনেছে অপাঙ্গে।

সূত—আয়ুষ্মন্ !

ঐ দেখুন, আপনার বায়ু-অধিষ্ঠিত অস্ত্র দেবরাজের অপকারে নিরত দৈত্যদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে আবার আপনার তূণীরে প্রবেশ করছে, মহাভুজঙ্গ যেমন গর্তে প্রবেশ করে তেমনি।

রাজা—তাহলে রথটা এগিয়ে নিয়ে এসো। আরোহণ করি।

('তাই হোক' বলে সূত রথ কাছে আনল। রাজা আরোহণের অভিনয় করলেন। উর্বশী দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজাকে দেখতে দেখতে সখীদের নিয়ে প্রস্থান করল, সেইসঙ্গে চিত্ররথও প্রস্থান করল)

রাজা—(উর্বশীর পথের দিকে উন্মুখ হয়ে) হায়, হ, দুর্লভ, মন্মথের অভিনিবেশ ঠিক তারই দিকে।

এই সুরাঙ্গনা পিতৃপদ এই আকাশপথে উঠতে সবলে আমার মনকে আকর্ষণ করছে, রাজহংসী যেম মৃণাল থেকে ছিঁড়ে-আনা আঁশটা নিয়ে আকাশে ওড়ে তেমনি।

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অংক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক–হি ! হি ! রাজার গুপ্তকথা বুকে বয়ে আমি যেন ফুটছি ; নিমন্ত্রিত বামুন যেমন পরমান্নের কথা মনে করে জিভকে আর ধরে রাখতে পারে না, আমিও তেমনি লোকজনের মধ্যে জিভকে আর বাগে রাখতে পারছি না। তাই যতক্ষণ আমার মাননীয় বয়স্য কাজের আসনটি থেকে না উঠছেন, ততক্ষণ জনবিরল এই বিমান-পরিচ্ছন্দকেই থাকি। (পরিক্রমা করে সেখানেই থাকল)

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী–কাশীরাজকন্যা হুকুম দিয়েছেন, 'ওলো নিপুণিকা ! আর্যপুত্র সূর্যপুজো করে ফেরার পর থেকেই শূন্যমনে আছেন দেখা যাচ্ছে।' তাই তাঁর প্রিয় বয়স্য আর্য মাণবকের কাছ থেকে জানব ওঁর এই উৎকণ্ঠার কারণ কী। কিন্তু আমি কেমন করে সেই বামনঠাকুরের কাছ থেকে কথা বের করব। একটা বিচ্ছিন্ন ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু যেমন বেশিক্ষণ থাকে না তেমনি তাঁর মধ্যেও এ গোপনকথা বেশিক্ষণ চাপা থাকবে না। যাই খুঁজে বের করি এঁকে ;

(পরিক্রমা করে দেখে) এই যে ছবিতে আঁকা বানরের মতো আর্য মাণবক নিশ্চলভাবে বসে আছেন। এঁর কাছে যাই তবে। (কাছে এসে) আর্য ! প্রণাম।

বিদূষক–কল্যাণ হোক তোমার। (স্বগত) এই দুষ্ট চেটীকে দেখে রাজার গোপন কথাটা যেন হৃদয় ভেদ করে বেরোতে চাইছে। (প্রকাশ্যে) নিপুণিকা ! সঙ্গীত-অনুশীলন ছেড়ে যাচ্ছিস কোথায় শুনি ?

নিপুণিকা–রানীমার কথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

বিদূষক–কী আদেশ দিয়েছেন তিনি ?

নিপুণিকা–রানীমা বললেন, আর্য মানবক তো সব সময়েই আমার পক্ষ নিয়ে কাজ করেন, তবে যখন আমি অবাঞ্ছিত এক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি তখন আমার কথা উনি একেবারেই ভাবছেন না কেন।'

বিদূষক–(অনুমান করে) প্রিয়বয়স্য কি তিনি চান না এমন কিছু করেছেন ?

নিপুণিকা–আর্য ! যার জন্যে প্রভু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন তাঁরই নাম ধরে তিনি রানীমাকে সম্বোধন করে ফেলেছেন।

বিদূষক–(স্বগত) সে কী ! তিনি নিজেই দেখছি রহস্য ফাঁস করেছেন। তাহলে আমি আর জিভকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজে কষ্ট পাই কেন ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তিনি কি উর্বশী নামে ওঁকে ডেকেছেন ? সেই অপ্সরাকে দেখার পর থেকে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল দেবীকেই নয়, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন।

নিপুণিকা–(মনে মনে) প্রভুর রহস্যদুর্গ তাহলে আমি ভেদ করেছি। (প্রকাশ্যে) আর্য ! রানীমাকে কী বলব তা হলে ?

বিদূষক–তাঁকে গিয়ে বলবি, আমি আগে বয়স্যকে সেই মরীচিকা থেকে ফেরাবার চেষ্টা করব, তারপর মুখ দেখব দেবীর।

নিপুণিকা–আজ্ঞে, তাই বলব। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে বৈতালিক)

মহারাজের জয় হোক।

আমাদের মনে হয় তোমার আর সূর্যের লক্ষ্য একই। সূর্য সমস্ত জগতে এই মানুষদের (কর্মাঙ্গন থেকে) অন্ধকার দূর করেন, তুমিও এই প্রজাদের সমস্ত শ্রেণীর তমোগুণজাত দোষ দূর কর, এই আলোকপতি সূর্য মধ্যগগনে ক্ষণকালের জন্যে অবস্থান করেন, তুমিও দিনের ষষ্ঠভাগে কিছুক্ষণের জন্যে (বিশ্রাম নিয়ে) তোমার নিজের ইচ্ছামতো থাক।

বিদূষক–(কান দিয়ে) কাজের আসন থেকে উঠে এই যে প্রভু এই দিকেই আসছেন। যাই, এঁর কাছে যাই।

(প্রবেশক)

(উৎকণ্ঠিত রাজা আর বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা–দেখবার পর থেকেই সেই সুরসুন্দরী আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে ; মকরকেতুর (কামদেবের) অব্যর্থ-লক্ষ্য বাণের আঘাতে হৃদয়ে আগে থেকেই পথ তৈরি হয়েছে।

বিদূষক–(স্বগত) তপস্বিনী কাশীরাজদুহিতাকে তুমি খুব কষ্ট দিয়েছ।

রাজা–তুমি আমার গর্হিত রহস্য রক্ষা করছ তো ?

বিদূষক–(সবিষাদে মনে মনে) হায়, হায়! দুষ্ট দাসী আমাকে ঠকিয়েছে। তা না হলে আমার বয়স্য আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতেন না।

রাজা–(আশঙ্কা নিয়ে) চুপ করে আছ কেন ?

বিদূষক–আমি জিভটাকে এমন নিয়ন্ত্রণে রেখেছি যে তোমাকেও হঠাৎ কিছু উত্তর দিচ্ছি না।

রাজা–এই তো চাই। কিন্তু এখন কোথায় একটু অবসর বিনোদন করা যায় বলো তো ?

বিদূষক–রান্নাঘরে যাওয়া যাক।

রাজা–সেখানে কেন ?

বিদূষক–সেখানে পাঁচ-রকমের খাবারের আয়োজনের দিকে তাকিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করতে পারব।

রাজা–(সহাস্যে) সেখানে তোমার প্রিয় জিনিসের অস্তিত্ব তোমাকে তৃপ্তি দেবে, কিন্তু আমার প্রার্থনা যে দুর্লভ, আমি কেমন করে নিজেকে তৃপ্ত করব বলো ?

বিদূষক–আচ্ছা, তুমি কি উর্বশীর দৃষ্টিপথে পড় নি ?

রাজা–তাতে কী ?

বিদূষক–তাহলে সে যে তোমার কাছে দুর্লভ নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

রাজা–এ তোমার পক্ষপাত, এ কথা মানতেই হবে তোমাকে।

বিদূষক–যতটুকু বলেছি তাতে আমার কৌতূহলই বেড়েছে। আচ্ছা, কুরূপতায় আমি যেমন অদ্বিতীয়, উর্বশী কি তেমনি রূপে অদ্বিতীয়া ?

রাজা–তাকে অঙ্গে অঙ্গে বর্ণনা করা অসম্ভব জানিবে। সংক্ষেপে বলি শোনো–

বিদূষক–কান পেতে আছি।

রাজা–তার অঙ্গ অলংকারেরও অলংকার, প্রসাধনেরও বিশেষ প্রসাধন, উপমানেরও প্রতিস্পর্ধী উপমান।

বিদূষক–এই জন্যেই তুমি দিব্যরসের অভিলাষে চাতকব্রত গ্রহণ করেছ।

রাজা—নির্জন জায়গা ছাড়া উৎকণ্ঠিতের আশ্রয় আর কিছু নেই। প্রমোদবনের পথটা বলে দাও তবে।

বিদূষক—(মনে মনে) কী আর করা যাবে? (প্রকাশ্যে) এদিকে এসো। (পরিক্রমা করে) আপনি অতিথি, প্রমোদবনের প্রেরণায় দক্ষিণবায়ু তোমার প্রত্যুদ্গমন করছে।

রাজা—বায়ুর এই বিশেষণটি উপযুক্তই বটে। এই বায়ু এই মাধবীলতাকে নিষিক্ত করে কুন্দ-লতাকে কম্পিত করে, স্নেহ ও দাক্ষিণ্যে মণ্ডিত হয়ে আমার চোখে প্রেমিকরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

বিদূষক—তোমার অনুরাগও এমনি হোক। (ঘুরে) এই যে প্রমোদবনের দ্বার, প্রবেশ করো।

রাজা—তুমি আগে যাও।

(দুজনের প্রবেশ)

রাজা—(সামনে তাকিয়ে) বয়স্য, আমি ভেবেছিলাম প্রমোদবনে প্রবেশ করলে আমার মনের অবসাদ কাটবে কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল।

আমি বেদনা লাঘব করার জন্যে দ্রুত উদ্যানে প্রবেশ করলাম কিন্তু এ হল স্রোতে-ভাসা মানুষের স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দেওয়ার মতো।

বিদূষক—কেমন করে?

রাজা—এই দুর্লভ বাসনায়-দুর্নিবার আমার মনকে পঞ্চবাণ তো আগেই পীড়িত করেছে, এখন উদ্যানের যে সহকারতরুগুলি থেকে বিবর্ণ পাতা মলয়বাতাসে ঝরেছে, তারা যদি আমাকে কিশলয় দেখায় তা হলে তো কথাই নেই।

বিদূষক—দুঃখ কোরো না। প্রেমের দেবতা শিগ্গিরই তোমার অভীষ্ট পূরণ করে তোমার সুখের কারণ হবেন।

রাজা—আমি ব্রাহ্মণের এই মুখের কথা (সত্য হিসাবেই) গ্রহণ করলাম।

(দুজনের পরিক্রমা)

বিদূষক—এই প্রমোদবনের শোভা দেখো, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বসন্ত এসেছে।

রাজা—হ্যাঁ, প্রতি পদক্ষেপেই তা লক্ষ্য করছি। এখানে—

আছে স্ত্রীনখের মতো পাটল রঙের দু-পাশে-কালো কুরবক, তরুণ অশোক উপচে-পড়া-রক্তরঙে মনোরম হয়ে এই ফুটি এই ফুটি এমন ভাব নিয়ে আছে, সহকার-তরুতে নবমঞ্জরী পরাগের ছোঁয়ায় শিষের দিকে কালো-হলুদ রঙের ছোপ নিয়েছে। বন্ধু তাই বসন্তশোভা শৈশব-আর-যৌবনের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে।

বিদূষক—স্ফটিক শিলাসনে-মণ্ডিত এই 'অতিমুক্ত'-লতাকুঞ্জে ভ্রমরেরা এসে বসায় ফুল ঝরে পড়ছে, মনে হচ্ছে এ কুঞ্জ যেন নিজ থেকেই পুজোর উপচার নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে।

রাজা—তোমার যেমন কল্পনা। (পরিক্রমা করে উভয়ের উপবেশন)

বিদূষক—এখানে সুখাসীন হয়ে ললিতলতার দিকে চেয়ে চেয়ে উর্বশীর জন্যে উৎকণ্ঠা দূর করতে পারবে।

রাজা— সনিঃশ্বাসে) বন্ধু, এই উদ্যানের লতাগুচ্ছে ফুল ধরেছে, তাদের পল্লবগুলো নত হয়ে আছে, তবু এ লতাগুচ্ছে আমার চোখে তৃপ্তি নেই, তার রূপ চোখে পড়বার পর আমার চোখ রূপ সম্বন্ধে কেমন খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে।

তাই যাতে আমার কামনা সফল হয় তার জন্যে কোনো উপায় ভেবে দেখো।

বিদূষক—(হেসে) ওহে, এ ব্যাপারে অহল্যায় আসক্ত ইন্দ্রের বদ্যি (চন্দ্র) আর উর্বশীতে আসক্ত তোমার আমি দুজনেই উন্মত্ত।

রাজা—না না, তা বোলো না। গভীর স্নেহ করণীয়ের ঠিক সন্ধান দেয়।

বিদূষক—এই আমি চিন্তামগ্ন হলাম। তুমি আবার হা-হুতাশ করে আমার ধ্যান ভেঙে দিও না। (চিন্তার অভিনয় করল)

রাজা—(কোনো-একটা লক্ষণ দেখেছেন এমন ইঙ্গিত দিয়ে, মনে মনে) পূর্ণচাঁদের লাবণ্যে মণ্ডিত যার মুখচ্ছবি সে তো সহজলভ্য নয়, তবু অকারণে (দক্ষিণ চক্ষুর স্ফুরণের মতো) এই আনন্দক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আমার মনও হঠাৎ প্রশান্তি লাভ করছে, যেন আমার অভীষ্টসিদ্ধির আর দেরি নেই। (আশায় উৎসুক হলেন)

(আকাশযানে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা—ওলো, কিছু না বলে কোথায় চললি বল্ তো?

উর্বশী—সখী! হেমকূটে যখন লতাপল্লবে ক্ষণিক বাধা পেয়ে আমার আকাশে ওড়া বিঘ্নিত হল তখন তো আমাকে উপহাস করেছিলি, এখন তবে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

চিত্রলেখা—তাহলে কি রাজর্ষি পুরূরবার কাছে যাচ্ছিস?

উর্বশী—এই আমার নির্লজ্জ বাসনা।

চিত্রলেখা—আগে কাকে পাঠিয়েছিস তবে?

উর্বশী—হৃদয়কে।

চিত্রলেখা—তাহলে (কী করতে চলেছিল) ভালো করে ভেবে দেখ্ আগে।

উর্বশী—প্রেমের দেবতাই আমাকে পাঠাচ্ছেন, চিন্তা করার কী আছে।

চিত্রলেখা—তবে আমার আর কিছু বলার নেই।

উর্বশী—তাহলে পথ দেখিয়ে দে যাতে আমার যেতে কষ্ট না হয়।

চিত্রলেখা—সখী, নিশ্চিন্ত হও। দৈত্যেরা যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে সুরগুরু কি আমাদের মাথায় 'অপরাজিতা'-গ্রন্থি বাঁধতে শেখান নি?

উর্বশী—ওঃ, একদম মনে ছিল না।

চিত্রলেখা—এই আমরা প্রতিষ্ঠানের চূড়ামণির মতো রাজভবনে এসে পৌঁছেছি, যা বিশেষভাবে যমুনাসঙ্গমে-পবিত্র ভাগীরথীর জলে যেন নিজেকে দেখছে।

উর্বশী—(তাকিয়ে) বরং বলা যেতে পারে স্বর্গই স্বর্গান্তরে এসেছে। (ভেবে) ওলো, সেই আর্তবন্ধু কোথায় আছেন বলে মনে হয়?

চিত্রলেখা—নন্দনবনখণ্ডের মতো এই প্রমোদবনে নেমে তা জানব। (উভয়ের অবতরণ)

চিত্রলেখা—(রাজাকে দেখে, সহর্ষে) এই যে প্রথম উদিত ভগবান চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকে ইনিও তেমনি তোর অপেক্ষায় আছেন।

উর্বশী—(দেখে) প্রথম যেদিন দেখেছি তার চেয়েও ওঁকে আজ বেশি সুন্দর লাগছে।

চিত্রলেখা—এ তো স্বাভাবিক। আয়, ওঁর কাছে যাই।

উর্বশী—'তিরস্করিণী'-তে প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনি। উনি নির্জনে তাঁর পাশে-বসা বন্ধুকে কী যেন বলছেন।

চিত্রলেখা—তোর যা ইচ্ছে। (তাই করল)

বিদূষক—তোমার দুর্লভ প্রণয়িনীর মিলনের একটা উপায় ভেবেছি। (রাজা নীরব)

উর্বশী–কে সেই নারী যিনি এঁর প্রার্থিতা হয়েও নিজেকে বড়ো বলে ভাবছেন ?

চিত্রলেখা–তুই যে (সাধারণ) মানুষের মতো আচরণে করছিস দেখছি।

উর্বশী–(অলৌকিক) ক্ষমতায় তা জানতে আমার মন সরছে না রে।

বিদূষক–শুনছ ? আমি বলছি উপায় ভেবেছি একটা।

রাজা—বলো তাহলে।

বিদূষক–তুমি বরং নিদ্রার সেবা করো। ওই নিদ্রাই স্বপ্নে তোমাদের মিলন ঘটাবে। অথবা সেই উর্বশীর প্রতিকৃতি এঁকে তার দিকে চেয়ে থাকো।

উর্বশী–(সহর্ষে) সংকীর্ণ হৃদয় ! এবারে আশ্বস্ত হও।

রাজা–দুটোই ব্যর্থ।

মদনবাণে হৃদয় সর্বদাই বিদ্ধ। মিলনসাধিকা নিদ্রাকে স্বপ্নে পাব কি করে বলো। আর সেই সুমুখীকে চিত্রে সম্পূর্ণরূপে দেখার আগেই যে আমার দু-চোখ জলে ভরে যাবে।

চিত্রলেখা–সখী ! শুনলি ?

উর্বশী–শুনলাম। কিন্তু হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় পেলাম না।

বিদূষক–আমার বুদ্ধির দৌড় এই পর্যন্তই।

রাজা–(সনিঃশ্বাসে) হয় সে আমার গুরুতর মনোবেদনার কথা জানে না, না-হয় আমার অনুরাগ অলৌকিক ক্ষমতায় জানতে পেরেও আমাকে অবজ্ঞা করছে। সেই মানবীর সঙ্গে আমার মিলনকামনাকে অপ্রাপ্তির নীরসতায় ব্যর্থ করে পঞ্চবাণই কৃতকৃত্য হল।

চিত্রলেখা–শুনলি তো ?

উর্বশী–হায় ! আমাকে এমন (বিমুখী) ভাবছেন। ওঁর সামনে গিয়ে এর উত্তর তো দিতে পারছি না। দিব্যবলে ভূর্জপত্র নির্মাণ করে তাতেই উত্তর দিতে চাই।

চিত্রলেখা–তাই করো।

(উর্বশী দ্রুত ভূর্জপত্র নিয়ে তাই করল)

বিদূষক–(দেখে) এ কী ! এ কী ! সাপের খোলসের মতো এ আবার কী এসে পড়ল !

রাজা–(ভালো করে দেখে) ভূর্জপত্রে কিছু লেখা রয়েছে।

বিদূষক–আপনার বিলাপ শুনে সেই অদৃশ্যা সমান অনুরাগের নিদর্শন হিসেবে এই লেখাটি ফেলে দেন নি তো ?

রাজা–কল্পনার সত্যি অবাধগতি। (নিয়ে এবং পড়ে, সহর্ষে) তোমার অনুমান সত্যি হয়েছে।

বিদূষক–এবারে তুমি প্রসন্ন হও। কী লেখা আছে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রাজা–শোনো–(পাঠ)–

প্রভু ! আমার হৃদয় এখনও তোমার অজানা, কিন্তু অনুরক্ত তোমার প্রতি আমার মনোভাব সম্বন্ধে তুমি যা ভাবছ, তা যদি ঠিক হয়, তবে চূর্ণ পারিজাতের শয্যায় শুলেও নন্দনকাননের বাতাস আমার অঙ্গে অতি-উষ্ণ হয়ে প্রবাহিত হবে কেন।

উর্বশী–এখন উনি কী যে বলবেন ?

চিত্রলেখা–মৃণালের মতো ক্ষীণ-হয়ে-যাওয়া অঙ্গ দিয়ে তিনি যা বলার তা তো আগেই বলেছেন।

বিদূষক—আহা ! আমি নৈবেদ্য পেলে যেমন আশ্বস্ত হই, তুমিও তেমনি (এই পত্র পেয়ে) আশ্বস্ত হলে।

রাজা—একে তুমি শুধু নিছক আশ্বাস বলছ ? সখা ! সম-অনুরাগের সূচক এবং মধুর অর্থবহ মর্মে মণ্ডিত প্রিয়ার প্রীতি-অভিজ্ঞান এই পত্রে নিবেশিত। মনে হচ্ছে উন্মীলিত-নয়ন-নিয়ে আমার আনন সেই মদির-নয়নার আননের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

উর্বশী—এবারে আমাদের প্রেম সম-বিভক্ত হল।

রাজা—বয়স্য, আমার আঙুলের ঘামে অক্ষরগুলো মুছে যাবে। প্রিয়ার এ হস্তাক্ষর তুমি সযত্নে রাখো।

বিদূষক—উর্বশী কি তোমাকে বাসনার ফুলটি দেখিয়ে ফলের বেলায় ফাঁকি দেবে ?

উর্বশী—ওলো, কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কাতর হৃদয়টি আমি একটু সামলে নিই, ততক্ষণ তুই তাঁর কাছে গিয়ে আমার পক্ষে যা বলা সাজে তাই বল্ গে।

চিত্রলেখা—(তিরস্কারিণী-প্রত্যাহার করে রাজার কাছে এসে) জয় হোক, জয় হোক মহারাজের।

রাজা—আসুন, আর্যা ! সখী সঙ্গে নেই বলে তুমি আমাকে ততটা তৃপ্তি দিতে পারছ না, সঙ্গমে একবার (একসঙ্গে) দেখা যমুনা গঙ্গাকে ছাড়া যেমন তৃপ্তি দিতে পারে না তেমনি।

চিত্রলেখা—কেন, প্রথমে দেখা যায় মেঘমালা, তারপরে তো বিদ্যুৎলতা।

বিদূষক—(আড়ালে) ও ইনি তাহলে উর্বশী নন, তাঁর প্রিয়সখী।

চিত্রলেখা—উর্বশী মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছে—

রাজা—কী আদেশ তাঁর ?

চিত্রলেখা—দানব-দুরাচারের সময়ে মহারাজের শরণ নিয়েছিলাম। সেই-আমি আপনাকে দেখার পর থেকেই প্রবলভাবে মন্মথের বশীভূতা হয়ে আবারও আপনার করুণা-ভিখারিণী।

রাজা—সুমুখী !

তুমি সেই প্রিয়দর্শনাকেই উৎকণ্ঠিতা বলছ। তার জন্যে পীড়িত পুরুরবাকে তুমি দেখছই না। মন্মথকৃত এই প্রণয় আমাদের দুজনেরই একই রকম। তপ্ত লোহার পাতের সঙ্গেই তপ্ত লোহার পাতের সংযোজন বিধেয়।

চিত্রলেখা—(উর্বশীর কাছে এসে) সখী আয়। প্রেমের দেবতা তোর চেয়ে তোর প্রিয়তমের উপরে আরও নিষ্ঠুর দেখলাম। তাঁরই দূতী হয়ে এলাম তোর কাছে।

উর্বশী—(তিরস্করিণী প্রত্যাহার করে) বাঃ, আমাকে তো চোখের পলকে ত্যাগ করলি দেখছি।

চিত্রলেখা—এই এক্ষুনি দেখব কে ত্যাগ করে। প্রথারক্ষা করে চলবি কিন্তু।

উর্বশী—(রাজার কাছে এসে সলজ্জভাবে) জয় হোক মহারাজের !

রাজা—সুন্দরী !

সত্যি আমারই জয়। তোমার উচ্চারিত এই জয়ধ্বনি দেবরাজ ছাড়া আর কখনও অন্য-কোনো পুরুষকে স্পর্শ করে নি। (হাত ধরে বসালেন)

বিদূষক—দেবী ! রাজার প্রিয়বস্য এই ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানালে না তো !

(উর্বশী স্মিতহাস্যে প্রণাম করল)

বিদূষক—কল্যাণ হোক তোমার।

(নেপথ্যে)

দেবদূত—চিত্রলেখা, উর্বশীকে তাড়াতাড়ি করতে বলো। ভরতমুনি আটটি রসের আধার যে নাট্য-প্রয়োগটি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন অভিনয়রম্য সেই প্রয়োগটি প্রভু (ইন্দ্র) লোকপালদের নিয়ে দেখতে চান।

চিত্রলেখা—দেবদূতের কথা প্রিয়সখীর কানে গেল তো? মহারাজের কাছে বিদায় নে এবারে।

উর্বশী—কথা ফুটছে না আমার।

চিত্রলেখা—মহারাজ! এ পরাধীন। মহারাজ আজ্ঞা দিলে দেবতাদের কাছে একে অপরাধী হতে হবে না।

রাজা—(কোনোরকমে বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে) তোমাদের প্রভুর আদেশ পালনে আমি বাধা হব না। কিন্তু এই মানুষটিকে (আমাকে) মনে রেখো।

(উর্বশী বিচ্ছেদদুঃখ অভিনয় করে সখীর সঙ্গে চলে গেল)

রাজা—(সনিঃশ্বাসে) সখা! আমার চোখ থাকা এখন যেন ব্যর্থ।

বিদূষক—(পত্র দেখাতে চেয়ে) এই যে (এইটুকু বলেই মনে মনে) হায় হায়! উর্বশীকে দেখে বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছি আমি। ভূর্জপত্রটি যে কখন আমার হাত থেকে খসে পড়েছে বুঝতেই পারি নি।

রাজা—বন্ধু, কী যেন বলতে চাইছ?

বিদূষক—নিরাশ হোয়ো না। উর্বশী দৃঢ়ভাবে তোমাতে আসক্ত। এতটা গভীর অনুরাগকে সে কখনও শিথিল করবে না।

রাজা—আমার মনও তাই বলছে। যাবার সময়—শরীরটা তার নিজের অধীন নয় বলে নিজের অধীন হৃদয়টুকু সে যেন আমার কাছেই গচ্ছিত রেখে গেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যা তার স্তনকম্পন দেখে অনুমিত হল।

বিদূষক—(মনে মনে) আমার বুক কাঁপছে, ভূর্জপত্রের কথাটা ইনি এক্ষুনি না তোলেন।

রাজা—এখন চোখকে পরিতৃপ্ত করি কী দিয়ে? (মনে করে) ও হ্যাঁ, দাও তো সেই ভূর্জপত্রখানি।

বিদূষক—(বিষাদের অভিনয় করে) সর্বনাশ! দেখছি না তো। উর্বশীর সঙ্গেই উধাও হল বুঝি!

রাজা—সব ব্যাপারে মূর্খের অবহেলা! খুঁজে দেখো।

বিদূষক— উঠে) এদিকে হতে পারে, না ওদিকে? (খোঁজার অভিনয় করে)

(সপরিবারে দেবী কাশীরাজকন্যার প্রবেশ)

দেবী—ওলো নিপুণিকা, তুই যে বললি আর্যপুত্রকে মাণবকের সঙ্গে লতাগৃহে প্রবেশ করতে দেখেছিস, সে কি সত্যি?

নিপুণিকা—আমি কি আর্যাকে কখনও মিছিমিছি কোনো সংবাদ দিয়েছি?

দেবী—তাহলে লতার আড়ালে লুকিয়ে এঁর গোপন কথা শুনি। যাতে বুঝতে পারি তুই যা বলেছিস তা সত্যি কি না।

নিপুণিকা—আপনার যা ইচ্ছে।

দেবী—(পরিক্রমা করে) ওলো, মলয়বাতাসে ছেঁড়া টুকরো-কাপড়ের মতো কী একটা উড়ে আসছে না ?

নিপুণিকা—(দেখে) রানীমা, ঘুরতে ঘুরতে আসাতে বুঝতে পেরেছি কিছু লেখা আছে এই ভূর্জপত্রটিতে। এ কী! এ যে আপনার নূপুরের কোণে এসে লাগল। (নিয়ে) কী! পড়ব তাহলে ?

দেবী—পড়ে দেখ আগে। যদি আপত্তিকর কিছু হয় তবে শুনব।

নিপুণিকা—(তাই করে) রানীমা, এ সেই কলঙ্ককথা—মহারাজের উদ্দেশে উর্বশীর কবিতা। আর্য মাণবকের অসাবধানতায় আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

দেবী—এর বিষয়টা আমাকে বল্ তাহলে।

(নিপুণিকা রাজার পূর্বপঠিত শ্লোকটি আবৃত্তি করল)

দেবী—এই উপহারটা নিয়েই সেই অপ্সরাকামুকের সঙ্গে দেখা করি।

(পরিজনদের নিয়ে, লতাকুঞ্জের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন)

বিদূষক—বয়স্য, প্রমোদবনের কাছে ক্রীড়াপর্বতের পাশে বাতাসের বশীভূত কী দেখা যাচ্ছে।

রাজা—(উঠে) বসন্তের প্রিয় ভগবান দক্ষিণবায়ু!

সুগন্ধের জন্যে লতাদের বসন্তসম্ভূত পরাগ অপহরণ করো। আমার প্রিয়তমার হস্তলিপি অপহরণ করে তোমার লাভ কী? অঞ্জনার কাছে প্রেম জানিয়ে তুমি তো এটা বুঝেছ যে এই ধরনের জিনিসই কামার্তদের মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে।

নিপুণিকা—এই জিনিসটারই খোঁজ পড়েছে, রানীমা।

দেবী—তাই তো দেখছি।

বিদূষক—কেসরফুলের রঙের মতো এই ময়ূরের পালক দেখে আমি প্রতারিত হয়েছি।

রাজা—আমি সবদিক থেকে হতভাগ্য।

দেবী—(সামনে এসে) আর্যপুত্র! হতাশ হয়ো না, এই সেই ভূর্জপত্র।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) দেবী তুমি ? এসো এসো।

বিদূষক—(আড়ালে) আঃ! আসার আর সময় পেলেন না ইনি!

রাজা—(জনান্তিকে) সখা কী করি এখন ?

বিদূষক—হাতেনাতে ধরা-পড়া চোর আর কী কৈফিয়ৎ দেবে ?

রাজা—(আড়ালে) মূর্খ! এখন পরিহাসের সময় নয়। (প্রকাশ্যে) দেবী! আমি এটাকে খুঁজছিলাম না, আমরা একেবারে অন্য-একটা জিনিস খুঁজছিলাম।

দেবী—সৌভাগ্যলাভ তো এইভাবেই গোপন করতে হয়।

বিদূষক—দেবী! শিগগির এঁর খাবার ব্যবস্থা করুন, যাতে পিত্তটাকে একটু দমন করতে পারেন।

দেবী—নিপুণিকা! ব্রাহ্মণ দেখছি তার বয়স্যের সপক্ষে ভালো একটা অজুহাত খাড়া করেছে।

বিদূষক—দেবী! দেখবেন, পিশাচকেও ভোজনে তুষ্ট রাখা যায়।

রাজা—মূর্খ; তুমি দেখি সবলে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ছাড়লে।

দেবী—তোমার কোনো অপরাধ নেই। আমিই অপরাধিনী, আমার দর্শন তোমার একান্ত

অবাঞ্ছিত জেনেও আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বরং যাই।

(ক্রোধের অভিনয় করে যেতে চাইলেন)

রাজা—আমি সত্যিই অপরাধী। হে রম্ভোরু, প্রসন্ন হও, রাগ কোরো না। সেব্য যখন কুপিত, তখন সেবক কী করে নির্দোষ হবে ? (পায়ে পড়লেন)

দেবী—(মনে মনে) আমার মন এমন দুর্বল নয় যে আমি এই অনুনয়কে মূল্য দেব। কিন্তু এই অভব্যতার পরে আমার অনুতাপ হবে, সেই ভয় করছি।

(পরিজনসহ রাজার কাছে থেকে প্রস্থান)

বিদূষক—রানী গেলেন, বর্ষার আবিল নদীর মতো। ওঠো এখন।

রাজা—(উঠে) বয়স্য, এ অনুচিত কিছু নয়। দেখো—

যদি যথার্থ প্রেম না থাকে তাহলে প্রিয়জনের ভালো ভালো কথায়-ভরা অনুনয় কৃত্রিম-রঙে-রঙিন মণির মনের মতোই নারীদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

বিদূষক—এ তোমার অনুকূলই হল বলব। চোখের অসুখ থাকলে কেউ প্রদীপের আলো সহ্য করতে পারে না।

রাজা—না, তা বোলো না। আমার মন উর্বশীগত হলেও দেবীর প্রতি আমার সম্মান অব্যাহত আছে। কিন্তু আমার অনুনয়ে তিনি যখন সাড়া দিলেন না, তখন আমিও ধৈর্য ধরে থাকব (দেখি, তিনি অনুতপ্ত হন কি না)।

বিদূষক—তোমার ধৈর্য অক্ষয় হোক। কিন্তু ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের প্রাণ বাঁচাও দয়া করো। স্নানাহারের বেলা হল যে।

রাজা—(উপর দিকে তাকিয়ে) দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

তাপ সহ্য করতে না পেরে ময়ূর তরুমূলে শীতল আলবালে এসে বসেছে। ভ্রমর কর্ণিকার ভেদ করে তার মধ্যে লীন হচ্ছে। উষ্ণ জল ত্যাগ করে কারণ্ডেরা তীরলগ্ন পদ্মলতাকে আশ্রয় করছে, ক্রীড়াগৃহে এই পঞ্জরের শুক ক্লান্ত হয়ে জল প্রার্থনা করছে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় অংক সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অংক

(ভরতের দুজন শিষ্যের প্রবেশ)

প্রথম—ভাই পল্লব, মহেন্দ্রসদনে যাবার সময় আমাদের আচার্যদেব তোমাকে আসনে বসিয়ে রাখলেন আর অগ্নিগৃহ রক্ষার ভার দিলেন আমার উপরে। তাই জিজ্ঞেস করছি গুরুদেব-পরিচালিত অভিনয়ে দেবসভা সন্তুষ্ট হয়েছে তো ?

দ্বিতীয়—গালব, সন্তুষ্ট হয়েছে কি না জানি না। সেখানে সরস্বতীর 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' কাব্যবন্ধের অনুষ্ঠানে নানা রসে দেবসভা মশগুল হয়েছিল ঠিকই, তবে—

প্রথম—তোমার অসমাপ্ত বাক্য শুনে মনে হচ্ছে কোথায় যেন গোলমাল আছে।

দ্বিতীয়—হ্যাঁ, অভিনয়ের সময় উর্বশী একটা জায়গায় ভুল করে ফেলেছে।

প্রথম—কী করে ?

দ্বিতীয়—লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিল উর্বশী। বারুণীর ভূমিকায় ছিল মেনকা। বারুণী

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলেন—সখী, স্বয়ং কেশব ও লোকপালকবৃন্দসহ ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা সমবেত হয়েছেন। সখী, এঁদের মধ্যে কার দিকে তোর টান বল্ তো ?

প্রথম—তারপর ?

দ্বিতীয়—তারপর উর্বশীর মুখ দিয়ে 'পুরুষোত্তম' এই কথাটির বদলে 'পুরুরবা' কথাটি বেরিয়ে গেল।

প্রথম—ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। গুরু তার উপরে ক্রুদ্ধ হলেন না ?

দ্বিতীয়—আচার্যদেব তাকে অভিশাপ দিলেন। দেবরাজ পরে অনুগ্রহ করলেন।

প্রথম—কী রকম ?

দ্বিতীয়—'আমার নির্দেশ তুমি মান নি, তাই স্বর্গে তোমার ঠাঁই নেই।'—আচার্যদেব এই অভিশাপ দিলেন। অভিনয়ের শেষে সে যখন লজ্জানত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখন দেবরাজ বললেন, 'যার প্রতি তুমি আসক্তা সেই রাজর্ষি আমার সংগ্রামের সাথী বলে তার কিছু উপকার আমাকে করতেই হবে। তাই বলছি, যতদিন পুরুরবা তোমার গর্ভের সন্তানের মুখ না দেখেন ততদিন তোমার ইচ্ছামতো তুমি পুরুরবার সেবা করো।'

প্রথম—অন্যের হৃদয় সম্বন্ধে যার বোধ আছে, সেই ইন্দ্রেরই উপযুক্ত এই কাজটি।

দ্বিতীয়—(সূর্য দেখে) কথা বলতে বলতে আমরা ভুল করে ফেললাম। গুরুর স্নানের বেলা বয়ে গেল। এসো আমরা দুজনে তাঁর কাছে যাই। (দুজনের প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—সংসারী জীব মাত্রেই প্রথম বয়সে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে, পরে পুত্রেরা তার ভার নিয়ে নিলে সে অবসর ভোগ করে। আমাদের বার্ধক্যে দিনে দিনে শরীর ক্ষয় করতে করতে বাঁধা পড়ে সেবার দাসত্বে। অন্তঃপুররক্ষার এই কাজ সত্যিই কষ্টকর। (পরিক্রমা করে)

মান ত্যাগ করে ব্রতচারিণী কাশীরাজকন্যা বিশেষ একটি ব্রতপালনের জন্যে নিপুণিকার মুখ দিয়ে অনুরোধ করেছেন মহারাজকে। তাঁর আদেশে আমাকেও সেই অনুরোধ জানাতে হবে তাঁকে। যাই মহারাজের সঙ্গে দেখা করি। তিনি নিশ্চয় এখন সান্ধ্য প্রার্থনা শেষ করে থাকবেন। (পরিক্রমা করে এবং দেখে) দিনান্তের রাজবাড়ির দৃশ্য সত্যিই মনোরম। কারণ এখানে—

রাত হল বলে ময়ূরেরা দাঁড়ের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভাস্কর্যের মতো উৎকীর্ণ। ছাদের কার্নিশগুলো জানলা-দিয়ে-বেরোনো ধূপের ধোঁয়াকে পায়রা বলে ভুল করাচ্ছে। অন্তঃপুরের আচারপূত বৃদ্ধেরা পুষ্পোপচারে বিকীর্ণ বিশেষ বিশেষ স্থানে উজ্জ্বল সন্ধ্যামঙ্গলদীপ জ্বালাচ্ছেন।

(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) মহারাজ এদিকেই আসছেন পরিচারিকাদের হাতে-ধরা প্রদীপে পরিবৃত হয়ে রাজা কর্ণিকার ফুলে ছাওয়া পর্বতের মতো শোভা পেলেন, যে পর্বতের পাখা ইন্দ্র কাটেন নি।

এখন দৃষ্টিপথে থেকে এঁর জন্যে অপেক্ষা করি।

(যথানির্দিষ্ট রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা–(মনে মনে) দিনের বেলাটা কাজের মধ্যে উৎকণ্ঠিত থেকে অতিকষ্টে আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু রাত কাটাব কী করে? রাতের প্রহরগুলো যে চিত্তবিনোদনের অভাবে সুদীর্ঘ মনে হবে।

কঞ্চুকী–(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, দেবী জানাচ্ছেন মণিহর্ম্যপ্রাসাদ থেকে চাঁদ খুব সুন্দর দেখা যাবে। যতক্ষণ চাঁদ রোহিনীর সঙ্গে মিলিত না হয়, ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে চাই।

রাজা–আর্য লাতব্য! দেবীকে জানাও, তিনি যা চান আমি তাই করব।

কঞ্চুকী–মহারাজ যা বলেন। (প্রস্থান)

রাজা–বয়স্য! সত্যিই কি ব্রতের জন্যেই দেবীর আয়োজন?

বিদূষক–আমার মনে হয় তোমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করে দেবী অনুতপ্ত হয়েছেন, এই দোষক্ষালনের জন্যেই তাঁর এই ব্রতপালন।

রাজা–তুমি ঠিকই বলেছ। কারণ–

স্বামীদের প্রণিপাতকে অবজ্ঞা করে মনস্বিনীরা পরে অন্তরে দগ্ধ হলেও দয়িতদের অনুনয়ে গোপনে লজ্জিত হন।

তাহলে, মণিহর্ম্যপ্রাসাদের পথ দেখাও।

বিদূষক–এই দিকে, এই দিকে মহারাজ। গঙ্গাতরঙ্গের মতো সুন্দর এই স্ফটিকসোপান দিয়ে তুমি সন্ধ্যায়-রমণীয় মণিহর্ম্যে আরোহণ করো।

রাজা–তুমি আগে ওঠো।

(সকলের সোপানে আরোহণের অভিনয়)

বিদূষক–(দেখেশুনে) বন্ধু, চাঁদ এখুনি উঠবে মনে হয়, কারণ অন্ধকারমুক্ত পূবদিকটা দেখতে সুন্দর লাগছে।

রাজা–ঠিক বলেছ।

উদয়পর্বতে আড়ালে-থাকা চাঁদের কিরণে অন্ধকার দূর হওয়ায় মনে হচ্ছে পূর্বদিক যেন বিক্ষিপ্ত কেশপাশ সংযত করে নিল। এ অবস্থায় (সুন্দরী নারীর মতোই) প্রাচী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

বিদূষক–আহা! দ্বিজরাজ (চাঁদ) একদিকে-ভাঙা চিনির ডেলার রূপ নিয়ে উদিত হলেন।

রাজা–(সহাস্যে) পেটুকের রাজা, সর্বত্র শুধু খাবার জিনিসেই গড়া। (কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে) ভগবান নিশাপতি!

যে-তুমি ধর্মচারীদের (যজ্ঞাদি) ক্রিয়াসম্পাদনের সহায়তায় সূর্যে সঙ্গত হও, অমৃতদানে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত কর, রাত্রিতে ঘনায়মান অন্ধকারকে বিনাশ কর, হরচূড়ায় নিজেকে স্থাপিত কর, সেই তোমাকে নমস্কার করি।

(শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন)

বিদূষক–বন্ধু, তোমার পিতামহের অনুমতি পেয়ে এবারে আসনে বোসো চুপ করে, আমিও একটু বসি। মনে করো এই অনুমতি-বচন তোমার ঐ পিতামহ এই ব্রাহ্মণে সংক্রামিত করেছেন। (অর্থাৎ আমার মুখ দিয়েই তিনি তোমাকে আসন গ্রহণের আজ্ঞা দিচ্ছেন)

রাজা–(বিদূষকের কথা শুনে উপবেশন করে, পরিজনদের দেখে) চাঁদের আলো ফুটলে

দীপের আলোর পুনরুক্তিতে আর প্রয়োজন কী ? তোমরা এবারে বিশ্রাম নিতে পারো।

পরিজনেরা—মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

রাজা—(চাঁদের দিকে তাকিয়ে) বন্ধু, এক ঘণ্টা বাদে দেবী আসবেন। ততক্ষণ আমার অবস্থাটা নির্জনে বলি তোমাকে।

বিদূষক—এ তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে, ঐরকম অনুরাগ দেখে তুমি অবশ্যই আশায় বুক বেঁধে নিজেকে সামলে নিতে পারো।

রাজা—তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু আমার হৃদয়তাপ অত্যন্ত প্রবল।

নদীর স্রোত কঠিন শিলায় বাধা পেয়ে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মিলন-সুখের বাধাতেও তেমনি প্রেম শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

বিদূষক—ক্রমশ-ক্ষীণ হয়ে যাওয়া শরীরে তোমাকে যে আরও সুন্দর লাগছে, তাতে মনে হচ্ছে তোমার প্রিয়াসমাগমের আর দেরি নেই।

রাজা—(লক্ষণ সূচিত করে) বয়স্য।

আশাজনক কথা বলে তুমি যেমন গুরুতর-ব্যথায়-ব্যথিত আমাকে আশ্বাস দিচ্ছ, আমার এই দক্ষিণবাহু তেমনি স্পন্দন জাগিয়ে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে।

বিদূষক—ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যে হয় না।

(রাজার প্রত্যাশা নিয়ে অবস্থান)

(আকাশযানে অভিসারিকা বেশে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্বশী—(নিজেকে দেখে) ওলো চিত্রলেখা, গায়ে সামান্য গয়না আর পরনে নীল শাড়ি—আমার এই অভিসারিকার বেশ কি তোর ভালো লাগছে ?

চিত্রলেখা—প্রশংসা করবার মতো ভাষার দৌড় আমার নেই। শুধু ভাবছি, আমি যদি পুরূরবা হতাম !

উর্বশী—সখী প্রেমের দেবতা তোকে আদেশ দিচ্ছে—আমাকে শিগ্‌গির প্রিয়তমের আবাসে নিয়ে চল্।

চিত্রলেখা—এই তো তোর প্রিয়তমের ভবনে এসে পড়েছি দুজনে, এ ভবন যেন কৈলাসেরই নামান্তর মাত্র।

উর্বশী—তাহলে দিব্য প্রভাবে জেনে নে, আমার সেই মন-চোর কোথায় কী করছেন।

চিত্রলেখা—(ধ্যান করে। মনে মনে) ঠিক আছে, প্রথমে এর সঙ্গে একটু মজা করি। (প্রকাশ্যে) ওলো, এই তো, মনের মতো প্রিয়াসমাগমের সুখ অনুভব করার জায়গাতেই তিনি আছেন।

(উর্বশীর বিষণ্ণতার অভিনয়)

চিত্রলেখা— বোকা কোথাকার। (তুই ছাড়া) প্রিয়সমাগমের অন্য চিন্তা করছিস কেন ?

উর্বশী—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তোর কথায় একটু সন্দেহের কাঁটা থাকায় আমার হৃদয় কেমন অনুদার হয়ে পড়েছিল।

চিত্রলেখা—(দেখে) এই যে রাজর্ষি মণিহর্ম্যপ্রাসাদে আছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বয়স্য। আয় তবে, এঁর কাছে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা—রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আমার মদনজ্বালাও বাড়ছে।

উর্বশী—ঠিক মর্মোদ্ধার করতে না পারায় এ কথায় হৃদয় কাঁপছে। তাই যতক্ষণ না আমাদের সংশয় দূর হচ্ছে ততক্ষণ আড়ালে থেকেই এঁদের গোপন কথা শুনি।
চিত্রলেখা—তোর যেমন ইচ্ছে।
বিদূষক—তাহলে এই অমৃতগর্ভ চাঁদের আলো উপভোগ করো না কেন ?
রাজা—এ ধরণের কোনো উপায়েই এই অস্বস্তি দূর করা যাবে না। দেখো—
সদ্য-আহৃত কুসুমে রচিত শয্যা, চন্দ্রকিরণ, সর্বাঙ্গে চন্দনলেখা বা মণিহার কিছুই আমার মদনজ্বালা দূর করতে পারবে না ; যদি পারে সেই দিব্যাঙ্গনা অথবা—
উর্বশী—অথবা আর কে ?
রাজা—তার বিষয়ে নির্জনে কোনো কথাই পারবে তা লাঘব করতে।
উর্বশী—হে হৃদয় ! এখন আমাকে ত্যাগ করে তাঁর (ঐ রাজর্ষির) মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তুমি ধন্য হলে।
বিদূষক—হ্যাঁ, আমিও যখন শিখরিণী বা রসাল হাতে না পাই তখন মনে মনে তাদের চেয়ে এবং তাদের নাম করে সান্ত্বনা পাই।
রাজা—এ তো তুমি পেতেই পারো।
বিদূষক—তুমি তাকে শিগ্গিরই পাবে।
রাজা—বন্ধু, আমার মনে হয়—
চিত্রলেখা—শোন্, অসন্তুষ্টা, শোন্—
বিদূষক—কী মনে হয় ?
রাজা—রথের ঝাঁকুনিতে তার কাঁধের স্পর্শ পাওয়ায় আমার এই কাঁধের অংশটুকুই ধন্য, শরীরের অন্য অঙ্গগুলো শুধু পৃথিবীর ভারমাত্র।
চিত্রলেখা—সখী, আর দেরি করছিস কেন ?
উর্বশী—(হঠাৎ এগিয়ে এসে) ওলো, আমি সামনে এলেও মহারাজ যে উদাসীন হয়েই রইলেন !
চিত্রলেখা—ওলো, বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তুই যে তিরস্করিণী-মায়াই ছাড়িস নি।

(নেপথ্যে)

এদিকে, এদিকে আসুন দেবী !

(সকলে কান দিল। উর্বশী সখীসহ বিষণ্ণা)

বিদূষক—কী মুশকিল ! কী মুশকিল ! দেবী এসে পড়লেন দেখছি। তাহলে কথার রাশ টানো এখন।
রাজা—তুমিও মনটাকে এখন জানান দিও না।
উর্বশী—ওলো, এখন কী করব ?
চিত্রলেখা—ভয় পাস নে। আমরা তো অদৃশ্য হয়েই আছি। রাজমহিষী উপবাসব্রতের বেশ ধারণ করেছেন দেখছি। তাই এখানে ইনি বেশিক্ষণ থাকবেন না।

(দেবী ও তাঁর সঙ্গে নৈবেদ্য হাতে পরিজনদের প্রবেশ)

দেবী—(চাঁদ দেখে) নিপুণিকা ! রোহিণীর সঙ্গে মিলিত চন্দ্রদেবকে আরও সুন্দর লাগছে।
চেটী—এখন দেবীর সঙ্গে মিলনে প্রভুও বিশেষ রমণীয় হলেন। (পরিক্রমা)
বিদূষক—জানি না দেবী আমাকে কোনো উপহার দিতে আসছেন, না ব্রতের ছলে রাগ

ভুলে তোমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করার দোষক্ষালন করতে আসছেন। (যে জন্যেই আসুন) আমার চোখে আজ ভারি সুন্দর লাগছে দেবীকে।

রাজা—(সহাস্যে) দুটোই হতে পারে, তবে তোমার পরের অনুমানটিই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ,

এ'র পরিধানে শুভ্র বসন, অঙ্গে মঙ্গলানুষ্ঠানের উপযোগী অলংকার, কেশগুচ্ছে পবিত্র দূর্বাদাম। তাঁর (শুচিসুন্দর) দেহ দেখে মনে হচ্ছে ব্রতের ছলে অবিনয় ত্যাগ করে ইনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

দেবী—(কাছে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

পরিজনেরা—প্রভুর জয় হোক।

বিদূষক—তোমাদের কল্যাণ হোক।

রাজা—এসো দেবী! (তাঁর হাত ধরে বসালেন)

উর্বশী—সখী, এই যে ইনি 'দেবী'-শব্দে সম্বোধিতা হলেন, তা ঠিকই হয়েছে। দীপ্তিমত্তায় ইনি শচীর চেয়ে কিছু কম নন।

চিত্রলেখা—তোর এই ঈর্ষাহীন উক্তি অভিনন্দনযোগ্য।

দেবী—আর্যপুত্রকে সামনে রেখে আমি একটি বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করব। তাই কিছুক্ষণের জন্যে এই উপরোধ তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজা—অমন করে বোলো না। উপরোধ মোটেই নয়, বলো 'অনুরোধ'।

বিদূষক—'স্বস্তিবাচন' উপহারসহ এ ধরনের উপরোধ বার বার হোক।

রাজা—দেবীর পালনীয় এই ব্রতের নাম কী? (দেবী নিপুণিকার দিকে তাকালেন)

নিপুণিকা—প্রভু, এর নাম 'প্রিয়ানুপ্রসাদন'।

রাজা—(দেবীর দিকে চেয়ে) যদি তাই হয়, হে কল্যাণী! বৃথাই তুমি এই ব্রতপালন করে তোমার মৃণালকোমল শরীরকে (অঙ্গকে) পীড়িত করছ। যে উৎসুক হয়ে তোমারই প্রসন্নতা ভিক্ষা করছে, সেই-দাসকেই তুমি প্রসন্ন করতে চলেছ?

উর্বশী—দেবীর প্রতি এ'র বিপুল সম্মান।

চিত্রলেখা—বোকা মেয়ে! অন্যের প্রতি আসক্ত নাগরের সৌজন্যের মাত্রা একটু বেশিই হয়।

দেবী—(সহাস্যে) আর্যপুত্রকে যে এ কথা বলতে হল এটুকুকেই ব্রতপালনের ফল বলতে পারি।

বিদূষক—আর কথা নয় বন্ধু! সুন্দর কথার পর আর বেশি পীড়াপীড়ি চলে না।

দেবী—মেয়েরা! তোরা পুজোর উপকরণগুলো নিয়ে আয়; মণিহর্ম্যে ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের কিরণকে পুজো করব আমি।

পরিজনেরা—তাই আনছি, দেবী। এই যে গন্ধকুসুম ও অন্যান্য উপচার।

দেবী—(গন্ধপুষ্পাদি দিয়ে চন্দ্রালোকে পুজোর অভিনয় করে) ওলো, তোরা আর্য মাণবককে এই মিঠাইগুলো দিয়ে আয়।

পরিজনেরা—দেবীর যা আদেশ। আর্য মাণবক, এগুলো আপনার জন্যে।

বিদূষক—(মিষ্টান্নের সরা নিয়ে) কল্যাণ হোক দেবীর। তোমার উপবাস বহু ফল বয়ে আনুক।

দেবী—আর্যপুত্র! এদিকে এসো।

রাজা–এই যে আমি।

দেবী–(রাজাকে পুজো করার অভিনয় করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে) এই আমি দেবতামিথুন রোহিণীচন্দ্রকে সাক্ষী করে আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করছি। আজ থেকে যে-স্ত্রীকে আর্যপুত্র চাইবেন, যে স্ত্রী আর্যপুত্রের মিলনপ্রার্থিনী তার সঙ্গে আমি প্রীতিবন্ধনে বাঁধা পড়ব।

উর্বশী–আহা! আমি জানি না এ কথার তাৎপর্য কী। আমার মন কিন্তু (এঁর প্রতি) বিশ্বাসে নির্মল হয়েছে।

চিত্রলেখা–এই মহাপ্রাণা পতিব্রতার অনুমতিতে তোর প্রিয়সমাগমের আর কোনো বাধা থাকবে না।

বিদূষক–(মনে মনে) হাতের মাছ পালিয়ে গেলে জেলে বলে 'পুণ্য হবে'। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, মহারাজ কি দেবীর এত প্রিয়?

দেবী–মূর্খ! আমি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েও আর্যপুত্রকে সুখী করতে চাই। এতেই বুঝে নাও তিনি আমার প্রিয় কি না।

রাজা–তোমার এই দানকে তুমি অন্যের হাতে তুলে দিয়ে পারো বা কেড়ে নিতেও পারো। কিন্তু হে ভীরু! তুমি আমাকে যা ভাবছ, আমি তা নই।

দেবী–হও বা না হও। আমি প্রিয়ানুপ্রসাদন-ব্রত যেমনটা চেয়েছিলাম, তেমনি করেই পালন করেছি। আয় মেয়েরা, আমরা যাই। (প্রস্থান)

রাজা–তুমি যদি এখন আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি তো 'প্রসাদিত হলাম' এমন বলতে পারব না।

দেবী–আর্যপুত্র! আমি (ব্রতপালনব্যাপারে) কখনও নিয়মভঙ্গ করি নি।

(পরিজনদের নিয়ে প্রস্থান)

উর্বশী–সখী, রাজর্ষি পত্নীপ্রেমিক, কিন্তু আমি তো হৃদয়কে নিবৃত্ত করতে পারছি না।

চিত্রলেখা–এখন কি নিরাশ হয়ে ফিরে যাবি?

রাজা–(আসনে এসে বসে) বয়স্য! দেবী (যথেষ্ট) দূরে চলে যান নি কি?

বিদূষক–যা বলতে চাও নির্ভয়ে বলো। বদ্যি যেমন হাল ছেড়ে দেয়, তোমার সম্বন্ধে দেবীও তেমনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

রাজা–যদি উর্বশী–

উর্বশী–আজ কৃতার্থ হয়।

রাজা–সেই কান্তা অদৃশ্যা হলেও যদি আমার মনে শুধু নূপুরের ধ্বনিটি বর্ষণ করত! যদি পিছন থেকে ধীরে ধীরে এসে তার করপদ্মের বেষ্টনীতে আমার চোখ চেপে ধরত। অথবা যদি এই হর্ম্যে অবতরণ করার পর তার চতুরা সখী ভয়ে-শ্লথগতি তাকে একপা-একপা করে সবলে আমার কাছে ধরে আনত!

উর্বশী–সখী, এই আমি তাঁর মনোরথ পূর্ণ করছি। (তাঁর পিছনে গিয়ে চোখ চেপে ধরল)

(চিত্রলেখা বিদূষককে ইশারা করল)

রাজা–(স্পর্শ-অনুভব রূপায়িত করে) সখা এই সেই নারায়ণের উরুসম্ভূতা সুন্দরী।

বিদূষক–জানলে কী করে?

রাজা–না জানার কী আছে?

অনঙ্গপীড়িত আমার এই দেহকে করস্পর্শে আর কেউ আনন্দ দিতে পারবে না। কুমুদ তো চন্দ্রকিরণেই উচ্ছ্বসিত হয়, সূর্যকিরণে নয়।

উর্বশী—(হাত সরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে) জয় হোক মহারাজের !

রাজা—সুন্দরী ! স্বাগত।

চিত্রলেখা—সুখে আছেন তো বন্ধু ?

রাজা—সুখ এক্ষুনি এলো বলা চলে।

উর্বশী—সখী, দেবী মহারাজকে দিয়ে গেলেন। তাঁরই বান্ধবী হিসেবেই আমি এঁর দেহসম্পর্কে এসেছি। অধিকারভঙ্গ করেছি বলে আমাকে দোষ দিতে পারবি না।

বিদূষক—ও, তাহলে তোমরা এখানে সূর্য অস্ত যাবার সময় থেকেই আছ !

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) দেবী দিয়েছেন বলে যদি আমার অঙ্গস্পর্শ করে থাক তাহলে জিজ্ঞেস করব প্রথমে কার অনুমতিতে তুমি আমার হৃদয় চুরি করেছিলে ?

চিত্রলেখা—বয়স্য, এর উত্তর এ দিতে পারবে না। এখন আমার অনুরোধ শুনুন।

রাজা—সাগ্রহে শুনছি।

চিত্রলেখা—বসন্তের পর গ্রীষ্ম এলে সূর্য-আরাধনা করব। তাই বলছিলাম, আমার প্রিয়সখী যাতে স্বর্গের জন্যে উৎকণ্ঠিতা না হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন।

বিদূষক—স্বর্গে মনে রাখবার মতো এমন কী আছে ? সেখানে তো না আছে পান, না আছে ভোজন। কেবল অনিমেষ-নয়নে মাছের অনুকরণ করা।

রাজা—ভদ্রে,

স্বর্গ অনিবর্চনীয় সুখের রাজ্য। তাকে কে ভোলাতে পারে ? তবে (এটুকু জানবে) অন্য নারীর অলভ্য এই পুরূরবা তার (তোমার সখীর) দাস হয়ে থাকবে।

চিত্রলেখা—অনুগৃহীত হলাম। উর্বশী ! মন খারাপ না করে আমাকে বিদায় দে, ভাই !

উর্বশী—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করে) সখী, আমাকে ভুলে যাস নে।

চিত্রলেখা—(সহাস্যে) বয়স্যের সঙ্গে যখন তোর মিলন হল, তখন তো আমার তোর কাছেই এই অনুরোধ করতে হবে। (রাজাকে প্রণাম করে প্রস্থান)

বিদূষক—এখন তো মনোরথের পূর্ণতায় ধন্য তুমি।

রাজা—সত্যি এ আমার গৌরব। দেখো—

সখা, এর চরণদুটির রমণীয় দাসত্বলাভ করে আমি যতটা কৃতার্থ হয়েছি, সামন্ত-রাজাদের মুকুটমণিতে রঞ্জিত শাসন এবং একচ্ছত্র প্রভুত্বতেও আমি নিজেকে ততটা কৃতার্থ মনে করি না।

উর্বশী—এর চেয়েও প্রিয়তর কিছু বলবার সাধ্য আমার নেই।

রাজা—(উর্বশীর হাত ধরে) কী অদ্ভুত ! ঈপ্সিতলাভও বিপরীত ফল দেয়—

চন্দ্রের সেই কিরণজাল এখন আমার শরীরকে পরিতৃপ্ত করে। মদনের সেই বাণরাজি এখন আমার অনুকূল। হে সুন্দরী, যে সব জিনিস আমার কাছে প্রতিকূলতায় রুক্ষ ছিল, সে-সব কিছুই তোমার সঙ্গে মিলনের পর সুখকর হয়েছে।

উর্বশী—দেরি করে এসে আমি মহারাজের কাছে অপরাধ করেছি।

রাজা—না, তা নয়।

দুঃখের পর যে সুখ আসে তা আরও বেশি উপভোগ্য। যে তাপসন্তপ্ত,

তরুচ্ছায়া তার পক্ষেই বিশেষ আরামদায়ক।
বিদূষক—বন্ধু, প্রদোষ-রমণীয় চন্দ্রকিরণ আমরা উপভোগ করলাম। এবারে ঘরে যাবার সময় হল।
রাজা—তাহলে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে দাও।
বিদূষক—এই দিক দিয়ে আসুন, আর্য।
রাজা—সুন্দরী! এখন আমার প্রবল বাসনা—
উর্বশী—কী?
রাজা—আমার বাসনা যখন পূর্ণ হয় নি, তখন রাত আমার কাছে মনে হত শতগুণে বিস্তারিত। তোমার সঙ্গে মিলনের পর যদি রাত অমনিই দীর্ঘায়িত মনে হয় তাহলে আমি ধন্য হব।

(সকলের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

চতুর্থ অংক

(নেপথ্যে সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক আক্ষিপ্তিকা-গীতি)

প্রিয়সখীর বিচ্ছেদে কাতর চিত্রলেখা সখীকে (সহজন্যাকে) নিয়ে সরোবরের তীরে এলেন; যে সরোবরে সূর্যকিরণের স্পর্শে পদ্ম প্রস্ফুটিত।
চিত্রলেখা—(প্রবেশ করে দ্বিপদিকাগীত গাইতে গাইতে চারদিক দেখে) সরোবরে সহচরীর দুঃখে কাতর প্রীতিবন্ধ হংসীযুগল অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করছে।

(সহজন্যার প্রবেশ)

সহজন্যা—(চিত্রলেখাকে দেখে) সখী! ম্লান পদ্মের মতো তোর মুখচ্ছবি তোর মনের অবস্থা বলে দিচ্ছে। বল্ তো তোর মন খারাপ কেন? তোর দুঃখের ভাগ নিতে চাই আমি।
চিত্রলেখা—অপ্সরাদের পালনীয় বিশেষ ব্রতপর্যায়ে সূর্যদেবের চরণবন্দনা করতে করতে উর্বশীর জন্যে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম।
সহজন্যা—তোরা দুজনে দুজনকে কত ভালোবাসিস তা তো আমি জানি। তারপর?
চিত্রলেখা—এ সময়টায় ওদের খবর কী জানবার জন্যে ধ্যানে বসে বুঝলাম অমঙ্গল ঘটেছে।
সহজন্যা—কী রকম?
চিত্রলেখা—উর্বশী তার প্রণয়দোসর রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদনে বিহার করতে গিয়েছিল। মন্ত্রীদের ওপরে রাজ্যভার দিয়ে গিয়েছিলেন রাজর্ষি।
সহজন্যা—সত্যি বলতে কি, ও রকম জায়গা ছাড়া বিহার ঠিক জমে না। তারপর?
চিত্রলেখা—সেখানে মন্দাকিনীর তীরে বালির পাহাড়-গড়ার খেলায় মেতেছিল উদয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা। রাজর্ষি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। তাই উর্বশীর রাগ হয়েছিল।
সহজন্যা—তা তো হতেই পারে। গভীর প্রেম অসহিষ্ণু হয়? তারপর?
চিত্রলেখা—তারপর স্বামী ক্ষমা চাইলেও গুরুর (ভরতমুনির) শাপে মনটা মোহগ্রস্ত ছিল

বলে সে তা উপেক্ষা করে দেবতার বিধিনিষেধ ভুলে স্ত্রীলোকের অপ্রবেশ্য কুমারবনে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে বনপ্রান্তের লতায় রূপান্তরিত হল।

সহজন্যা—বিধির অসাধ্য কিছু নেই। ও রকম ভালোবাসার এমন পরিণতি ভাবাই যায় না। এখন রাজর্ষির অবস্থা কী?

চিত্রলেখা—প্রিয়তমের অন্বেষণে দিনরাত ঐ বনেই পড়ে রয়েছেন। এর ওপর আবার মেঘোদয়, তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হবে, মেঘোদয়ে তো (বিরহীর) উৎকণ্ঠা বেড়েই থাকে।

(এই সময়ে জম্ভলিকা গীত)

সরোবরে প্রীতিবন্ধ হংসীযুগল সহচরীর দুঃখে কাতর হয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন করে বিলাপ করছে।

সহজন্যা—মিলনের কি কোনো উপায় আছে?

চিত্রলেখা—গৌরীচরণরাগ থেকে উদ্ভূত 'সংগমনীয়'-মণি ছাড়া মিলনের আর উপায় কী?

সহজন্যা—ঐ ওরকম (দিব্য-) আকৃতির মনুষ্যদের বেশিদিন দুঃখভোগ করতে হয় না। বিশেষ কারো অনুগ্রহের ফলে অবশ্যই আবার তাদের মিলন হবে। এখন আয়, উদীয়মান সূর্যদেবের উপাসনা করি।

(এরপর খণ্ডধারা-গীতি)

চিন্তাক্লিষ্ট মনে সহচরীকে দেখবার ইচ্ছে নিয়ে হংসী বিকশিতপদ্মে-রমণীয় সরোবরে বিচরণ করছে। (প্রস্থান)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

(নেপথ্যে পুরূরবার প্রবেশসূচক আক্ষিপ্তিকাগীতি)

গজরাজ প্রিয়বিচ্ছেদের মত্ততায় বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং দেহের বিপুল অংশ তরুলতার ফুলপল্লবে মণ্ডিত করে বনে প্রবেশ করছে।

(উন্মত্তবেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা—দাঁড়া, দুরাত্মা রাক্ষস, দাঁড়া!

আমার প্রিয়াকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?

ওঃ, শৈলশিখর থেকে আকাশে উঠে আমার ওপরে শরবর্ষণ করছে।

(ঢিল নিয়ে মারতে ছুটলেন। তারপর দ্বিপদিকাগীতের সঙ্গে চারদিক চেয়ে)

সরোবরে প্রিয়াবিচ্ছেদের দুঃখ হৃদয়ে বয়ে, পাখা কাঁপিয়ে হংসযুবা ব্যাধের দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়ে বিলাপ করছে।

(চিন্তা করে) এ দেখছি নবীন মেঘ, উদ্ধত রাক্ষস নয়। এ ইন্দ্রধনু, দুরাকৃষ্ট ধনু নয়। এ-ও বৃষ্টির তীব্রধারা, শরবর্ষণ নয়। আর এ হল কষ্টিপাথরে-টানা স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল বিদ্যুৎ, প্রিয়া উর্বশী নয়।

(চিন্তা করে) সুন্দরী তবে গেল কোথায়?

(মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়ে আবার দ্বিপদিকাগীতির সঙ্গে উঠে নিঃশ্বাস ফেলে) আমি ভেবেছিলাম মৃগনয়নাকে কোনো নিশাচর হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি নবীন-বিদ্যুতে মণ্ডিত হয়ে (কৃষ্ণ-) মেঘ ধারাবর্ষণ করছে।

কুপিতা হয়ে সে দিব্যশক্তিতে অদৃশ্যা হয়ে আছে। কিন্তু কুপিতা হয়ে তো সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, নাকি স্বর্গেই চলে গেল? কিন্তু আমার প্রতি তাঁর

হৃদয় তো প্রেমপূর্ণ। আমি সামনে থাকতে দেবশত্রুরা তাকে হরণও করতে পারবে না। তবুও সে আমার দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে। কী দুর্ভাগ্য আমার! (সমস্ত দিক দেখে সনিঃশ্বাসে) ভাগ্য যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার দুঃখ ধারাবাহিক।

একই সঙ্গে দুঃসহ প্রিয়াবিচ্ছেদ ঘটল, নবমেঘোদয়ে প্রখর তাপ কমে গিয়ে দিনও হল রমণীয়।

(তারপর চর্চরীগান)

ধারাসারে দিঙ্‌মণ্ডল সরস করে শোভমান হে জলধর! আমার আজ্ঞায় তুমি ক্রোধ সংবরণ করো। আমি পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে করতে যদি প্রিয়ার দেখা পাই তখন তুমি যা করবে আমি সহ্য করব।

(হেসে) আমি অনর্থক আমার মনস্তাপকে বাড়তে দিচ্ছি। কারণ, মুনিরাও বলেন—'রাজা কালের নিয়ন্ত্রক', তাহলে এই বর্ষাকালকে আমি অপসারিত করি না কেন?

(এর পর চর্চরীগান)

প্রবাহিত পবনে পল্লবদল কম্পিত করে নানান্ রম্য-ভঙ্গীতে নৃত্যে মেতেছে কল্পতরু। গন্ধে-আকুল ভ্রমরের গান আছে তার সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে বাজছে পরভৃতদের তূর্য।

(নৃত্য করে)

অথবা বর্ষার এইসব লক্ষণেই আমার রাজ-উপচার-মূর্তি নিয়েছে। কারণ, বিদ্যুৎ-স্বর্ণে রমণীয় মেঘ আমার রাজচ্ছত্র, নিচুলতরুর মঞ্জরী আমার ওপরে চামর দোলাচ্ছে। গ্রীষ্ম চলে যাওয়ায় যাদের কণ্ঠ তীব্রতর হয়েছে, সেই ময়ূরেরা আমার চারণকবি। আর ধারা-বইয়ে-দেওয়া পর্বতেরা হল আমার উপহার-বয়ে-আনা বণিকদল।

যাক, আমার উপচারের প্রশংসায় আর লাভ কী? এখন অরণ্যে সেই প্রিয়তমার অন্বেষণ করি।

(এর পরে ভিন্নক-গীতি)

প্রিয়াবিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর এবং বিরহখিন্ন ও ধীরগতি গজরাজ কুসুমশোভিত পর্বতারণ্যে যেন চলতেই পারছে না।

(তারপরে দ্বিপদিকা গানের সঙ্গে পরিক্রমা করে এবং দেখে সহর্ষে তাকিয়ে) আমার প্রচেষ্টায় প্রেরণাই পাচ্ছি যেন। কারণ—

ঈষৎ-রক্তিমরেখা-মণ্ডিত পুষ্পে জলগর্ভ এই নবকন্দলী অভিমানে অশ্রুময় তার চোখ দুটিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কী করে বুঝব সে বিশেষ কোন্ পথে গিয়েছে?

সেই সুন্দরী যদি বৃষ্টিভেজা-ধুলোর এই বনস্থলীর মাটি পা-দুটিতে স্পর্শ করত তাহলে তার আলতা-পরা পায়ের সুন্দর ছাপ দেখা যেত, যার পিছন দিকটা তার নিতম্বভারের দরুন গভীর দেখাত।

(পরিক্রমা করে দেখে সানন্দে) একটা চিহ্ন পেয়েছি যার ফলে সেই কুপিতার পথ অনুমান করতে পারব।

নিঃসন্দেহে এটি সেই নত-নাভিমণ্ডিতার স্তনচ্ছদ, যা শুকপাখির পেটের মতো শ্যামবর্ণ ; ক্রোধে স্খলিতপদে চলার সময়ে যা খসে পড়েছে, ঝরে-পড়া চোখের-জলে-ধোয়া ওষ্ঠরাগে যা অঙ্কিত।
(ভালো করে দেখে) ওগো ! ইন্দ্রগোপমণ্ডিত নবতৃণভূমি ! নির্জন বনে কোথায় আমার প্রিয়ার খবর পাব ? (দেখে) বাঃ, ধারাবৃষ্টির পর বাষ্পনিঃসারী এই পর্বতস্থলীর পাষাণে উঠে—
একটি ময়ূরী মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিকূল বাতাসে তার চূড়া কাঁপছে। তার কেকাগর্ভ কণ্ঠটি সে দূরে বাড়িয়ে দিয়েছে।
একেই জিজ্ঞেস করি। (কাছে এসে)

(তারপর খণ্ডক-গান)

(সবলে-) পরিগৃহীতা প্রিয়তমার দর্শনলালসায় কাতর গজরাজ বিস্মিতহৃদয়ে ভ্রমণ করছে।

(খণ্ডকের পর চর্চরী-গান)

ওগো শিখী ! আমি তোমার কাছে প্রার্থী। বলো, এই বনে ঘুরতে ঘুরতে তুমি কি আমার কান্তাকে দেখেছ ? তার মুখ চাঁদের মতো, তার গতিভঙ্গী হংসের মতো, এইসব লক্ষণ দেখে তোমরা তাকে চিনবে। এইজন্যেই তোমাকে সব বললাম।
ওগো নীলকণ্ঠ ! ওগো সিতাপাঙ্গ ! তুমি কি এই আমার দর্শনীয়া স্ত্রীকে দেখেছ ? —যার অপাঙ্গ আয়ত, যার কণ্ঠ সমুন্নত ?
এ কী ? এ যে উত্তর না দিয়েই নাচতে শুরু করল ! এর আনন্দের কারণটা কী ?
(চিন্তা করে) হ্যাঁ, বুঝেছি।
আমার প্রিয়া নিরুদ্দেশ হওয়ায় মৃদু-বাতাসে-বিভক্ত এর মেঘবরণ পুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হয়েছে। কারণ, সেই সুকেশীর রতিক্রীড়ায় শিথিলবন্ধ, কুসুমসজ্জিত কেশপাশ যদি থাকত তাহলে এই শিখী কী করত ? (অর্থাৎ তার পুচ্ছধারণই বৃথা হয়ে যেত)
যাক। পরের দুঃখে যে আনন্দিত তাকে জিজ্ঞেসই করব না। (পরিক্রমা করে) এই জামগাছে একটি কোকিলবধূ বসে আছে। গ্রীষ্মশেষে এর আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। একেই জিজ্ঞেস করি। পাখিদের মধ্যে এই জাতিই চতুর। একেই অনুরোধ করি তবে।

(এরপর খুরক-গীতি)

গজরাজ গগনস্পর্শী কলেবর বিদ্যাধর-কাননে বিচরণ করছে। বেদনায় নিঃসৃত অশ্রুধারায় তার নয়ন পূর্ণ। তার হৃদয়ের আনন্দ সুদূরে অন্তর্হিত।

(খণ্ডকের পর চর্চরী)

নন্দনবনে স্বচ্ছন্দচারী, মধুরপ্রলাপী ওগো পরভৃত। যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখে থাক আমাকে বলো।

(এই বলে নেচে বলন্তিকাগীত আশ্রয় করে হাঁটু গেড়ে বসে)

শোনো,
তোমাকে প্রেমিকেরা মদনদূতী বলে, তুমি (মানিনীদের) মানভঙ্গে-নিপুণ অব্যর্থ

অঙ্গ। হে কলভাষিণী, হয় সেই প্রিয়তমাকে আমার কাছে আনো, না-হয়, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো যেখানে সেই কান্তা আছে।

কী বললে? অনুরক্ত হলেও তোমাকে সে ছেড়ে গেল কেন? তবে শোনো—

(একটু-পরিবর্তিত দেহসংস্থানে তাকিয়ে)

সে কুপিতা হয়েছিল, কিন্তু আমি একবারও তার রাগ হবার মতো কিছু করেছি বলে মনে করতে পারছি না। স্বামীদের ওপরে স্ত্রীদের প্রভুত্ব কোনো প্রণয়স্খলনের অপেক্ষা করে না।

এ কী! এ দেখি আমার কথার মাঝখানেই নিজের কাজে মন দিল!

পরের দুঃখ খুব গভীর হলেও তা শীতল এ কথা ঠিকই বলা হয়ে থাকে। কারণ বিপদাপন্ন আমার অনুনয় উপেক্ষা করেই সে রাজজম্বুগাছের ফল আস্বাদনে রত হল, এই মদান্ধা যেন (প্রিয়ার) অধরপানেই প্রবৃত্ত হল।

তা হলেও প্রিয়ার মতো সুকণ্ঠী বলেই এর ওপরে রাগ করব না। এখান থেকে যাই; (পরিক্রমা করে, কান দিয়ে) আমার দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণপাতের ইঙ্গিতবহ নূপুরধ্বনি শুনছি। ওদিকে যাই। (পরিক্রমা করে)

অত্যন্ত ব্যথিত মনে গজরাজ অরণ্যে ভ্রমণ করছে। প্রিয়তমার বিচ্ছেদে তার মুখ ক্লান্ত, নয়ন অবিরল অশ্রুপাতে স্খলিত, অত্যন্ত গুরুতাপে তার অঙ্গ তাপিত।

(এইভাবে ককুভ-পদ্ধতিতে পদটির ষড়ঙ্গ পুনরাবৃত্তি করে এবং দ্বিপদিকাগানে দিঙ্মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে) প্রিয়করিণী-বিযুক্ত হয়ে, গুরুতর শোকানলে দগ্ধ হয়ে, গজরাজ আকুল হয়ে অশ্রুসিক্ত-নয়নে ভ্রমণ করছে।

হায়! এ যে মেঘে-অন্ধকার দিঙ্মণ্ডল দেখে মানসযাত্রায়-উৎসুক রাজহংসদের কূজন, নূপুরধ্বনি তো নয়!

যাক, মানস-উৎসুক এই পাখি সরোবর থেকে ওড়ার আগেই প্রিয়ার খবর জেনে নিতে হবে। (এগিয়ে এসে) ওহে জলবিহঙ্গপতি—

একটু পরেই না হয় মানস-সরোবরে রওনা হবে। যাত্রার পাথেয় পদ্মনাল রেখে দাও, আবার না হয় তুলে নিও। আমাকে আগে দয়িতার বার্তা দিয়ে দুঃখমুক্ত করো। সজ্জনদের কাছে স্বার্থের চেয়ে প্রার্থিজনের কাজই বড়ো।

এই যে ওপরে তাকাচ্ছে, তার মানে সে বলতে চায়—'মানস-যাত্রায় মন পড়ে আছে বলে আমি তাকে লক্ষ্যই করি নি।' (উপবেশন করে চর্চরী গান)

ওরে হংস লুকোচ্ছিস কেন? (নৃত্য করে উঠে)

হে হংস! যদি আমার কুটিলভ্রূমণ্ডিতা প্রিয়াকে সরোবরের তীরে না দেখে থাক, তাহলে, হে তস্কর! তার মদালস গতিভঙ্গী তুমি কেমন করে পেলে?

(চর্চরিকায় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে)

তাই,

হে হংস! আমার কান্তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও; কারণ, তার গতি তুমি চুরি করেছ। যার কাছে কোনো (অপহৃত) জিনিসের অংশবিশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার কাছে সম্পূর্ণ জিনিসটাই দাবি করা যেতে পারে।

(আবার চর্চরীগীতি)

হে গতি-অভিলাষী! এ গতিভঙ্গী কার কাছ থেকে শিখলে? সেই জঘনভারে-

অলসাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ।
(আবার চর্চরী। 'হংস প্রযচ্ছ' ইত্যাদি পাঠ করে দ্বিপদিকার্থ দেখে নিয়ে, হেসে)
আমি রাজা, চোরকে শাস্তি দিতে উদ্যত—এই মনে করে ভয়েই উড়ে পালাল।
(পরিক্রমা করে) এখানে দেখছি একটি প্রিয়াসমন্বিত চক্রবাক। একে বরং জিজ্ঞেস করি।

(তারপর মল্লঘটী এবং চর্চরীসহ কুটিলিকা নৃত্যগীতি)

দয়িতাবিরহে মত্ত হয়ে গজরাজ মর্মরমণিমনোহর পুষ্পিতলতরু-মণ্ডিত অরণ্যে বিচরণ করছে।

(দ্বিলয়ে গীত হবার পর চর্চরী)

গোরোচনা ও কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক! তুমি কি মধুবাসরে ক্রীড়ারতাকে দেখ নি?

(চর্চরিকায় এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে)

ওগো রথাঙ্গনামা! রথাঙ্গের (চক্রের) মতো নিতম্ব যার, তার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। এই শতমনোরথে পূর্ণ রথী (বীর) তোমাকে জিজ্ঞেস করছে।
কী? জিজ্ঞেস করছ কে আমি? না, না। আমাকে তো এ চেনে না।
(আমি সে···) সূর্য ও চন্দ্র যার মাতামহ, উর্বশী এবং পৃথিবী দুজনেই যাকে নিজে থেকে পতিরূপে বরণ করেছে।
এ কী? চুপ করে আছে? তাহলে একে তিরস্কার করি। সরোবরে পদ্মপাতার আড়ালে পড়লেও সহচরী দূরে আছে মনে করে উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকতে থাক্‌। পত্নীপ্রেমে এমনি তোর বিচ্ছেদকাতরতা! অথচ যথার্থই যে বিরহী সেই-আমাকে প্রিয়ার বার্তা দেবার ব্যাপারে তোর এই বিমুখতা।
আমার ভাগ্য বিরূপ হয়ে তার প্রভাব দেখাচ্ছে। যাহোক, এখান থেকে অন্যখানে যাই। (একটু সরে দাঁড়িয়ে) থাক, যাব না।
ভিতরে গুঞ্জনরত ভ্রমর নিয়ে এই পদ্মটি আমাকে যেতে দিল না। এ যেন অধরদংশনে শীৎকারমণ্ডিত তার মুখ।
(অর্ধদ্বিচতুরস্রক ভঙ্গিতে) হংসবধূবা কামরম্য সরোবরে খেলা করছে, হঠাৎ তার প্রেমরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

(চতুরস্রকে এগিয়ে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে)

যাক, পদ্মের মধ্যেকার এই ভ্রমরের কাছেই অনুরোধ জানাই, এখান থেকে চলে যাবার পর যাতে অনুশোচনা করতে না হয়।
ওগো মধুকর! সেই মদিরনয়নার বার্তা দাও। (ভেবে) আমার সেই বরাঙ্গীকে নিশ্চয় দেখ নি। কারণ, যদি তার নিঃশ্বাস-সুরভির পরিচয় পেতে তাহলে কি তোমার এই পদ্মে অনুরাগ হত?
যাই তবে। (পরিক্রমা করে দেখে) একটি নীপশাখায় শুঁড় রেখে করিণী-সহ একটি গজরাজ দাঁড়িয়ে আছে।

(মল্লঘটীসহ কুটিলিকা)

করিণীর বিরহে সন্তপ্ত গজরাজ মদবারিগন্ধে-আকুল ভ্রমরবেষ্টিত হয়ে অরণ্যে বিচরণ করছে।
(স্থানক-সহ দেখে) এর কাছ থেকে প্রিয়ার কিছু সংবাদ শুনব। (দেখে) না

থাক, এত তাড়াহুড়ো করব না।
তার প্রিয়া-হস্তিনীর শুঁড়ে-করে-আনা শল্লকীশাখা এ আগে আস্বাদন করুক, তাতে নতুন পল্লব উদ্গত হয়েছে, তার রসে মদিরার মতো সুবাস।
(কিছুক্ষণ থেকে, দেখে) এই তো তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবারে জিজ্ঞেস করি।

(এরপর চর্চরী)

লীলাপ্রহারে-পাতিত-তরুবর, হে গজরাজ! তোমাকে প্রশ্ন করি, উত্তর দাও। যে লাবণ্য চন্দ্রকান্তিকে হেলায় পরাজিত করে আমার সেই প্রিয়াকে তোমার সামনে দিয়ে যেতে দেখেছ কি?
হে মদকল গজপতি, তুমি কি দূর থেকে তাকে দেখেছ, যে যুবতিদের মধ্যে চন্দ্রকলার মতো (শ্রেষ্ঠ), যার কেশদাম যূথিকায় মণ্ডিত, যার যৌবন অচঞ্চল, যাকে দেখলেই আনন্দ?
(শুনে সহর্ষে) প্রিয়াদর্শনের সূচক তোমার এই স্নিগ্ধ-গম্ভীর বৃংহণে আমি আশ্বস্ত হলাম। আমাদের দুজনের সাদৃশ্যের জন্যেও তোমাতে আমার গভীর প্রীতি।
আমাকে বলে রাজাধিরাজ, তুমিও নগাধিরাজ, তোমার দানেরই (দানবারির) ধারার মতো প্রার্থীদের মধ্যে আমার দানও অবিচ্ছিন্ন। হস্তিনীদলে তোমার এই সঙ্গিনী যেমন, স্ত্রীরত্নশ্রেষ্ঠা উর্বশীও তেমনি আমার প্রিয়তমা। তোমার সব-কিছুই আমার মতো, শুধু (আমার মতো) প্রিয়াবিচ্ছেদের দুঃখ তুমি পাও নি। সুখে থাকো তুমি। আমি যাই। (পরিক্রমা করে পাশে তাকিয়ে) এ কী! এ যে বিশেষ রমণীয় সুরভিকন্দর-নামে পর্বত; অপ্সরাদের অত্যন্ত প্রিয়ও বটে। সুন্দরীকে হয়তো এর উপত্যকায় পাওয়াও যেতে পারে!
(পরিক্রমা করে দেখে) হায়! আমার পাপে মেঘও বিদ্যুৎ-বিরহিত হল। তবু এই পর্বতকে না জিজ্ঞেস করে যাব না।

(এরপর খণ্ডিকা)

দেখো, গহনবনে লীন হয়ে অবিচলভাবে নিজের কাজে মগ্ন একটি শূকর বিচরণ করছে, উদ্গত খুরের আঘাতে মাটি ভেদ করে চলেছে সে।
হে স্থূলনিতম্ব পর্বত! তোমার কোনো বনে কি এমন-কোনো অঙ্গনা আশ্রয় নিয়েছে, যার স্তনদুটি ঘননিবন্ধ, দেহের সন্ধিগুলি সুডোল, যার নিতম্ব প্রশস্ত, যে অনঙ্গের আবাস-স্বরূপ?
চুপ করে আছে যে? মনে হয়, দূরত্বের জন্যে শুনতে পারছে না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি একে। (পরিক্রমা করে)

(এরপর চর্চরী

স্ফটিকশিলায় অত্যন্ত নির্মল, বহুপুষ্পময় চূড়ায় মণ্ডিত এবং কিন্নরের মধুর গানে মনোহর হে পর্বত, আমার প্রিয়তমাকে প্রদর্শন করো।

(চর্চরিকায় এগিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে)

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি তোমার রম্য বনপ্রান্তে এক সর্বাঙ্গসুন্দর। নারীকে দেখেছ, যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্না?
(শুনে সহর্ষে) কি বলল? ঠিক তেমনটি দেখেছে? বলছে 'এর চেয়েও প্রিয়তম

কিছু শুনুন' ? কোথায় তাহলে আমার প্রিয়তমা ? (নেপথ্যে তাই শুনে) হায় ! এ তো গুহায় প্রতিধ্বনিত আমারই কথা ! (হতাশার অভিনয় করে) শ্রান্ত আমি। এই পার্বত্য নদীর তীরে বসে তরঙ্গবায়ু সেবন করি। বৃষ্টির জলে আবিল হলেও এই নদী দেখে আমার মন প্রসন্ন হচ্ছে।

তরঙ্গ তার ভ্রূকুটি, চঞ্চল ভ্রমরশ্রেণী তার মেখলা। ঐ যে, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ক্রোধে বিস্রস্ত বসন আকর্ষণ করে চলেছে। নদীকে অমন বক্রগতিতে যেতে দেখে আমার মনে হচ্ছে সেই কোপনা উর্বশীই নদীরূপ ধারণ করে আমার ত্রুটিগুলি মনের মধ্যে আবর্তিত করে কুটিল পদক্ষেপে চলেছে।

যা হোক, এর কাছে প্রার্থনা জানাই।

(এরপর কুটিলিকা-গীতি)

আমার এই নতিতে প্রসন্ন হও হে প্রিয়তমা সুন্দরী সুরনদী ! তোমাকে ঘিরে আছে অকরুণ চঞ্চল বিহঙ্গের দল, তোমার তীরে উৎসুক হয়ে বসে আছে একটি হরিণ, তুমি ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিতা।

(কুটিলিকার পর চর্চরী)

দ্রুতবিস্তারিত হয়ে বর্ষাকাল দশদিক আচ্ছন্ন করছে। মহাসমুদ্র মনোরম ভঙ্গীতে নৃত্যরত হয়েছে। পুবহাওয়াতে-আহত তরঙ্গোচ্ছ্বাস তার উদ্গত বাহু, প্রতিফলিত মেঘ তার অঙ্গ, হংস-চক্রবাক-শঙ্খ-কুংকুম তার আভরণ, শ্বিপমকরে আকুল কৃষ্ণকমল তার পরিচ্ছদ। বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া তরঙ্গের ধ্বনি হল করতালি।

(চর্চরিকায় এগিয়ে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হয়ে)

মানিনী ! তোমাতে যার প্রেম একনিষ্ঠ, যে প্রিয়বাদী, যার মন প্রণয়ভঙ্গে পরাঙ্মুখ, সেই-আমার কোন্ সামান্যতম অপরাধে তুমি এ দাসকে পরিত্যাগ করছ ? না, এ সত্যিই নদী ; কারণ উর্বশী কখনো পুরূরবাকে পরিত্যাগ করে সমুদ্র অভিসারে যাবে না। যাহোক, হতাশার মধ্যে দিয়ে শ্রেয়লাভ হয় না। এখন সেইখানেই যাব যেখানে আমার নয়নাভিরামা অদৃশ্যা হয়েছে। (পরিক্রমা করে) আঃ তার পথের সন্ধান পেয়েছি।

এই সেই রক্তকদম্বতরু, গ্রীষ্মের অবসানসূচক যার একটি ফুল আমার প্রিয়া কেশগুচ্ছের অলংকার করেছিল ; সম্পূর্ণ পরাগবিকাশ না হওয়ায় যা ছিল অমসৃণ। (দেখে) একটা কৃষ্ণসার-মৃগ বসে আছে, প্রিয়ার সংবাদের জন্যে তাকেই অনুরোধ করি।

কৃষ্ণ ও কর্বুরকান্তি ঐ মৃগকে দেখে মনে হচ্ছে বনশোভা দেখার জন্যে বনশ্রীই যেন কটাক্ষপাত করেছেন।

(চর্চরী)

নিতম্বভারে যে অলস, স্তনযুগল যার পীনোন্নত, যার যৌবন অচঞ্চল, যার দেহ ক্ষীণ, যার গতি হংসের মতো, যার নয়ন হরিণের মতো, সেই সুরাঙ্গনাকে যদি আকাশনীল অরণ্যে বিচরণ করতে দেখে থাক, তবে আমাকে সেই বিরহসমুদ্রের পানে নিয়ে চলো।

(দেখে) কী ! আমাকে অবজ্ঞা করে অন্যদিকে মুখ ফেরালো নাকি ?

এর কাছে আসছিল একটি মৃগী, স্তন্যপায়ী শাবকটি তার গতিরোধ করেছে। ঘাড়

বাঁকিয়ে অনন্যদৃষ্টিতে সে তাকেই (ঐ মৃগীকেই) দেখছে।
ওহে যূথপতি !
তুমি কি বনে আমার প্রিয়াকে দেখেছ ? তার বৈশিষ্ট্য তোমাকে বলছি শোনো,
তোমার আয়তলোচনা সহচরীর মতো সে-ও মনোজ্ঞভাবে তাকায়।
আমার কথায় কান না দিয়ে সে প্রিয়ার দিকেই চেয়ে রইল ? তা তো হবেই।
অবস্থাবিপর্যয় ঘটলে লোকের মান থাকে না। এখান থেকে যাই (পরিক্রমা করে দেখে) পাথরের ফাটলে টক্‌টকে লাল-রঙের কী যেন দেখা যাচ্ছে ?
এর থেকে আলো ছড়াচ্ছে, তাই এটা সিংহনিহত কোনো হরিণের মাংসখণ্ড নয় ;
তবে কি আগুনের ফুলকি কিন্তু এক্ষুনি তো বৃষ্টি হল ! (চিন্তা করে)
ও ! এ দেখি রক্তাশোকস্তবকের মতো লালরঙের একটি মণি, যা নেবার জন্যে সূর্য যেন কর (বাহু ও শিলাতে কিরণ) প্রসারিত করে তা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।
এটা আমার মনকে আকর্ষণ করছে। এটা নেব আমি।

('আদাস্যে'-পদের পরে)

(তুলে নেবার অভিনয় করে) প্রণয়িনীতে প্রীতিবন্ধ গজরাজ দুঃখিত হয়ে ম্লানমুখে বাষ্পাকুলনয়নে বিচরণ করছে।
(দ্বিপদিকা-গানে এগিয়ে গিয়ে এবং তা তুলে নিয়ে। মনে মনে)
কিন্তু—যার মন্দারপুষ্পে সুবাসিত কেশে এই মণি মানাত, সেই প্রিয়াই এখন দুর্লভ। তাহলে একে আর চোখের জলে মলিন করি কেন ?

(নেপথ্যে

বৎস, গ্রহণ করো, গ্রহণ করো।
এ হল সংগমনীয় মণি, পার্বতীর চরণে-দেওয়া লাক্ষারস থেকে এর জন্ম। একে (দেহে) ধারণ করলে অচিরেই প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেয়।

রাজা—(শুনে) কে আমাকে আদেশ দিচ্ছে ? (চারদিকে চেয়ে) কোনো মৃগবৃত্তি মুনিই আমাকে করুণা করছেন। ভগবন্‌, আপনার আদেশে আমি অনুগৃহীত হলাম।
(মণি নিয়ে) ওগো সংগমনীয় !
তুমি যদি সেই ক্ষীণকটি-অঙ্গনা-থেকে-বিযুক্ত আমার মিলনসাধক হও, আমি তোমাকে আমার চূড়ামণি করব, শংকর যেমন বালচন্দ্রকে তার শিরোভূষণ করেছেন তেমনি।
(পরিক্রমা করে, দেখে) পুষ্পহীন হলেও এই লতাকে দেখে আমার প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তবে এ যে আমার মনকে মুগ্ধ করবে এ তো স্বাভাবিক। বৃষ্টিতে পাতা ভেজা থাকায় এ যেন এক তন্বী, যার অধর অশ্রুজলে-ধোয়া। সময় চলে যাওয়ায় ফুলফোটা বন্ধ হয়েছে বলে এ যেন অলংকারহীনা ; ভ্রমরগুঞ্জন না থাকায় এ যেন চিন্তামৌন-অবলম্বিনী কেউ। এ যেন সেই কোপনা নারী, আমাকে অবজ্ঞা করে পরে যে অনুতপ্তা।
আমার প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাকে আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করব।
(লতাটিকে আলিঙ্গন)
লতা ! দেখো আমি শূন্যহৃদয়ে ভ্রমণ করছি। যদি ভাগ্যক্রমে তাকে পাই, তবে

অবশ্যই এ-বন থেকে তাকে সরাব, আর কখনও সেই নিষ্ঠুর রমণীকে প্রবেশ করতে দেব না এখানে।

(চর্চরিকায় এগিয়ে লতাকে আলিঙ্গন)

(সেই লতার জায়গায় উর্বশীর প্রবেশ)

রাজা—(নিমীলিতচোখে স্পর্শ অভিনয় করে) আহা! উর্বশীর অঙ্গস্পর্শে আমার দেহ শীতল হল। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না কেন। কারণ—

প্রথমে যাকেই প্রিয়া বলে মনে করেছিলাম সে-ই অন্য কিছু হয়ে গিয়েছে। তাই যখন আমি স্পর্শ-অনুভবে প্রিয়াকে পেয়েছি তখন আর নিমীলিতনয়নে দেখব না।

(ধীরে ধীরে চোখ খুলে) এ কী! সত্যি প্রিয়তমাই তো!

উর্বশী—(সাশ্রুনয়নে) জয় হোক মহারাজের!

রাজা—হে তন্বী! তোমার বিচ্ছেদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আমি সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে ফিরে পেয়েছি, মূর্ছিত মানুষ যেমন চেতনাকে ফিরে পায়, তেমনি।

(তারপরে চর্চরী)

তোমার অন্বেষণে সাশ্রুনয়নে বনে ভ্রমণ করতে করতে ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, গজ, পর্বত, নদী, কুরঙ্গ—এদের কাকে না জিজ্ঞেস করেছি—

উর্বশী—অন্তশ্চেতনা দিয়ে আমি মহারাজের সব আচরণই প্রত্যক্ষ করেছি।

রাজা—'অন্তশ্চেতনা' কথাটার অর্থ কী? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

উর্বশী—বলছি। আগে, রাগের মাথায় আমি মহারাজকে যে-অবস্থায় ফেলেছি, তার জন্যে মহারাজ আমাকে মার্জনা করুন।

রাজা—(মার্জনা চেয়ে) আমাকে প্রসন্ন করবার দরকার নেই। তোমার দর্শনেই আমার অন্তরাত্মা আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয় নিয়ে প্রসন্ন হয়েছে। বলো, তুমি কেমন করে এতটা সময় আমাকে ছেড়ে থাকতে পারলে?

উর্বশী—শোনো প্রভু! ভগবান কার্তিকেয় চিরকুমারব্রত গ্রহণ করে অকলুষ-নামে গন্ধমাদনের প্রান্তে বাস করতে লাগলেন এবং নিয়ম করলেন—

রাজা—কী নিয়ম?

উর্বশী—যে-নারী এই প্রদেশে প্রবেশ করবে সে লতায় পরিণত হবে। গৌরীচরণরাগ থেকে যার উদ্ভব সেই-মণি ছাড়া সে মুক্তি পাবে না। মুনির শাপে আমার হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল বলে আমি দেবতার নিয়মের কথা ভুলে এবং তোমার অনুনয় উপেক্ষা করে এই কুমারবনে প্রবেশ করেছিলাম। প্রবেশ করামাত্রই বাসন্তী লতা হয়ে গিয়েছিলাম।

রাজা—এবারে সব বুঝলাম।

শয্যায় যে তুমি রতিশ্রমে নিদ্রিত আমাকে প্রবাসগত মনে করতে, সেই-তুমি আমার দীর্ঘবিরহ কেমন করে সহ্য করেছ?

তুমি যা বললে তোমার সঙ্গে মিলনের কারণস্বরূপ মুনির কাছ-থেকে-পাওয়া এই মণির প্রভাবেই তোমাকে পেয়েছি। (মণি দেখালেন)

উর্বশী—ও! এই সেই সংগমনীয়। এই জন্যেই প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করামাত্রই আমি আগের রূপ ফিরে পেলাম। (মণি নিয়ে মাথায় রাখল)

রাজা—সুন্দরী, এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো। ললাটে-নিহিত এই মণির প্রভাবে উদ্ভাসিত তোমার মুখ বালসূর্যের আলোয় রক্তবর্ণ পদ্মের শোভা ধারণ করেছে।

উর্বশী—প্রিয়ংবদ! দীর্ঘকাল হল তুমি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছ। প্রজারা আমাকে দোষ দিতে পারে। চলো ফিরে যাই।

রাজা—তুমি যা বল।

উর্বশী—কীভাবে যেতে চাও, প্রভু?

রাজা—ওগো লীলাগতি! আমাকে গৃহে নিয়ে চলো, (তোমার দিব্যপ্রভাবে) বিমানে-রূপান্তরিত একটি নবনির্গত মেঘে; তাতে উজ্জ্বল চিত্রমালায় রূপ নেবে ইন্দ্র-ধনু, যার পতাকার রূপ নেবে বিদ্যুৎচমক।

(চর্চরী)

সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, আনন্দরোমাঞ্চিত দেহে হংসযুবা ইচ্ছানুক্রমে-পাওয়া ব্যোমযানে বিহার করছে। (খণ্ডধারাগানের পর প্রস্থান)

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ চতুর্থ অংক সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অংক

(পরিতুষ্ট বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—কী আনন্দ! প্রিয়বয়স্য উর্বশীকে নিয়ে দীর্ঘকাল নন্দনবন এবং অন্যান্য দেবতারণ্যে বিহার করে ফিরেছেন।

এখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছেন তিনি। প্রজারা সসম্মানে উপচার দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করছে। নিঃসন্তানতা ছাড়া আর অন্য কোনো অভাব নেই তাঁর। আজকে বিশেষ এক তিথি পড়েছে বলে পবিত্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে মহিষীদের নিয়ে স্নান করে সম্প্রতি প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। যাই, তিনি প্রসাধন শেষ করার আগেই (কুংকুমচন্দনাদি) অনুলেপন এবং ফুলমালায় সবার আগে ভাগ বসাই। (পরিক্রমা)

(নেপথ্যে)

সর্বনাশ! সর্বনাশ!

যা অন্তঃপুরচারিণীদের শিরোভূষণ হতে পারে প্রভুর সেই মণিটি আমি তাল-পাতার পাথায় রেখে একটা রেশমী চাদরে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। একটুকরো মাংস মনে করে একটা শকুন তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূষক—(শুনে) সর্বনাশ! ঐ সংগমনীয় চূড়ামণিটি বয়স্যের অত্যন্ত আদরের জিনিস। তাই প্রসাধন শেষ না করেই তিনি আসন ছেড়ে এদিকেই আসছেন। ওঁর কাছে যাই তবে।

(বিচলিত পরিজনসহ রাজার প্রবেশ)

রাজা—নিজের মরণ যেচে-আনা এই পাখি-চোরটি কোথায়—সকলের যিনি রক্ষক তাঁর বাড়িতেই যে এই প্রথম চুরি করল?

কিরাতী—সোনার শিকলিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে মণি নিয়ে যেন আকাশে আঁচড় কেটে সে উড়ছে।

রাজা—দেখতে পেয়েছি পাখিটাকে। মুখে প্রলম্বিত স্বর্ণসূত্রটি ধরে দ্রুত মণ্ডলাকারে ঘুরছে পাখিটা। মণিটির রক্তরাগরেখায় সে যেন বলয় এঁকে চলেছে, জ্বলন্ত কাঠি হাতে ঘোরালে যেমনটি হয় তেমনি।

এখন করি কী?

বিদূষক—(কাছে এসে) দয়া দেখিয়ো না যেন। অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে।

রাজা—ঠিক বলেছ। ধনুক নিয়ে এসো এক্ষুনি।

(ধনুর্রক্ষিণী যবনীর প্রস্থান)

রাজা—বয়স্য, পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না তো!

বিদূষক—মাংসাশী ঐ অপরাধিটি দক্ষিণ দিকে গিয়েছে।

রাজা—(পরিক্রমা করে দেখে), হাঁ দেখতে পেয়েছি এবারে—

প্রভামণ্ডলে শোভমান এই মণি দিয়ে পাখিটি যেন দিগঙ্গনার কেশে অশোক-স্তবকের অলংকার পরিয়ে দিচ্ছে।

(ধনুক নিয়ে যবনীর প্রবেশ)

যবনী—দস্তানা-সহ এই আপনার ধনুক।

রাজা—ধনুক দিয়ে আর কী হবে?

তীরের পাল্লা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে ঐ মাংসাশী পাখিটি।

এখনও পাখিতে-নিয়ে-যাওয়া ঐ বিশেষ মণিটি রাতে ঘনমেঘে-যুক্ত মঙ্গলগ্রহের মতো শোভা পাচ্ছে।

(কঞ্চুকীকে দেখে)—লাতব্য, প্রধান নগররক্ষককে বলো সন্ধ্যায় আবাসতরুতে আশ্রয় নিলে ঐ বিহঙ্গদস্যুকে শিকার করুক সে।

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

বিদূষক—তুমি এখানে বোসো এখন।

রত্নচোর পাখিটা তোমার দণ্ড এড়িয়ে যাবে কোথায়?

রাজা—(বিদূষকের সঙ্গে বসে) রত্ন বলেই ঐ পাখিতে-নিয়ে-যাওয়া রত্নটিতে আমার মোহ নেই! ঐ সংগমনীয় (মণি) আমাকে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত করেছে বলেই ঐ মণি আমার এত প্রিয়।

বিদূষক—হাঁ, এ তো তুমি আগেই আমাকে বলেছ।

(বাণ-সহ মণি নিয়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—জয় হোক মহারাজের।

বাণরূপে পরিণত আপনার বলে (বলরূপ অস্ত্রে) বিদারিত হয়ে এই বধ্য বিহঙ্গ তার অপরাধের যোগ্য শাস্তি পেয়ে আকাশ থেকে চূড়ামণিসহ মাটিতে পড়েছে।

(সকলে বিস্ময় রূপায়িত করল)

কঞ্চুকী—জলে-ধুয়ে-নেওয়া এই মণিটি কাকে দেব?

রাজা—কিরাতী, মণিটিকে আগুনে শুদ্ধ করে পেটিকায় রেখে দাও।

কিরাতী—যে-আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা—লাতব্য, কার এই বাণ তা তুমি জান?

কণ্চুকী–নাম তো খোদাই করা আছে। কিন্তু আমি ঠিক পড়তে পারছি না।
রাজা–আমার কাছে আনো বাণটি।

(কণ্চুকী তাই করলেন)

(রাজা পড়তে পেরে এমন ভাব করলেন যাতে তার পুত্রলাভ সূচিত হল)

কণ্চুকী–আমি কাজে যাই তাহলে। (প্রস্থান)
বিদূষক–কী ভাবছ ?
রাজা–বাণটি যে ছুঁড়েছে তার নাম শোনো। (পড়লেন)

এই বাণটি ধনুর্ধর ও শত্রুপীড়ক আয়ুর–যে আয়ু ঐল (পুরূরবা) এবং উর্বশীর পুত্র।

বিদূষক–(সহর্ষে) কী আনন্দ ! তুমি পুত্রলাভে ধন্য হলে।
রাজা–বন্ধু, ব্যাপার কী বলো তো ?

নৈমিষ অরণ্যে যজ্ঞের সময়টুকু বাদ দিয়ে আমি তো উর্বশীর কাছ থেকে কখনও দূরে থাকি নি। তার গর্ভলক্ষণ তো আমার চোখে পড়ে নি। তিনি সন্তান লাভ করলেন কী করে ? তবে–

কিছুদিনের জন্যে তার দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম বটে। তার স্তনবৃন্ত হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণাভ, চোখের দৃষ্টি ছিল অলস, মুখকান্তি ছিল লবলীপাতার মতো পাণ্ডুর।

বিদূষক–তুমি মানবীর গুণগুলো দিব্যাঙ্গনায় আরোপ করছ কেন ? তাদের আচার-ব্যবহার সবই প্রভাবপ্রচ্ছন্ন।
রাজা–যা বলছ তাই যেন হয়। পুত্রকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখল কেন সে ?
বিদূষক–স্বর্গবাসিনীদের রহস্যের নাগাল কী করে পাওয়া যাবে ?
কণ্চুকী–(প্রবেশ করে) জয় হোক মহারাজের।

চ্যবনমুনির আশ্রম থেকে কুমারকে নিয়ে এক তাপসী এসেছেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা–দুজনকে অবিলম্বে ভিতরে আনো।
কণ্চুকী–মহারাজের যেমন আদেশ। (প্রস্থান। কুমার ও তাপসীসহ পুনঃপ্রবেশ)

এদিক দিয়ে আসুন, মা।

(সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক–(দেখে) এই কি সেই ক্ষত্রিয়কুমার–

শকুন লক্ষ্যভেদী হাঁসুলী-ফলা বাণে যার নাম লেখা ? তোমার সঙ্গে এর খুবই সাদৃশ্য।

রাজা–তা হবে, এবং সেই জন্যেই–

এর উপরে দৃষ্টি পড়তেই আমার চোখ সজল হয়ে উঠেছে। বাৎসল্যে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছে, মনে আসছে প্রসন্নতা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত গাম্ভীর্য ত্যাগ করে একে কম্পান্বিত দেহে নির্দয় ভাবে আলিঙ্গন করি।

কণ্চুকী–ওইখানেই দাঁড়ান মা।

(তাপসী ও কুমার দাঁড়ালেন)

রাজা–মা, প্রণাম।

রাজা—মা, প্রণাম।

তাপসী—মহাভাগ! চন্দ্রবংশকে চিরস্থায়ী কর। (মনে মনে) আহা! না বললেও রাজর্ষির সঙ্গে এর ঔরস-সম্পর্ক এমনিতেই বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

(কুমার ধনুক মাঝখানে রেখেই অঞ্জলি রচনা করল)

রাজা—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার—(মনে মনে) ইনি আমার পিতা আর আমি এঁর সন্তান এইটুকু শুনেই যদি (তাঁর প্রতি) আমার হৃদয় এমন প্রীতিরসে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহলে যারা উৎসঙ্গে লালিত হয়েছে তাদের (পিতার প্রতি) প্রীতিরস কত গভীরই না হয়!

রাজা—এখানে কেন এলেন, মা?

তাপসী—শুনুন মহারাজ! দীর্ঘায়ু (কুমার) এই আয়ুর জন্মের পর-পরই কোনো কারণে উর্বশী একে আমার হাতে গচ্ছিত রাখে। ক্ষত্রিয়কুমারের জন্যে জাতকর্মাদি যা করণীয় তা সবই ভগবান চ্যবনমুনি করেছেন।
(বৈদিক) বিদ্যাশিক্ষার পর একে ধনুর্বেদ শেখানো হয়েছে।

রাজা—এ (কুমার) সত্যিই ধন্য।

তাপসী—আজ এ ঋষিকুমারদের সঙ্গে পুষ্প ও সমিধ্ আহরণে বেরিয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ করেছে।

রাজা—(উৎকণ্ঠিতভাবে) কী করেছে?

তাপসী—শুনলাম তরুশিখরে প্রচ্ছন্ন একটি শকুনকে লক্ষ্য করে এ বাণ নিক্ষেপ করেছে।

(বিদূষক রাজার দিকে চাইল)

রাজা—তারপর?

তাপসী—তারপর সব শুনে শ্রদ্ধেয় চ্যবন বললেন, গচ্ছিত এ বালককে প্রত্যর্পণ কর। এইজন্যে আমি দেবী উর্বশীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাজা—আপনি তাহলে আসন গ্রহণ করুন, মা।

(তাঁর কাছে নিয়ে আসা আসনে বসলেন)

রাজা—লাতব্য, উর্বশীকে ডাকুন।

কঞ্চুকী—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা—(কুমারকে দেখে) এসো বৎস। সন্তানের স্পর্শ সমস্ত অঙ্গকে রোমাঞ্চিত করে। আমার কাছে এসে আমাকে আনন্দিত কর, চন্দ্রকিরণ যেমন চন্দ্রকান্তমণিকে আনন্দিত করে তেমনি করে।

তাপসী—বাছা! পিতাকে আনন্দিত কর।

(কুমার রাজার কাছে গিয়ে পাদস্পর্শ করল)

রাজা—(কুমারকে আলিঙ্গন করে পাদ-পীঠে বসিয়ে) বাছা! তোমার পিতার প্রিয়বন্ধু এই ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদূষক—ভয় পাবে কেন? বানর তো আশ্রমবাসীদের পরিচিতই।

কুমার—(সহাস্যে) তাত! প্রণাম।

বিদূষক—স্বস্তি।

(উর্বশী ও কণ্ডুকীর প্রবেশ)

কণ্ডুকী—এদিক দিয়ে আসুন দেবী।

উর্বশী—(কুমারকে দেখে) ধনুর্বাণ নিয়ে পাদপীঠে বসে আছে, মহারাজ স্বয়ং এর কেশগুচ্ছ বেঁধে দিচ্ছেন। কে এই বালক ?

(তাপসীকে দেখে) ও, সত্যবতীকে দেখেই বুঝেছি এ আমার পুত্র আয়ু। বেশ বড়ো হয়েছে তো ! (পরিক্রমা)

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) এই-যে তোমার মা এসেছেন, তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তিনি। স্নেহনিঃসৃত দুগ্ধধারায় তাঁর পরিহিত স্তনাংশুক অভিষিক্ত।

তাপসী—বাছা, এগিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এসো।

(কুমার উর্বশী প্রত্যুদ্‌গমন করল)

উর্বশী—মা, প্রণাম করছি তোমাকে।

তাপসী—স্বামীসোহাগিনী হও, বাছা।

কুমার—মা, প্রণাম।

উর্বশী—(নতমুখ কুমারকে আলিঙ্গন করে) পিতার মনের মতো হও।

(রাজার কাছে এসে) জয় হোক মহারাজের !

রাজা—সন্তানবতীর শুভাগমন হোক। এখানে আসন গ্রহণ কর। (অর্ধাসন দিলেন)

(উর্বশীর উপবেশন, সকলের যথোচিত উপবেশন)

তাপসী—কৃতবিদ্য আয়ু এখন কবচ ধারণের উপযুক্ত অর্থাৎ যৌবনে উপনীত। তাই তোমার স্বামীর সমক্ষেই আমি আমার হাতে গচ্ছিত এই পুত্রকে প্রত্যর্পণ করে এবারে বিদায় নিচ্ছি। আশ্রমের কাজকর্ম পড়ে আছে ওদিকে।

উর্বশী—অনেক দিন পর আর্যাকে দেখলাম, তাই ছাড়তে মন চায় না। তবু বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। আপনি আসুন, আবার যেন দেখা হয়।

রাজা—মা, শ্রদ্ধেয় চ্যবন ঋষিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

তাপসী—জানাব।

কুমার—আর্যা ! যদি সত্যিই চলে যাচ্ছেন তাহলে আমাকেও আশ্রমে নিয়ে চলুন না।

রাজা—বৎস ! ঐ আশ্রমে তো তুমি আগে বাস করেছ, এখন দ্বিতীয় আশ্রমে বাস করবার সময় তোমার।

তাপসী—পিতার আদেশ পালন কর।

কুমার—তাহলে—

আমার কোলে যে শুয়ে থাকত, চূড়ায় হাত বুলোলে যে আরাম পেত, অল্প দিন হল যার পেখম হয়েছে—মণিকণ্টক-নামে আমার সেই ময়ূরটিকে তুমি পাঠিয়ে দিও।

তাপসী—(হেসে) তাই করব। তোমরা সুখী হও সকলে। (প্রস্থান)

রাজা—কল্যাণী !

আজ তোমার সন্তানকে পেয়ে আমি পুত্রবানদের মধ্যে অগ্রগণ্য, পৌলমীসম্ভূত জয়ন্তকে পেয়ে পুরন্দর যেমন তেমনি !

(উর্বশীর স্মরণজনিত ক্রন্দন)

বিদূষক—এ কী ! ইনি হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেন কেন ?

রাজা—(সবেগে) সুন্দরী ! বংশরক্ষার উপায় হল বলে আমার এই প্রবল আনন্দের সময়ে

তুমি চোখের জল ফেলছ কেন ? তোমার পীনোন্নত স্তন বেয়ে এই চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মুক্তাবলী-রচনাকে পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট করে তুলছে।

(চোখের জল মুছিয়ে দিলেন)

উর্বশী—শুনুন—মহারাজ ! প্রথম সন্তানদর্শনের আনন্দে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এখন মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণে মনে-পড়ে যাওয়া শপথ আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলছে।

রাজা—শপথটি বলো।

উর্বশী—আমার হৃদয় যখন মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হল তখন মহেন্দ্র আদেশ দিলেন—

রাজা—কী আদেশ ?

উর্বশী—'যখন আমার প্রিয়বন্ধু রাজর্ষি তোমার গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখবেন, তখনই আবার তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।' এই জন্যেই মহারাজের বিচ্ছেদের ভয়েই এর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এই পুত্রকে শ্রদ্ধেয় চ্যবনমুনির আশ্রমে আর্যা সত্যবতীর হাতে গোপনে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন পিতৃ-পরিচর্যার যোগ্য হয়েছে মনে করে তিনি এই দীর্ঘায়ুকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করেছেন। তাই আপনার সান্নিধ্য আমার এইখানেই শেষ হল।

(সকলের বিষাদের অভিনয়)

রাজা—দীর্ঘশ্বাস ফেলে হায়, সুখের প্রতি দৈবের কী প্রতিকূলতা !

হে বৃশোদরী ! সন্তানলাভ করে যেই আমি আশ্বস্ত হলাম অমনি তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল। প্রথম বর্ষণে যেই তরুর তাপ প্রশমিত হল অমনি বজ্রপাত হল তার ওপরে। এই বিচ্ছেদও সেইরকম।

বিদূষক—এ ব্যাপারটা দেখছি পর পর অনর্থই ঘটিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় মহারাজ এখন বল্কল ধারণ করে তপোবনে যাবেন।

উর্বশী—এই মন্দভাগিনী আমার সম্বন্ধে মহারাজ ভাবছেন, কৃতবিদ্য সন্তান লাভ করে—(তাকে সিংহাসন লাভের উপযোগী করে) নিজের কাজ গুছিয়ে এখন দিব্যি স্বর্গে চলে যাওয়া হচ্ছে !

রাজা—সুন্দরী ! তা কখনই নয়। পরাধীনতা সহজেই বিচ্ছেদ ঘটায়, নিজের খুশিমতো তা কিছুই করতে পারে না। (তুমি পরাধীনা) তাই প্রভুর আজ্ঞাই পালন করো। আমিও তোমার পুত্র আয়ুর উপরে রাজ্যভার ন্যস্ত করে অরণ্যের শরণ নেব, যে-অরণ্যে মৃগদল বিচরণ করে।

কুমার—বলদই যে-জাঙাল বইতে পারে সেই জাঙালে বাছুরকে জুড়ে দেওয়া কিন্তু পিতার উচিত হবে না।

রাজা—বৎস ! গন্ধগজ শাবক হলেও অন্যান্য সাধারণ গজদলকেও বশীভূত করতে পারে। সর্পশিশুর বিষ আরও উগ্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা বালক হলেও পৃথিবীরক্ষায় সমর্থ। স্বকর্মসাধনে সমর্থ এই বিশেষ বল স্বভাবসিদ্ধ, বয়সে অর্জিত নয়। লাতব্য, আমার কথায় অমাত্যপরিষদকে বলো—আয়ুর অভিষেকের আয়োজন করা হোক।

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (দুঃখিত হয়ে প্রস্থান)

(সকলের দৃষ্টিব্যাঘাত রূপায়ণ)

রাজা—(আকাশের দিকে চেয়ে) মেঘশূন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কেন ?

উর্বশী—(দেখে) ইনি যে দেবর্ষি নারদ দেখছি।

রাজা—হ্যাঁ, তাই বটে। শ্রদ্ধেয় নারদ! গোরোচনার মতো পিঙ্গল জটাজালে শোভিত, চন্দ্রকলার মতো শুভ্র উপবীতে মণ্ডিত এঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণবর্ণশাখায় মণ্ডিত গতিশীল কল্পবৃক্ষ, যার মণ্ডনমাধুর্য বেড়েছে মুক্তামালা ধারণ করে। এঁর অর্ঘ্য আনো।

উর্বশী—(যথোক্ত উপাচার নিয়ে) এই যে শ্রদ্ধেয় আপনার উপচার।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—পৃথিবীপতির জয় হোক।

রাজা—(উর্বশীর হাত থেকে অর্ঘ্য নিয়ে তা দান করে) হে পূজনীয়! আপনাকে অভিবাদন করি।

উর্বশী—হে শ্রদ্ধেয়! আপনাকে প্রণাম করি।

নারদ—অবিচ্ছিন্ন দম্পতী হয়ে বাস করো।

রাজা—(মনে মনে) তাই যদি হতো। (প্রকাশ্যে কুমারকে আলিঙ্গন করে) বৎস! ভগবান নারদকে প্রণাম করো।

কুমার—হে পূজনীয়! উর্বশীর পুত্র আয়ু আপনাকে প্রণাম করছে।

নারদ—দীর্ঘজীবী হও।

রাজা—এই আসনকে ধন্য করুন।

(নারদের উপবেশন। নারদের উপবেশনের পরে সকলের উপবেশন)

নারদ—রাজন, মহেন্দ্রের আদেশ শুনুন।

রাজা—আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি।

নারদ—প্রভাবদর্শী ইন্দ্র বনগমনে কৃতসংকল্প আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন—

রাজা—কী আদেশ দিচ্ছেন?

নারদ—ত্রিকালদর্শী মুনিরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন দেবদানবের এক যুদ্ধ আসন্ন। আপনি আমাদের সংগ্রামের সাথী। তাই আপনি শস্ত্র পরিত্যাগ করবেন না। এই উর্বশীও যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মিণী হোক।

উর্বশী—(মনে মনে) ওঃ, আমার হৃদয় থেকে যেন শল্য উৎপাটিত হল।

রাজা—দেবরাজের অধীন আমি (তিনি যা চান তাই হবে)।

নারদ—ঠিক। তোমার কাজ ইন্দ্র করবেন, ইন্দ্র যা চান তুমি তাই করবে। সূর্য অগ্নিকে উদ্দীপিত করে এবং অগ্নি তেজে সূর্যকে উদ্দীপিত করে।

(আকাশে তাকিয়ে) রম্ভা, স্বয়ং মহেন্দ্রের পাঠানো কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেকের উপকরণ নিয়ে এসো।

(অপ্সরাদল তাই নিয়ে এলো)

অপ্সরাদল—শ্রদ্ধেয়! এই যে অভিষেকসম্ভার।

নারদ—আয়ুষ্মানকে মঙ্গলাসনে উপবেশন করাও।

রম্ভা—এসো বৎস। (এই বলে কুমারকে উপবেশন করালো)

নারদ—(কলসবারিতে কুমারের শিরোদেশ অভিস্নাত করে) রম্ভা, অন্যান্য করণীয়গুলি করো।

(কুমার যথাক্রমে প্রণাম করল)

নারদ—মঙ্গল হোক তোমার।

রাজা—কুলশ্রেষ্ঠ হও।

উর্বশী—পিতার অনুগ্রহভাজন হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম—যুবরাজের জয় হোক। দেবর্ষি অত্রি যেমন ব্রহ্মার মতো, চন্দ্র যেমন অত্রির মতো, বুধ যেমন চন্দ্রের মতো, মহারাজ (পুরূরবা) যেমন বুধের মতো, তুমিও তেমনি তোমার জনপ্রিয় গুণে পিতার মতো হও। তোমার অতুলনীয় বংশে সমস্ত আশিস পরিপূর্ণ হয়েছে (নতুন কোনো প্রার্থনা পুনরুক্তির মতো)।

দ্বিতীয়—একদিকে হিমালয় আর একদিকে সমুদ্র এ দুয়ের মাঝখানে জলধারাকে বিভক্ত করে গঙ্গা যেমন আরও শোভা পায় তেমনি একদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিতধী অটলধৈর্য তোমার পিতা এবং আর একদিকে তুমি—এ দুয়ের মাঝখানে রাজলক্ষ্মীও আরও বেশি শোভা পাচ্ছে।

অপ্সরাদল—(উর্বশীর কাছে এসে) কী আনন্দ! পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং স্বামীর অবিচ্ছেদ—এ দুটি দুর্লভ ভাগ্য তুমি লাভ করলে।

উর্বশী—এ ভাগ্য আমাদের সকলের। (কুমারের হাত ধরে) এসো বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ মাতাকে প্রণাম করবে (এবার)।

(কুমার উঠল)

নারদ—দাঁড়াও, যথাসময়ে তাঁর কাছে যাবে। তোমার পুত্র আয়ুর যৌবরাজ্যে অভিষেক আমাকে দেবরাজকৃত কার্তিকেয়ের অভিষেকের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

রাজা—আপনার অনুগ্রহ যখন পেয়েছে তখন সে কেনই-বা যোগ্য হবে না?

নারদ—ইন্দ্র তোমার আর কী প্রিয় সাধন করবেন?

রাজা—যদি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এর পর আর আমার কী প্রার্থনা থাকতে পারে? তবু এই হোক—

(ভরতবাক্য)

পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন যে-দুজনের একত্র অবস্থান দুর্লভ, সজ্জনদের কল্যাণে সেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন হোক।

(সকলের প্রস্থান)

॥ 'বিক্রমোর্বশী' নাটক সমাপ্ত ॥

বিবিধ

নলোদয়

প্রথম সর্গ

রে হৃদয় ! যিনি পাপরূপ অতি-গহন অরণ্যের দাবাগ্নিস্বরূপ, যিনি কন্দর্পকে পুত্ররূপে লাভ করেছেন, যিনি শত্রুসমূহের হাত থেকে সর্বদা ত্রিভুবন রক্ষা করছেন, সেই যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ হতে বিচলিত হোয়ো না।

যিনি নবরূপে গোপীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, গোপীনারীগণ যাঁকে চোখ দিয়ে পান করত, যিনি পৃথিবীকে পালন করেন, কংসের কাছ থেকে যিনি কেবল দ্বেষভাবই লাভ করেছিলেন এবং কালিয়নাগকে যিনি পরাভূত করেছিলেন, (সেই যদুপতিকে কখনও বিস্মৃত হোয়ো না)।

যিনি শত্রুদের মান-মর্যাদা বিনষ্ট করেছিলেন, যিনি নিক্ষেপ করায় শকটাসুর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছিল, ভক্তিসহকারে প্রণাম করে যাঁর সংনামাবলী পাঠ করলে মানুষকে আর সংসারভোগী হতে হয় না, (সেই যদুনন্দনকে ভুলো না)।

অলিকুল যেমন মদস্রাবী মাতঙ্গের কাছ থেকে মদবারি লাভ করে, তেমনি স্তুতিনিন্দায় সমভাবে থেকে মানবকুল যাঁর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং নানা অত্যাচারে নিপীড়িত জগৎ যাঁর কৃপায় দৈত্যকুলের বিনাশরূপ হিতকর কার্য লাভ করে থাকে, (তুমি তাঁর থেকে বিচলিত হোয়ো না)।

এক রাজা ছিলেন। তাঁর নামটি ছিল বড়ই সুন্দর। তিনি নীতিশাস্ত্রের যথাযথ প্রয়োগবিধি জানতেন। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়বিধ ঈতি না থাকায় তাঁর রাজ্যে প্রজারা ভূমিজাত রত্নরাজি লাভ করে পরমসুখে বাস করত।

তিনি সেনারূপে নৌকার সাহায্যে শররূপ জল আলোড়িত করে শত্রুরূপ নদীসমূহ উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর রাজ্যে কামাদি ব্যসনে আসক্ত হত না, আর বনভূমির বৃক্ষগুলিকে হস্তীর বন্ধনস্তম্ভরূপে ব্যবহার করা হত।

অপরাধ করলে পুত্রকেও তিনি হত্যা করতেন, তাঁর সম্পদে সাধুব্যক্তির অধিকার থাকত, অধীন রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে তিনি ধনলক্ষ্মীর মহাসাগররূপে পরিণত হয়েছিলেন, আর তাঁর অসি-গদা প্রভৃতি অস্ত্রসমূহকে ঐ ধনসাগরের হিংস্র জলজন্তু বলে মনে হত।

তাঁর রাজ্যে অনেক সৎ ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর নিকটেই বিরাজ করতেন। এই কারণে অদিতি, চন্দ্র ও সূর্যের দ্বারা শোভমান স্বর্গের থেকে পৃথিবীর পার্থক্য খুব অল্পই ছিল। তাঁর প্রবল প্রতাপে শত্রুরাজাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছিল।

সেই রাজা খল-সেনা রাখতেন না এবং যাগযজ্ঞের জন্যে তিনি পৃথিবীতে বহু যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন। স্নেহপ্রবণ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে নিবেদন করে আমি আজ সেই রাজার চরিত অবলম্বনে একখানি সুকাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছি। এ কাব্যটি হবে আমার নানা-পাপরূপ সমুদ্র লঙ্ঘনের নৌকার মতো।

সূর্যের মতো তেজস্বী সেই রাজার গুণে দশদিক সুশোভিত ছিল। যুদ্ধের শেষে তাঁর জয়লাভের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। শত্রুসমূহ বিনাশ করে সেই রাজা নল নিজরাজ্য শাসন করতেন।

তিনি কন্দর্পতুল্য মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনি সহস্র বৎসরের পরমায়ু লাভ করেছিলেন। রুদ্রকুমার কার্তিকেয়র তুল্য দুর্জয় এবং আক্রোশকারী শত্রুশ্রেণীকেও তিনি পরাস্ত করতেন।

তিনি ছিলেন নানাবিধ অশ্ববিদ্যায় নিপুণ। সেই সেই বিদ্যায় পারদর্শী অন্য রাজারা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। শত্রুর প্রতিও তাঁর চিত্তবৃত্তি দয়াপরবশ ছিল। নীতিমার্গ অবলম্বন করে তিনি যে ধন লাভ করতেন, রাজলক্ষ্মী তাঁকে তার থেকেও অনেক বেশী ধনৈশ্বর্য দান করেছিলেন।

ক্লেশস্বীকার করে শত্রুরাও যদি তাঁর শরণাপন্ন হত, তাহলে তিনি তাদেরও ধন রক্ষা করতেন। তাঁর কোনোরকম ছল বা কপটতা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ বীরসেন তাঁর পিতা ছিলেন।

শত্রুকুল ধ্বংস করে পৃথিবীতে তিনি বিপুল যশ বিস্তার করেছিলেন। তাঁর চরিতকথা বড়ই সুন্দর। তাঁর তাড়নায় শত্রুপক্ষের হাতিগুলি মাটিতে দাঁত গুঁজে পড়ে থাকত।

সেই নল সর্ববিধ ব্যসন নিবারণ করে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পৃথিবী পালন করতেন। শত্রুদের মধ্যে অতি প্রবল রাজারা নিজেদের অপরাধ দূর করে তাঁকে প্রণাম করতেন।

বিদর্ভাধিপতি ভীমের এক কন্যা জন্মেছিলেন। ত্রিলোকে ঐ কন্যা মাননীয়া ছিলেন। প্রচুর ধনাগমের ফলে ভীমরাজা সম্মানের পাত্র ছিলেন; সেজন্যে তাঁর দম্ভ ছিল না। অধিক বলশালী শত্রুও তাঁর কাছে এসে ভয়ে পলায়ন করত।

যাঁদের সমস্ত কার্যই পূজার্হ—সেই উমা, রমা ও রম্ভার সদৃশী এবং রম্ভাতরুতুল্য উরুদ্বয়শালিনী দময়ন্তী নিজ কান্তিতে কন্দর্পকে ধারণ করে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।

সেই দময়ন্তী ছিলেন নারীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা, আবার নলও ছিলেন মানবকান্তির নিকেতন। তাঁর শত্রুসমূহ অন্নাভাবে কাতর হয়ে ও কোথাও রক্ষা না পেয়ে ক্লেশদায়ক মরুভূমিতে পলায়ন করেছিল।

দময়ন্তী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নলকে কামনা করতেন, নলও দময়ন্তীকে কামনা করতেন। নল স্বীয় তেজঃপ্রবাহে বহু যুদ্ধ জয় করে যুদ্ধলক্ষ্মীকে লাভ করেছিলেন। দময়ন্তীও সৌন্দর্যে জগতের সমস্ত বধূগণকে জয় করেছিলেন।

'সূর্যপ্রভাবিহীন মনোহর উদ্যানে গিয়ে আমি আজ আমার স্মরজনিত তাপ অপনোদন করব'—এই ভেবে নল রথে আরোহণ করে সেই উদ্যানে গমন করলেন।

আশ্চর্য! শত্রুহন্তা কামতাপসন্তপ্ত সেই নল হিতসাধনে সমাগত কতকগুলি পাখিকে দেখতে পেলেন। সেগুলি তাঁর সন্তোষ উৎপাদন করল। তাই তিনি সস্নেহে তাদের কাছে গেলেন।

সারসতুল্যশব্দকারী সেই বিহঙ্গসমূহ তাঁকে তারস্বরে বলল—"হে হিংসারহিত নরপতি! তুমি আমাদের পীড়া দিও না। তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

হে নল! তুমি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর। ভৈমীর কাছে আমরা তোমার প্রশংসা করব। তার ফলে সে তোমাতে আসক্তা হয়ে তোমার ক্রোড়ে বিরাজ করুক। তুমিও তাঁর কাছে গিয়ে ক্রীড়া কোরো"।

দময়ন্তী ছিলেন যেন দৈত্যশিল্পী ময়দানবের উৎকৃষ্ট মায়া দিয়ে তৈরি। তিনি সখীদের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময়ে হাঁসগুলি তাঁর কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলল ঃ

"হে ভৈমী! তুমি যদি সেই চন্দ্রবদন, শত্রুকুলের আশাচ্ছেদকারী ও কুমারী নারীগণের বাঞ্ছনীয় নলের ভার্যা হও, তাহলে তুমি লক্ষ্মীর মতো শোভিতা হবে"।

হাঁসগুলি এ কথা বলার পর আনন্দ ও প্রেমরসে উচ্ছলিতা ভৈমী স্মরের প্রভাবে শোভিত হলেন না—এমন নয়। তিনি হংসগুলিকে আবার নলের আলয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই হাঁসগুলি দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারা ঐশ্বর্যনিধি নলের কাছে পুনরায় এসে ভৈমীর নানা প্রকার প্রশংসা করল।

হাঁসগুলি এভাবে ভৈমীর প্রশংসা করলে নল বিরহাতুরা ভৈমীর বশীভূত হয়ে পড়লেন। ভৈমীর প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মাবার ফলে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। এদিকে দময়ন্তীও নলের গুণসমূহ চিন্তা করতে করতে বিরহশয্যায় আশ্রয় নিলেন।

তারপর পর্বত ও সমুদ্রযুক্তা পৃথিবীর অলংকারভূতা উদ্গতযৌবনা স্তনোদ্ভেদাদি-বিশিষ্টা ও বরের প্রতি অনুরাগহৃষ্টা স্বীয় কন্যারত্নের কামজ ক্লেশ দর্শন করে নৃপতি ভীম যথাবিধি স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করলেন। সেই রাজার দেহ কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর ছিল। প্রধান প্রধান নৃপতিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জরাজনিত দেহভাব না থাকায় তিনি যুবার মতো শোভা পেতেন।

সসৈন্যে বহু ভূপতি সহাস্যবদনে সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা মাথায় যে সব মালা ধারণ করেছিলেন, সেগুলি ভ্রমরশোভিত ছিল না, এমন নয়।

সমরে শত্রুবিনাশকারী, দেবসেনাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রও স্বয়ংবরসভায় যাত্রা করলেন, তখন স্বর্গবাসী দেববৃন্দের সৈন্যরাও শ্রম স্বীকার করে সেই বিদর্ভরাজভূমিতে উপস্থিত হল। তারা সর্বদাই আনন্দে মেতে রইল।

অনন্তর আজানুলম্বিতবাহু নল অন্য উৎসবের শোভাপহারী সেই মহোৎসবে উপস্থিত হলেন। তখন উৎকৃষ্ট কিরণমালাসম্পন্ন সূর্যের দ্বারা দিবাভাগ যেমন শোভা পায়, তেমনি নলের আগমনে সেই পরমোৎকৃষ্ট স্বয়ংবরপুরী শোভা পেতে লাগল।

যাঁরা শত্রুদের প্রতি প্রদীপ্ত নালীকা নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, যাঁদের মুখকান্তি কমলতুল্য, যাঁরা কপটতাদিপরিশূন্য, নলের দেহকান্তি সেইসব রাজা ও দেববৃন্দকে উপহাস করত না কি?

স্বীয় যশোরক্ষক, শত্রুগণের যশোনাশক, অসিদ্বারা শত্রুবিনাশী চন্দ্রানন নলকে দেখে দেবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জড়ের মতো হয়ে পড়লেন।

যিনি অন্যের অপরাজেয় অরিগণের অনলস্বরূপ, অলংকারশূন্য হলেও যাঁকে দেবতারা সৌন্দর্যে পরাজিত করতে পারতেন না, সেই নলকে ইন্দ্র বললেন—

"হে নল! যার গুণাবলী আমাদের পরিশ্রমের কারণ, সেই শ্রেষ্ঠতমা ভৈমীর কাছে গিয়ে তুমি আমাদের কামতাপের কথা বলো। সেখানে দ্বারপাল প্রভৃতি কেউই তোমাকে দেখতে পাবে না, কেননা, তুমি আমাদের মায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকবে।"

সুরপ্রবর ইন্দ্র এই কথা বলার পর বিবেকসম্পন্ন নল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করে দময়ন্তীর কাছে গেলেন। রাজা নল সেখানে উপস্থিত হলে কোন্ রমণী আর ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

"হে ভৈমী! ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু ও যম এই দেবতাদের দূত আমি। আমার নাম নল। ঐ দেবগণ ঐশ্বর্যশালী, নীতিজ্ঞ ও সম্মানভাজন। এঁরা তোমাকে কামনা করেন। স্বয়ংবরসভায় এঁরা উপস্থিত আছেন—জানবে।

হে অপ্সরাসদৃশে! দেহধারী জীবগণের প্রভু এই দেবগণ কামতাপজনিত দুঃখে নিমগ্ন। তাই তুমি দেবগণের কাছে অভিসার করো এবং বরমাল্য প্রদান করো। আর অমৃতাদিসম্পন্ন স্বর্গসুখ লাভ করো"।

দেবগণ কামাতুর হয়ে নলের মুখে স্তুতিবাক্য পাঠালেও নলের প্রতি আসক্তা ভৈমী দেবগণের প্রতি অনুরাগিণী হলেন না, মৃণাললোভী হংসগণ যেমন মরুভূমিজাত পদার্থে উৎসুক হয় না, তেমনি।

অয়তনয়না ভৈমী নিজভবনে নলকে দেখে কামাতুরা হয়ে পড়লেন। তিনি বিশেষভাবে শোভা পেতে লাগলেন। তিনি যে দেবগণের জায়া হবেন না—তা নিষধরাজ নলকে বলে দিলেন।

তূর্যনিনাদ বিঘোষিত হলে পর, যাঁর আনন্দবর্ধনের জন্যে নিজে দময়ন্তীর কাছে গিয়েছিলেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের চরণে প্রণাম করে নল দময়ন্তীর মনের কথা বললেন।

তারপর সেই রাজারা মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখর স্বয়ংবরসভার মঞ্চে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। সেই মৃগাক্ষী দময়ন্তীও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন।

তারপর সূতগণ স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত সেই সব নৃপতি ও মাননীয় দেবগণের নাম-পরিচয় প্রদান করলে প্রজাবৃন্দ তাঁদের নমস্কার জানাল।

সেই সভার দময়ন্তী অগ্নিসমান দেদীপ্যমান, স্ফূর্তিমান এবং নলতুল্য দেহধারী কয়েকজন পুরুষকে দেখতে পেলেন না কি? তাঁদের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না।

(তখন দময়ন্তী মনে মনে বললেন—) 'আমি যদি সতী হই, কখনও মিথ্যা না বলে থাকি, যদি দীন হয়েও নিয়ত ন্যায় ও ধর্মপথে চলে থাকি, আর যদি দান ও ধর্মের আচরণ করে থাকি, তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরকান্তি নল আমার জ্ঞানের বিষয় হোন।

আর যদি আমি অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা না হয়ে শুধুমাত্র নরেশ্বর নলে নিজেকে সমর্পণ করে থাকি, তাহলে এই দেবসভারূপ বনের মাতঙ্গস্বরূপ নলদেহের কান্তি আমাকে রক্ষা করুক'।

এভাবে স্থিরচিত্তে শুভ্রবসনা সেই রমণী জানতে পারলেন—যাঁরা ভূমিস্পর্শ করেন নি, তাঁরাই দেবতা; আর যিনি পদতল দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে আছেন, তিনিই সাধুগণের রক্ষক, তাঁর পতি নল।

যাঁর দেহে বাল্যভাবহেতু অবসাদ ছিল, সেই দময়ন্তী দেবগণের প্রার্থিতা হয়েও ভ্রমরতুল্য চঞ্চল দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নলের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রীতিরসে আপ্লুত হয়ে সখীদের সঙ্গে নিয়ে নলকে বরণ করলেন।

সেই দময়ন্তী আপন তেজে উমা ছিলেন না—এমন নয়। সেই চন্দ্রবদনা নলকে বরণ করলে নল অধিকতর শোভা পেতে লাগলেন। সজ্জনগণের মধ্যে প্রভূত সম্মান থাকায় রুদ্রসম নল ধরাতলে অধিক গুণশালী হয়ে উঠলেন।

তখন দেবশ্রেষ্ঠগণ উৎকৃষ্ট-কান্তিমান, অতিশয় প্রভাবশালী ও বিপুল ঐশ্বর্যবান নলের চিত্ত মদদম্ভবর্জিত জেনে তাঁকে বর প্রদান করে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন।

অতি মহিমান্বিত ও শত্রুর কপটতাবিনাশী নল প্রিয়াকে নিয়ে লক্ষ্মীর আবাসভূমি নিজ নগরীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে নানা সম্পদ তাঁকে আশ্রয় করল, কারণ তিনি ছিলেন ক্ষমাপরায়ণ।

সেই নগরীতে চাঁদের মতো নির্মল হাস্যে সমুচ্ছল ও উৎসবপ্রমত্ত প্রজারা অতিস্বচ্ছ সুরা পান করে আনন্দমুখর হয়ে উঠল। সুরার প্রভাবে তারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগল এবং দেবযাগ আরম্ভ করল।

॥ প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় সর্গ

তারপর শত্রুর গর্বখর্বকারী কমনীয়াকৃতি নল নিষধনগরীর প্রাসাদমধ্যে পরমাসুন্দরী দময়ন্তীকে নিয়ে নিভৃতে নানাপ্রকার রতিক্রীড়া আরম্ভ করলেন।

শৌর্যের সাগরতুল্য নল (দময়ন্তীর সান্নিধ্যে) যেমন কান্তিমান হয়ে উঠলেন, দময়ন্তীও প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হয়ে তেমনি শোভা লাভ করলেন। সেই সময়ে সারসের কলরবে ও ঋতুজাত পুষ্পে সজ্জিত হয়ে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটল।

চন্দ্রের কিরণস্পর্শে লজ্জা পেয়েই যেন নলিনী দিক্‌প্রান্তে বিলীন হয়েছিল। দিনপতি যে কর দিয়ে শালিধান্যমঞ্জরীর অগ্রভাগের কান্তি হরণ করেন, সেই কর দিয়ে নলিনীকে প্রস্ফুটিত করলেন। আর তখন ভ্রমরের মধুপানের আশা প্রবল হয়ে উঠল।

তখন সারসের ক্রেংকারে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠল এবং কুরুবকতরুতে অঙ্কুরোদ্গম দেখা দিল। পঙ্কহীন নির্মল জলে কমলসমূহ সুশোভিত হয়ে কাকে না মুগ্ধ করেছিল?

সূর্যের প্রচণ্ড তেজ প্রবল হিমের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদনদেব সর্বত্র শররূপ সর্পকে নিক্ষেপ করলেন। অভিমানী নল কামশরের বশীভূত হয়ে উৎসবমুখর নিজগৃহে প্রবেশ করলেন।

সেই সময়ে কামদেবের সূচিরূপে চম্পকমুকুল উদ্‌গত হল। তাতে জগতের বিরহব্যথা এমনিভাবে সূচিত হতে লাগল যে, সেই ব্যথায় কত বিরহী দম্পতীর প্রাণবিয়োগ ঘটল।

পলাশবৃক্ষের মাথায় অল্পই পাতা ছিল। অথচ ঐ বৃক্ষে প্রচুর ফুল ফুটেছিল। ঐ ফুলগুলিকে প্রবাসী বিরহীদের রক্তমাখা মাংস বলে মনে হতে লাগল। ঐ মাংস নীচাশয় চপলস্বভাব মদনরূপ রাক্ষসেরই খাদ্য হবার যোগ্য।

ঋতুরাজ বসন্তের মনমাতানো কান্তি দেখে প্রণয়ীদের মনে আদিরসের উদ্দীপক বিভাব প্রভৃতির উন্মেষ ঘটল। বসন্তের রাত্রি মাতঙ্গের মতো শোভা পেতে লাগল, আর চন্দ্রের কলাকে মনে হল ঐ মাতঙ্গের দাঁত। ঐ দাঁত দিয়ে রাত্রিরূপ মাতঙ্গ পত্নীবিরহিত ব্যক্তিদের মনে নিদারুণ বেদনা দিতে লাগল।

এই বসন্তকালে চারদিকে অশোকমঞ্জরীতে ভ্রমরের গুঞ্জন আর হুংকার শোনা যায়। এই সময়ে যে-পুরুষ ললনাদের মনে শোকতরঙ্গ তুলে নিজের কামমত্ততা বিনাশ করে, কামদেব ভ্রমরের হুংকারশব্দের মধ্যে দিয়ে সেই পুরুষের সকল আশা বিধ্বস্ত করেন।

চারদিকে শুধু সুদর্শন সারসের মেলা। পৃথিবী কামদেবের যুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়ে উঠল। আর এভাবেই পরম প্রতাপশালী কামদেব বিরহীদের জয় করলেন।

এই সময়ে বসন্তের প্রভাবে মানুষের মন চঞ্চল হয়। রমণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখন কোন্ পুরুষ মৃত্যু কামনা না করে? এই কারণে কামিনীরা পুরুষের প্রার্থনা অস্বীকার না করে নানারকম মধু পান করে।

যে যে কথায় কামিনীদের হৃদয়ে মাদকতা বাড়ানো যায়, কুহুস্বরে বিশেষ ভঙ্গিমায় সেই সেই কথা বলে কোকিলও যেন ক্রোধভরে বিরহিণীদের ভৎর্সনা করতে লাগল।

চন্দ্র অপরূপ শোভা ধারণ করলেন। সহকারতরুতে কোকিলের মধুর আলাপ বেড়ে উঠল। ময়ূর কি নাচ আরম্ভ করল না? কিংবা সুমধুর কেকারব করতে লাগল না?

এই বসন্তকালে সহকারতরুগুলি মঞ্জরীতে ভরে ওঠে। এমন সময়ে কোন্ পুরুষ দুঃসহ বিরহ সহ্য করতে পারে? আর এমন কোন্ রমণী আছে, যে প্রিয়তমের সঙ্গে শেষে হ-কার-যুক্ত ক-ল-পদ (অর্থাৎ কলহ) বিস্মৃত না হয়।

কামদেবের দৌত্যভার নিয়েই যেন ভ্রমরের দল অনুরাগভরে ফুলের মধু পান করে ভীষণভাবে মেতে উঠল, আর বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ছোটাছুটি করতে করতে মধুর সুরে গান আরম্ভ করে দিল। তাদের সেই গুনগুন গানে ঋতুরাজের শোভা আরও বেড়ে গেল।

বসন্তের নির্মল আকাশে ভ্রমরের দল মদভরে বিচরণ করতে লাগল। তা দেখে কামুকেরা ভুল করে ভাবল, বুঝিবা কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা গগনতলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই ভেবে তারা বিরহে কাতর হয়ে অভিমানী 'মনের মানুষের' সঙ্গ লাভ করল না কি?

এই সময়ে যে-পুরুষ ঘর ছেড়ে চলে যায়, নিতান্ত অজ্ঞান সেই বিবেকহীন মানুষ হৃদয়ে অসমাপ্ত রতিভাব নিয়ে কামজনিত নানা অসাধু পীড়া লাভ করে।

নীতিজ্ঞানহীনা যে-নারী ক্রোধভরে নতুন মালা গাঁথার ছলে প্রিয়তমের কাছে না যায়, অচিরেই সে প্রিয়তমের অভাবে অনুতাপ ভোগ করে ও মূক হয়ে পড়ে। হায়, কী কষ্ট!

হে পর্বতজাত তরুবর। কুসুমরূপ নয়ন তোমার, আর দুঃসহ রোগরহিত তুমি। আকাশের বিবর পর্যন্ত উঠে গিয়ে কী উচ্চতাই লাভ করেছ। তাই আমার কান্তকে দেখে বোলো—আমি যেন এই বসন্তকালে রমার মতো তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই বিহার করতে পারি।

এই কথা বলে, পতিসমাগমরহিতা পরমাসুন্দরী রমণী ঐ গিরিতরুর আশ্রয় নিল। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পেল না। তখন সে কামরূপ কৃষ্ণসর্পের বিষে জর্জরিত হতে লাগল।

যে-বসন্তঋতুকে আগত দেখে অলিকুল নিজেদের কত-কী প্রার্থনা জানিয়ে যেন মধুররবে গুঞ্জন করে, সেই সময়ে হৃদয়মধ্যে সতত বিরাজমান মদনের কুসুমশর কোন্ রমণীই বা সহ্য করতে পারে ?

অনন্তর সেই নল নিজে অরিরহিত হলেও মদনাক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মন্দারতরুশোভিত মনোহর উদ্যানে পত্নীর সঙ্গে গমন করলেন।

পতির গুণের সমান অধিকারিণী ভীমনন্দিনী চন্দ্রবদন ও পরম মাননীয় সেই নলের অনুগামিনী হয়ে নন্দনকাননতুল্য বনে গিয়ে আনন্দিত হলেন।

এখানে 'মনোহর ঐ দৃষ্টি একবার নিক্ষেপ কর'—প্রিয়তমের এই কথায় অন্যান্য রমণীদের বলয়ে কম্পন দেখা দিল। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথকভাবে নানা আরাম উপভোগ করলেন। তাঁদের উদরে মনোহর বলিরেখা শোভা পাচ্ছিল।

সেই রমণীদের মধ্যে কেউ অভিমানিনী হয়ে, নবকুসুমভারে আনত বৃক্ষশোভিত বনভূমির কোথাও গিয়ে লুকোতে চাইলেন না। কারণ, তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষ সুন্দর পুষ্পের মালা উপহার দিয়ে নিজের অপরাধ দূর করে ঐ মানিনীর মানভঙ্গ করতেন।

(নায়ক-প্রেরিত কোনো দূতী মানিনীকে বলল—) "হে মনোহরতনুসৌন্দর্যধারিণী সখী। তোমার অল্পমাত্র রোষও তাঁর ক্লেশ উৎপাদন করে, আর তাঁর যৌবনমধুর মুখ শুকিয়ে যায়। তখন তিনি তোমার পদপ্রান্তে পড়ে তোমার স্তুতি করতে করতে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেন না—এমন নয়।

তাছাড়া, যে-বসন্ত তরুলতাকে কুসুমভারে পরিপূর্ণ করেছে, সেই বসন্তের নবীনতা অস্তমিত হয়ে পড়ছে না কি ? তাই এই সময়ে তুমি এমন অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ কর। এই বসন্তের সেই পরম সৌন্দর্য আর পূর্বের মতো রমণীয় রূপে ফিরে আসবে না।

এইভাবে দূতীর অনুরোধে সেই রমণী নিজ বল্লভের কাছে গেল। আর সেই প্রিয়তমও ললাটে-পতিত কুন্তলদামে শ্যামমুখী প্রিয়ার সঙ্গে নানা আমোদপ্রমোদ আরম্ভ করল।

কোনো রসিক নায়ক বলল—"হে সুন্দরী ! এই শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন পুষ্পগুচ্ছ-সমন্বিত, বকপক্ষিবর্জিত সরোবরতট কত মনোরম। এখানে তোমার মান কেন ?" এইভাবে অনেক স্তবস্তুতি করে ঐ নায়িকাকে কুঞ্জমধ্যে নিয়ে গেল।

অন্য-এক সুন্দরী লোহিত-পরাগে রক্তবর্ণ এক বৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের হাস্যচ্ছটায় ঐ রেণুলোহিত বৃক্ষকে শ্বেতবর্ণ করে তুলল। ফলে, কুসুমচয়নের বাসনায় সেখানে দাঁড়িয়েও সে আর কুসুম দেখতে পেল না।

আর এক ষোড়শী একটি পল্লবিত বৃক্ষের শোভাদর্শনে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে ঐ তন্বী তখন এক লতার মতো শোভা পাচ্ছিল।

কোনো নায়িকা লতাবলয়মধ্যবর্তিনী সখীদের মধ্যে যখন লুকোল, তখন তার বল্লভ ঐ সখীদের কলহাস্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে থেকে প্রণয়িনীকে খুঁজে বার করল।

কোনো রমণীয় নয়নে বৃক্ষের পুষ্পপরাগ পড়ায় তার নয়ন কলুষিত হল, তখন সে নেত্রগত পরাগ বার করাবার সুখের প্রার্থনায় নিজ বল্লভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর প্রিয়তমের দিকে ভঙ্গিমা-সহকারে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে সে তার প্রিয়তমের মনোহরণ করল না—এমন নয়।

কোনো কামী নিজের প্রিয়তমার কাছে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও নানা ছল ও কপট চাটুবাক্যে সেই অপরাধের অপনয়ন করতে লাগল। সরল-হৃদয়া সেই রমণী প্রাণতুল্য প্রিয়তমের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করল না।

অন্য-কোনো পুরুষ অভিমানিনী প্রিয়ার কাছে নানাবিধ পক্ষিসমাকুল উপবনের এমনই উচ্চ প্রশংসা করল যে ঐ মানিনীর মনে বিস্ময়রসের উদ্রেক ঘটায় চতুর ঐ নায়ক নিজের অপরাধ স্খলন করে নিল।

অপর একজন কামুক প্রাণসমা, অভিমানিনী কান্তার পদাঘাত আপনার আনত মস্তকে ধারণ করল।

নিজেদের সুরম্য ভবন ত্যাগ করে বিলাসিনীরা আমোদ-প্রমোদের জন্যে স্ব স্ব কান্তকে নিয়ে সুগন্ধি ও শীতল মলয়পবনসংস্পর্শে মনোরম উদ্যানবাটিকায় গমন করল।

তখন কামিজনের সেই মনোহর উদ্যানমধ্যবর্তিনী রমণীদের সঙ্গে যথোক্তরূপে বিহার করে নিকটবর্তী পদ্মশোভিত সরোবরে গমন করল।

তখন রসিক ও সরলমতি মহারাজ নল 'হে অসীমগুণামৃতময়ী তুমি কি জলবিহারে ইচ্ছা করে?' এই কথা বলে দময়ন্তীকে নিয়ে সেই সরোবরে দ্রুত গমন করলেন।

পঙ্কবিহীন সেই সরোবরের অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য এবং সরোবরস্থিত চক্রবাক, কুররী, হংসী ও সারসীসমূহ প্রতাপশালী সেই নলের মন হরণ করল।

অতিকায় তিমিমাছ ইত্যাদি সেই সরোবরের জলে থাকলেও এবং স্বভাবভীরু কামিনীরা সেখানে এসে বিহারবাসনায় একান্ত চঞ্চল হলেও ঐ সব জলজন্তুর ভয়ে তারা নানারকম আশংকা করতে লাগল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভরে ঈষৎ আন্দোলিত এই সরসীর জলে যদি একটু বিহার করা যায়, তাতে কী-ই বা ক্ষতি?

তখন অলিদল পরাগরঞ্জিত কমলসমূহ পরিত্যাগ করে সৌরভলোভে অনুরাগবশতঃ কামিনীদের মুখকমলে গিয়ে বসতে লাগল।

তারপর কামানলসন্তপ্ত রমণীগণ কমলিনীসমূহকে স্নানাদির দ্বারা কম্পিত ও ভ্রমরীদের ভীত করে তুললে তারা সুমধুর রবে গুঞ্জন করতে করতে চারদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করল।

অতখন সরোবর অতিশয় শোভার আধার হয়ে রইল। তরঙ্গভরে কমলদল যখন কাঁপতে লাগল, তখন রমণীগণ সেই তরঙ্গমালাকে কুমীরের বিলোড়ন ভেবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল।

বহুক্ষণ জলবিহারের পর রমণীরা তীরে উঠল। সরোবরের সেই সুনির্মল জলে কলরবমুখর সারসেরা সশব্দে খেলা করছিল। ফলে সরোবরের সুনীল বক্ষ ফেনপুঞ্জে ভরে উঠল, তা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে।

এরপর ত্রিবলীনম্র রমণীরা গাত্রসৌরভে অলিসমূহকে আকর্ষণ করতে করতে সূর্য-দেবের অস্তাচলে যাবার সময়ে সূর্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত নিজ নিজ গৃহে গমন করল।

"অয়ি প্রিয়ে! আমার দেহ কামবাণে জর্জরিত। তাই আমি কামবিনাশে মনস্থ করেছি। তুমি আমার রতি অভিলাষ পূরণ করো।" —এই কথা বলে রাজা নল দময়ন্তীকে নানা চিত্রশোভিত কামোদ্দীপক ও আকাশচুম্বী এক প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যারাগে সূর্য অরুণবর্ণ ধারণ করলেন। এখন কমল তাঁর গুণ (অরুণিমা) গ্রহণে সমর্থ হল না। এখন সহস্রকিরণ যদি তাঁর কিরণজাল কমলের দিকে প্রসারিত

করেন, তবে তিনি স্পষ্টতঃই তস্কর বলে প্রতিপন্ন হবেন।

তখন রবির কিরণজাল যে যে স্থান থেকে অপসৃত হতে লাগল, সেই সেই স্থান মহান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হল।

এই সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ রবিকর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, বিহগকুল সুমধুর ধ্বনি করতে লাগল, মেষসমূহ দলে দলে আপন গৃহের দিকে চলতে লাগল, আর আকাশমন্ডল নক্ষত্রসমূহে সুশোভিত হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে জলরাশি থেকে শশধর উদিত হলেন। মনে হল, যেন জগজ্জয়ী কন্দর্পের রজতকুম্ভ শোভা পাচ্ছে। চন্দ্ররাজের অভ্যুদয়ে আকাশ অপূর্ব শ্রী ধারণ করল।

সেই কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্করূপ অলঙ্কারধারী, বিরহী পথিকগণের যমস্বরূপ এবং প্রতিরাত্রে সমুদিত শশীকে কোন্ বিরহিণী দর্শন করতে পারে?

তারপর হিমকণাবাহী ও কুমুদসমূহের প্রবোধনকারী নিশাকরের কিরণজাল সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করল।

তখন যে যে উপায়ে অনুনয় করা দরকার, ঠিক সেভাবে নায়কেরা বধূদের অনুনয় করতে লাগল। আর সেই অনুনয়চাতুর্যে তারা কামিনীদের বশে আনতে সক্ষম হল।

কামোন্মাদনা সহ্য করতে না পেরে সেইসব নায়ক সহাস্যবদনে ও হাবভাবে সুরাসুরের অমৃতপানের মতো করে একান্ত আদর-সহকারে সুরাপানে প্রবৃত্ত হল।

সেই সেই রমণীরা সুরাপান করে কেউবা নম্রা, কেউবা অনম্রা হয়ে পড়ল। স্ত্রীলোকেরা মদনশোভায় সুশোভিত হলেও সুরাপানের ফলে তাদের সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেল।

যা পান করলে অপরাধ বিস্মৃত হওয়া যায় এবং ভ্রমরেরা যা এইমাত্র পরিত্যাগ করেছে, সেই সুরাপান করে কামুকেরা বিস্তৃত শয্যাতলে আশ্রয় নিল।

তারপর সেই রমণীকুল ও তাদের সহচর যুবকবৃন্দ মদন-মহোৎসবে অপূর্ব শ্রী লাভ করল। সসাগরা পৃথিবীতে ঐ সব রমণী গুণগরিমায় বিখ্যাত ছিল, আর লীলাবিলাস প্রভৃতিতেও তারা ছিল পারদর্শিনী।

শৃঙ্গাররসে আর্দ্র চিত্ত নিয়ে নল দময়ন্তীর সঙ্গে বিহার আরম্ভ করলেন। সেই দময়ন্তী রূপে ও গুণে লক্ষ্মীকেও পরাজিত করেছিলেন আর তিনি ছিলেন সরলহৃদয়া ও চিরানন্দময়ী।

সেই দময়ন্তী নিঃশঙ্কচিত্তে ও সরলহৃদয়ে তাঁর প্রিয়তম নলের মনোরথপূরণে কৃতার্থা হয়েছিলেন, আর তাঁকে পেয়ে নলেরও সব সাধ চরিতার্থ হয়েছিল। কামদেবের উৎপীড়নে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নল দময়ন্তীর অভিলাষ পূরণ করে অধিকতর শোভা পেতে লাগলেন।

এইভাবে মহারাজ নল আনন্দ অনুভব করছিলেন। বাহুবলে তিনি রাজ্য থেকে বহু ধন লাভ করেছিলেন। নানাবিধ শুভকর্মের আশ্রয় ছিলেন তিনি। কিন্তু নানা কাপট্যের আধার কলির প্রভাবে তিনি বহুবিধ বিপদের শিকার হয়ে পড়লেন।

বিশালবুদ্ধি মহারাজ নল স্বয়ংবরের পরে কুবেরের মতো ধনশালী হয়ে উৎসব সহকারে পৃথিবী রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর শোভাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

॥ দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় সর্গ

তারপর সেই সুশোভিত স্বয়ংবরসভা থেকে মেঘধ্বনির ন্যায় কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট দেবশ্রেষ্ঠগণ স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সকল শুভকর্মের পরিপন্থী কলিকে দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন–'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

কলি বললেন–অতিশয় যশস্বিনী ভীমতনয়া দময়ন্তীকে লাভ করার জন্যে আমি এখন মর্ত্যলোকে চলেছি। শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী দময়ন্তীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে আমি ভীষণভাবে কামনা করি।

কলির মুখে এ কথা শুনে দেবগণ বললেন–পার্বতীর চেয়েও বরেণ্যা, সরলস্বভাবা ও পরম সৌভাগ্যবতী সেই দময়ন্তী সচ্চরিত্র নলকে পতিত্বে বরণ করেছেন। তাই তুমি আর সেখানে যেও না।

উৎসবের মদ্য আস্বাদনকারী ও যজ্ঞাংশভাক এই সব দেবতাদের কাছ থেকে এই কথা শুনে মদান্ধ কলি নিজ স্বভাবদোষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

কলি বললেন–যে রমণী অহংকারে প্রমত্ত হয়ে প্রবলতম দেবশ্রেষ্ঠগণকে দুর্বল জ্ঞান করে নলের প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, নবলতার তরুর মতো সেই দময়ন্তী নলের সন্নিধানে না থাকুক।

এইভাবে বলবান কলি অভিসম্পাত-বাক্য উচ্চারণ করলেন। তারপর নলের দেহে প্রবেশ করার জন্যে তাঁর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। বনবিহাররত নলের ছিদ্র পেয়ে তিনি তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করলেন।

কলি নলদেহে প্রবেশ করার পর তিনি নিজের ভাই পুষ্করের কাছে কপট পাশাখেলায় পরাজিত হলেন। তখন নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তিনি ভার্যা দময়ন্তীকে নিয়ে নিজের সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী থেকে চলে গেলেন।

শত্রুরূপী ভ্রাতা (পুষ্কর) নলের প্রতি নানারকম কটুবাক্য প্রয়োগ করল। আর সে কী না অপহরণ করল ? তখন নল মনোহর ভূষণসমূহ ত্যাগ করে অনাহারে (বনে বনে) ভ্রমণ করতে লাগলেন।

কণ্টকাকীর্ণ পথে রোদন করতে করতে পদক্ষেপ করে নল যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি অন্যেরও শোকের কারণ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর তাঁকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

নলের না ছিল রাজলক্ষ্মী, না ছিল রমণীয় বাসগৃহ। এদিকে যে পরিধেয় বস্ত্রটুকু ছিল, সেটিকেও (দময়ন্তীর) প্রার্থিত হংসগুলি হরণ করল। তিনি কিন্তু ক্ষমার তরণী দিয়ে নিজের ক্রোধসিন্ধু উত্তীর্ণ হলেন ও সবরকম মদ-মান দূরে নিক্ষেপ করলেন।

অধিক তাপে আমাদের মেদ গলে যেতে পারে–এই ভেবে একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁরা উভয়ে পরিধান করলেন। তারপর উভয়ে তরুবেষ্টিত ও অভিনব সানুদেশসমন্বিত পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন। এমন কষ্টেও তাঁদের মৃত্যু ঘটল না।

'বিপদে এটাই নীতি'–এই মনে করে তিনি দুরদৃষ্টগ্রস্তা, অসহায়া ও নিদ্রিতা দময়ন্তীর বস্ত্রাংশ ছিন্ন করে তাঁকে এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করলেন।

শত্রুকুলের মান অপহরণকারী তিনি সেই কলির সংঘটিত নানা দুঃখদুর্দশায় বিধুর

হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। কারণ, নিজেদের ভাগ্যদোষ কোথায় না মহিমার সঙ্গে বিরাজ করে ?

তিনি দাবানলময় অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে মৃগকুল ছোটাছুটি করতে করতে শ্রান্ত হয়ে কাতর শব্দ করছিল। বিহঙ্গকুল অত্যন্ত তাপে ব্যাকুল হয়ে মরতে লাগল। গাছেরা অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়ে এক অতি ভীষণ আকার ধারণ করল।

শোকভারে ব্যাকুল নল উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পেলেন, কে যেন কেঁদে বলছে—'হে নল, এদিকে এসো।' তা শুনে সূর্যের মতো তেজস্বী নল 'হে অনাথ, তোমার কোনো ভয় নেই।'—এ কথা বলতে বলতে নিজে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ছুটে গেলেন।

করুণার একান্ত আশ্রয় সেই নল যেখানে প্রাণীটি ছিল, সেখানে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে বললেন—'বল, তুমি কোথায় ? তোমার বিপদ বিনষ্ট হোক'।

কাছে গিয়ে নল দেখলেন যে, এক জায়গায় কর্কোটক নাগ দাবাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। নিজের সামর্থ্যে দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে জীবনের আশা ছেড়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করছে। নল তাকে ধরতে চাইলেন।

হিতকারী নল সেই নাগকে ধরে কিছুটা দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেই সময়ে ঐ নাগ তাঁকে দংশন করল। তার বিষে নলের দেহ বিরূপ আকার ধারণ করল। তখন নাগ বলল—'তোমার আত্মা বেদনায় কাতর হবে না।

'আমার দেওয়া এই বস্ত্রখণ্ডটি গ্রহণ কর। এর ফলে তোমার দেহ কলির প্রভাব কাটিয়ে শীঘ্রই সকল বিপদ থেকে মুক্ত হবে। যাঁরা যশের আশ্রয় হন, তাঁরা গুণোদয়ের দ্বারা সর্ববিধ মঙ্গল লাভ করেন।

'হে নিষ্পাপ নল ! অভিমান ত্যাগ করে নিজের এই দেহ নিয়েই তুমি সর্বান্তঃকরণে ঋতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। মানুষের বিপদ কোথায় না হয়ে থাকে ?

'শান্তিলাভের জন্যে যাও, সুখলাভ কর'—এই কথা বলে সূর্যের মতো তেজস্বী সর্পরাজ অন্তর্হিত হল। উত্তম জনমণ্ডলীর মধ্যে সরল ও স্নিগ্ধ মিত্র কোথায় না থাকে ?

সেই নল একটুও বিচলিত না হয়ে প্রীতিবশে সেই বস্ত্রটি গ্রহণ করলেন এবং রক্ষণাদিবিহীন ও মাংসাশী নানা হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে ঋতুপর্ণের কাছে গেলেন না কি ? (অর্থাৎ ঋতুপর্ণের কাছে গেলেন)

রাজা ঋতুপর্ণ সানন্দে নলকে সারথির কাজে নিযুক্ত করলেন। নল যখন রথে করে পথ অতিক্রম করতেন, তখন ঋতুপর্ণের অশ্বগুলি তারস্বরে হ্রেষারব করতে করতে অতি বেগে গমন করত।

এদিকে নল যখন দময়ন্তীকে দুঃখসাগরে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন হঠাৎ দময়ন্তীর ঘুম ভাঙ্গল (নলকে দেখতে পেলেন না) সেই অবস্থায় তাঁর জীবনের সুখ চলে গেল। জীবনকে বিষাদময় বলে মনে হল।

যিনি পূর্বে রাজপ্রাসাদ ও উপবনে থেকে পতির সঙ্গে পরম সুখে আনন্দরস উপভোগ করেছেন, সেই দময়ন্তী আজ রামবিরহিতা সীতার মতো এই বনে অবসাদে ও ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন।

সেই বন ছিল নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, সাপ ও পাখিদের আবাসস্থল, তরুরাজিতে সমাচ্ছন্ন ও ভ্রমরজালে আবৃত। সেই ভীষণ বনে দময়ন্তী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দ্রুতপদে যাওয়ার ফলে শ্যামলবেণী দুলিয়ে দুলিয়ে দময়ন্তী বিলাপ করতে লাগলেন—'হে রাজন ! তুমি খড়্গ প্রভৃতির সাহায্যে শত্রুদের নিধন করে বন্ধুদের রক্ষা করে থাক।

'হে অনুপম ! তুমি মনুপ্রণীত নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম অবগত আছ। সেই তুমি গহনবনচারিণী, নিরাশ্রয়া ও কুলমর্যাদাব্রতে দীক্ষিতা সহধর্মিণী আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে ?

'আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, এ পাপ তুমি নিজে কর নি, অপরের প্রভাবে এ কাজ করেছ। তোমাকে আমি জানি না—এমন তো নয়। কলির প্রভাবে এ কাজ করেছ বলে এই ঘোর বিপদে আমি তোমায় দোষ দিতে পারি না।

'রে প্রাণ ! যতক্ষণ তুমি এ দেহ ত্যাগ না করছ, ততক্ষণ তোমার হৃদয়বাসী তিনি অনলগত লৌহের মতো অন্তরের সন্তাপে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অবস্থান করছেন না কি ?

'এই আত্মীয়বর্গ রাজ্যমধ্যে তোমাকে রাজ্যেশ্বররূপে পেয়ে কত সুখসৌভাগ্য লাভ করেছিল। হে কান্ত ! হে শত্রুকুলে নিঃশঙ্কহৃদয় ! হে সস্মিতবদন ! সেই-তুমি এই বনপ্রদেশ থেকে কোথায় চলে গেলে ?'

(বিলাপরতা দময়ন্তী মৃগকে জিজ্ঞাসা করছেন)—'হে মৃগ ! যাঁর যশোরাশি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থানেও ধরে না, যিনি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুর বক্ষদেশ নিমেষে বিদীর্ণ করেন আমার সেই হৃদয়বল্লভ কি এই পর্বতের সানুদেশমধ্যে গমন করেছেন ?'—এই বলে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন।

'হে অশোক ! নারীরা তোমার সম্মান করে তোমাকে দোহদ প্রদান করে থাকে। আমি তোমাকে নমস্কার করছি, তুমি তা গ্রহণ কর ; আর তোমার সঙ্গে আমার যে অনন্ত প্রণয় জন্মাল, তা স্মরণ করে এই ব্যক্তিটিকে তোমার নামের সমান কর।'

অতিশয় রূপবতী ও উদারপ্রকৃতিসম্পন্না দময়ন্তী উন্নত দেবদারুর বনে এভাবে বিলাপ করে সবেগে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলেন। তারপর রোদন করতে করতে এক মরুদেশে উপস্থিত হলেন, সেখানে না ছিল জল, না ছিল তৃণভূমি।

ভীমনন্দিনী দময়ন্তী সেই মরুপথ ধরে এক বনে এসে পেঁছিলেন। সেখানে নানাবিধ সর্প বিরাজ করছিল। ব্যাধ চারদিকে বিচরণ করছিল, আর মদনক্লিষ্ট ও পরিশ্রান্ত মৃগদল শব্দ করতে করতে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল।

সজলনয়নে উদ্বিগ্নমনে সুনয়না সুনাসা নারীশ্রেষ্ঠা সেই ভীমনন্দিনী কাঁদতে কাঁদতে এক অজগরের কাছে গিয়ে পড়লেন। সেই অজগর তাঁকে গ্রাস করল।

অনন্তর রিপুবল-বিনাশক তীক্ষ্ণস্বভাব এক কিরাত দময়ন্তীর প্রাণ-বিনাশক ও অচিরেই প্রাণপরিত্যাগী সেই অজগরের মুখে নিজের খড়্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে তাকে আক্রমণ করল। অজগরের সেই দশা দেখে সকলেই তাকে উপহাস করেছিল।

সেই কিরাত অতিশয় কামাতুর হয়ে নির্জন বনমধ্যে অসহায়া কৃশাঙ্গী দময়ন্তীকে কামনা করল। নির্জনে রমণীকে দেখে কোন্ কামান্ধ না কামনা করে ?

'দেখ মানিনী ! এই দুর্গম বনে উপস্থিত হয়ে আমি অজগরকে মেরে তোমার প্রাণরক্ষা করেছি। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শরণাগত ব্যক্তি কোথায় না পূজিত হয় ?

'হে সুশোভন-চন্দ্রাননা ! তুমি আমাকে তোমার দাস বলে মনে কর'—কিরাতের এ রকম

দুর্বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রোধে চপলনয়না দময়ন্তী তাকে শাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কিরাতের মেদ শাপানলে দগ্ধ হতে লাগল। তখন কি সে ভূতলে পড়ে গেল না ?

কামোন্মত্ত শবরকে দগ্ধ করে দময়ন্তী সুউচ্চ বৃক্ষের দিকে ও পর্বত-কন্দরের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে অন্য-এক ভীষণ বনভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন।

জলবিরহিত দাবানলপরিপূর্ণ পর্বতসঙ্কুল বনে পদব্রজে ভ্রমণ করতে করতে দময়ন্তী বিলাপ করতে লাগলেন—'হে ক্লেশবহুল, হে অনন্তদুঃখের আকর, সখা অন্তঃকরণ ! এখন তুমি সত্বর মৃত্যুকেই বরণ কর।

'হে বৃক ! তুমি ক্রোধের সঙ্গে আমাকে আক্রমণ কর। চলে যেও না। তোমার পত্নী বৃকী তোমার সঙ্গে থেকে সুশোভিতা হোক। অশুভদৈবসম্পন্ন নিষ্করুণ প্রাণবল্লভ ব্যতিরেকে আমার কী-বা সুখ ?

'হে রাক্ষস ! তুমি মেদ দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করেছ। হে মৃত্যুহীন ! তুমি এত ক্ষুধার্ত, তাই আর বসে থেকো না, আমায় ভক্ষণ কর। এই ব্যক্তির দুঃখ দূর কর। হে করুণার্দ্রহৃদয় ! দুঃখিনীকে দয়া কর। হে উদারদর্শন ! আমি তোমাকে শরীর দান করছি।

'হে লক্ষ্মীপ্রদ ব্রহ্মা ! আমার বিপদকে মকরালয় সমুদ্রের মতো জেনো। হে দেবগণের হিতকারী হরি ! এই মহাদুঃখকর ভয়ের সময়ে আমাকে আশ্বাস-বচন দিয়ে আশ্বস্ত করে রক্ষা কর।

'হে নিষধেশ্বর ! তোমার শত্রু (পুষ্কর) নির্ভয়হৃদয়ে অচলা লক্ষ্মীর সঙ্গে কত সুখসমৃদ্ধি ভোগ করছে। আর তুমি সব বাসনা পরিহার করে এত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বিপদগ্রস্ত হয়েছ। হায় ! কবেই বা আমি শাশ্বত সুখ লাভ করব।

'হে নিষধপতি ! তুমি তরুণ মানবগণের গর্ব খর্ব করে থাক। জীবনহরণে তোমার অল্পমাত্র ইচ্ছা দেখে দুর্নীতিপরায়ণ শত্রু দূর থেকে পলায়ন করে। এই রকম তুমি একবার চরম কোপবহ্নি প্রকাশ কর।

'হে নীতিজ্ঞ, সম্মানার্হ, সংযমী ! হে শুভকারী ! তুমি যে-দেশে গিয়েই বাস কর, সেখানকার বিপথগামী দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুগণকে তুমি বিনাশ করে থাক।

'হে হিতপ্রদ ! নীতিভ্রষ্ট শত্রুগণের উন্মত্ত হস্তিসমূহের কবলে পড়েও যেন তোমার বিপদ না ঘটে। তোমার উপকারী হিতৈষীরা যেখানে আছেন, সেই নিজনগরীতে তুমি ফিরে এস।' এই বলে নীতিপরায়ণা রাজেন্দ্রকন্যা বার বার বিলাপ করতে লাগলেন।

বিরহবিধুরা নিরপরাধা সেই কৃশাঙ্গী দময়ন্তী এক জায়গায় সমৃদ্ধিশালী একদল বণিককে রত্নরাশি নিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে দেখলেন। তাদের দেখে তাঁর মনঃপীড়ার অবসান হল।

প্রতিকূল দৈববশে দময়ন্তী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কার্যসিদ্ধির জন্যে ঐ বণিকদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। ঐ বণিকদল তাঁকে সঙ্গে যেতে নিষেধ করলেও অল্পজলবর্তিনী শফরী যেমন জলোচ্ছ্বাসে চলতে থাকে, তেমনি দময়ন্তীও বণিকদের সঙ্গেই চললেন।

বহু কষ্ট ভোগ করে দময়ন্তী সুবাহু-নামে রাজার ধনধান্যসমৃদ্ধ রাজধানীতে পৌঁছলেন। সুবাহু ছিলেন অন্যায়-নিবারক রাজা। তাঁর ধনাগমের বহুবিধ সমৃদ্ধিতে রাজধানী বিশেষভাবে শোভিত ছিল।

অঙ্গমালিন্যহেতু দময়ন্তীর প্রকৃত সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। রাজমাতা তাঁকে সানন্দে আশ্রয় দিলেন। এখানে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। প্রাণধারণের উপযোগী আহারটুকুমাত্র গ্রহণ করে শোকাকুলচিত্তে তিনি এখানে বাস করতে লাগলেন।

অসহায় অবস্থায় থেকে শুধুমাত্র নীতিমার্গ আশ্রয় করে অনাথার মতো পদব্রজে বনে বনে পরিভ্রমণ করে দময়ন্তী এইভাবে নিজের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

॥ তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ সর্গ

এরপর সাম-দান প্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ে সুপণ্ডিত নলের দুর্দশার কথা শুনে ভীম অনুচরদের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে নলের অন্বেষণের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করলেন। অন্যান্য রাজন্যবর্গ মহারাজ ভীমের বশীভূত ছিলেন।

তারপর শত্রুর-খড়্গে-অক্ষত ভীমের আদেশে বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গুরুর আদেশে শিষ্যের-মতো দিনরাত নলের অন্বেষণে বিচরণ করতে লাগলেন।

তারপর সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে নীতিনিপুণ একজন ব্যক্তি অশ্বারোহীপূর্ণ এক নগরীতে উপস্থিত হলেন। বনের মধ্যে নানাদিকে ভ্রমণের ফলে যিনি ভয় প্রভৃতি দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই সুনয়না দময়ন্তী এই নগরীতেই অবস্থান করছিলেন।

হতভাগিনী দময়ন্তী সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিজগৃহে গমন করলেন, আর সেই ব্রাহ্মণও পুরস্কারপ্রাপ্তির লোভে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। সুশোভনা দময়ন্তী ন্যায়নিষ্ঠ ও সৌভাগ্যান্বিত পতিকে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যত্ন নিলেন না।

'হে বস্ত্রখণ্ডের অপহারক! কোথায় তুমি? আমার এই দুর্গতি তোমার পক্ষে যশস্কর নয়। আপনজনকে ত্যাগ করে তুমি যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ—এটাও তোমার যশ প্রকাশ করছে না। তোমার চিরানুগত আমি তোমায় ডাকছি।'

নলের অন্বেষণের জন্যে পর্বত প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে ঘুরতে অন্বেষণকারী ব্যক্তি পূর্বোক্ত কথা বলে বেড়াতে লাগল। উদ্দেশ্য হল ঐ-কথা শুনে যে-ব্যক্তি উত্তর দেবে, তার কথা দময়ন্তীকে এসে বলবে। অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা নাগরিক বস্তু ত্যাগ করে ছদ্মবেশে নাগভক্ষক গরুড়ের মতো দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল।

সেই অন্বেষণকারীদের মধ্যে একজন নীতিজ্ঞ রাজকন্যার কাছে এসে বলল—'ভয় তোমাকে ত্যাগ করবে। চেতনাবতী নারীর পক্ষে যা দুঃসহ, সে-রকম কোনো পীড়া আর তোমাকে কষ্ট দেবে না।

অযোধ্যায় নিজের আবাসে স্থিত ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে আমি তোমার এই কথা উচ্চস্বরে শুনিয়েছি। লক্ষ্মীমন্ত রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে সে-কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর করলেন না।

তবে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে রাজা-ঋতুপর্ণের বাড়িতেই থাকে এবং রাজার সারথির কাজে নিযুক্ত আছে। সে অনেক দুষ্কর কাজ করতে পারে। তার হাত দুখানা তত লম্বা নয়। পথে আমাদের ভীষণ দুঃখিত হয়ে আসতে দেখে সে নির্জনে বলল—

"যিনি ধর্মতত্ত্ব অবগত আছেন, সেই দময়ন্তী বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে এই ব্যক্তির প্রতি যেন কোপ না করেন। এই ব্যক্তি এখন বড়ই দৈন্যদশায় পড়েছে। আয় না থাকায় তার না আছে বসন, না আছে বাহন।"

তার এই প্রামাণিক সত্যবাক্যে আমি নিজেকে কৃতকর্মা মনে করে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' ব্রাহ্মণ এই কথা বলার পর, সেই দময়ন্তী তাঁকে নমস্কার করে বহু ধন দান করলেন।

তারপর ঋতুপর্ণের কাছে কৃতজ্ঞতা-ঋণ পরিশোধ করে সেই অযোধ্যা থেকে গরুড়ের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঋতুপর্ণকে নিয়ে নল যাতে তার কাছে আসতে পারেন, তার জন্যে তপোনিরতা পার্বতীর মতো দময়ন্তী নিজের বুদ্ধিকৌশলের বিস্তারে যত্নবতী হলেন।

দময়ন্তী নানা সুমিষ্ট কথায় বিমোহিত করে অন্য এক অতি অসাধারণ ব্রাহ্মণকে দিয়ে গোপনে ঋতুপর্ণের কাছে নিজের স্বয়ংবর-বার্তা শোনালেন। মানী ব্যক্তি শীঘ্র পাপ স্মরণ করেন না।

তখন ঋতুপর্ণ বর্মে বিভূষিত হয়ে আনন্দসহকারে গোপনে নলকে বললেন—'হে সাধু! আজকের দিন অতিক্রম হতে না পারে, এমনি করে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে। লক্ষ্মীরূপিণী দময়ন্তী আমার কাছে এলো বলে।

'সেই-রমণী আত্মগুণে নিবন্ধ করে আমাকে আকর্ষণ করছে। বধূর দ্বারা পূজিত হয়ে কোন্ ব্যক্তি না মন হারায়? শোনা যাচ্ছে, স্বয়ংবর মহোৎসব হবে আগামীকাল। আর আমাদের যেতেও হবে শত যোজন পথে।

'তাই রাত্রির প্রহরকে চলে যেতে না দিয়ে তুমি যদি তাড়াতাড়ি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো, তবেই আমি তার কাছে পৌঁছতে পারি!' নলজায়া দময়ন্তীর ছল বুঝতে না পেরে ঋতুপর্ণ এই কথা বললেন। কামান্ধরা কোথায় কালবিলম্ব করে?

'যদি সে (আমার সারথি) অশ্বগুলিকে ঠিকমতো চালনা করে, তাহলে সেই দময়ন্তী নিশ্চয়ই কাল আমাকে ভজনা করবে।' এই রূপে দময়ন্তীর পক্ষে কোনো অন্যায় আশংকা না করে (দময়ন্তীলাভ বিষয়ে) ঋতুপর্ণ স্থিরনিশ্চয় হলেন এবং শীঘ্রই বিকৃত-চিত্ত হয়ে পড়লেন।

তখন নল রথে চড়লেন ও শত্রুবিনাশী রাজা ঋতুপর্ণকে সেই রথে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন। রথটি ছিল দ্রুতগামী, নানা অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ, শুভ্র অশ্বযুক্ত এবং ভীষণ শব্দকারী।

রথের প্রচণ্ডগতিতে উত্থিত বায়ুতে রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয়টি উড়ে গিয়ে এক অসনবৃক্ষের উপরে পড়ল। ক্ষণেকের মধ্যে রথ বহুদূরে চলে আসায় তা আর আনা গেল না। রাজা রথের দ্রুতগতি দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন।

নল ছিলেন অশ্বচালনায় দক্ষ ও প্রজাপতি দক্ষের মতো তপঃসিদ্ধ। রাজা ঋতুপর্ণ ছিলেন অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ও অক্ষফলগণনায় পারদর্শী। রাজার এই গুণ চিন্তা করে নলের আনন্দ জন্মাল।

নল ও ঋতুপর্ণ—দুজনেই দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে এঁদের কেউ গতিরোধ করতে পারেন না। এমন দুই বীর অভ্যুদয়বাসনায় একসঙ্গে জলস্পর্শ করে পরস্পরের বিদ্যা বিনিময় করলেন।

তারপর স্পষ্টতঃই নলের দাহনশক্তি অধিক হওয়ায় কলি তাঁকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি এক

উচ্চ বিভীতকতরুকে আশ্রয় করল। কিন্তু ঋতুপর্ণের কাছ থেকে কলি-দহন-বিদ্যা শিখে নিয়ে নল কলিকে সেখানেও থাকতে দিলেন না।

(কলি নলকে বলল—) "হে নল! তোমার হৃদয়মধ্যবর্তিনী সেই দময়ন্তীর অনলসম রোষে পড়ে আমি দগ্ধপ্রায় বলে জেনো। তাই অগ্নিতুল্য পীড়ায় পীড়িত হয়ে আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

এভাবে বিনয় প্রকাশ করায় মহাশয় নল নানাবিধ ছলনার আশ্রয়কারী কলিকে মুক্তি দিলেন। শত্রুদের প্রণতিতে যিনি শত্রুতা ভুলে যান, তিনি অনন্ত কীর্তি লাভ করে থাকেন।

শত্রু কলি শীঘ্র ছেড়ে যাওয়ার পর মহাত্মা নল আশ্বস্ত হয়ে অশ্ব-রথ চালনা করে রাজাকে নিয়ে চললেন। 'সেই রমণী কাল তাহলে তোমারই হবে?'—এই কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে হাসতে লাগলেন।

নল ছিলেন নিষ্পাপ ও সজ্জনপ্রিয়। দিনের শেষে ঋতুপর্ণকে নিয়ে তিনি প্রিয়তমা দময়ন্তীর আবাসভূমি সেই সমৃদ্ধশালী নগরীতে এসে পেঁছিলেন।

'আপনার কষ্ট হয় নি তো?'—এই কথা বলে রাজা ভীম মহীপতি ঋতুপর্ণকে সংবর্ধনা করার জন্যে পরম আদরে নিজের আকাশচুম্বী প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

ভীম ছিলেন সজ্জনদের পূজ্য ও শত্রুদের বিনাশকারী। তাঁর লোকেরা ব্যগ্র না হয়ে উৎসবের আয়োজন করছিল। ঋতুপর্ণ সেই উৎসবে রাজপুরীর সমৃদ্ধি দেখে তৎক্ষণাৎ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করতে লাগলেন।

তারপর শুচিশুদ্ধ নল শরীরসৌন্দর্যে প্রখ্যাততমা, প্রাণসমা দময়ন্তীর ছল স্মরণ করে সুপরিসর ও পরম মনোহর বাসগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন।

নিজের কৌশল প্রয়োগের পর রথ চালনা করে নল অবিলম্বে নিকটে আসছেন দেখে নলপ্রিয়া সেই দময়ন্তীর চিত্ত অনন্ত প্রেমরসে সিক্ত হল। আনন্দে তাঁর মনে নানা সু-সম্ভোগের কথা আসতে লাগল।

আমার প্রাণবল্লভ শত্রুকুল ধ্বংস করেছিলেন। সুন্দর পদ্মের মতো তাঁর মুখমণ্ডল। এতটুকু পাপ নেই তাঁর। তবে কেন তিনি ঋতুপর্ণের আবাসে বাস করছেন? এই কথা চিন্তা করে বিষণ্ণা দময়ন্তী তাঁর এক সখীকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই সখী নলের কাছে গিয়ে তাঁকে নানাভাবে বোঝাল। তারপর বার বার পরীক্ষা করে আত্মীয়ের মতো কথা বলে নিজসখী দময়ন্তীর পরম রমণীয় প্রাসাদে নিয়ে এলো। কারণ, গুণবান ব্যক্তিরা লক্ষ্মীলাভ করেন না কি?

সুবেশধারী সেই নল কর্কোটক নাগ-প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বিকৃত রূপ পরিহার করলেন। দময়ন্তী অবিচল-চিত্তে অবস্থান করছিলেন। আর স্নেহবৎসল নল রাজপ্রাসাদে স্থানলাভ করে দময়ন্তীর সঙ্গে নানারকম রতিক্রীড়ায় মেতে উঠলেন।

রাজপ্রাসাদে শান্তিলাভ করে অরিন্দম নল এক অতি মনোজ্ঞ কক্ষে দময়ন্তীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করলেন। তারপর শ্বশুর ভীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

(প্রভাতে) ঋতুপর্ণ নলকে আত্মসদৃশ দেখে জড়ের মতো হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। শত্রুর সম্মান-খর্বকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ নল ধনরত্ন দিয়ে সম্মানিত করে ঋতুপর্ণকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

রাজা নল ভীমপুরীতে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলেন। প্রাণসমা দময়ন্তী তাঁর সান্ত্বনা ও সুখ বিধান করতে লাগলেন। নল অন্তঃপুরবাসিনীদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দূর করলেন। চন্দ্রানন নল এইভাবে একমাস অতিবাহিত করলেন।

তারপর নল এক মহতী সেনা নিয়ে নিজের রাজধানীতে যাত্রা করলেন। সেই সেনা ছিল শত্রুগণের অপরাজেয় এবং অসি-গদা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। নল মহাযুদ্ধে (ভ্রাতা) পুষ্করকে আহ্বান করলেন।

(নল পুষ্করকে বললেন–) তুমি আমার উপরে গভীর মায়া বিস্তার করে আমাকে প্রতারিত করেছিলে। আর সেই মায়া বিস্তার করে তুমি কি মানী ব্যক্তিদের মনে কষ্ট দাও নি? এখন তুমি ধনুর্ধারণ করতে পারো, অথবা পাশাখেলাতেও বসতে পারো। বল, তুমি কী ইচ্ছা কর?

নল এই কথা বলার পর সেই পুষ্কর আবার পাশাখেলায় রাজি হয়ে ভুল করে বসল। এই পাশাখেলায় ইতিপূর্বে যে নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করেছিল, আর নল বনে বনে ঘুরে কত কষ্টই না পেয়েছিলেন।

নলের মধ্যে ছল বা কপটতা ছিল না, আর তাঁর ছিল শুভ অদৃষ্ট। সেই নলের কাছে পুষ্কর প্রাণ পণ রেখে পাশা খেলতে বসল ও দারুণভাবে পরাজিত হল। নল তাকে ছেড়ে দিলেন। ক্রোধাদিশূন্য ব্যক্তি কারও কোনো অপরাধ চিরদিন মনে রাখেন না।

হে পুষ্কর তুমি নিজ ভবনে বাস করে আমার দেওয়া ভূমি রক্ষা কর। সেখানকার প্রজাদের আনন্দ বর্ধন কর। তুমি ও আমি–উভয়ে অধিকতর শক্তি লাভ করে প্রীতিপূর্ণ নয়নে ও স্নেহঘন-মনে পূর্বের মতো মিলেমিশে বাস করি।

নিজ বলে ইন্দ্র, পবন ও ধর্মরাজের সমতুল্য, নীতিমান নল স্নেহার্দ্র হৃদয়ে এইভাবে অনুনয় করলে পুষ্কর তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন।

(পুষ্কর বললেন–) হে আশ্রিতবৎসল। প্রভূত যশে তুমি দশদিক পরিব্যাপ্ত করেছ, নিজবলে শত্রুসেনা বিনাশ করেছ। চিরদিন তোমার এই সমৃদ্ধি যেন অব্যাহত থাকে। তোমার কোনো বাসনা কখনও যেন ব্যাহত না হয়।

এইভাবে স্তুতি করতে করতে পুষ্কর নলের চরণে প্রণত হলেন। শত্রুদের কাছে অনলস্বরূপ নলের মুখ বিকশিত শতদলের মতো শোভা ধারণ করল। পুষ্কর তাঁর অনুগমন করলেন।

তারপর মণিমুক্তাখচিত রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হয়ে নল কবচধারী ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে সুসমৃদ্ধ রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে শাসন করতে লাগলেন। তিনি মহাত্মা ব্যক্তিদের কথায় চলতেন। তাঁর রাজ্যে কোনো অশান্তি ছিল না।

এদিকে নলের শত্রুদের দণ্ডশক্তি ছিল না। তাই তারা লক্ষ্মীভ্রষ্ট হল। বনে বনে ঘুরে তারা শোকে আর বিপদে পড়তে লাগল। নল সমস্ত প্রজার সুখসমৃদ্ধি বিধানে তৎপর হলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁকে শ্রীহরির মতো করে আশ্রয় করলেন।

নলকে আবার ফিরে পেয়ে সেই রাজপুরী পূর্বের মতো শোভা ধারণ করল। নল ছিলেন তেজস্বী ও উৎসবপ্রিয়। তিনি সব সময়ে নানা উৎসবে সমুজ্জ্বল বহুবিধ সম্পদ লাভ করতে লাগলেন।

—চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত—

॥ 'নলোদয়' কাব্য সমাপ্ত ॥

শ্রুতবোধ

আমি (কালিদাস) 'শ্রুতবোধ' নামে একটি বই সংক্ষেপে লিখছি। এই বই পড়লে শোনামাত্রই ছন্দসমূহের লক্ষণ বোঝা যাবে।

সংযুক্ত অক্ষরের ঠিক আগের অক্ষরটি এবং দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষর গুরু বলে জানতে হবে, অনুস্বরযুক্ত অক্ষরটিও গুরু, তাছাড়া বিসর্গযুক্ত অক্ষরও গুরু বলে জানা উচিত। প্রতিপাদের একেবারে শেষ অক্ষরটি লঘু হলেও ছন্দের প্রয়োজনে কখনও কখনও তা গুরু হবে, আবার গুরু অক্ষরও কোনো সময় লঘু হতে পারে।

লঘুস্বরের একটি মাত্রা থাকবে, যার দুটি মাত্রা আছে তাকেই দীর্ঘস্বর বলে! প্লুতস্বরের তিনটি মাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের আধমাত্রা আছে, তা জানা উচিত।

জিহ্বার বিরাম স্থানকে কবিরা 'যতি' বলে থাকেন। 'যতি'র নামান্তর হচ্ছে বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি—এ কথা (কবিরাই) নির্দেশ করেন।

যে ছন্দের প্রথম পাদে ১২টি মাত্রা, তৃতীয় পাদেও ঐ একই মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮টি মাত্রা এবং চতুর্থপাদে ১৫টি মাত্রা, সেই ছন্দকে আর্যা-ছন্দ বলে।

হে হংসগামিনী, অমৃতভাষিণী! যে ছন্দের শেষার্ধ আর্যা পূর্বার্ধের সমান হয়, সেই ছন্দকে ছন্দোবিদ্‌রা **গীতি** বলে থাকেন।

[অর্থাৎ গীতছন্দের প্রথমপাদে ১২টি মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮টি মাত্রা, তৃতীয়পাদে ১২টি মাত্রা এবং চতুর্থপাদে ১৮টি মাত্রা থাকবে]

অয়ি কামিনী! যদি আর্যার প্রথমার্ধ শেষার্ধের সমান হয়, তবে সেই ছন্দকে মহাকবিরা **উপগীতি** বলেন।

[অর্থাৎ উপগীতি ছন্দের প্রথমপাদে ১২টি মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৫টি মাত্রা, তৃতীয়পাদে ১২টি এবং চতুর্থপাদে ১৫টি মাত্রা থাকবে]

যে-বৃত্তের প্রতিপাদে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু হয়, তাকে **অক্ষরপঙক্তি** ছন্দ বলে।

[এই ছন্দের প্রত্যেকটি পাদে ৫টি করে অক্ষর থাকে, সমস্ত শ্লোকে থাকে মোট ২৮টি বর্ণ বা অক্ষর। প্রতিপাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ লঘু হবে। গণ—ভ, গ, গ]

ওগো ঘনকুচযুগশালিনী! যে-ছন্দের প্রথম চারটি অক্ষর লঘু এবং শেষ দুটি অক্ষর গুরু, সেই ছন্দ **শশিবদনা**।

[এই ছন্দের প্রতিপাদে থাকে ৬টি করে অক্ষর, তার মধ্যে প্রথম চারটি অক্ষর লঘুস্বরযুক্ত এবং বাকি দুটি হবে গুরুস্বরবিশিষ্ট। গণ—ন, য]

অয়ি এণাক্ষী, বালিকা! যে ছন্দের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু (অন্যগুলি গুরু) পণ্ডিতগণ তাকে **মদলেখা** ছন্দ বলেন।

[এই ছন্দের প্রতিপাদে ৭টি করে অক্ষর থাকে, তার মধ্যে প্রথম ৩টি অক্ষর, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অক্ষর হবে গুরু। গণ—ম, স, গ]

পদ্য ছন্দের লক্ষণে সমস্ত পাদে পঞ্চম অক্ষর লঘু এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু আর দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের সপ্তম অক্ষরটি—লঘু হয় (প্রথম ও তৃতীয়পাদে সপ্তম অক্ষর গুরু হয়)।

['ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে পদ্য ছন্দের নাম অনুষ্টুপ। এর অক্ষর সংখ্যা প্রতিপাদে ৮টি]

যে ছন্দের প্রতিপাদের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর গুরু (অন্যগুলি লঘু), তাকে **মাণবকক্রীড়** ছন্দ বলে।

['ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থে এই ছন্দের নাম মাণবকাক্রীড়িতক এবং 'ছন্দোমঞ্জরী'তে এর নাম মাণবক। অক্ষর সংখ্যা প্রতিপাদে ৮টি। গণ—ভ, ত, ল, গ]

পণ্ডিতেরা সেই ছন্দকেই (নগ) **নাগস্বরূপিণী** বলে থাকেন, যে-ছন্দের প্রতিপাদের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অক্ষর গুরু (অবশিষ্টগুলি লঘু) হয়।

['ছন্দোমঞ্জরী'তে এই ছন্দের নাম প্রমাণিকা। অক্ষর সংখ্যা প্রতিপাদে ৮টি। গণ—জ, র, ল, গ]

হে বীণাপাণি! যে ছন্দে প্রতিপাদে সমস্ত বর্ণই দীর্ঘ, আর যতি পড়ে বেদ ও বেদের সংখ্যা দিয়ে, কবিরা সেই ছন্দকে বলে থাকেন **বিদ্যুন্মালা**।

[বেদের সংখ্যা চার। দুবার বেদ শব্দটি থাকায় প্রতি চার অক্ষর অন্তর যতি হয়। এই ছন্দের প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ৮টি। গণ—ম, ম, গ, গ]

অয়ি তন্বি, যে ছন্দের প্রতিপাদে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও দশম অক্ষর হয় গুরু (অন্যগুলি লঘু), আর যদি যতি হয় ইন্দ্রিয় ও বাণের সংখ্যা দিয়ে, তাহলে সে ছন্দকে বলা হয় **চম্পকমালা**।

[ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ; আর কামদেবের বাণও পাঁচ। অতএব প্রতি পাঁচ অক্ষর অন্তর যতি পড়ে। এই ছন্দে প্রতিচরণে অক্ষর সংখ্যা ১০টি। গণ—ভ, ম, স, গ। ছন্দঃসূত্র এবং ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে এই ছন্দের নাম রুক্মবতী]

ওগো প্রেমনিধি, যেখানে চম্পকমালার শেষ অক্ষর (অর্থাৎ দশম অক্ষর) থাকে না, ছন্দোনিপুণ কবিরা তাকে **মণিমধ্য** ছন্দ বলেন।

[এই ছন্দে প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ৯টি; এর মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম অক্ষর গুরু, অন্যগুলি লঘু। গণ—ভ, ম, স]

অয়ি অলংকারশোভিতা, যদি মন্দাক্রান্তা ছন্দের শেষ যতিটি না থাকে (অর্থাৎ শেষের সাতটি অক্ষর বাদ যায়), তাহলে যে ছন্দের উদয় হয়, ওগো কমলবদনা, সেই ছন্দকে পণ্ডিতরা **হংসী** বলেন—এটা তুমি নিশ্চিত জেনো।

[মন্দাক্রান্তা ছন্দ ১৭ অক্ষরের; তার ৭টি অক্ষর বাদ গেলে, থাকে ১০টি : অতএব

হংসী ছন্দটির প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১০টি। তার মধ্যে প্রথম চারটি অক্ষর এবং দশম অক্ষর গুরু, অন্যগুলি লঘু। গণ–ম, ভ, ন, গ]

হে কম্বুগ্রীবা, যে ছন্দের ষষ্ঠ ও নবম বর্ণ লঘু হয় এবং প্রত্যেক বেদ ও অশ্বসংখ্যক অক্ষরে যতি পড়ে, অয়ি তন্বি, ছন্দোবিদগণ তাকে **শালিনী** বলে থাকেন।

[এই ছন্দের প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১০টি। শ্লোকে বেদ শব্দটি–'চার' এবং তুরঙ্গ শব্দটি সাত সংখ্যার প্রতীক। গণ–য, ত, ত, গ, গ]

ওগো বিপুলনিতম্বিনী, যে ছন্দে প্রতিচরণের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম এবং অন্ত্য অক্ষর অর্থাৎ একাদশ বর্ণ গুরু হয়, অয়ি উৎকটকামুকা, সেই ছন্দের নাম **দোধক**।

[প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১১টি। গণ–ভ, ভ, ভ, গ, গ]

তোমার গমনভঙ্গী হংসকে লজ্জা দেয়–অয়ি সুজঙ্ঘে, যে বৃত্তের তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অক্ষর লঘু (অন্যগুলি গুরু) হয়, উত্তম কবিরা তাকে **ইন্দ্রবজ্রা** ছন্দ বলেন।

[এগারো অক্ষরের ছন্দ ; প্রতিপাদে ত, ত, জ, গ, গ, গণ থাকে]

হে সুবর্ণা! যদি ইন্দ্রবজ্রার প্রত্যেক পাদের প্রথম বর্ণ লঘু হয়, তাহলে, ওগো উদ্বেলমদনা, সেই ছন্দকে শ্রেষ্ঠ কবিরা **উপেন্দ্রবজ্রা** বলে থাকেন।

[এগারো অক্ষর থাকে প্রতিপাদে। গণ–জ, ত, জ, গ, গ]

অয়ি সীমন্তিনী, উক্ত ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা–এই উভয় ছন্দেরই পাদ যে-বৃত্তে থাকে, চন্দ্রমনোরমে, সেই বৃত্তকে পণ্ডিতেরা **উপজাতি** আখ্যা দিয়ে থাকেন, আর তুমি এভাবেই এই বৃত্তের প্রয়োগ করবে।

[ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে যে ছন্দ তাকেই উপজাতি বলে, তবে মনে রাখতে হবে, শ্লোকে প্রথমপাদ উপেন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি পাদ ইন্দ্রবজ্রা অথবা প্রথমপাদ ইন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা হলে অন্য ছন্দের আবির্ভাব ঘটে, সেক্ষেত্রে উপজাতিবৃত্ত হবে না]

হে ব্যক্তাভিলাষা, যে-ছন্দের প্রথম চরণটি ইন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা, সেই ছন্দকে মনীষীরা **আখ্যানকী** বলেন ; আর তাঁরা বিপরীতপর্বা আখ্যানকী তাকেই বলেন, যে-বৃত্তের প্রথম চরণ উপেন্দ্রবজ্রার এবং বাকি তিনটি ইন্দ্রবজ্রার।

অয়ি বিধুমুখী, যদি বৃত্তের প্রতিচরণে প্রথম, তৃতীয়, নবম এবং শেষ অর্থাৎ একাদশ অক্ষর দীর্ঘ হয়, তাকেই কবিরা **রথোদ্ধতা** বলেন।

[এগারো অক্ষরের ছন্দ। গণ–র, ন, র, ল, গ]

অয়ি বিনীতা মৃগনেত্রা! যদি রথোদ্ধতার প্রতিচরণের নবম ও দশম অক্ষরের বিপর্যয় হয় (অর্থাৎ নবম বর্ণ লঘু এবং দশম বর্ণ গুরু হয়) তাহলে সেই বৃত্তকে প্রাচীন কবিরা **স্বাগতা** বলে থাকেন।

[এগারো অক্ষরের বৃত্ত। গণ–র, ন, ভ, গ, গ]

হে অনল্পকামা, যদি প্রতিপাদের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ অক্ষর গুরু হয় (অন্যগুলি লঘু) তাহলে ওগো নিবিড়পীনস্তনভারানতা, সেই বৃত্তকে **তোটক** বলা হয়।

['বিরতিপ্রভব' শব্দের অর্থ বিশ্রামস্থল অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষর। বারো অক্ষরের ছন্দ। গণ–স স, স, স]

অয়ি বিলাসিনী! যদি তোটকছন্দের পঞ্চম বর্ণ গুরু হয় এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু না হয়ে লঘু হয়, তাহলে, ওগো অবলা কবিরা সে-ছন্দকে **প্রমিতাক্ষরা** বলে থাকেন।

[শ্লোকে 'রসসংখ্যক' পদের অর্থ এখানে ছয় বা ষষ্ঠ ; কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভেদে আস্বাদনীয় রস ছয় প্রকার। তাই 'রসসংখ্যক গুরু' পদের অর্থ হল, ষষ্ঠ অক্ষর হবে দীর্ঘ। তোটকের পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু ; কিন্তু এই ছন্দে প্রতিপাদের পঞ্চম বর্ণ গুরু এবং ষষ্ঠটি হয় লঘু। গণ—স, জ, স, স]

অয়ি শারদচন্দ্রনিন্দিতমুখকমলা, যে-বৃত্তের প্রতিপাদের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু হয়, উত্তম কবিরা তাকেই **ভুজঙ্গপ্রয়াত** ছন্দ বলেন।

[শ্লোকে 'একাদশাদ্যম্' শব্দের অর্থ একাদশস্য আদ্যম্ অর্থাৎ একাদশ অক্ষরের আগের অক্ষর, তার মানে দশম অক্ষর। ছন্দের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা ১২টি। গণ—য, য, য, য]

হে কৃশোদরী, যে-বৃত্তে প্রতিপাদের চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ অক্ষর (শেষ অক্ষর) গুরু হয়, অয়ি সুমধ্যে, সেই বৃত্তকে **দ্রুতবিলম্বিত** বলা হয়।

[প্রতিপাদের অক্ষরসংখ্যা ১২টি। গণ—ন, ভ, ভ, র]

ওগো কমলনয়না, দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের যদি প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রথম অক্ষর না থাকে, তবে অয়ি সুন্দরী, সে বৃত্ত হবে **হরিণীপ্লুতা**।

[এটি অর্ধসমবৃত্ত। প্রথম ও তৃতীয় পাদ এগারো অক্ষরের। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ ১২ অক্ষরের। প্রথম ও তৃতীয় পাদে গণ—স, স, স, ল, গ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে গণ—ন, ভ, ভ, র। ছন্দঃসূত্রে এবং ছন্দোমঞ্জরীতে এই বৃত্তের নাম হরিণপ্লুতা]

অয়ি মদভরে উল্লাসিত ভ্রূসহায়ে কামের কার্মুকবিজয়িনী! উপেন্দ্রবজ্রার চরণ-চতুষ্টয়ে যদি উপান্ত বর্ণগুলি অর্থাৎ একাদশ অক্ষরগুলি লঘু হয় এবং শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষরগুলি গুরু হয়, তাহলে পণ্ডিতগণ সেই বৃত্তকে **বংশস্থবিল** বলেন।

[উপেন্দ্রবজ্রা এগারো অক্ষরের বৃত্ত ; কিন্তু এই বৃত্তটি বারো অক্ষরের। উপেন্দ্রবজ্রার তিন অক্ষরের প্রথম তিনটি গণ, যথা—জ, ত, জ ; শেষ অক্ষরটি অর্থাৎ এগারো সংখ্যকটি গুরু। এই ছন্দে উপেন্দ্রবজ্রার প্রথম তিনটি গণ ঠিকই আছে, তবে একাদশ অক্ষরটি লঘু এবং দ্বাদশ অক্ষরটি, যেটা এ ছন্দের বাড়তি অক্ষর, সেটি হবে গুরু। তাই এ ছন্দের গণ দাঁড়ায়—জ, ত, জ, র]

অয়ি অশোকাঙ্কুরকরপল্লবা, বংশস্থবিলের পাদগুলির প্রথম বর্ণ যে-ছন্দে গুরু হয়ে যায়, ওগো যৌবনলীলায় রতিরঙ্গলালসা, কবিরা সে ছন্দকে **ইন্দ্রবংশা** বলেন।

[এই ছন্দের প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ১২টি। গণ—ত, ত, জ, র]

হে প্রিয়ে, অমৃতভাষিণী, যে-বৃত্তে প্রতি চরণের প্রথম দুটি অক্ষর অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু আর যুগ এবং গ্রহসংখ্যক অক্ষরের যতি পড়ে, সেই বৃত্তকে **প্রভাবতী** নামে দেখো।

[প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১৩টি। গণ—ত, ভ, স, জ, গ। 'যুগগ্রহৈঃ'—শ্লোকের পদটির দ্বারা সত্যত্রেতাদি ভেদে চারটি যুগ ও নয়টি গ্রহ বোঝানোর ফলে এই যতি—চতুর্থ ও নবম অক্ষরে দেখানো হয়েছে]

সুদশনশালিনী, ওগো সুভাষিণী, যে-বৃত্তের প্রথম তিনটি অক্ষর (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়), অষ্টম, দশম এবং শেষের দুটি অক্ষর (দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ) গুরু হয়, আর যতি থাকে মহেশের নেত্র ও দিকের সংখ্যা দিয়ে, তবে সে-বৃত্তকে **প্রহর্ষিণী** বলে জানবে।

[তের অক্ষরের ছন্দ। গণ-ম, ন, জ, র, গ। শ্লোকের 'মহেশনেত্রদিগ্‌ভিঃ' পদ দিয়ে যতি ঠিক করা হয়েছে। মহেশনেত্র তিনটি এবং দিকের সংখ্যা দশটি। তাই যতিও হবে তিন এবং দশ অক্ষরের পর]

প্রিয়ে, অয়ি বিধুমুখী, **বসন্ততিলক** বৃত্ত তাকেই বলে, যে-বৃত্তের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ এবং চতুর্দশ বর্ণ গুরু হয় এবং প্রত্যেক ছয় ও আট অক্ষরের পর যতি হয়।

[চোদ্দ অক্ষরের ছন্দ। গণ–ত, ভ, জ, জ, গ, গ]

অয়ি প্রিয়ে, হে বালা, যে-বৃত্তের প্রথম ছয়টি অক্ষর হবে লঘু, দশম এবং ত্রয়োদশও তাই (লঘু), এবং গিরি আর তুরঙ্গের সংখ্যায় যার যতি তাকেই বলে **মালিনী**, প্রসিদ্ধা সে কবিচিত্তহারিণী।

[মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতের সংখ্যানুসারে গিরিশব্দের দ্বারা ৮ সংখ্যা বোঝায় ; আর তুরঙ্গ শব্দটি সূর্যের সাতটি অশ্বকে বোঝানোর জন্যে ৭ সংখ্যার দ্যোতক। সুতরাং মালিনীবৃত্তের প্রতি চরণে আট ও সাত অক্ষরের পর যতি হবে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ১৫টি। গণ—ন, ন, ম, য, য]

অয়ি সুমুখী, যে-বৃত্তের প্রতিপাদে প্রথম পাঁচটি অক্ষর (প্রথম থেকে পঞ্চম অক্ষর পর্যন্ত), তারপর একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং ষোড়শ অক্ষর লঘু হয়, আর যদি যতি পড়ে রস, বেদ এবং অশ্বের সংখ্যা দিয়ে, তবে ওগো মঞ্জুভাষিণী, জেনো সেই বৃত্ত হবে **হরিণী**।

[মধুর, লবণ, কটু প্রভৃতি ভেদে রস ছয় প্রকার, বেদের সংখ্যা চার এবং অশ্বের সংখ্যা সাত। তাই এ ছন্দে প্রত্যেক পাদে ৬, ৪ এবং ৭ অক্ষরের পর যতি পড়বে। প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১৭টি। গণ–ন, স, ম, র, স, ল, গ]

অয়ি কমলধারিণী, অব্যাজমনোহরতনু! যে-ছন্দে প্রতি চরণের প্রথম বর্ণ লঘু এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্বের তিনটি বর্ণও (অর্থাৎ চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ বর্ণ) লঘু হয় ; আর যদি প্রতিপাদে রস ও ঈশের সংখ্যায় যতি হয় ; তাহলে ওগো শোভনাঙ্গ-জঘনশালিনী, ভোগসুভগা, সে-বৃত্ত হয় **শিখরিণী**।

[রসের সংখ্যা ছয় এবং রুদ্রানুসারে ঈশের সংখ্যা এগারো। অতএব ছয় ও এগারো অক্ষরের পর প্রতিপাদে যতি পড়ে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ১৭টি। গণ–য, ম, ন, স, ভ, ল, গ]

হে ভ্রমরনীলকুন্তলা, প্রিয়ে, কোনো বৃত্তে যদি প্রতি চরণের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ তারপর চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং শেষ অক্ষর অর্থাৎ সপ্তদশ বর্ণ গুরু হয় ; আর যদি গিরীন্দ্র এবং সর্পকুলের সংখ্যা দিয়ে যতি হয়ে থাকে, তাহলে অয়ি গভীরনাভিহ্রদা, সুভ্রু, কান্তে সে বৃত্তের নাম **পৃথ্বী**।

[গিরীন্দ্রের সংখ্যা ধরা হয় ৮টি এবং সর্পকুলের সংখ্যা ৯টি। অতএব প্রতি আট এবং নয় অক্ষরে যতি হয়। প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা ১৭টি। গণ–জ, স, জ, স, য, ল, গ]

অয়ি সতনু, মুগ্ধে, ওগো কুমুদামোদিনী, যে-ছন্দের প্রথম চারটি অক্ষর, দশ, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ অক্ষর গুরু হয়, আর যদি যুগ, রস এবং অশ্বের সংখ্যায় প্রতি পাদে যতি পড়ে, তাহলে ওগো তন্বী, কান্তে, উত্তম কবিরা

সে-বৃত্তকে **মন্দাক্রান্তা** বলে থাকেন।

[যুগের সংখ্যা চার, রসের সংখ্যা ছয় এবং অশ্বের সংখ্যা সাত। অতএব এই ছন্দে প্রতিপাদে চার, ছয় এবং সাত অক্ষরে যতি পড়ে। প্রতি চরণে অক্ষর সংখ্যা ১৭টি। গণ—ম, ভ, ন, গ, গ, য, য]

হে প্রিয়তমা, প্রথম তিনটি বর্ণ, ষষ্ঠ, অষ্টম, তারপর একাদশ, তারপর ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ অক্ষর যে-বৃত্তে গুরু হয়, আরও যদি সূর্য এবং মুনির সংখ্যায় প্রতিপাদে যতি পড়ে, তাহলে ওগো পূর্ণেন্দুবদনা, সে-বৃত্তকে কাব্যরসিকেরা **শার্দূলবিক্রীড়িত** বলেন।

[সূর্যের সংখ্যা বারো (দ্বাদশাদিত্য) এবং মুনির সংখ্যা সাত (সপ্তর্ষি)। অতএব এই ছন্দের প্রতিপাদে বারো এবং সাত অক্ষরে যতি পড়ে। প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১৯টি। গণ—ম, স, জ, ত, ত, গ]

অয়ি মৃগমদতিলকযুক্তা, রম্ভাস্তম্ভের মতো উরুশোভিতা, যে-বৃত্তের প্রতি চরণে প্রথম চারটি বর্ণ, সপ্তম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং শেষ দুটি বর্ণ অর্থাৎ বিশ এবং একবিংশ অক্ষর গুরু আর যদি মুনি, মুনি এবং মুনি—এই তিনবার মুনি সংখ্যায় যতি দেখা যায়, হে সুতনু বালা, তখন সেই প্রসিদ্ধ বৃত্তকে শ্রেষ্ঠ কবিরা **স্রগ্ধরা** বলে থাকেন।

[মুনির সংখ্যা সাত। তিনবার মুনি শব্দটি লিখিত হওয়ায় প্রত্যেক সাত, সাত এবং সাত অক্ষরে যতি হবে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ২১টি। গণ—ম, র, ভ, ন, য, য, য]।

॥ কালিদাস রচিত 'শ্রুতবোধ' সমাপ্ত ॥

ঋতুসংহার

প্রথম সর্গ

গ্রীষ্মকাল

প্রিয়ে! এখন গ্রীষ্মকাল! সূর্য এখন ভয়ংকর, চন্দ্র এখন প্রীতিপদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শুষ্কপ্রায়, অপরাহ্ণ এখন রমণীয় আর কামদেবের প্রভাব এখন স্তিমিত।

প্রিয়ে! গ্রীষ্মে লোকের উপভোগ্য হয় রাত্রিকাল যার অন্ধকারের পুঞ্জ চন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত, কখনও জলযন্ত্রযুক্ত বিচিত্র ধারাগৃহ, (চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি) নানাপ্রকার মণি আর চন্দনের আর্দ্রতা।

গ্রীষ্মের রাত্রিতে রসিক পুরুষেরা সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যতল, দ্রুত শ্বাসপ্রবাহে প্রকম্পিত কামোদ্দীপক প্রিয়ার অধরসুধা, সুরা এবং তন্ত্রীর লয়সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে।

সূক্ষ্মবস্ত্র ও মেখলায় মণ্ডিত যাদের নিতম্ব, হার ও চন্দনে যাদের স্তন অলংকৃত, স্নানে ব্যবহার্য নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে যাদের কেশ সুবাসিত সেই রমণীরা রসিক পুরুষের গ্রীষ্মতাপের উপশম করে।

যাদের চরণ লাক্ষারসের লালিমায় সুরঞ্জিত এবং নূপুরযুক্ত, যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হংসধ্বনির অনুসরণ করে যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই কামিনীরা পুরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে।

চন্দনের রসে চর্চিত এবং তুষারের মতো শুভ্র উৎকৃষ্ট হারে মণ্ডিত স্তন, আর সুবর্ণমেখলায় পরিবেষ্টিত নিতম্ব কার চিত্তকে আকুলিত না করে।

উন্নত স্তন নিয়ে সেই যুবতী রমণীদের শরীরের সন্ধিস্থানগুলি ঘর্মজলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্থূল বসন বর্জন করে এখন সূক্ষ্ম বসনে স্তন আচ্ছাদিত করে।

চন্দনজলে সিক্ত তালবৃন্তের বাতাসে, হারবেষ্টিত স্তনমণ্ডলের উপহারে এবং বীণাতন্ত্রীর কলধ্বনিময় সূক্ষ্ম সঙ্গীতের শব্দে সুপ্ত কামদেব এখন যেন জাগরিত হয়।

রাত্রিকালে ধবল অট্টালিকায় সুন্দরী রমণীরা সুখে নিদ্রা যায়। প্রবল উৎকণ্ঠায় চাঁদ বহুক্ষণ তাদের মুখ নিরীক্ষণ করে যেন লজ্জা পেয়েই রাত্রিশেষে পাণ্ডুর হয়ে যায়।

প্রিয়ার বিচ্ছেদের আগুনে প্রবাসী পুরুষের হৃদয় এমনই দগ্ধ হয় যে প্রবল বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জে ব্যাপ্ত এবং সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীর পানে দৃষ্টিদানেও তারা সমর্থ হয় না।

সূর্যের খরতাপে-দগ্ধ হরিণের তালু প্রবল তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়ে যায়। দলিত কাজলের মতো নীল আকাশ নিরীক্ষণ করে জলের আশায় সে ছুটে চলে বন থেকে বনান্তরে।

চাঁদ যার সুন্দর অলঙ্কার সেই-সন্ধ্যার মতো বিলাসিনী রমণীরা চাঁদের মতো মনোরম অলংকারে সজ্জিত হয়ে বিলাসপূর্ণ মৃদু হাসি ও কুটিল দৃষ্টিপাতে প্রবাসী পুরুষের হৃদয়ে কাম উদ্দীপিত করে।

সূর্যের কিরণে ভীষণ উত্তপ্ত সাপ পথে গরম ধুলোয় বিশেষভাবে দগ্ধ হয়ে নতমুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁকাপথে চলতে চলতে ময়ূরের তলায় আশ্রয় নেয়।

প্রবল তৃষ্ণায় সিংহের পরাক্রমের উদ্যোগ থাকে না। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, দূর থেকেই তার মুখ বিস্ফারিত হয়ে থাকে, জিহ্বা চঞ্চল হয়, কেশরের অগ্রভাগ কাঁপিতে থাকে। কাছের হাতিকেও পশুরাজ হত্যা করে না।

সূর্যের কিরণে তাপিত হাতির শুকনো গলায় জলকণা উদ্গত হয়। প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হাতি জলের অন্বেষণে সিংহকেও ভয় পায় না।

যজ্ঞীয় অগ্নির মতো সূর্যের তেজে ময়ূরের শরীর এবং চৈতন্য অবসন্ন। কলাপের-তলে-মুখ-রেখে-অবস্থিত সাপকে কাছে পেয়েও তারা হত্যা করে না।

যে-সরোবরে ভদ্রমুস্ত-মূল আছে তার শুকনো পাঁক শূকরেরা লম্বা মুখের অগ্রভাগ দিয়ে এমনভাবে খোঁড়ে যে মনে হয় সূর্যের প্রখর রৌদ্রে অত্যন্ত তাপিত হয়ে তারা ভূগর্ভে প্রবেশ করছে।

সূর্যের অত্যন্ত তীক্ষ্ন কিরণে তাপিত মণ্ডূক পঙ্কিল-জলে-পূর্ণ জলাশয় থেকে লাফিয়ে উঠে পিপাসায় আকুল হয়ে সাপের ফণার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

দল বেঁধে একে অন্যকে আঘাত করে হাতিরা সরোবরের সমস্ত মৃণাল তুলে ফেলে এবং ঘন-মর্দনে সরোবর কর্দমাক্ত করে। মাছেরা বিপদে পড়ে এবং সারসেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

সাপের মাথায় মণির তেজ সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত। চঞ্চল দুটি জিভ দিয়ে সাপ বায়ু পান করে। বিষ, আগুন ও সূর্যরশ্মিতে তাপিত এবং তৃষ্ণায় আকুল সাপ মণ্ডূকদের হত্যা করে না।

মহিষীদলের ফেনাযুক্ত, চঞ্চল, দীর্ঘ এবং উপর-দিকে-প্রসারিত মুখ থেকে আরক্ত জিভ বেরিয়ে আসে। পিপাসায় কাতর হয়ে জলের অন্বেষণে তারা পর্বতের গুহা থেকে নির্গত হয়।

অত্যন্ত প্রখর দাবানলে শস্যের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। রুক্ষ বাতাসে শুকনো পাতা উপরে ওড়ে। সূর্যের তাপে চারিদিকে জল শুকিয়ে যায়। উঁচু জায়গা থেকে নিরীক্ষণ করলে অরণ্য ভয়ের উদ্রেক করে।

পাতা-ঝরা গাছে বসে পাখিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্লান্ত বানরগুলি পর্বতের লতাকুঞ্জে প্রবেশ করে। গবয়ের দল জলের আশায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঋজুদেহী শরভের দল কূপ থেকে জল তোলে।

প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত অগ্নি তীরস্থিত তরু ও লতার আলিঙ্গনে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

দিকে দিকে অগ্নির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত নতুন কুসুম্ভফুলের মতো নির্মল-সিঁদুরের-কান্তিবিশিষ্ট বনভূমি সত্বর দগ্ধ হয়ে যায়।

বাতাসের সংযোগে বৃদ্ধি পেয়ে দাবানল পাহাড়ের গুহায় জ্বলতে থাকে। শুকনো বাঁশবনের মধ্যে জোরালো শব্দে প্রকাশিত হয়, অল্প সময়েই বেড়ে উঠে তৃণভূমিতে প্রবেশ করে। বনপ্রান্তে সঞ্চারিত বহ্নি হরিণদের ব্যাকুল করে তোলে।

শিমুলগাছের বনে আগুন যেন আরও বেড়ে ওঠে। গাছের কোটরে আগুন সোণার মতো গৌরবর্ণ হয়ে শোভা পায়। বাতাসের কম্পনে উঁচু গাছের ডালে শুকনো পাতায় লেগে দাবাগ্নি বনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দাবাগ্নিতে হাতি, গবয় ও সিংহের শরীর দগ্ধ। আগুনের জ্বালায় পরস্পর শত্রুতা ভুলে বন্ধুর মতো মিলিতভাবে তারা শুষ্ক বনাঞ্চল ও কন্দর থেকে দ্রুত নির্গত হয়ে বিশাল তটদেশযুক্ত নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রিয়ে! তোমার সঙ্গীত সুললিত। জলাশয় এখন পদ্মবনে পরিপূর্ণ। পাটল-কুসুমের গন্ধ এখন রমণীয়, শীতল জলে স্নান এখন সুখপ্রদ, চাঁদের কিরণ এখন উপভোগের বিষয়। সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনিতে মুখরিত হর্ম্যতলে সহচরীদের সঙ্গে তুমি রাত্রিতে এই গ্রীষ্ম সুখেই যাপন কর।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'গ্রীষ্মবর্ণনা' নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় সর্গ

বর্ষাকাল

প্রিয়ে! বর্ষা এলো রাজার মতো। জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘ তার মত্ত হাতি, বিদ্যুৎ তার পতাকা, বজ্রধ্বনি তার মাদল, তার বেশ উজ্জ্বল। প্রার্থীজনের প্রিয় রাজার মতো কামিজনের প্রিয় বর্ষাকাল।

সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সে মেঘের শোভা গাঢ় নীলপদ্মের পাতার মতো, কোথাও পুঞ্জীভূত দলিত কাজলের মতো, কোথাও গর্ভবতী রমণীর স্তনের মতো।

তৃষ্ণায় আকুল চাতকপাখির দল মেঘের কাছে জল চায়। সে-মেঘ জলের ভারে অবনত। অজস্র জলের ধারা বর্ষণ করে ও শ্রুতিমধুর শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে ভেসে চলে মেঘ।

মেঘেরা ধারণ করে ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ তার ধনুর্গুণ। বজ্রপাতের শব্দ তাদের মাদল। সুতীক্ষ্ন ধারাপাতের তীব্র শরাঘাতে প্রবাসী মানুষের চিত্ত বড় ব্যথিত করে।

খণ্ড খণ্ড নীলকান্তমণির মতো তৃণাঙ্কুরে, সদ্যোজাত কন্দলীগাছের পাতায় এবং ইন্দ্রগোপ-কীটে সমাচ্ছন্ন পৃথিবী এখন রঙিন রত্নে অলংকৃত সুন্দরী ললনার মতো শোভা পায়।

মেঘের মনোরম গর্জনে সব সময়েই উল্লসিত ময়ূর-ময়ূরীর দলকে এখন প্রসারিত কলাপের শোভায় সুন্দর দেখায়। চুম্বন-আলিঙ্গনের চেষ্টায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং নৃত্য করে।

নদীগুলি পঙ্কিল জলরাশি নিয়ে দুই পাড়ের গাছগুলি উপড়ে ফেলে প্রবল বেগে অতিদুষ্ট বিভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মতো ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে দ্রুত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

হরিণীর মুখের টানে তৃণপুঞ্জ ছিন্ন, কোমল-অঙ্কুরে-শোভিত, নবপল্লবসজ্জিত বিচিত্রনীল বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য চিত্ত হরণ করে।

চঞ্চল নীলপদ্মের মতো নয়নের শোভা যাদের মুখে সেই চকিত হরিণের সমাবেশে চারদিকে পরিব্যাপ্ত সৈকতময় বনভূমি আকুলতা জাগিয়ে তোলে।

যখন মুহুর্মুহুঃ মেঘের গম্ভীর গর্জনে অন্ধকার ঘনীভূত সেই রাত্রিতেও বিদ্যুতের প্রভায় পথ চিনে অভিসারিকা নায়িকা চলে ভালোবাসার আকর্ষণে।

মেঘের ঘোর গম্ভীর গর্জনে এবং বিদ্যুতের চমকে চকিত চিত্তে রমণীরা শয্যায় অপরাধী স্বামীকেও গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

প্রবাসী পুরুষের প্রিয়তমার নীলপদ্মের মতো চোখের বিন্দু বিন্দু জলে বিম্বফলের মতো সুন্দর কোমল অধর সিক্ত হয়ে যায়। নিরাশ হয়ে তারা ফুলের মালা, আভরণ এবং সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন পরিহার করে।

কীটপোকা, ধুলো এবং তৃণের মিশ্রণে পাণ্ডুবর্ণ নববর্ষার জল সাপের মতো তির্যক গতিতে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে বয়ে চলে। মণ্ডূকের দল সভয়ে তা নিরীক্ষণ করে।

শ্রুতিমধুর গুঞ্জনকারী মূর্খ ভ্রমর উৎকণ্ঠাবশে ফুল-পাতা-ঝরা পদ্মবন বর্জন করে নতুন পদ্মের আশায় নৃত্যরত ময়ূরের চক্রাকার কলাপের উপরে উড়ে পড়ে।

নবীন মেঘের গর্জনে হাতিরা মদমত্ত হয়ে মুহুর্মুহুঃ শব্দ করে। তাদের কপোল দেশে নির্মল পদ্মফুলের আভা এবং ভ্রমরের দল ও মদজলে সে-স্থল আচ্ছাদিত হয়ে থাকে।

যাদের শিলাখণ্ডে সাদা পদ্মের মতো মেঘের চুম্বন, চারদিক নির্ঝরে পরিব্যাপ্ত এবং নৃত্যরত ময়ূর-ময়ূরীতে মুখরিত সেই পর্বতগুলি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে।

কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কেতকী গাছগুলিকে কাঁপিয়ে তুলে, তাদের ফুলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে এবং জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে বাতাস কার চিত্তকে উৎকণ্ঠিত না করে!

কামিনীরা নিতম্ব পর্যন্ত লম্বিত কেশদাম, কর্ণ ও মস্তকের আভরণের সুগন্ধি কুসুম, হারসমন্বিত স্তনদেশ এবং সুরাপূর্ণ মুখমণ্ডলের শোভায় বিলাসী পুরুষের অনুরাগ জাগিয়ে তোলে।

বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুতে সুশোভিত এবং জলভারে অবনত মেঘদল, আর মেখলা ও মণিময় কর্ণাভরণে সুসজ্জিত রমণীগণ একই সঙ্গে প্রবাসীজনের চিত্ত হরণ করে।

রমণীরা কদম্ব, সদ্য-ফোটা বকুল ও কেতকী ফুলের মালা গেঁথে মাথায় দেয়, আর অর্জুন গাছের কুঁড়ি দিয়ে পছন্দমতো গয়না তৈরি করে পরে।

সন্ধ্যালগ্নে বধূরা অঙ্গে প্রচুর অগুরু চন্দনের প্রলেপ দেয় এবং ফুলের গয়না পরে কেশ সুবাসিত করে। মেঘের গর্জন শুনে তাড়াতাড়ি তারা গুরুজনের কক্ষ ত্যাগ করে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

নীলপদ্মের পাতার মতো নীল এবং জলভারে অবনত অত্যুচ্চ মেঘমালা মৃদু বাতাসে কম্পিত হয়ে আস্তে আস্তে ভেসে চলে, সঙ্গে আছে ইন্দ্রধনু। স্বামীবিরহে উৎকণ্ঠিত পথিকবধূর হৃদয় যেন ঐ মেঘ হরণ করে নেয়।

নবীন জলে বনান্তের উত্তাপ দূর হয়। চারদিকে কদম্ববৃক্ষের প্রস্ফুটিত কুসুম-সম্ভারে সে যেন আনন্দিত। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় কম্পনে বনান্ত যেন নৃত্য করে। কেতকীফুলের কাঁটায় কাঁটায় যেন তার হাসি দেখা যায়।

মেঘে পরিপূর্ণ এই বর্ষাকাল পতির মতো বধূদের মাথায় নবপ্রস্ফুটিত মালতী ফুল ও যূথিকার কুঁড়ি সহযোগে বকুলফুলের মালা রচনা করে এবং নবপ্রস্ফুটিত কদম্বফুলে বধূদের কানের অলঙ্কার তৈরি করে।

নারীকুল উন্নত বর্তুল পয়োধর-যুগলের অগ্রভাগে হার ধারণ করে, প্রশস্ত নিতম্বদেশে সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে। নবীন বৃষ্টির কণায় তাদের ত্রিবলীযুক্ত কটিদেশে রোমাঞ্চ উদ্গত হয়।

নবীন জলকণার স্পর্শে শীতল বায়ু ফুলের ভারে অবনত বৃক্ষে কম্পন জাগায় এবং কেতকীফুলের পরাগের স্পর্শে সুবাসিত হয়ে প্রবাসী জনের চিত্ত হরণ করে।

জলভারে অবনত আমাদের আশ্রয়স্থল এই বিন্ধ্যপর্বত এই কারণেই জলের ভারে অবনত মেঘগুলি অত্যন্ত প্রখর গ্রীষ্মবহ্নির শিখায় অতিশয় উত্তপ্ত বিন্ধ্যপর্বতকে জল-বর্ষণের দ্বারা যেন আনন্দিত করে।

বিবিধগুণের সমবায়ে রমণীয়, অবলাজনের চিত্তহারী, বৃক্ষ, শাখা ও লতার অবিচল মিত্র, প্রাণিকুলের প্রাণস্বরূপ এই বর্ষাকাল তোমার সতত অভিলষিত কল্যাণ বিধান করুক।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'প্রাবৃট্‌বর্ণনা' নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় সর্গ

শরৎকাল

কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে।

কাশফুল পৃথিবীকে, চাঁদ রাত্রিকে, হাঁসের পাল নদীর জলকে, কুমুদফুল জলাশয়-গুলিকে, ফুলের-ভারে-নুয়ে-পড়া ছাতিমগাছ বনপ্রান্তগুলিকে এবং মালতীফুল উদ্যানসমূহকে সাদা করে তোলে।

চঞ্চল পুঁটিমাছের সুন্দর মালার মতো যাদের মেখলা, প্রান্তে-বসে-থাকা সাদা হাঁসের মালার মতো যাদের হার এবং বিশাল তটপ্রান্তের মতো যাদের নিতম্ব সেই যৌবন-বিলাসিনী নারীদের মতো নদীরা এখন মন্থর গতিতে চলে। (চঞ্চল পুঁটিমাছের সুন্দর মালা নদীগুলির চন্দ্রহার, এক-প্রান্তে-বসে-থাকা সাদা হাঁসের মালা তাদের হার, বিশাল তটপ্রান্ত তাদের নিতম্ব)।

জলবর্ষণের ফলে হালকা এবং রুপো, শঙ্খ ও পদ্মের ডাঁটার মতো সাদা, শত শত খণ্ডে-বিভক্ত মেঘ বাতাসের বেগে চঞ্চল হয়ে উড়ে চলে। ফলে আকাশকে কোথাও কোথাও রম্য চামরের হাওয়ায় সেবিত রাজার মতো দেখায়।

পুঞ্জীভূত দলিত কাজলের মতো আকৃতির মনোরম আকাশ, বন্ধুকফুলের লালিমায় মণ্ডিত প্রান্তর এবং পাকা ধানে ভরা শস্যক্ষেত্রগুলি জগতে কোন্ যুবকের মনকে উৎকণ্ঠিত না করে।

যার অতি সুন্দর শাখার অগ্রভাগ মৃদু বাতাসে কাঁপে, অজস্র পুষ্প উদ্গত হওয়ায়

যার পাতার অগ্রভাগ কোমল, মত্ত মধুকর যার ক্ষরিত মধু পান করে সেই কাঞ্চনতরু কার চিত্তকে না উদ্বিগ্ন করে !

তারকারাজির উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, মেঘের আবরণশূন্য চাঁদমুখ নিয়ে নির্মল জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম বসন পরে, তরুণী ললনার মতো রজনী প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়।

বালিহাঁসের মুখের আঘাতে যাদের ঢেউগুলি বিক্ষুব্ধ, কলহংস ও সারসেরা যাদের তীরভূমি মুখরিত করে রাখে, পদ্মের রেণুতে আরক্ত সেই নদীগুলি চারপাশের মরালের গুঞ্জনে মানুষের আনন্দ বিধান করে।

নয়নসুখকর এবং আনন্দজনক চাঁদ তার জ্যোৎস্নাধারায় হৃদয় হরণ করে। শীতল জলকণাবর্ষণে সেই চাঁদ পতিবিচ্ছেদের বিষময় শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রমণীকুলের ক্ষীণ অঙ্গ অতিমাত্রায় সন্তপ্ত করে।

যে-বাতাস ফলের ভারে নুয়ে পড়া শালিধানের গাছগুলিকে কাঁপায়, ফুলের ভারে অবনত বড়ো গাছগুলিকে নাচায়, প্রফুল্ল পদ্মের জলাশয়ে পদ্মটিকে নাড়া দেয় সেই বাতাস তরুণ প্রেমিকদের মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করে।

উন্মত্ত মরাল-মরালীতে পরিব্যাপ্ত, স্নিগ্ধ এবং প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মে সুশোভিত সরোবরগুলি প্রভাতের মৃদু বাতাসে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে হৃদয়কে সহসা উৎকণ্ঠিত করে।

এখন আর মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু নেই, আকাশের পতাকা বিদ্যুৎ আর প্রকাশিত হয় না, ঊর্ধ্বমুখে ময়ূরেরা আর আকাশ নিরীক্ষণ করে না।

ময়ূরেরা নাচানাচি বন্ধ করায় কামদেব তাদের ছেড়ে হাঁসেদের মধ্যে আশ্রয় নেন। হাঁসেরা মধুর গান করে। পুষ্পোদ্গমের সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কদম্ব, গিরিমল্লিকা, অর্জুন, শাল ও রক্তকদম্ব গাছকে পরিত্যাগ করে সপ্তপর্ণ তরুকে অবলম্বন করেন।

শিউলিফুলের মনোহর গন্ধে, সুখে উপবিষ্ট পক্ষিকুলের কলধ্বনিতে এবং প্রান্তে অবস্থিত মৃগীকুলের নয়নরূপ নীলপদ্মের শোভায় উপবনগুলি প্রেমিকপুরুষের চিত্তকে ব্যাকুলিত করে।

যে-বাতাস কহ্লার, পদ্ম এবং কুমুদফুলকে বার বার কাঁপিয়ে তোলে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে আরও শীতল হয় সকালবেলায় সেই বাতাস পাতার অগ্রভাগে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুতে কেঁপে ওঠে এবং অতিশয় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে।

পরিপুষ্ট শালিধানের প্রাচুর্যে আচ্ছাদিত ক্ষেত্রের এবং সুখে অবস্থিত অসংখ্য গোবৃন্দের শোভায় মণ্ডিত এবং সারস ও হাঁসের নিনাদে মুখরিত প্রান্তরগুলি মানুষকে আনন্দ দেয়।

ললনাদের সুললিত গমনের অনুকরণ করে হংসকুল, মুখচন্দ্রের কান্তি অনুকরণ করে বিকশিত পদ্ম, মদিরামধুর দৃষ্টিপাত অনুকরণ করে নীলপদ্ম আর সুন্দর ভ্রু-বিলাস অনুকরণ করে ছোট ছোট ঢেউগুলি।

রমণীদের অলঙ্কারমণ্ডিত বাহুর শোভা ধারণ করে ফুলভারে অবনত কিশলয়যুক্ত কৃষ্ণকায় বল্লরী এবং তাদের যে-মৃদুহাসি দন্তচ্ছটায় নির্মল এবং চাঁদের মতো সুন্দর তার শোভা ধারণ করে কঙ্কেলিফুলের-সুষমায়-মণ্ডিত নবমালতী।

রমণীরা নিবিড় ঘন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের অগ্রভাগে তাজা মালতীফুল গ্রহণ করে এবং উৎকৃষ্ট সুবর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণমণ্ডলে নানারকম নীলপদ্ম ধারণ করে।

রমণীরা এখন হৃষ্টচিত্তে চন্দনরসে চর্চিত হারে স্তনমণ্ডল, মেখলায় সুবৃহৎ নিতম্ব এবং সুমধুর ঝঙ্কৃত সুন্দর নূপুরে চরণকমল অলংকৃত করে।

চন্দ্র-তারায় খচিত মেঘমুক্ত আকাশ—প্রফুল্ল কুমুদে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসে সমাকীর্ণ এবং মরকত মণির মতো স্বচ্ছ জলে শোভিত সরোবর অত্যন্ত রমণীয় শোভা ধারণ করে।

শরতে কুমুদের স্পর্শে শীতল বাতাসের প্রবাহ চলে, মেঘশূন্য দিঙমণ্ডল মনোরম হয়ে ওঠে, জলে কোনো মালিন্য থাকে না, ধরনী কর্দমশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রের নির্মল কিরণে ও তারকার বৈচিত্র্যে শোভা পায়।

সুন্দরী যুবতীর মুখের মতো পদ্ম এখন প্রভাতবেলায় সূর্যের কিরণমালায় প্রবুদ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে, প্রবাসী নায়কের বধূর হাসির মতো কুমুদফুলও চাঁদ অস্তমিত হলে ক্ষীণ হয়ে যায়।

নীলপদ্মে প্রিয়তমার কালো চোখের শোভা, মত্ত হাঁসের ডাকে প্রিয়তমার সুবর্ণ মেখলার শব্দ এবং বন্ধুকফুলের মধ্যে প্রিয়তমার অধরশোভা অনুভব করে পথিক পুরুষ এখন জ্ঞানশূন্য হয়ে বিলাপ করে।

কামিনীকুলের মুখমণ্ডলে চন্দ্রের শোভা, মণিময় নূপুরে হংসের মধুর নিনাদ এবং মনোহর ওষ্ঠপ্রান্তে বন্ধুকফুলের সৌন্দর্য স্থাপিত রেখে ভাগ্যবতী শারদলক্ষ্মী অন্য কোথায় চলে যান।

প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, প্রফুল্ল নীলপদ্মের মতো যার চোখ, সদ্যফোটা কাশফুলের মতো শুভ্র বসন যার পরিধানে, এবং কুমুদের মতো রমণীয় যার কান্তি সেই প্রমত্তা কামিনীর মতো এই শরৎকাল তোমাদের মনে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বিধান করুক।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'শরদ্বর্ণনা' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ সর্গ

হেমন্তকাল

হেমন্তকাল উপস্থিত। এখন নতুন পাতার আবির্ভাবে শস্যগুলি সুন্দর দেখায়, লোধ্র-ফুল ফোটে, শালিধান পাকে, পদ্মফুল ম্লান হয়ে যায় এবং শিশির ঝরে।

পীনস্তনী বিলাসবতী রমণীদের কুচমণ্ডল সুন্দর কুংকুমের লোহিত রাগে আরক্ত এবং তুষার, কুন্দফুল ও চাঁদের মতো মুক্তাগুচ্ছে অলংকৃত।

বিলাসিনী রমণীদের করযুগলে বলয় ও অঙ্গদ-অলংকারের সম্পর্ক নেই, নিতম্বে নেই নূতন সূক্ষ্ম পরিধান, উন্নত স্তনমণ্ডলে নেই সূক্ষ্ম বসন।

কামিনীরা রত্নখচিত সুবর্ণময় মেখলায় নিতম্ব ভূষিত করে না এবং পদ্মের শোভাযুক্ত চরণকমলে হংসধ্বনির অনুকারী নূপুর গ্রহণ করে না।

রমণীরা রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগের জন্যে অঙ্গে কৃষ্ণচন্দন লেপন করে, মুখপদ্মে পত্রাবলী রচনা করে, কালাগুরু চন্দনে মস্তক সুরভিত করে।

রতিশ্রমে ক্ষীণ তরুণীদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ। দন্তক্ষতে ওষ্ঠাধর পীড়িত দেখে আনন্দের সময়ে তারা উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে না।

উন্নতস্তনযুক্ত বক্ষভাগের যে-শোভা সেই-শোভা ধারণ করেও হিমকাল যেন স্তনপীড়নের ফলে ক্লিন্ন হয়ে প্রভাতবেলায় তৃণপ্রান্তে লগ্ন শিশিরপাতের মধ্য দিয়ে রোদন করে।

প্রভূত-উৎপন্ন শালিধানে পরিব্যাপ্ত, দলে দলে হরিণীসমাগমে বিভূষিত এবং মনোহর ক্রৌঞ্চনিনাদে মুখরিত প্রান্তরগুলি চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে।

প্রফুল্ল নীলপদ্মে শোভিত, রাজহংসে অলংকৃত সুশীতল নির্মল সলিলে পরিপূর্ণ সরোবরগুলি পুরুষের চিত্ত হরণ করে।

প্রিয়ে! হিমপাতের শীতলতায় পরিপক্ক প্রিয়ঙ্গুলতা বাতাসে অনবরত কাঁপে এবং প্রিয়তমের বিরহে বিলাসিনীর মতো পাণ্ডুর হয়ে যায়।

পুষ্পরসের পরিমলে যাদের মুখ সুবাসিত, নিঃশ্বাসের বাতাসে যাদের অঙ্গ সুরভিত সেই প্রণয়ীযুগল কামরসে জর্জরিত হয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করে নিদ্রা যায়।

নবযৌবনা কামিনীদের দন্তক্ষতচিহ্নিত অধর এবং নখলেখচিহ্নিত স্তনগুলি নির্দয় রতিসম্ভোগের লক্ষণ সূচিত করে।

দর্পণহস্তে কোনো রমণী প্রভাতের রৌদ্রে মুখপদ্ম প্রসাধিত করে এবং প্রিয়তমের রসাস্বাদনে ও দন্তাগ্রের দংশনে বিদীর্ণ অধরোষ্ঠ আকর্ষণ করে নিরীক্ষণ করে।

কোনো রমণী যথেচ্ছ রতিবিহারের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হওয়ায় এবং রাত্রিজাগরণের ফলে নয়নপদ্ম আরক্ত হওয়ায় সূর্যের কোমল কিরণের উত্তাপে নিদ্রা যায়। তার কেশবন্ধন শিথিল হওয়ায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং স্কন্ধদেশে আলুলায়িত।

অপর তরুণীরা যাদের কেশাগ্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফীত ও উন্নত স্তনের গুরুভারে যাদের দেহযষ্টি অবনত, তারা মাথা থেকে সুবাসশূন্য ফুলের মালা ফেলে দিয়ে কেশরচনা করে।

অপর কোনো কামিনী প্রণয়ীর দ্বারা পরিভুক্ত শরীর নিরীক্ষণ করে আনন্দে অধরের সুন্দর শোভা রচনা করে, কৃষ্ণবর্ণের মনোরম কেশগুচ্ছ আলম্বিত হওয়ায় নয়ন কুঞ্চিত করে এবং অঙ্গে নখক্ষতের চিহ্ন থাকায় চোলবস্ত্র পরিধান করে।

অন্য রূপবতী তরুণীরা যারা দীর্ঘক্ষণ রতিক্রিয়ার পরিশ্রমে ক্লান্ত, যাদের দেহযষ্টি শিথিল এবং বিশাল জঘন ও স্তনাগ্রভাগ অত্যন্ত নিপীড়িত তারা অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রলেপ দেয়।

অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল বিবিধ গুণে রমণীয়, রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন অঢেল পাকা শালিধানে পরিপূর্ণ, চারদিকে এখন বকের মেলা। এই হেমন্তকাল সর্বদা তোমাদের সুখ প্রদান করুক।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'হেমন্তবর্ণনা' নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম সর্গ

শীতকাল

হে সুন্দরী! শীত-ঋতুর কথা শ্রবণ কর। এই ঋতু শালিধান ও আখের প্রাচুর্যে মনোহর, এখানে-ওখানে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চের নিনাদ এখন সুন্দর, কাম এখন প্রবল, এ ঋতু রমণীদের প্রিয়।

জানালাবন্ধ গৃহের অভ্যন্তর, আগুন, সূর্যের কিরণ, স্থূল বসন এবং যুবতী রমণীরা এই সময়ে পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

চাঁদের কিরণের মতো শীতল চন্দন, শরতের চাঁদের মতো স্বচ্ছ প্রাসাদতল এবং ঘন তুষারপাতে শীতল বাতাস এখন লোকের চিত্তকে আনন্দিত করে না।

অজস্র তুষারপাতের ফলে শীতল রাত্রিগুলি চাঁদের কিরণে আরও শীতল হওয়ায় এবং পাণ্ডুবর্ণের তারাগুলিতে কদর্যরূপে সজ্জিত হওয়ায় লোকের কাছে উপভোগের বিষয় হয় না।

যাদের মুখপদ্ম সুখপ্রদ সুরাপানে আমোদিত সেই রমণীরা পান, চন্দন ও ফুলের মালা নিয়ে আবেগভরে পর্যাপ্ত অগুরুচন্দনের ধূপে সুবাসিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

মত্তযৌবনা কামিনীরা অপরাধী পতিদের বারবার ভর্ৎসনা করায় তারা ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে কাঁপে। রতিক্রিয়ায় তাদের অভিলাষ আছে দেখে কামিনীরা সব দোষ ভুলে যায়।

নবযৌবনা রমণীরা সারারাত্রি বহুক্ষণ-যাবৎ অত্যন্ত কামাতুরা যুবা-প্রণয়ীদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে রমণক্রিয়ায় লিপ্ত থাকায় রাত্রিশেষে বক্ষদেশে শ্রান্তিবোধে অলসভাবে বিচরণ করে।

মনোরম কাঁচুলিতে স্তনবন্ধন করে, লাল ক্ষৌমবস্ত্রে বক্ষঃস্থল শোভিত করে এবং কেশগুচ্ছের মধ্যে মধ্যে পুষ্প নিবেশিত করে রমণীরা যেন শীতকালকেই ভূষিত করে।

বিলাসী প্রেমিকেরা বিলাসিনী রমণীদের কুঙ্কুমের-রাগে-পীতবর্ণ সুখভোগ্য এবং নবযৌবনের-তাপে-উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে শীতমুক্ত হয়ে নিদ্রা যায়।

রাত্রিতে কামিনীরা উৎফুল্লচিত্তে নায়কদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রতিসুখের উদ্দীপক মত্ততাজনক মনোহর উৎকৃষ্ট সুরা পান করে। তাদের সুগন্ধি নিঃশ্বাসে মদিরার পদ্ম কেঁপে ওঠে।

যার মদিরার উন্মাদনা স্তিমিত হয়েছে এবং স্তনের অগ্রভাগ দয়িতের আলিঙ্গনে কঠিন হয়েছে এমন কোনো কামিনী প্রভাতে স্বীয় কলেবর প্রিয়তম কর্তৃক উপভুক্ত হয়েছে দেখে সহাস্যে শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে অন্য কক্ষে চলে যায়।

কোনো সুন্দরী কামিনী অগুরু চন্দনের ধূপে-সুরভিত কেশপাশ আলুলায়িত করতে করতে সকালবেলায় শয্যা ত্যাগ করে। তার নিতম্ব গুরু এবং কটিদেশ ক্ষীণ, তার কেশপাশের অগ্রভাগ কুঞ্চিত এবং তা থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে।

যাদের সদ্য-জলে-ধোয়া মুখমণ্ডল সোনার পদ্মের মতো সুন্দর, নয়নপ্রান্ত আরক্ত এবং আকর্ণ-বিস্তৃত এবং কেশপাশ কাঁধের উপর আলুলায়িত সেই রমণীরা এখন প্রভাতে গৃহমধ্যে লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করে।

যারা গুরু জঘনভারে পীড়িত, যাদের কটিদেশ ঈষৎ অবনত, যারা স্তনভারে কাতর হয়ে ধীরগতিতে চলে এমন অন্য তরুণীরা সত্বর কামক্রীড়ার উপযোগী রাত্রিকালীন পরিধেয় পরিত্যাগ করে দিনের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে।

স্তনের অগ্রভাগ নখক্ষতের চিহ্নে পরিব্যাপ্ত দেখে এবং কচিপাতার মতো ওষ্ঠপ্রান্তে দন্তক্ষত স্পর্শ করে তরুণীরা অভীষ্ট এই রসে আনন্দ উপভোগ করে এবং সূর্যোদয়ে মুখের প্রসাধন করে।

এখন গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু শালিধান ও আখে এই ঋতু রমণীয়। রতিক্রিয়া এখন প্রবল। কামদেব এখন গর্বিত। যাদের প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন সেই রমণীদের কাছে এই ঋতু মনোবেদনার কারণ। এই শীতকাল সর্বক্ষণ তোমাদের কল্যাণময় হয়ে উঠুক।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'শিশিরবর্ণনা' নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ সর্গ

বসন্তকাল

প্রিয়ে! কামাসক্ত লোকদের অন্তর বিদ্ধ করার জন্যে সেনাপতি বসন্তকাল সমাগত। বিকশিত আম্রমুকুল তার তীক্ষ্ণ শর এবং ভ্রমরশ্রেণী তার সুন্দর ধনুকের গুণ।

প্রিয়ে! বসন্তে সবই অত্যন্ত সুন্দর! এখন গাছে গাছে ফুল, জলের মাঝে পদ্ম, কামিনীরা কামাতুরা, বাতাস সুগন্ধি, সন্ধ্যাকাল সুখপ্রদ এবং দিনগুলি রমণীয়।

এই বসন্তকাল দীঘির জলের, মণিময় মেখলার, চাঁদের কিরণের, রমণীদের এবং কুসুমিত সহকারতরুর সৌভাগ্য এনে দেয়।

বিলাসিনী রমণীদের কুসুম্ভফুলের রসে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম বসনে নিতম্ব এবং কুঙ্কুমের রঙে গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্রে স্তন অলংকৃত হয়।

রমণীদের কানে অলঙ্কারের উপযোগী কর্ণিকার ফুল এবং চঞ্চল নীল কুন্তলে অশোক এবং বিকশিত নবমল্লিকা ফুল শোভা পায়।

যাদের অন্তর কামে পীড়িত, সেই-নিতম্বিনী রমণীদের স্তনে শ্বেত চন্দন মাখানো হার, হাতে বলয় ও অঙ্গদ-অলঙ্কার এবং নিতম্বে চন্দ্রহার শোভা পায়।

বিলাসিনী রমণীদের পত্রাবলী-আঁকা সোনার পদ্মের মতো মুখে রত্নরাজির মধ্যে মুক্তোর মতো রমণীয় বিন্দু বিন্দু ঘাম ছড়িয়ে পড়ে।

কামিনীদের কামাকুল কলেবরে ঘন ঘন শ্বাস ওঠে, বসনের বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়। এ সময়ে প্রিয়তম কাছে থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অনঙ্গের প্রভাবে রমণীদের শরীর কৃশ, পাণ্ডুর এবং অলস হয়ে যায়। তাদের ঘন ঘন হাই ওঠে এবং তাদের শরীরে লাবণ্যের জোয়ার আসে।

কামিনীদের মদিরাজনিত অলস চোখে চঞ্চল হয়ে, কপোলতলে পাণ্ডুর হয়ে, স্তনে কঠিন হয়ে, কটিদেশে ক্ষীণ হয়ে এবং নিতম্বে স্থূল হয়ে—তাদের শরীরে এখন কামদেব বহুধা অবস্থান করেন।

কামদেবের প্রভাবে কামিনীদের অঙ্গ তন্দ্রার আলস্যে উদ্‌ভ্রান্ত, সুরাপানের মত্ততায় বাক্য ঈষৎ মদালস এবং দৃষ্টিপাত ভ্রূকুটিকুটিল।

সুরাপানের মত্ততায় অলস বিলাসিনী রমণীরা শুভ্র স্তনে শ্যামালতা, কৃষ্ণচন্দন ও কুঙ্কুমমিশ্রিত এবং মৃগনাভিযুক্ত চন্দন লেপন করে।

কামনার মত্ততায় যাদের অঙ্গ অলস সেই যুবক-যুবতীরা সত্বর স্থূল বসন বর্জন করে লাক্ষারসে রঞ্জিত এবং সুগন্ধি অগুরু চন্দনের ধূপে সুবাসিত সূক্ষ্ম বসন পরিধান করে।

আম্রমুকুলের রসে মাতাল পুরুষকোকিল অনুরাগের পুলকে কোকিলবধূকে চুম্বন করে। পদ্মের মাঝে কূজনরত ভ্রমরও প্রিয়ার কাছে মধুর চাটুবাক্য শোনায়।

তাম্রবর্ণের কচিপাতার গুচ্ছে যারা অবনত, যাদের সুন্দর শাখাগুলি পুষ্পিত—সেই আম্রতরুগুলি যুবতীদের অন্তর উৎকণ্ঠিত করে।

প্রবালের মতো তাম্রবর্ণের ফুল এবং পাতায় আগাগোড়া শোভিত অশোকতরু নিরীক্ষণ করে নবযৌবনা যুবতীদের হৃদয় শোকাকুল হয়ে ওঠে।

মত্ত ভ্রমরের চুম্বনে যার ফুল রমণীয়, মৃদু বাতাসের আকুলতায় যার কোমল কচি

পাতা অবনত সেই মনোরম আম্রমুকুল দেখে দেখে কামিনীদের মন অকস্মাৎ অস্থির হয়ে যায়।

প্রিয়ে! প্রিয়ার মুখের মতো যাদের কান্তি কুরবক গাছের সেই সদ্যোজাত পাতার গুচ্ছের অতি সুন্দর শোভা দর্শন করে কোন্ সহৃদয় কন্দর্পের শরক্ষেপে ব্যথিত না হয়?

বাতাসে কম্পিত, ফুলের ভারে অবনত এবং জ্বলন্ত আগুনের মতো দীপ্তিমান পলাশের বনে সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী বসন্তে রক্তবসনা নববধূর মতো শোভা পায়।

সুন্দরীনিহিত যুবকদের হৃদয় শুকপাখির মুখের মতো সুন্দর পলাশ ফুলে কি ছিন্ন হয় নি? কর্ণিকার ফুলে কি দগ্ধ হয় নি? তবে কেন এই কোকিল অনবরত মধুর রবে আবার তাদের হৃদয়কে আঘাত করছে?

আনন্দে মুখর পুরুষকোকিলের অব্যক্ত মধুর স্বরে এবং মত্ত ভ্রমরের উমদমধুর গুঞ্জনে বিনয় ও লজ্জায় অবনত বধূদের হৃদয় শ্বশুরগৃহেও ক্ষণে ক্ষণে আকুল হয়ে ওঠে।

বসন্তে শিশিরপাত বন্ধ হওয়ায় বাতাস মনোরম। সে-বাতাস সহকারতরুর কুসুমিত শাখাগুলি কম্পিত করে, কোকিলের কুহুধ্বনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং পুরুষের হৃদয় হরণ করে।

বিলাসবতী বধূর হাসির মতো সাদা কুন্দফুলে উদ্ভাসিত মনোহর কাননগুলি অনুরাগশূন্য মুনির চিত্তকেও হরণ করে, বাসনামলিন যুবকদের চিত্তকে তো আগেই হরণ করেছে।

বসন্তকালে রমণীদের স্বর্ণমেখলা আলম্বিত, স্তনদেশে হার শোভিত এবং দেহযষ্টি কন্দর্পের প্রভাবে শিথিল। কোকিল ও ভ্রমরের সুমধুর গুঞ্জনের প্রভাবে সেই-রমণীরা পুরুষের হৃদয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

যাদের প্রান্তভাগ বিবিধ মনোহর পুষ্পবৃক্ষে শোভিত, যাদের সানুদেশ আনন্দিত কোকিলের কুহুরবে মুখরিত, যাদের শিলাতলগুলি সারি সারি শৈলেয়বৃক্ষে আচ্ছাদিত সেই পর্বতগুলি দেখে সকলে আনন্দ পায়।

স্ত্রীর বিচ্ছেদে যার হৃদয় কাতর সেই পথিক কুসুমিত সহকারতরু দেখে চোখ বোজে, কেঁদে ওঠে, শোক করে, হাত দিয়ে নাক বন্ধ করে এবং উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে।

উন্মত্ত ভ্রমর ও কোকিলের ঝঙ্কারে এবং কুসুমিত আম্র ও কর্ণিকার তরুতে রমণীয় বসন্তকাল মানিনীদের অন্তরে মদনকে উদ্দীপিত করার জন্যে যেন অতি তীক্ষ্ন শরের আঘাত হানে।

সুন্দর আম্রমঞ্জরী যার উৎকৃষ্ট বাণ, সুন্দর পলাশফুল যার ধনুক, ভ্রমরশ্রেণী যার ধনুকের গুণ, চাঁদ যার নিষ্কলঙ্ক শ্বেতচ্ছত্র, মলয় বাতাস যার মত্ত হাতি, কোকিল যার বৈতালিক সেই ভুবনবিজয়ী বসন্তসখা অনঙ্গ বার বার তোমাদের মঙ্গল করুন।

॥ ঋতুসংহার কাব্যে 'বসন্তবর্ণনা' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

॥ ঋতুসংহার কাব্য সমাপ্ত ॥

শৃঙ্গারতিলক

কন্দর্পের বাণরূপ অনলে যারা দগ্ধ তাদের জন্যেই বিধাতা রমণীদেহরূপ রম্য সরোবর নির্মাণ করেছেন ; (রমণীর) বাহুদুটিই তার মৃণাল, মুখই তার পদ্ম, লাবণ্যলীলাই তার জল, নিতম্বই তার শিলা-সোপান, (চঞ্চল) নয়নই তার শফরী। কেশকলাপ তার শৈবাল, আর প্রিয়ার স্তন দুটিই তার চক্রবাকমিথুন।

মধুযামিনী এলো, কিন্তু যদি প্রিয় না আসে তবে অনলে (মদনানলে) প্রাণ যাক! যদি আবার জন্ম নিই তাহলে প্রার্থনা করি যেন কোকিলের মুখ বন্ধ করার জন্যে ব্যাধ হই, চাঁদকে ধ্বংস করার জন্যে যেন রাহু হই, কামদেবের পক্ষে যেন শিবনেত্রের দীপ্তি হই, আর প্রাণনাথের পক্ষে যেন হই স্বয়ং কামদেব।

হে সখী! তোমার কপোলতলে কস্তুরীরচিত পত্ররচনা ঠিক তেমনই আছে—ভ্রষ্ট হয় নি, স্তনতটে চন্দন মুছে যায় নি, অধরে তাম্বুলরাগও স্খলিত হয় নি। ব্যাপার কী? তুমি কুপিতা হয়েছিলে (অর্থাৎ), না কি তোমার পতি নিতান্ত বালক?

সখী! এ সবের কারণ শোন। তোমাকে সব খুলে বলছি। রতিগৃহে গিয়ে আমি কুপিতা হই নি, আমার প্রিয়তমও বালক নয়। নবযৌবনা, সচকিতা এবং কন্দর্পগর্বহারিণী আমাকে দেখামাত্র (প্রবাসপ্রত্যাগত) তার শুক্রপাত হল। তাই রতিক্রিয়ার কোনো প্রসঙ্গই ওঠে না।

তা ছাড়া, তিনি (প্রবাস থেকে) ফিরে এলেন বলে দীর্ঘ সময় বিদেশের নানা কথাপ্রসঙ্গে অর্ধেক রাত কেটে গেল। তারপর যেই আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ কেবল শুরু করেছি অমনি পূর্বদিক সপত্নীর মতো রক্তাভ হয়ে উঠল।

॥ প্রথম তিলক সমাপ্ত ॥

প্রিয়া! বিধাতা পদ্ম দিয়ে নয়ন, কুন্দফুল দিয়ে দন্ত, নবপল্লব দিয়ে অধর এবং চম্পকদল দিয়ে অঙ্গ নির্মাণ করে, কেন পাষাণ দিয়ে হৃদয় নির্মাণ করলেন?

পদ্মদলের উপরে একটি খঞ্জনকে যে দেখে সে (রাজোচিত) চতুরঙ্গ সেনার আধিপত্য লাভ করে, আর আমি তোমার মুখপদ্মের উপর তোমার নয়নরূপ দুদুটি খঞ্জন দেখলাম। জানি না, এ দৃশ্য আমাকে কোন্ সৌভাগ্যের অধিকারী করবে।

শৃঙ্গাররসাষ্টক

যেখানে সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না, যা সমস্ত গুণের অতীত এমন একটি বস্তুকেই এ সংসারে কোনো কোনো জড়বুদ্ধি লোক মোক্ষ বলে থাকে। আমার মতে কিন্তু মদনহাস্যে মধুর তারুণ্যতরঙ্গিত রতিরম্য মদির নয়ন যার এমন তরুণীর নীবিবন্ধনের মোক্ষই (মোচনই) প্রকৃত মোক্ষ।

কবে সুবাসিত রম্যগৃহে শুয়ে প্রিয়ার স্তন দুটি বুকে নিয়ে 'ওগো প্রিয়! ওগো মুগ্ধা, ওগো কুটিল-নয়না, ওগো চন্দ্রাননা, প্রসন্ন হও'—এ কথা বলতে বলতে নিমেষে রাত কাটিয়ে দেব!

এখন তো সন্ধ্যা, সূর্য তো এখন ওঠে না। চাঁদের কিরণও তো এত প্রখর হয় না। আকাশে কি দাবানল জ্বলে উঠল না কি? নির্মল আকাশে বজ্রাগ্নিই বা আসবে কোথা থেকে? ও বুঝেছি, বিরহিণী পথিকবধূর প্রাণবায়ু সেবনের আশায় রাত্রিরূপিণী সাপিনী ছুটে আসছে। এ তারই ফণা থেকে ঠিকরে-পড়া আলো।

রাতে প্রিয়াবিচ্ছেদে বিধুর চক্রবাক আসছে, যাচ্ছে, জলে পড়ছে, পদ্মাঙ্কুরগুলি নাড়া দিয়ে খুঁজে দেখছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, পাগলের মতো ঘুরছে এবং মৃদুমন্দ গুঞ্জন করছে।

ভ্রমরদল পদ্মে এসে বসায় ছায়া হয়েছে। তাই সন্ধ্যা না হলেও সন্ধ্যা ভেবে প্রিয়াবিচ্ছেদে ভীরু চক্রবাক দিনকে রাত বলে মনে করছে। তাই খাবার জন্যে যে বাঁকাপদ্মের নালটি সে ভেঙেছিল, চাঁদ মনে করে সে আর তা মুখে তুলছে না। তৃষ্ণার্ত হয়েও পাতার উপরকার জলবিন্দুকে তারা মনে করে তা আর পান করছ না।

সুগন্ধে ভরপুর সোনার বরণ কেতকীকে জগতে সকলেই জানে। পদ্মভ্রমে সেই কেতকীর মধ্যে এসে পড়ল ভ্রমর। পরাগে তার চোখ হল অন্ধ, কাঁটায় তার পাখা গেল ছিঁড়ে। হে সখা, এ অবস্থায় সে থাকতেও পারছে না যেতেও পারছে না।

তাঁকে (শিবকে) দেখে তিনি (পার্বতী) কাঁপতে লাগলেন। তার (তপস্যায়) ক্ষীণ দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। ফেলবার জন্যে পা তুলে তিনি তা তুলেই রইলেন। পথে শিলায় প্রতিহত হলে নদী যেমন অস্থির হয়, তিনিও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন—এগোতেও পারলেন না, স্থির হয়েও থাকতে পারলেন না।

রতিশ্রমে যাদের অঙ্গ পীড়িত প্রিয়বাহুপাশে বাঁধা পড়ে এখনও যারা নিদ্রিতা তারা শিগগিরই বাড়ি ফিরে যাক, সূর্য উঠছে যে! কাকেরা ইঙ্গিতে এ কথা বলবার জন্যেই যেন কা কা করছে (অর্থাৎ কে কে এখনও নিদ্রিতা!)

হে মুগ্ধা। যারা দৈবাৎ কমলে একটি খঞ্জন দেখে সেই ভাগ্যবানেরা প্রসিদ্ধি লাভ করে বহু ভূমির অধিকারী হয়। কিন্তু তোমার মুখপদ্মে নয়নরূপ দুটি খঞ্জন যারা দেখে তারা মদনবাণবর্ষণে বিকল হয়। কী অদ্ভুত!

হে প্রিয়া! অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ কর, বাইরে থেকো না। চন্দ্রের রাহুগ্রাসের সময় এটা। তোমার মুখের বিপুল লাবণ্য দেখে পূর্ণচন্দ্র ত্যাগ করে সে তোমার মুখচন্দ্রকেই গ্রাস করবে।

॥ দ্বিতীয় তিলক সমাপ্ত ॥

হে কুম্ভ-বর! তোমাকে বহুবার শুকনো কাঠে আঘাত করা হয়েছে, প্রচণ্ড তাপ সহ্য করেছ তুমি, তারপর দেহে পঙ্ক লেপন করে আগুনে পোড়ানো হয়েছে তোমাকে। এ সবই তোমার পক্ষে বরণীয়ই বলব, কারণ তুমি প্রিয়ার স্তনতটে লালিত হয়ে তার বাহুলতার হিল্লোলে লীলাসুখ ভোগ করছ। দুঃখ বিনা কি সুখলাভ হয়?

নির্লজ্জ! কেন কাছে ঘেঁসে জোর করে আমার মুখচুম্বন করছ? লজ্জা করে না? আমার আঁচল ছাড়ো, ছেড়ে দাও বলছি। ধূর্ত! বাগাড়ম্বর-সার শপথের আর দরকার নেই। কাল সারা রাত জেগে আমি ক্লান্ত। সেই (নবীনা) প্রিয়ার কাছেই যাও। ফেলে দেওয়া (শুষ্ক) নির্মাল্য-কুসুমে কি আর ভ্রমরেরা লুব্ধ হয়?

॥ তৃতীয় তিলক সমাপ্ত ॥

হে পথিক। আমার স্বামী বাণিজ্যে গিয়েছেন, তাঁর খবরও পাচ্ছি না। তাঁর মা (আমার শাশুড়ী) মেয়ের ছেলে হওয়ায় আজ সকালে জামাই-বাড়ি গিয়েছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, আমার বাড়িতে রাতে কী করে থাকবে তুমি? এখন সন্ধ্যা। তুমি অন্য কোথাও যাও।

এ রাত ঘন মেঘে ঢাকা পড়ায় ঘোর অন্ধকার। কর্মক্লান্ত আমার পতি নিদ্রামগ্ন। আমি বালিকা—কন্দর্পের ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। এ গ্রামে বড় চোরের উপদ্রব। হে পথিক, ঘুমিও না, ওঠো।

এ বালিকা দেখছি সাক্ষাৎ ব্যাধ, এর ভ্রূ-যুগল ব্যাধের ধনু, আর কটাক্ষ যেন বাণ। আমার মনটা (এই ব্যাধের হাতে) হরিণের মতো হল।

॥ চতুর্থ তিলক সমাপ্ত ॥

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

—ভাই কোথায় চললে?

—বৈদ্যের বাড়ি।

—সেখানে কেন?

—রোগের উপশমের জন্যে।

—সর্বরোগহারিণী প্রিয়তমা কি বাড়িতে নেই?—যদি বায়ু হয়ে থাকে কুচকুম্ভমর্দনেই তা যাবে। যদি পিত্ত কুপিত হয়ে থাকে মুখামৃতপানেই তা নিরাময় হবে। আর যদি শ্লেষ্মা হয়ে থাকে; আহ! রতিক্রীড়ার পরিশ্রমেই তা দূর হবে।

হে বালিকা ! হে হরিণায়ত-নয়না ! আমার দিকে তাকাও। বিষই বিষের ওষুধ— এই তো আগেকার জনশ্রুতি।

মদনাগ্নির শিখা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট। বাইরের চন্দনের প্রলেপে কি আর তার জ্বালা কমবে ? পোনের উপরকার পাঁকের প্রলেপ উত্তাপ কেবল বেড়েই যায়, কমে না।

যে-সব মত্ত বারাঙ্গনাদের নয়নের সৌন্দর্য দেখে পরম-কৃতী (নয়নসৌভাগ্যে ভাগ্যবান) কৃষ্ণসারমৃগেরা দেশত্যাগ করেছে, তাদেরই স্তনযুগলের বিশালতার কাছে পরাজিত হয়ে গজেরা এখনও মদমত্ত হয়। মূর্খ বারবার পরাজিত হলেও অভিমান প্রকাশ করে না। (অভিমান করে মুখ লুকোয় না)।

॥ পঞ্চম তিলক সমাপ্ত ॥

ফুলে ফুল ফোটার কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। হে বালিকা, তবে তোমার মুখপদ্মে কেন দুটি পদ্ম দেখছি ?

সুন্দরী ! তোমার এই স্তনদুটি পতিত হল কেন ? এই প্রশ্ন হলে—

—মূর্খ ! দেখ অধঃস্থল উৎখাত হলে পর্বতও ভূমিসাৎ হয়—এই উত্তর হয়।

কামিনীর স্তনমণ্ডলে এক অপূর্ব অগ্নি দেখা যায়। দূর থেকে যা অঙ্গে তাপ দেয়, কিন্তু হৃদয়ে লগ্ন হলেই তা শীতল হয়ে যায়।

হে কমলায়তনয়না ! এই স্তনযুগলকে পতিত দেখে বৃথা পরিতাপ করছ। দেখ, অত্যুন্নত জনতাপকরী সহস্ররশ্মি সূর্যও পতিত হয়, পরকে যারা তাপিত করে তাদের এমনিই হয়ে থাকে, এতে বিস্মিত হবার কী আছে ?

হে কমলনয়না ! আমার উপর সত্যি যদি তোমার ক্রোধ হয়ে থাকে আর তাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহলে আর অন্য কী করবার আছে ? তাহলে আমার দেওয়া আগেকার সেই আলিঙ্গন আর চুম্বনগুলি ফিরিয়ে দাও।

হে কামদেবের আম্রমঞ্জরী ! হে কমলায়ত-চারু-লোচনা ! আমার মন অপহরণ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ ? দেশটা কী অরাজক ?

॥ ষষ্ঠ তিলক সমাপ্ত ॥

হে জীবনবন্ধু ! তুমি সেখানেই (প্রবাসে) কিছুদিন কাটাও। এদেশ সম্প্রতি বাসের অযোগ্য। চাঁদের কিরণও এখানে তাপ দেয়।

হে কল্যাণী ! চন্দনরসে অঙ্গ সিক্ত করে দু-তিন দিন কোনো রকমে কাটাও। ফিরে এসে দুই বাহুতে তোমাকে আলিঙ্গন করে চাঁদের কিরণের চেয়েও বেশী শীতলতা দান করব।

॥ সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

॥ শৃঙ্গারতিলক সমাপ্ত ॥

পুষ্পবাণবিলাস

শ্রীমতী গোপবধূদের স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনে উন্নত স্তনের মর্দনবশতঃ চন্দনরেণু বিগলিত হলেও যিনি (প্রকৃতিসিদ্ধ) সৌরভ বহন করেন, রাত্রি-জাগরণের ফলে রক্তিম আভায় রঞ্জিত যাঁর নয়ন দুটি প্রভাতে কী এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে সেই বেণুরবরসিক কোনো এক জারশ্রেষ্ঠ তোমাদের রক্ষা করুন।

সহস্র যুবতীর সঙ্গে ক্রীড়াশীল নন্দ-নন্দনের যে বিচিত্র চরিত্র ভুবনে বিদিত সেই সব অবলম্বন করে মনোজ্ঞ শৃঙ্গারকাব্য রচনা করতে ইচ্ছুক আমার প্রতি বীণাপাণি প্রসন্ন হোন।

কান্ত দৃষ্টিপথে এলে ভ্রূ-বিলাসিনীর নয়ন দুটি বিকশিত হল, পরে তাকে নির্জন স্থানে পেয়ে তার অঙ্গ পুলকিত হল। কান্ত স্তনগ্রহণে উৎসুক হলে সারা দেহে কম্পোদয় হল, তিনি কণ্ঠে আলিঙ্গন করলে তার দৃঢ়বন্ধ নীবীও বিগলিত হল।

অরবিন্দ-সুন্দর-মুখী এই কুরঙ্গনয়না (কামিনী) কাছের মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে মুখে একটু হাসি নিয়ে চোখের প্রান্ত হাত মেলে আড়াল করে দূর থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে, এক্ষুনি তার তুঙ্গ স্তনাঙ্গন থেকে উত্তরীয়ের সুন্দর আঁচলটি খসে পড়েছে।

সুন্দরী ! দেখ মাধবীলতার মধ্যে এই কুঞ্জগৃহটি ঝরে-পড়া ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। এটি একেবারে নিশ্ছিদ্র। বিলাসিনীরা যদি রতিকালে অস্ফুটধ্বনি করেও ফেলেন, কোকিলের কুহুরবে তা ঢাকা পড়ে যাবে।

বিম্বফল মনে করে তোমার রাঙা ঠোঁট পাখিতে ঠুকরিয়েছে। তুমি আকুল হয়ে ছোটাছুটি করায় তোমার খোঁপাটি এলিয়ে গিয়েছে, ঘামে তোমার মুখের তিলক (অলকাতিলকা) মুছে গিয়েছে। কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তোমার দেহ। আঃ কান ফাটানো কাঁকনধ্বনি তুলে হাত দুটো নাড়তে নাড়তে বনের টিয়াটি ধরবার জন্যে কেন ঘুরছ ? এদিকে তোমার ননদ এসে তো ফুল তুলে নিয়ে গেলেন।

একটি করপল্লবে বিস্রস্ত কেশপাশ ধরে অন্যটিতে শাড়ির আঁচল স্তনমণ্ডলে তুলে এ কামিনী কান্ত-গৃহ থেকে সাক্ষাৎ রতিপতির জয়লক্ষ্মীর মতো নির্গত হচ্ছে। তার দেহে (কান্তদেহের) চন্দনের ছোপ লেগেছে, (কান্ত-মুখের তাম্বুলরাগে তার অধর রক্তবর্ণ হয়েছে)।

অয়ি চন্দ্রমুখী ! প্রিয় দূর দেশে যাবেন বলে আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কারণ বিশ্বভুবনকে যে চাঁদ আনন্দিত করে সে-ই এখন আমার শত্রুর মতো। তা ছাড়া, কোকিলের এই কলগুঞ্জন আমার বিলাপের উদ্রেক করছে। হায়, পরম উপভোগ্য মন্দগামী সমীরণও আমার প্রাণ হরণ করছে।

তাপ নিবারণের জন্যে সে নবকিশলয়ে শয্যা রচনা করছে, কিন্তু তপ্ত করপদ্মের স্পর্শে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। মদনানলে অঙ্গ অঙ্গারের মতো হয়ে উঠেছে তার। শিব ! শিব ! কোমলাঙ্গীর এই (দারুণ) পরিতাপকে বর্ণনা করবে ?

সখা ! (আজ) চাঁদ পদ্মে শয়ন করছে। নীলোৎপল দুটি থেকে স্বচ্ছ মুক্তামালা নির্গত হচ্ছে। স্বর্ণলতাকে শুভ্রতা বেষ্টন করছে। আর কমল-কোরক দুটির স্পর্শে অভিনব পুষ্পমালা কেমন ম্লান হয়ে পড়ছে। এই সব দুর্লক্ষণ আমার তার (অন্য নায়িকার) কাছে যাবার স্পৃহাকে নষ্ট করছে।

দূতী ! তোর নয়নপদ্ম দুটি দেখছি নিতান্ত ক্লান্ত, তোর ঘর্মজলের বিন্দুগুলি কপালে মুক্তোর মতো শোভা পাচ্ছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিস তুই, হায় সুন্দরী ! চাঁদের আলোর তাপে যাতায়াত করে আমার জন্যে তুই কী কষ্টই না করলি ?

সখী দেখ। চক্রবাকীর মতো রমণীরা, বনহরিণীর মতো চকিতনয়না, কোমলাঙ্গী (কামিনী) এই দুরন্ত বসন্তে বিরহ সহ্য করতে না পেরে মরবার সংকল্প নিয়ে রাশীকৃত অঙ্গারের মতো নবপল্লব-শয্যায় পড়ে আছে।

হায় ! আজ কলকণ্ঠ কোকিলের নিষ্ঠুরতা, পূর্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতা, দক্ষিণ সমীরণের দাক্ষিণ্যহানি সেই অবলার মৃত্যু ঘটাতে জোট বেঁধেছে। শুধু তৃণাদি কেঁপে উঠলে তুমি এলে মনে করায় এ ব্যাপারে (মৃত্যুতে) বিঘ্ন ঘটছে।

অয়ি কোমলাঙ্গী ! নয়ন অশ্রুসিক্ত কোরো না, শলাকা দিয়ে লাগানো কাজল ধুয়ে যাচ্ছে, তীব্র নিঃশ্বাস রোধ কর, নবমালিকা শুকিয়ে যাচ্ছে। হায় ! শয্যায় লুটিয়ে পোড়ো না, অঙ্গরাগ হ্রাস পাবে। প্রিয়ের আসবার সময় এখনও যায় নি। অন্য কিছু মনে কোরো না।

সর্বজনের চিত্তবিক্ষেপকারিণী কোনো এক শশিমুখী সখীমণ্ডলের মধ্যে বসে চঞ্চল চোখ ও ভ্রূর ইশারায় সখীর সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ চোখে কাজল দিয়ে পীনোন্নত স্তনদুটিতে স্থিত মণিমালিকাটি আঁচল দিয়ে ঢাকল।

সখা ! দেখ, জ্যোৎস্না এই সুন্দরীর মুখের আঘ্রাণ নিচ্ছে, পক্কবিম্বের প্রভা এর অধর চুম্বন করছে। রম্য কমলমুকুলের লাবণ্য এর স্তন স্পর্শ করতে চাইছে। কোকনদের কান্তি এর হাত দুটি ধরে খেলা করছে। প্রবালদ্যুতি এর পদসেবা করছে।

দূতী ! আহা ! আমি তোকে যা বলেছি তুই তা সব করেছিস। তোর মতো পরহিতপ্রবণা এ সংসারে নেই। হায় কোমলাঙ্গী ! আমার জন্যে গিয়ে তুই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিস। শ্রম ছাড়া কি সুকৃত সিদ্ধ হয় ?

প্রিয়া (আগের মতো) কেশপাশে মালা পরছে না, অঙ্গ আর মৃগনাভি-চিত্রে সজ্জিত করছে না, আমার সামনে আর বিলাসগমনে চলাফেরা করছে না। (কিছু জিজ্ঞেস করলে) অপ্রিয় উত্তর দিচ্ছে।

বালিকা ! গোপনে আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, স্তনস্পর্শাদি ললিতক্রিয়া সমস্তই তুমি খলদের ভয়ে বিস্মৃত হয়েছ। তোমার সঙ্গে কথা বলাও এখন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এতেও আমার

ততটা দুঃখ নেই, তোমার দেখা পাওয়াই যে দুর্লভ হয়ে উঠল এতেই আমার অত্যন্ত বেদনা।

স্মিতাননে যে কলংকী চাঁদের লজ্জা জন্মিয়ে দেয়, বচনে যে গৃহশুকের সুন্দর রবকে সর্বদা নিন্দা করে, নিঃশ্বাসে যে পদ্মবাসিত বায়ুকেও অতিক্রম করে, তোমার বিচ্ছেদে তাকে (আমার সেই সখীকে) তারাই (সেই পরাজিত ও নিন্দিত চাঁদ, শুক ও বায়ু) শোচনীয় দশায় এনে ফেলেছে।

সখা ! যদি সেই তন্বী গান করে বীণাধ্বনি শ্রুতিকটু মনে হয়, যদি স্মিতহাস্য প্রকাশ করে তাহলে চাঁদকে মলিন বলে মনে হয়। তার চোখের সামনে যদি নবোৎপল থাকে তা ম্লান হয়ে যায়। তার রূপ যদি দেখা যায় এ বিদ্যুল্লতাও তার কাছে বিবর্ণ মনে হয়।

হে নাথ ! তুমি যে বলেছিলে, 'আমার রাগ (অনুরাগ) তোমার চেয়ে অনেক বেশী,' তা সত্যি, কারণ তুমি আমাকে দেখতে চেয়ে এই ভোরেই বাড়িতে এসেছ, কিন্তু তোমার বুকে এই কুংকুমপত্ররচিত রাগ, চোখে জাগরণজনিত রাগ এবং কপালে লাক্ষারসজনিত রাগ তুমি ভালোই ধারণ করে আছ।

হে প্রাণনাথ ! এই বসন্তে তুমি দেশান্তরে যেতে চেষ্টা করছ। তবু আমি তাতে ভয় পাচ্ছি না। কারণ (ঐ দেখ) কুমুদফুলের কেশরসৌরভে সুবাসিত সরোবর-সমীরণের সঙ্গে রাত্রে চাঁদের স্বচ্ছ রশ্মিছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অয়ি মানিনী ! সখীদোষজনিত এই অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ ত্যাগ করে আমাকে মুখ দেখাও, আমার চোখের জড়তা দূর হোক। প্রিয়া ! মধুর কথা বল, কানে তা অমৃতবর্ষণের সুখ দিক। ধীরে ধীরে তোমার অনুগ্রহ-শীতল দৃষ্টি দান কর, তাপ জুড়াক।

মান করায় এই বালিকার মন ম্লান। সে অবনত প্রিয়ের দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সে চলে গেলে বালিকা অত্যন্ত পরিতাপ করছে। সখীরা তাকে জোর করে ধরে আনলে সে মৌন অবলম্বন করে থাকছে, আবার প্রিয়তম চলে যেতেই সে কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়ছে।

তার কথা একবার শুনলে কুহুরব কর্ণপীড়াদায়ক মনে হবে। তার মুখকান্তি যতদিন লোকে দেখে নি ততদিনই চাঁদের সুষমায় তারা আকৃষ্ট হয়েছে। তার নয়ন দুটির সামনে মৃগীদের চোখ বুজে থাকাই সঙ্গত। যতদিন তাকে দেখি নি ততদিন স্বর্ণলতাকেই সুন্দর বলে মনে হত।

॥ 'পুষ্পবাণবিলাস' সমাপ্ত ॥

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

॥ মঙ্গলাচরণ এবং অবতরণিকা ॥

চতুর্মুখ-মুখপদ্ম-বন-বিহারিণী রাজহংসী-সর্বশুক্লা সরস্বতী আমার মানসে (মানস সরোবরে) নিত্য বিরাজ করুন।

ভগবান বাসুদেব, দেবাদিদেব শঙ্কর, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, উমানন্দন এবং শুভশ্রীময়ী সরস্বতীকে প্রণাম করে বিক্রমার্কচরিত-কথা রচনা করছি।

শ্রীকৈলাস-শৈল-শিখরে সমাসীন মহাদেবকে একদিন জগদম্বা বললেন, 'বুদ্ধিমানেরা কাল কাটান বেদশাস্ত্রার্থ বিচার করে, কিন্তু বাকি যারা মূর্খ, তারা কাল কাটায় ঘুমিয়ে, নয় ঝগড়া করে।

এ কথা বলে তিনি এটাই বোঝাতে চাইলেন যে, সমস্ত মানুষের সময় যাতে (সদ্ভাবে) কাটে তার জন্যে সমস্ত মানুষের চিত্তাকর্ষক কোনো আখ্যায়িকা বলা উচিত।

তখন মহেশ্বর পার্বতীকে বললেন, 'শোনো তবে, হৃদয়েশ্বরী। সকলের হৃদয় হরণ করে—এমন গল্প আমি বলছি'।

ভর্তৃহরির বৈরাগ্যের কথা

উজ্জয়িনী নামে এক নগর আছে। তার ঐশ্বর্যে দেবগণও বিস্ময় মানেন, সৌন্দর্যে ইন্দ্রালয় অমরাবতীও হার মানে। সেখানে ছিলেন এক রাজা, নাম ভর্তৃহরি। তিনি ছিলেন সমস্ত কলাবিদ্যায় প্রবীণ এবং সকল শাস্ত্রে পারদর্শী। সামন্তরাজ-পত্নীদের মাথার সিঁদুরে তাঁর পাদপদ্ম-দুটি ছিল অরুণবর্ণ। বিক্রমাদিত্য নামে তাঁর অনুজ নিজ বিক্রমে শত্রুদের শক্তিকে খর্ব করেছিলেন।

তাঁর (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের) অগ্রজ সেই ভর্তৃহরির অনঙ্গসেনা নামে এক ভার্যা ছিলেন। রূপলাবণ্যাদির উৎকর্ষে তিনি দেবাঙ্গনাদেরও হার মানাতেন।

সেই নগরে সকল শাস্ত্রে, বিশেষত মন্ত্রবিদ্যায় বিচক্ষণ অথচ দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ মন্ত্র-সাধনায় ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে তুষ্ট করেছিলেন।

পরিতুষ্টা দেবী ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তোমার মন্ত্রসাধনায় এবং ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমাকে জরা-মৃত্যুরহিত করুন।'

দেবী তখন তাঁকে একটি দিব্য ফল দিয়ে বললেন, 'হে পুত্র, ফলটি ভক্ষণ কর, তাহলেই জরামৃত্যুরহিত হবে।'

ব্রাহ্মণ তখনকার মতো ফলটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেবার্চনাদি সেরে যখন ফলটি খেতে যাচ্ছেন, তখন মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা লাগল ঃ একে তো দরিদ্র, তার উপর অমর হয়ে কার কোন্ উপকারে আমি লাগব ? আবার, বহুকাল বেঁচে থাকতে গিয়ে সেই ভিক্ষাই তো করতে হবে। অতএব যে-ব্যক্তি পরোপকারী, এ ফল তাঁরই কল্যাণে লাগবে। কেননা, যিনি জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, মুহূর্তের জন্যেও যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাঁরই জীবন সার্থক।

তাই বলা হয়েছে ঃ

বিজ্ঞান-বীরত্ব-বিভবাদি গুণের অধিকারী বিখ্যাত মানুষ যদি ক্ষণকালও বেঁচে থাকেন, তবে তাতেও তাঁর জীবনের সার্থকতা—এ কথা সজ্জনেরা বলে থাকেন। (নইলে) কাকও তো বেঁচে থাকে বহুদিন, কিন্তু অন্যের দেওয়া নৈবেদ্য-টৈবেদ্য খেয়েই তাকে থাকতে হয়।

যশ এবং ধর্মসহ যে জীবন, তাই-ই তো জীবন। পরের দেওয়া খাবার খেয়ে কষ্ট করে চিরজীবী হয় কাক। তা ছাড়া, যিনি বেঁচে থাকলে আরো অনেকে বেঁচে থাকেন, তাঁর বাঁচাটাই বাঁচা। পাখিরা ঠোঁট দিয়ে কেবল নিজেদের উদরটাই কি পূরণ করে না ?

নিজ নিজ ভরণপোষণে ব্যস্ত হাজার হাজার ক্ষুদ্র মানুষ তো রয়েছেই, কিন্তু পরার্থই যাঁর স্বার্থ, সজ্জনদের পুরোধা তেমন পুরুষ তো একজনই আছেন। বাড়বানল সমুদ্র পান করে স্বীয় দুষ্পূরণীয় উদর পূরণ করতে, কিন্তু মেঘ যে পান করে তা শুধু নিদাঘ-ক্লিষ্ট জগতের সন্তাপ হরণের জন্যে।

এইরূপ বিচার করে, এই ফল যদি রাজাকে দেওয়া হয় তবে তিনি জরা-মৃত্যুরহিত হয়ে সকলের উপকার করতে পারবেন—এ কথা চিন্তা করে সেই ফল নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন ঃ হে রাজন্, ভুজঙ্গমাল্যধর হর এবং পীতাম্বর-ধারী হরি আপনার কল্যাণ করুন।

আশীর্বচন-শেষে রাজহস্তে ফলটি দিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে রাজন্, দেবতার বর-প্রসাদে লব্ধ এই অপূর্ব ফলটি আপনি ভক্ষণ করুন, (দেখবেন) আপনি জরা-মৃত্যুহীন হবেন।'

রাজা সেই ফল নিয়ে, ব্রাহ্মণকে বহু পারিতোষিক দিয়ে বিদায় জানিয়ে, ভাবতে লাগলেন ঃ এ ফল খেলে আমি অমর হব। অনঙ্গসেনাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। আমি বেঁচে থাকতেই যদি সে মারা যায়, তবে তার বিয়োগদুঃখ আমি সহ্য করতে পারব না। সুতরাং এ ফল আমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় অনঙ্গসেনাকে দেব।

এই ভেবে অনঙ্গসেনাকে ডেকে ফলটি দিলেন।

মথুরা-থেকে-আসা একটি ভৃত্য ছিল অনঙ্গসেনার প্রিয়তম পুরুষ, অনঙ্গসেনা ভেবে-চিন্তে ফলটি তাকেই দিলেন। সেই মাথুরিকের সবচেয়ে প্রিয়জন ছিল এক দাসী, ফলটি দিল সে তাকে। সেই দাসীর প্রণয়-পাত্র ছিল এক গোয়ালা, সে তাকেই দিল। তার (অর্থাৎ সেই গোয়ালার) আবার টান ছিল এক ঘুটেকুড়ুনীর প্রতি, সে তাকেই দিল।

তারপর, সেই ঘুটেকুড়ুনী গাঁয়ের বাইরে গোবর কুড়িয়ে গোবরের চুপড়ি মাথায় বসিয়ে তার উপরে সেই ফলটাকে রেখে যখন রাজপথে আসছিল, তখন রাজা ভর্তৃহরি রাজকুমারদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে তার মাথায় গোবরের চূড়ায় বসানো সেই ফলটি দেখতে পেলেন। ফলটি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

অনন্তর ডেকে পাঠালেন ব্রাহ্মণকে। 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি যে ফলটি দিয়েছিলেন, তেমন ফল আর আছে কি ?'—প্রশ্ন করলেন রাজা।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারাজ, ওটি দেবতা-বর-প্রসাদে পাওয়া দিব্য ফল, তেমন ফল তো আর নেই। রাজা হলেন সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর সামনে মিথ্যা বলতে নেই। তাঁকে দেবতার মতোই দেখতে হয়। শাস্ত্রেও তাই বলা হয়েছে ঃ

রাজা সর্বদেবময়—এ কথা ঋষিরা কতভাবে বলেছেন। তাই, তাঁকে দেবতা বিবেচনা করে সুধীজন কখনও মিথ্যা বলেন না।'

তখন রাজা বললেন, 'একজন স্ত্রীলোকের কাছে ঐরকম ফল দেখা গেছে, তা কি করে সম্ভব ?'

ব্রাহ্মণ তার উত্তরে বললেন, "সেই ফলটি খেয়েছিলেন, কি, খান নি ?"

রাজা বললেন, "আমি খাই নি, দিয়েছি আমার প্রাণপ্রিয়া অনঙ্গসেনাকে।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "তাঁকে জিজ্ঞেস করুন সেই ফল তিনি কী করলেন।"

তখন রাজা তাঁকে ডাকিয়ে শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেই ফল তিনি কি করেছেন।

রানী বললেন—মাথুরিককে দিয়েছেন।

তখন ডাকা হল তাকে, জিজ্ঞেস করলে সে (মাথুরিক) বলল, দাসীকে দিয়েছে।

দাসী বলল—গোয়ালাকে, গোয়ালা বলল—ঘুটেকুড়ুনীকে দিয়েছে।

রাজার কণ্ঠ থেকে তখন বেরিয়ে এলো বিলাপের ধ্বনি ; চরম বিষাদগ্রস্ত হয়ে অতঃপর তিনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন :

মনোহর রূপ কিংবা যৌবনের জন্যে পুরুষদের বেশি বড়াই করা বৃথা। ভ্রূভঙ্গ-বিলাসিনীদের মনের প্রভু মনসিজ যা ইচ্ছে তাই করেন।

হায়! নারীচিত্ত হরণ করা কারো সাধ্য নয়! সেজন্যেই বলে : ঘোড়ার লাফ, বোশেখী মেঘের ডাক, স্ত্রীলোকের চরিত্র, পুরুষের ভাগ্য, অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির কথা মানুষ তো দূরের কথা দেবতাও জানেন না।

ব্যাধেরা বনের চঞ্চল পাখিকেও ধরে ফেলে, স্রোতের নদীতেও নৌকাকে ধরে রাখা যায়, কিন্তু নারীদের অস্থির মতিগতির ধারণা করা যায় না।

এমন কি,

বন্ধ্যাপুত্রের রাজ্যলক্ষ্মী লাভ এবং আকাশে কুসুমশোভা দৈববশে হলেও হতে পারে, কিন্তু নারীদের অল্পমাত্রও চিত্তশুদ্ধি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সতত সুখ-দুঃখ জয় করে যে যোগীরা জীবনে চলেন, নারীদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে তাঁরাও মোহগ্রস্ত হন ; বলতে গেলে, স্ত্রী-চরিত্র তাঁরা কেউই সঠিক জানতে পারেন না।

এ ছাড়া, আরো যা বলা হয়, তা হল :

কামক্রীড়ায় একজনকে সম্ভোগ করার পর নারীরা সবাই নাকি স্বভাবত অন্য পুরুষকে কামনা করে—নির্মল মনের লোকেরা এ রকম বলে থাকেন।

নাইবা থাক কাজল কিংবা মন্ত্র, তন্ত্র, শিক্ষণ—নারীরা মুহূর্তেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষকেও বঞ্চনা করে। মনে হয়, জাতিকুলহীন, নীচ, দুষ্কৃতকারী, অস্পৃশ্য ও মরণাপন্ন লোকই নারীদের বরণীয় প্রেমাস্পদ।

গৌরব, প্রতিষ্ঠা, গুণাবলী, সাধুসঙ্গ দিয়ে—এমন কি, কোলে করে ধরে রাখলেও স্ত্রীলোক স্বীয় দোষ ত্যাগ করে না।

ধনের লোভে নারীরা হাসে, কাঁদে, পুরুষের বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু নিজেরা পুরুষকে বিশ্বাস করে না। তাই কুলশীলবান পুরুষের পক্ষে নারীমাত্রই শ্মশানপুষ্পের ন্যায় বর্জনীয়।

বৈরাগ্যের চেয়ে বড়ো ভাগ্য নেই, জ্ঞানের চেয়ে বড়ো সখা নেই, শ্রীহরির চেয়ে বড়ো ত্রাণকর্তা নেই, সংসারের চেয়ে বড়ো শত্রু নেই।"

এইসব শ্লোক উচ্চারণ করে পরম বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে ভর্তৃহরি স্বয়ং বনে প্রস্থান করলেন।

॥ ভর্তৃহরির বৈরাগ্য কথা সমাপ্ত ॥

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির কাহিনী

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবদ্বিজ-দরিদ্র-অনাথ-আর্ত-কুব্জ-পঙ্গু প্রভৃতির আশা পূরণ করে সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালন করতে লাগলেন। পরিচারকদের সন্তুষ্ট করে, মন্ত্রী ও সামন্তরাজদের পরামর্শ গ্রহণ করে তিনি তাঁদের মন জয় করলেন। এইভাবে, সকলকে সন্তুষ্ট করে রাজা রাজত্ব করছিলেন।

অনন্তর একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী রাজার কাছে এসে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন :

যিনি কুণ্ডলীকৃত সাপের মালা অবলীলায় গলায় পরেন, সেই মহাদেব এবং বরাহবেশী ভগবান বিষ্ণু আপনাকে অধিকতর ঐশ্বর্য দান করুন!

আশীর্বাদ-শেষে রাজার হাতে ফল দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে মহাশ্মশানে আমি অঘোরমন্ত্রে হোম করব, সেখানে আপনি হবেন আমার উত্তরসাধক।'

রাজা কথা দিলেন। তাঁর সেই কথায় বেতাল প্রসন্ন হল, আর অষ্ট মহাসিদ্ধিও পাওয়া গেল। ভূতলে বিক্রমাদিত্যের মতো কেউ ছিল না। ত্রিভুবনে তাঁর কীর্তি গঙ্গাধারার ন্যায় অব্যাহত বইতে লাগল।

ইত্যবসরে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে রম্ভা ও উর্বশীকে ডেকে বললেন, "তোমাদের দুজনের মধ্যে নাচে গানে যে বেশি পটু, সে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে সেই তপোবনে যাক। যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা নষ্ট করতে পারবে, তাকে আমি পুরস্কার দেব।"

এ কথা শুনে রম্ভা বলল, 'আমি নৃত্যে পটীয়সী।' উর্বশী বলল, 'দেব, শাস্ত্রনির্দেশমতো নৃত্য আমি জানি।'

দুজনের মধ্যে বিবাদ দেখা দেওয়ায় সমাধানের জন্যে দেবসভা ডাকা হল। প্রথমে রম্ভার নৃত্য হল, দ্বিতীয় দিনে উর্বশীর। দুজনের নৃত্য দেখে দেবগণ সকলেই সন্তুষ্ট। 'এ-ই নৃত্যে অধিক নিপুণা'—এ সিদ্ধান্ত কিন্তু কেউ নিতে পারলেন না।

সেই সময় নারদ বললেন, 'দেবরাজ, ভূতলে বিক্রমাদিত্য রয়েছেন। তিনি সকল কলাবিদ্যায়, বিশেষত সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যায় বিচক্ষণ। তিনিই পারবেন এদের বিবাদ-ভঞ্জন করতে।'

তখন বিক্রমাদিত্যকে ডাকতে দেবরাজ মাতলিকে পাঠালেন উজ্জয়িনীতে। ডাকে সাড়া দিয়ে বিক্রমাদিত্য এসে নমস্কার জানালে দেবরাজ সসম্মানে তাঁকে যোগ্য আসনে বসালেন। তারপর, নৃত্যমণ্ড আবার সাজানো হল। প্রথমে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে নৃত্য করল রম্ভা। দ্বিতীয় দিনে রঙ্গমঞ্চে শাস্ত্রানুসারে নৃত্য করল উর্বশী। তা দেখে, বিক্রমাদিত্য উর্বশীর প্রশংসা করলেন এবং জয়ধ্বনি দিলেন। ইন্দ্র বললেন, 'এর জয়-ঘোষণা করা হল কেন?' বিক্রম বললেন, 'দেব, নৃত্যে প্রথমত অঙ্গসৌষ্ঠবই প্রধান। নৃত্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে :

অনুচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গে চলবে পদচালনা। কটি, জানু, মস্তক, অক্ষি ও কর্ণের সমনিয়ত অবস্থিতি, প্রশস্ত অবকাশের মুহূর্তে সুদর্শন বিশ্রান্তি, বক্ষের সমুন্নতি, বিশেষ করে অভ্যাস, অস্খলন এবং পাদসৌষ্ঠব—এগুলিই নৃত্যবিদ্‌রা বেশি করে দেখেন।

বেশি বলে কাজ কি? রঙ্গোচিত অবস্থানবিশেষ নর্তকীর পক্ষে দেখাবার মতো জিনিস। অবস্থানবিশেষের কথা নৃত্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে :

চতুষ্কোণ-ভাবে সমপাদ বিক্ষেপ এবং লতার মতো দুটি বাহুর সঞ্চালন—সমস্ত নৃত্যের শুরুতে সাধারণ কর্তব্যরূপে বিবেচিত। শরীরটাকে এমনি করতে হবে যাতে অন্যে তা দেখতে না পায়।

এছাড়া, টানা টানা চোখ, শরতের চাঁদের মতো সুন্দর মুখ, লতার মতো দুটি বাহু, ঘন কাঁধ, পীনোন্নত স্তন-মণ্ডিত বক্ষ, ব্যস্তসমস্ত দুটি হাত, হস্তপরিমিত মধ্যভাগ, বর্তুল নিতম্ব, সুডোল আঙুলের দুটি পা এবং নর্তকীর মনোগত ভাব যাতে দেহের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় দেহের আঁটসাঁট হবে তেমনি।

মণিবন্ধে নিশ্চল বলয়সহ বাম হস্ত বিন্যস্ত থাকবে নিতম্বে, শ্যামাশাখাসদৃশ অপর হস্তটি থাকবে স্রস্ত-শিথিল; পায়ের আঙুলে এবং পেলব পুষ্পশ্রীময় মণিময় কুট্টিমে দৃষ্টি রেখে তন্বী বামা যখন নৃত্য করবে, তখন সুন্দর পা-দুটিকে বেশ ভালোভাবে ঠেকিয়ে রাখতে হবে যাতে স্খলন না ঘটে।

—এই নৃত্যাবস্থান-বিশেষের কথা মনে রাখতে হয়।

অথবা, আর কথা না-ই বা বাড়ালাম—

যা বলবার তা অঙ্গসমূহের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এমনি ভাবে অঙ্গচালনা করে অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হবে, লয় অনুসারে পা পড়বে, রসপরিবেশনে তন্ময় হতে হবে; করাঙ্গুলি চালনা করে কোমল অভিনয়ে মাঝখানকার সূক্ষ্ম ভাগগুলিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে যেন সেই তন্ময়তা বিষয়ান্তরের আকর্ষণ নষ্ট করে। এই হল গিয়ে যথার্থ 'রাগবন্ধ'।

এবংবিধ নৃত্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ মেনে নৃত্য করায় উর্বশীকে আমি প্রশংসা করেছি।"

তা শুনে সন্তুষ্ট দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মানিত করে উত্তম-রত্ন-খচিত মহামূল্য এক সিংহাসন দান করলেন।

সেই সিংহাসনে খোদাই করা ছিল বত্রিশটি পুতুল। তাদের মাথায় পা দিয়ে সেই

সিংহাসনে উঠতে হয়। সেই অতিমনোহর সিংহাসন নিয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞামতো বিক্রমাদিত্য নিজ নগরীতে ফিরে চললেন। তারপর শুভ মুহূর্তে শুভ লগ্নে সেই সিংহাসনে বসে তিনি রাজত্ব করতে লাগলেন।

তারপর বহু বৎসর অতিবাহিত হলে প্রতিষ্ঠাননগরে শেষনাগরাজের ঔরসে আড়াই বছর বয়সের কন্যার গর্ভে জন্মালেন শালিবাহন। উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতু, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি অমঙ্গলচিহ্ন রাজা প্রজা সকলেই দেখলেন। বিক্রমাদিত্য তখন দৈবজ্ঞদের ডেকে বললেন, 'দৈবজ্ঞ মহাশয়গণ, এ সব কী উৎপাত যা প্রতিদিন রাজা প্রজা সবার দৃষ্টিতে পড়ছে? এদের ফল কী? কার অনিষ্ট সূচনা করছে?'

তাঁরা বললেন, 'মহারাজ, এই ভূমিকম্প হয়েছে সন্ধ্যাকালে, অতএব, রাজার অনিষ্ট সূচনা করছে। নারদীয় পুরাণে সে-রকমই বলেছে: প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা—দু সন্ধ্যাতে ভূমিকম্প রাজাদের অনিষ্ট ঘটায়, ধূমকেতুকে বলা হয় রাজার বিনাশসূচক এবং দিগ্‌দাহ যদি পীতবর্ণ হয় তবে তা রাজাদের নিকট ভয়প্রদ।'

দৈবজ্ঞদের এই অভিমত শুনে রাজা আবার বললেন, 'হে দৈবজ্ঞগণ, আমি একদা তপস্যায় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলে তিনি বললেন:

হে রাজন্, আমি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি পর্যায়ক্রমে অমরত্ব প্রার্থনা কর।

তখন আমি বললাম, হে প্রভু, আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, তার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়, অন্যথা নয়।

ঈশ্বর বললেন—তথাস্তু।

কিন্তু ঐরূপ পুত্র কেমন করে জন্মাবে?'

দৈবজ্ঞেরা বললেন, 'দৈবী সৃষ্টি আমাদের চিন্তার বাইরে। তেমন পুত্র কোনো-না-কোনো দেশে জন্মাতে পারে। সে-রকম লক্ষণও দেখা যাচ্ছে।'

তখন রাজা বেতালকে ডেকে সকল বৃত্তান্ত তার গোচরে এনে বললেন, 'হে যক্ষ, তুমি পৃথিবীতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে অনুরূপ সন্তান কোন্ দেশে কোন্ নগরে জন্মেছে তা সঠিক জেনে স্থান নির্ণয় করে শীঘ্র চলে এসো।'

অতঃপর বেতাল 'মহা অনুগ্রহ' এই বলে পানের একটা বীড়া নিয়ে কুশদ্বীপাদি স্থানে অনুসন্ধান করে জম্বুদ্বীপে পৌঁছে প্রতিষ্ঠাননগরে প্রবেশ করে জনৈক কুম্ভকারের গৃহে একটি শিশু ও একটি বালিকাকে ক্রীড়ারত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'বল দেখি তোমরা দুজন পরস্পরে কে কার কী হও।' বালিকাটি বলল, 'এ আমার পুত্র।'

বেতাল বলল, 'বৎসে তোমার পিতা কে?' বালিকাটি তখন এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দিল। বেতাল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, 'এই কন্যাটি কে?' ব্রাহ্মণ বলল, 'এটি আমার কন্যা। আর এর পুত্র এই শিশু।'

তা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট বেতাল পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলল, 'হে ব্রাহ্মণ, এটা কী করে সম্ভব?' ব্রাহ্মণ বলল, 'দেবতাদের কাজকর্ম মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। এই কন্যার সঙ্গে শেষনাগরাজ সহবাস করেছিলেন, তাই এর গর্ভে এই পুত্র শালিবাহন জন্মেছে।'

ঘটনা শুনে বেতাল সত্বর উজ্জয়িনীতে ফিরে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলল।

তাকে পারিতোষিক দিয়ে খড়্গ হাতে রাজা রওনা হলেন প্রতিষ্ঠাননগরে। সেখানে গিয়ে খড়্গাঘাতে শালিবাহনকে যেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, ওমনি শালিবাহন লাঠি

নিয়ে এমন তাড়া করল যে বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠাননগর থেকে গিয়ে পড়লেন উজ্জয়িনীতে এবং বেদনা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন। রাজার ভার্যারা সকলে অগ্নিপ্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হল। তখন মন্ত্রীরা বিবেচনা করলেন—এই রাজা অপুত্রক, সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

ভট্টাচার্য বললেন, 'অনুসন্ধান করে দেখুন এই স্ত্রীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী কি না।' অনুসন্ধান করে জানা গেল একজন স্ত্রী সাতমাস গর্ভবতী। তখন সব মন্ত্রী মিলে গর্ভাভিষেক সমাপ্ত করে নিজেরাই রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হলেন।

ইন্দ্র-দত্ত সেই সিংহাসনটি তেমনি শূন্যই রইল। একদিন সভা-মধ্যে অশরীরী বাণী শোনা গেল—'হে মন্ত্রিগণ, স্বয়ং রাজ্য পালন করার এবং এই সিংহাসনে উপবেশন করার যোগ্য তেমন রাজা নেই। তাই কোনো পবিত্রস্থানে এই সিংহাসন নিক্ষেপ কর।'

তা শুনে সমস্ত মন্ত্রী মিলে অতিপবিত্র ক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষেপ করলেন। তারপর বহু বর্ষ অতীত হলে রাজ্য পেলেন ভোজরাজ। ভোজরাজের রাজত্বকালে একদা এক ব্রাহ্মণ যেখানে ঐ সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই ক্ষেত্র কর্ষণ করে যাবনাল বপন করল। সেই ক্ষেত্রে ফল হল প্রচুর। ঠিক যেখানে সিংহাসনটি মাটি-চাপা হয়ে পড়ে ছিল, সেই জায়গাটি উঁচু দেখে পাখি তাড়াবার জন্যে মাচা বেঁধে তার উপর বসে ব্রাহ্মণ পাখিদের উড়িয়ে দিত।

তারপর, একদিন বিহারে বেরিয়ে সমস্ত রাজপুত্রদের নিয়ে ভোজরাজ যখন সেই ক্ষেত্রের কাছে গিয়েছেন তখন মঞ্চে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ বলল, 'মহারাজ, এই ক্ষেতে ভালো ফল হয়েছে। সসৈন্যে এসে ইচ্ছেমতো খান, আর ঘোড়াদের ছোলা খেতে দিন। আজ আমার জন্ম সফল, কেননা আপনি আমার অতিথি। আমার সৌভাগ্য যে, এ রকম অনুরোধ করার সুযোগ এসেছে।'

প্রস্তাব শুনে রাজা সসৈন্যে ক্ষেতের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ব্রাহ্মণও নেমে এলো মাচা থেকে। ক্ষেতের মাঝে রাজাকে তখন সে বলল, 'হে রাজন, কেন এই অধর্ম করছেন? এই ব্রাহ্মণের চাষের ক্ষেত আপনি ধ্বংস করছেন। কেউ অন্যায় করলে লোকে তার নামে আপনার কাছে অভিযোগ করে, অথচ আপনি নিজেই অন্যায়ে প্রবৃত্ত। এখন কেই বা আপনাকে নিবৃত্ত করবে?

প্রবচন রয়েছে ঃ

হস্তী কণ্ডূয়নার্ত হলে, রাজা প্রজাপীড়ক হলে এবং বিদ্বানেরা পাপকর্ম করলে, কোন্ জন নিবৃত্ত করতে পারে?

আপনি তো ধর্মশাস্ত্র জানেন, ব্রাহ্মণের দ্রব্য কেন নষ্ট করছেন? ব্রাহ্মণের দ্রব্য যে বিষ।

তাই তো বলে ঃ

সাধারণ বিষ বিষই নয়, ব্রাহ্মণের ধনই বিষ বলে বিবেচ্য। বিষ শুধু পানকর্তাকেই হত্যা করে, ব্রাহ্মণের ধন হরণকর্তার পুত্রপৌত্রকেও বিনাশ করে।

ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজা সপরিবারে যখন ক্ষেতের বাইরে গেলেন, তখন পাখি তাড়াতে মাচায় উঠে ব্রাহ্মণ আবার বলতে লাগল, 'মহারাজ, যাচ্ছেন কেন? ক্ষেতে ভালো ফল হয়েছে। যাবনালের ডাঁটাগুলো ঘোড়ারা খাক, শশা রয়েছে, আপনারা খান।'

পুনর্বার ব্রাহ্মণের অনুরোধ শুনে সপরিবারে রাজা যখন ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন,

তখন পাখি তাড়াবার মাচা থেকে নেমে ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ নিষেধ করল।

রাজা এবারে নিজের মনে আলোচনা করতে লাগলেন : কী আশ্চর্য! যখন এই ব্রাহ্মণ মঞ্চে আরোহণ করে তখন এর মনে 'দাতব্য ভোক্তব্য' বুদ্ধির উদয় হয়; যখন মঞ্চ থেকে অবতরণ করে, তখনই এর বুদ্ধি হয় বিপরীত। আমি বরং মঞ্চে আরোহণ করে দেখি ব্যাপারটা কী?—এই ভেবে মঞ্চে আরোহণ করলেন।

ভোজরাজের চিত্তে তখন এই বাসনা জাগল : বিশ্বের আর্তি দূর করতে হবে, সমস্ত লোকেরই দারিদ্র্য সুষ্ঠুভাবে নাশ করতে হবে, দুষ্টদের শাস্তি দিতে হবে, সজ্জনদের পালন করতে হবে, ধর্মানুসারে প্রজাদের রক্ষা করতে হবে। বেশি কী? এ সময়ে যদি কেউ শরীরটাও চেয়ে বসে, তাও দিতে হবে।

আনন্দে ভরপুর রাজা পুনরায় বিচার করতে লাগলেন : সত্যি, এই ক্ষেত্রই ব্রাহ্মণের এমন বুদ্ধি ঘটাচ্ছে।

শাস্ত্রের বচন রয়েছে :

জলে তৈল, খলে গোপন বিষয়, সৎপাত্রে স্বল্পমাত্রও দান, প্রাজ্ঞজনে শাস্ত্র-বস্তুশক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি বিস্তারলাভ করে।

কেমন করে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানা যায়—এই চিন্তা করে ব্রাহ্মণকে ডেকে তিনি বললেন, 'ওহে ব্রাহ্মণ, এই ক্ষেত্র থেকে আপনার কী পরিমাণ উপার্জন হয়?'

ব্রাহ্মণ বলল, 'মহারাজ, সর্ববিষয়ে বিচক্ষণ আপনার অজানা কিছুই নেই। যা সঙ্গত তাই করুন। রাজা হলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, তাঁর কৃপাদৃষ্টি যার উপর পড়ে, তার দৈন্য-দুর্ভিক্ষাদি থাকে না। রাজা হলেন সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ। সেই রাজা আপনি আমার দৃষ্টিসীমায় এসেছেন, আজ আমার দৈন্য-দারিদ্র্যাদির অবসান হল। ক্ষেত্রের মূল্য আর কতটুকু?'

অতঃপর রাজা সেই ব্রাহ্মণকে ধনধান্যাদি দিয়ে তুষ্ট করে সেই ক্ষেত্র গ্রহণ করে তার অধোদেশ খনন করাতে আরম্ভ করলেন। পুরুষপ্রমাণ গর্ত হলে একটি সুন্দর শিলা দেখা গেল। তার নীচে চন্দ্রকান্তশিলানির্মিত নানারত্নখচিত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকাযুক্ত অতিমনোহর এক দিব্য সিংহাসন রাজা দেখতে পেলেন। সেই সিংহাসন দেখে আনন্দে আত্মহারা ভোজরাজ গ্রামে নেবার জন্যে সিংহাসনটিকে যখন ওঠাতে গেলেন, তখন তা অত্যন্ত ভারি বলে মনে হল এবং উঠল না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, 'অমাত্য, সিংহাসন কেন উঠছে না?' মন্ত্রী বললেন, 'রাজন্, দিব্য ও অপূর্ব এই সিংহাসন বলি, হোম ও পূজাদি ব্যতিরেকে উঠবে না, এবং ওঠাতে আপনার সাধ্যও হবে না।'

তাঁর কথা শুনে রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের দিয়ে বিধানমতো সমস্ত অনুষ্ঠান করালেন। তখন দেখতে দেখতে সেই সিংহাসন হালকা হয়ে নিজেই উঠে আসতে লাগল। তা দেখে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'অমাত্য এ সিংহাসন তোলা প্রথমে আমার অসাধ্য ছিল। কিন্তু এখন আপনার বুদ্ধিবশে এটি আমার হস্তগত হয়েছে। সত্যি, বুদ্ধিমানদের সংসর্গ প্রাপ্তিযোগ এবং সুখের কারণ হয়।'

তখন মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, শুনুন তবে। যে নিজে বুদ্ধিমান নয়, আবার অন্যের বুদ্ধিও শোনে না, তার সর্বনাশ হয়। আপনি তেমন নন। আপনি বুদ্ধিমান হয়েও আপ্তবাক্য শোনেন, তাই আপনার কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটে না।'

রাজা বললেন, 'যিনি অনর্থ নিবারণ করেন এবং আগামী বিষয় সাধন করতেও পারেন তিনিই মন্ত্রী।

শাস্ত্রে বলে ঃ

উপস্থিত কার্য চালাবার জন্যে, আগামী কার্যকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে, অকার্য প্রতিরোধের জন্যে যিনি মন্ত্রণা দিতে পারেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, প্রভুর হিতকার্য করাই মন্ত্রীর কর্তব্য।

যাঁদের মন্ত্রণা বাস্তবানুগ এবং কার্য প্রভুর কল্যাণপ্রদ, তাঁরাই রাজার মন্ত্রী। পরম্পরা-জ্ঞানহীন এবং অধ্যবসায়হীন অন্যেরা গণ্ডোপরি মাংসপিণ্ডের মতো বৃথা ক্লেশকর, মন্ত্রী তারা হতে পারে না।

আর,

মন্ত্রী বিনা রাজ্য, ধান্য বিনা গৃহ, যৌবন বিনা সৌভাগ্য (সৌন্দর্য) এবং জ্ঞান বিনা বৈরাগ্য কোনো কাজের নয়।

দুর্জনদের শান্তি, পাষণ্ডদের মতি, বেশ্যাদের প্রীতি, খলদের মৈত্রী, পরাধীনের স্থিতি, নির্ধনের ক্রোধ, সেবকের ক্ষোভ, মনিবের স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণীদের পতিভক্তি, চোরদের যুক্তি, মূর্খদের সম্মতি—এগুলো সব কিছুই নিষ্ফল বিবেচ্য।

আর যা (ভালো) তা হল ঃ

মহাপুরুষদের সেবা, আপ্তদের পরামর্শ শ্রবণ, দেব-ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন এবং ন্যায়-মার্গ অনুসরণ—এ সব রাজার কর্তব্য। মহারাজ, রাজলক্ষণোক্ত গুণাবলী সকলই আপনার মধ্যে আছে। আপনি সমস্ত রাজাদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

মন্ত্রীরও এবংবিধ গুণগরিমা থাকা আবশ্যক ঃ যিনি কুলক্রিয়াক্রমে কামন্দক, চাণক্য, এবং পঞ্চতন্ত্রাদি শাস্ত্র সকল এবং কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তিনিই হবেন মন্ত্রী।

মন্ত্রীর গুণাবলী ঃ

প্রভুর কার্যসম্পাদনে উদ্যম, পাপ হতে ভয়, প্রজাদের কাছে মন্ত্রগুপ্তি, পরিচারকদের কার্যে উৎসাহদান, রাজার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ, সময় বুঝে চলা, অহিত কার্য থেকে রাজাকে নিবারণ করা—এমনি সব গুণ থাকলেই তাকে মন্ত্রী বলা যায়। যেমন নন্দরাজ-মন্ত্রী বহুশ্রুত রাজার ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।'

ভোজরাজ বললেন, 'সে আবার কী ?'

মন্ত্রী বললেন, 'শুনুন মহারাজ, বলছি।

বিশাল-নগরীতে নন্দ নামে মহাশৌর্যসমন্বিত এক রাজা ছিলেন। নিজ বাহুবলে তিনি সমস্ত বিরোধী নৃপতিকে নিজ পাদপদ্মের অধীন করে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে পুত্র, ষড়বিধ দণ্ডনীতি, শস্ত্র ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বহুশ্রুত নামে মন্ত্রী এবং ভানুমতী নামে ভার্যা ছিলেন। ভানুমতী ছিলেন রাজার অতিপ্রিয়। তাঁর প্রতি অনুরক্ত রাজা সর্বদা তাঁর সঙ্গসুখ অনুভব করতেন। যখন সিংহাসনে বসতেন, ভানুমতীকে বসাতেন তাঁর অর্ধাঙ্গে। ক্ষণমাত্রও তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারতেন না রাজা। একদিন মন্ত্রী নিজমনে বিচার করলেন : এই রাজা নির্লজ্জভাবে সভার মধ্যে সিংহাসনে স্ত্রীকে বসান। সমস্ত লোকই রাণীকে ঐ অবস্থায় দেখে। এটা অত্যন্ত অনুচিত। যে কামী, উচিত-অনুচিত বিবেচনা তার নেই।

তাই তো—

নীলোৎপলনয়না স্বর্গাঙ্গনা সব অপ্সরা প্রভৃতি কি ছিল না যে ত্রিদশরাজ ইন্দ্র বেচারী অহল্যাকে সম্ভোগ করতে গিয়েছিলেন? হৃদয়ের পর্ণকুটীর কামানলে দগ্ধ হতে থাকলে পণ্ডিত হয়েও কে পারে উচিত অনুচিত বিচার করতে?

যতক্ষণ না রমণীদের কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ হয়, ততক্ষণই মানুষ প্রতিষ্ঠা ও ধৈর্য বজায় রাখতে পারে।

তাই তো বলে ঃ

পুরুষ ততক্ষণই প্রতিষ্ঠা ধরে রাখতে পারে, ততক্ষণই মনের চঞ্চলতাকে প্রশমন করতে পারে, ততক্ষণই তার হৃদয়ে বিশ্বের গহন তমোনাশক পরম প্রদীপস্বরূপ সিদ্ধান্ত-সূত্রের স্ফুরণ ঘটে, যতক্ষণ না মানিনীদের ক্ষীরসমুদ্রপারের বেলাবলয়ের মতো (শ্বেতবৃত্তাকার) দীর্ঘলোলায়ত নেত্রের কটাক্ষে তার হৃদয় বিদ্ধ হয়। হায়! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ পুরুষকেও বিকল করে। তাই বলা হয় ঃ

দেব মীনকেতন মুহূর্তের মধ্যেই কলাকুশলকে বিকল করেন, পবিত্র পুরুষকে উপহাসের পাত্র করেন, পণ্ডিতকে বিড়ম্বিত করেন এবং ধীর ব্যক্তিকে অধীর করেন।

অধিকন্তু, কামমোহে আচ্ছন্ন পুরুষ বনিতারূপ অনলে প্রবেশ করে শাস্ত্র, সত্য, তপস্যা, চরিত্র, বিজ্ঞান, পরম তত্ত্ব—সমস্তকেই ঐ অনলের ইন্ধন করে ফেলে।

ঐতিহ্য, বলনাশ, স্ববংশের অবমাননা ও আসন্ন মৃত্যু—কামী পুরুষ কিছুই দেখতে পায় না।'

এইসব বিচার করে একদিন অবসরমতো মন্ত্রী রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।'

রাজা বললেন, 'বলুন কী নিবেদন।'

মন্ত্রী বললেন, 'এই-যে দেবী ভানুমতী সভামধ্যে আপনার সঙ্গে অর্ধাসনে বসেন, এটা অত্যন্ত অনুচিত। শাস্ত্রকাররা বলেন—রাজমহিষী অসূর্যম্পশ্যা। এখানে কত রকমের লোক আসে, তাঁকে দেখে।'

রাজা বললেন, 'সবই তো জানি, কিন্তু করি কী? এঁকে যে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। এঁকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না।'

মন্ত্রী বললেন 'তবে এ রকম করা যাক।' রাজা সাগ্রহে বললেন, 'কী ঠিক করেছেন বলুন।' মন্ত্রী তখন বললেন, 'চিত্রকর ডেকে পটের উপর রানী ভানুমতীর ছবি আঁকিয়ে নিয়ে সামনের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে তাঁর প্রতিকৃতি আপনার চোখের সামনেই থাকবে।'

কথাটা রাজার মনে ধরল। তারপর, রাজা চিত্রকর ডেকে বললেন, ওহে চিত্রকর, ভানুমতীর রূপ চিত্রে পরিস্ফুট কর।'

চিত্রকর বলল, 'মহারাজ, তাঁর রূপ প্রথমে আমি প্রত্যক্ষ দেখব, তারপর যেমন যেমন তাঁর অবয়বসংস্থান তেমনি আলেখ্য রচনা করব।'

তা শুনে রাজা ভানুমতীকে ডেকে পাঠালেন এবং চিত্রকরকে দেখালেন।

চিত্রকর তাঁকে নিরীক্ষণ করে 'ইনি পদ্মিনী নারী' এই সিদ্ধান্ত করে পদ্মিনীলক্ষণ-যুক্ত প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে লাগল।

পদ্মিনীলক্ষণ হল ঃ

কমল-কোরকের মতো কোমলাঙ্গী, বিকচ-পদ্ম-সুগন্ধি-বদনা, সুরতসময়ে অঙ্গে

দিব্যগন্ধে আমোদিতা, চকিতমৃগনয়না, রক্তাপাঙ্গা (নেত্র-প্রান্ত যার রক্তাভ) বিল্বফল-সদৃশ-অনুপম-স্তন-শ্রী-মণ্ডিতা।

তার নাক হবে তিলফুলের মতো, দেব-দ্বিজ-গুরুজনের পূজা ও সেবাযত্নে সশ্রদ্ধ হবে তার মন, পদ্মের পাপড়ির মতো হবে তার লাবণ্য, চাঁপার মতো গৌরবর্ণ হবে তার গা মনোহর-পত্রযুক্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মকোষের মতো হবে সেই কামিনীর অঙ্গ।

রাজহংসীর মতো ললিত মৃদু তার গতি, তনু দেহের মধ্যদেশে তার ত্রিবলীরেখা, কলহংসীর মতো সে অস্ফুট-মিষ্টভাষিণী, সুবেশা। সে হালকা নরম বিশুদ্ধ খাবার খায়, সুন্দর কেশ তার, শুভ্রকুসুম ও বসন প্রিয় তার। এমন নারীই পদ্মিনী।'

অনুরূপ শাস্ত্রোক্তলক্ষণ-অনুসারে চিত্রকর রানীর চিত্র অঙ্কন করে রাজার হাতে দিলেন। রাজাও চিত্রাঙ্কিতা রানীকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে চিত্রকরকে যোগ্য পুরস্কার দিলেন।

এর পরে, রাজপুরোহিত শারদানন্দ চিত্রপটে অঙ্কিত ভানুমতীকে দেখে শিল্পীকে ডেকে বললেন 'হে চিত্রকর, ভানুমতীর সব লক্ষণই এঁকেছ, কিন্তু একটি ভুলে গেছ।'

শিল্পী বলল, 'প্রভু, কী ভুলে গেছি বলুন।' শারদানন্দ বললেন, 'রানীর বাম জঘনস্থলে তিলের মতো মৎস্যচিহ্ন আছে। তা তুমি ছবিতে দাও নি।' রাজাও শারদানন্দের কথা শুনে তার সত্যতা যাচাই করতে সঙ্গম-সময়ে যখন রানীর বামজঘন নিরীক্ষণ করলেন, তখন অমনি তিলকসদৃশ মৎস্যচিহ্ন দেখতে পেলেন।

তা দেখে রাজা নিজের মনে ভাবলেন, 'কেমন করে শারদানন্দ রানীর গোপন অঙ্গে বর্তমান মৎস্যচিহ্ন দেখলেন? কোনো-না-কোনো ভাবে রানীর সঙ্গে এঁর সংসর্গ হয়ে থাকবে, নতুবা ইনি জানলেন কী করে? স্ত্রীচরিত্র-বিষয়ে পাপ আশঙ্কা করতেই হয়।

তাই তো বলে ঃ

আলাপ করছে একজনের সঙ্গে, অপাঙ্গে দেখছে আরেক জনকে, হৃদয়ে স্মরণ করছে অন্য একজনকে। কোনো একজনের উপর স্ত্রীলোকদের অনুরাগ স্থির থাকে না।

আগুনে রাশি রাশি কাঠ দিলেও তৃপ্তি নেই তার, সমুদ্রে নদীরা অনিবার জল ঢাললেও তৃপ্তি নেই তার, সমস্ত জীবের প্রাণ নিয়েও তৃপ্তি নেই যমের, তেমনি পুরুষদের ভোগ করেও তৃপ্তি নেই কামিনীর।

শাস্ত্রে একস্থানে বলেছে ঃ স্ত্রীদের পাতিব্রত্য, বুঝলে নারদ, (ব্যভিচারের) স্থান কাল পাত্রের অভাবে যদি বা ঘটে তবেই সম্ভব।

মোহবশে যে-মূর্খ মনে করে—এ রমণী আমার প্রতি অনুরক্ত, সে ব্যক্তি নৃত্যক্রীড়ার ময়ূরের মতো তার বশীভূত হয়।

যে ব্যক্তি রমণীদের কথামতো কাজ করে—সে-কথা স্বল্পই হোক, সত্যই হোক, কিংবা অতিগুরুত্বপূর্ণই হোক—সংসারে সে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। রক্তবর্ণ লাক্ষারসকে যেভাবে নিঙড়ে নিঙড়ে পায়ে আলতা পরে, তেমনি পুরুষদের নিঃশেষে শোষণ করে অবলারা তাদের পদতলে ফেলে রাখে।'

এ রকম ভেবে মন্ত্রীকে ডেকে রাজা পূর্ববৃত্তান্ত জানালেন। মন্ত্রীও তখনকার মতো রাজার মনের মতো কথা বললেন, 'মহারাজ, কার মনে যে কী রকম আছে কে জানে? হতে পারে, এ বৃত্তান্ত সবটাই সত্য।'

রাজা বললেন, 'অমাত্য, যদি তুমি আমার প্রীতিভাজন হও তবে ঐ শারদানন্দকে বধ করার ব্যবস্থা কর।'

মন্ত্রীও 'তথাস্তু' বলে সম্মতি জানিয়ে জনগণের সম্মুখে শারদানন্দকে ধরে এনে বন্দী করলেন।

তখন শারদানন্দ বললেন, 'হায়! রাজা যে কারো প্রিয় নন, এই জনশ্রুতি সত্য।

তাই তো—

প্রভূত অর্থ পেয়ে কে না গর্বিত হয়? কোন্ বিষয়ীর বিপদের শেষ আছে? সংসারে নারী কার না মন ভেঙেছে? কোন্ লোক সত্যি রাজার প্রিয়?

কালের কবলে কে না পড়েছে? কোন্ যাচক গৌরবের অধিকারী হয়েছে? দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পড়ে কোন্ পুরুষ মঙ্গলমতো নিষ্কৃতি পেয়েছে?

কাকের শুচিতা, দ্যূতকারের সত্যবাদিতা, ক্লীবের শৌর্য, মদ্যপের তত্ত্বচিন্তা, সর্পের ক্ষমা, স্ত্রীলোকের কামোপশম এবং রাজার মিত্রতা কেউ দেখেছে বা শুনেছে কি?

রাজরোষ যার উপর পড়ে, সে সৎ হলেও অসৎ (প্রতিপন্ন) হয়।

শাস্ত্রে সে কথাই বলে :

রাজরোষে শুচি হয় অশুচি, পটু অপটু, বীর কাপুরুষ, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু, কুলীন কুলহীন।

তারপর, মন্ত্রী বধ্যস্থানের দিকে নিয়ে যেতে থাকলে শারদানন্দ এই শ্লোক উচ্চারণ করলেন :

'মানুষের পূর্বেকার পুণ্যরাশিই তাকে বনে, রণে, শত্রুমধ্যে, জলে, অগ্নিতে, মহাসাগরে, পর্বতচূড়ায়, সুপ্ত, প্রমত্ত বা যে কোনো বিষম অবস্থায় পড়লেও রক্ষা করে।'

মন্ত্রী মনে মনে বিচার করলেন, 'হায়! এটা সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ব্রাহ্মণবধ কেন করি? এটা অতীব গর্হিত কাজ।'—এই ভেবে শারদানন্দকে অন্যের অগোচরে গুপ্তকক্ষে নিয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ গৃহে লুকিয়ে রেখে ফিরে এসে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার আজ্ঞা পালন করেছি।'

রাজা বললেন, 'উত্তম কাজ করেছ।' তারপর, একদিন রাজকুমার মৃগয়া করতে বনে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ দেখা গেল।

অকালবৃষ্টি, মৃতাশৌচ, বজ্রপাত, উল্কাপাত প্রভৃতি কুলক্ষণ দেখা গেল এবং তার সঙ্গে পিছনে সুহৃদদের নিষেধ বাক্য শোনা গেল।

সে সময় মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিসাগর বললেন, 'কুমার জয়পাল, আজ মৃগয়ায় যেয়ো না। খুব খারাপ সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

তখন জয়পাল বললেন, 'দুর্নিমিত্তে আমার আস্থা নেই!'

মন্ত্রিপুত্র বললেন, 'হে রাজকুমার, বুদ্ধিমান পুরুষ অনিষ্টকর দুর্নিমিত্ত বিশ্বাস করে চলে।

শাস্ত্রে বলে :

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করবেন না, বিষধর সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া করবেন না, যোগীদের নিন্দা করবেন না এবং ব্রহ্মহিংসা করবেন না।'

এভাবে বারণ করলেও বুদ্ধিসাগরের বাক্য না শুনে রাজকুমার মৃগয়ায় গেলেন। নির্গমনকালে মন্ত্রিপুত্র এ কথাও বললেন, 'কুমার জয়পাল, তোমার বিনাশকাল সমাসন্ন,

নইলে এমন বুদ্ধি হয় না।

পূর্বে কেউ কোনোদিন সোনার হরিণ ধরে নি, কেউ পূর্বে দেখেও নি, কেউ শোনেও নি। তবুও রঘুনন্দনের লোভ হল, বিনাশকালে অমনি বিপরীত বুদ্ধি হয়।

উপার্জিত কর্মফল ভোগ না করলে শেষ হবে কেমন করে?

বেশ্যাদের সদ্ভাব নেই, সম্পদের স্থায়িত্ব নেই, মূর্খদের বিবেচনা নেই, [illegible] ছাড়া কৃতকর্মের ক্ষয়ও নেই।'

যা হোক, রাজকুমার বনে গিয়ে বহু হিংস্র জন্তু শিকার করে এক কৃষ্ণসার হরিণ দেখতে পেয়ে তার পিছু ধাওয়া করতে করতে বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করলেন। যখন খেয়াল হল, দেখলেন সঙ্গে কেউ নেই। সৈন্যরা তখন নগরের পথ ধরেছে। এদিকে কৃষ্ণসারকেও আর দেখা যাচ্ছিল না। অগত্যা একা ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে একটি সরোবর দেখতে পেলেন. সরোবরের সম্মুখে বন। সেখানে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন, গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধলেন, সরোবরে জল পান করে গাছের ছায়ায় মাটিতে যখন বসেছেন, তখন অতি ভয়ংকর এক বাঘ এসে হাজির। বাঘ দেখে বাঁধন ছিঁড়ে ঘোড়া পালাল ছুটে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠল নগরের পথে। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাল ধরে গাছে উঠলেন। সেই গাছে আগে থেকেই উঠে বসে ছিল এক ভালুক। তাকে দেখে এক রাজপুত্র আবারো ভীষণ ভয় পেলেন; কিন্তু সেই ভালুক বলল, 'ওহে রাজকুমার, তুমি ভয় পেয়ো না। আজ তুমি আমার শরণাগত, অতএব আমি কোনো অনিষ্ট করব না। আমাকে বিশ্বাস করলে বাঘের থেকেও ভয় নেই।'

রাজপুত্র বললেন, 'হে ঋক্ষরাজ, আমি তোমার শরণাগত, বিশেষ করে, ভয়ে ভীত। অতএব শরণাগতকে রক্ষা করে তুমি মহৎ পুণ্য লাভ করবে।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

একদিকে সহস্রবিধ উত্তম দক্ষিণাসমন্বিত সমস্ত যজ্ঞ এবং অন্যদিকে ভয়ভীত প্রাণীদের প্রাণরক্ষা—দুয়েতেই সমান পুণ্য।'

তখন ভালুক রাজপুত্রকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিল। বাঘও এসে গাছের তলায় রইল। তারপর সূর্য গেল অস্তাচলে। রাতে অতি শ্রান্ত রাজপুত্র যখন ঘুমিয়ে পড়ছিলেন, ভালুক তাঁকে বলল, 'গাছের নীচে পড়ে যাবে তো, এসো, আমার কোলে ঘুমোও।'

ভালুকের কথামতো রাজকুমার তার কোলে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন বাঘ বলল, "ওহে ভালুক, এই গ্রামবাসী আবার শিকার করতে এসে আমাদের মারবে, এই শত্রুকে কেন মিছে কোলে রেখেছ? এ যে মানুষ।

কথিত আছে ঃ

পশুপাখির মধ্যে যে কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে, মানুষের মধ্যে তা নেই। বাঘ, বানর, সাপের মধ্যেও কথা রাখার যেটুকু প্রমাণ আছে, মানুষের মধ্যে তাও নেই।

তুমি এর উপকার করছ, কিন্তু উপকৃত হয়েও এ তোমার অপকারই করবে। তাই ওকে তুমি নীচে ফেলে দাও। আমি একে খেয়ে ভালোয় ভালোয় চলে যাই। তুমিও তোমার জায়গায় যাও।'

ভালুক বলল, 'এ যে রকম লোকই হোক, আমার এ শরণাগত। একে ফেলে দেব না। শরণাগতকে মারলে মহাপাপ হবে।

যারা বিশ্বাসঘাতক এবং শরণাগতঘাতক, তারা প্রলয় অবধি ঘোর নরকে বাস করে।'

তারপর রাজপুত্রের ঘুম ভাঙল। ভালুক বলল, 'রাজকুমার, আমি একটু ঘুমোব। তুমি সুবধানে থেকো।'

রাজকুমার বললেন, 'ঠিক আছে।' তখন ভালুক রাজপুত্রের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন বাঘ বলল "ওহে রাজকুমার, একে তুমি বিশ্বাস কোরো না, জানো তো নখই এর অস্ত্র।

শাস্ত্রে তো বলেছে ঃ

তীক্ষ্ন নখযুক্ত প্রাণীদের, নদীদের, শৃঙ্গবানদের, শাস্ত্রধারীদের বিশ্বাস করতে নেই, আর বিশ্বাস করতে নেই স্ত্রী ও রাজবংশীয়দের।

এই ভালুকের চিত্ত দেখা যাচ্ছে চঞ্চল। তাই এর অনুগ্রহও ভয়ংকর।

ক্ষণপূর্বে তুষ্ট, ক্ষণপরে রুষ্ট—এমনি ক্ষণে ক্ষণে যারা রুষ্ট এবং তুষ্ট হয়, সেই অস্থিরচিত্তদের অভয়দানও ভয়প্রদ।

এ তোমাকে আমার কাছ থেকে রক্ষা করে নিজে ভক্ষণ করতে চাইছে। কাজেই, ঐ ভালুককে নীচে ফেলে দাও। আমি একে খেয়ে চলে যাব। তুমিও নিজের নগরে ফিরে যাবে।' তার কথা শুনে রাজপুত্র যেই ভালুককে ঠেলে দিয়েছেন নীচে, অমনি পড়তে পড়তে গাছের অন্য একটা ডাল ধরে ভালুক নিজেকে পতনের মুখ থেকে বাঁচাল। তাকে দেখে রাজপুত্র আবার ভয় পেলেন। ভালুক বলল, 'ওরে পাপিষ্ঠ ভয় পাচ্ছিস কেন? পূর্বকৃত কর্মফল তোকে ভোগ করতেই হবে। অতএব তুই পিশাচ হ, আর অনবরত বলতে থাক 'সসেমিরা'—এই অভিশাপ দিলে এদিকে রাতও ভোর হয়ে গেল। বাঘ সেখান থেকে চলে গেল। ভালুকও রাজপুত্রকে অভিশাপ দিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেল।

রাজপুত্রও 'সসেমিরা, সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচ হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল। রাজপুত্রের শূন্য ঘোড়া নগরে ফিরল। লোকেরা শূন্য ঘোড়াকে একাকী ফিরতে দেখে রাজার কাছে গিয়ে সেই সওয়ারহীন ঘোড়ার কথা নিবেদন করল।

রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'অমাত্য, কুমার যখন মৃগয়া করতে বনে যাত্রা করেছিল, তখন বিশ্রী অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তা অগ্রাহ্য করে সে চলে গেল, তার সত্যতাই প্রমাণিত হল এখন, কেননা তার বাহন এই অশ্ব একাকী ফিরে এসেছে। সুতরাং তার অন্বেষণে আমরা বনে যাব।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, সেটাই কর্তব্য।'

তখন রাজা মন্ত্রী ও পরিজনবর্গ সহ যে-পথ দিয়ে রাজকুমার গিয়েছিলেন, সেই-পথেই বনে যাত্রা করলেন। দেখতে পেলেন বনের মধ্যে 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচ হয়ে রাজপুত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে রাজা গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন। যা হোক, পুত্রকে নিয়ে শেষে নিজ নগরীতে ফিরলেন। মণি-মন্ত্র-ঔষধ-বিশেষজ্ঞদের ডেকে তাদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হল, তবু রাজপুত্র সুস্থ হলেন না। রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, 'অমাত্য, আজ যদি শারদানন্দ থাকতেন, তবে ক্ষণমাত্রে তাকে চিকিৎসায় সারিয়ে তুলতেন। তাঁকে আমি মেরেছি। মানুষ যে-কাজ করে, তা বিচার করেই করা উচিত। অন্যথায় পরে বিপদ দেখা দেয়।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

হঠাৎ কিছু করতে নেই, অবিবেচনা পরম আপদের উৎস। সম্পদের গুণের প্রতি

পক্ষপাত আছে বলে স্বয়ং বিমুশকারীকে গিয়ে সে বরণ করে।

ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। না ভেবেচিন্তে কিছু করতে নেই। করলে অনুশোচনা করতে হয়। ব্রাহ্মণী-নকুলের গল্পে যেমন ঘটেছিল।

আমাকে সে সময় কেউ বারণ করবার ছিল না।'

মন্ত্রী বললেন, সে সময়টা ছিল সে-রকমই। যেমন ভবিতব্যতা, তেমনি বুদ্ধি হয়েছিল।

বলা হয় ঃ

ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, সে সময় আশা, বুদ্ধি, মতি, ভাবনা এবং সহায়ও সেরূপ হয়।

তা কোনোমতেই হয় না যা হবার নয়। যা হবার বিনা প্রচেষ্টায়ও তা হয়। যার ভবিষ্যতে থাকার কথা নয়, করতলগত হলেও তা নষ্ট হয়ে যায়।"

রাজা বললেন, 'কর্মানুসারেই তা ঘটেছে। এখন কুমারের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'কী ভাবে ?'

রাজা বললেন, 'যে-কেউ আমার পুত্রকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলবে, তাকে অর্ধেক রাজ্য দান করব। আমার নামে এই ঘোষণা প্রচার করুন।'

মন্ত্রীও তাই করে নিজ বাড়িতে এসে শারদানন্দের সামনে সব বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন। সে-সব শুনে শারদানন্দ বললেন, 'মন্ত্রিবর! রাজার কাছে এমন প্রস্তাব দিন যে, আমার একটি কন্যা আছে। রাজপুত্রকে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। সে একটা উপায় করে দেবে।'

তা শুনে রাজার নিকট মন্ত্রী সে-রকমই বললেন। তখন রাজা সমস্ত সভাসদসহ মন্ত্রীর বাড়িতে এসে বসলেন। সেই সঙ্গে রাজপুত্রও 'সসেমিরা' বলতে বলতে এসে বসলেন।

তা শুনে পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ এই পদ্যগুলি আওড়ালেন ঃ (সদ্ভাব······ পৌরুষম্ ॥)।

যারা সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত, তাদের বঞ্চনা করার মধ্যে কি বিদগ্ধতা আছে ? যে কোলে চড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে হত্যা করার মধ্যে কোন্ পৌরুষ আছে ?

সেই পদ্য শুনে রাজপুত্র চারটি অক্ষরের মধ্যে একটি (অর্থাৎ প্রথম 'স') বাদ দিয়ে 'সেমিরা' 'সেমিরা' বলতে লাগলেন।

তখন শারদানন্দ দ্বিতীয় পদ্য বললেন ঃ (সেতুং·····মুচ্যতে ॥)

সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি হতে পারে, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নেই।

এ পদ্য শুনে রাজপুত্র দুটি অক্ষর (প্রথম দুটি 'সসে') বাদ দিয়ে 'মিরা, মিরা' বলতে লাগল বারংবার।

শারদানন্দ তখন তৃতীয় পদ্য বললেন ঃ (মিত্রদ্রোহী·····সংপ্লবম্ ॥)

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক—এই তিন পাপী প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে।

রাজপুত্রের মুখে তখন আর একটি মাত্র অক্ষর উচ্চারিত হতে থাকল (অর্থাৎ তিনটি 'সসেমি' বাদ গেল, রইল শুধু 'রা'।)

এরপর শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন ঃ (রাজন্‌......কুরু ৷৷)

হে রাজন, আপনার পুত্রের যদি কল্যাণ কামনা করেন, তবে ব্রাহ্মণদের দান ও দেবতাদের আরাধনা করুন।

শারদানন্দ অনুরূপ বললে রাজপুত্র সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হলেন। তখন পিতার নিকট ভালুকের বৃত্তান্ত সব বললেন। তা শুনে রাজা বললেন ঃ

'তুমি তো লোকালয়ে বাস কর কুমারী, বনে তো যাও নি কখনও, বাঘ-ভালুকদের ভাষা তবে জানলে কেমন করে ?'

পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ তখন বললেন, 'দেবদ্বিজের অনুগ্রহে আমার জিহ্বায় সরস্বতীর বাস। তাই তো আমি জানতে পারি মহারাজ, যেমন জেনেছিলাম ভানুমতীর তিল।'

সে কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাজা যেমন পর্দাটি টেনে সরালেন, অমনি শারদানন্দকে দেখতে পেলেন! অনন্তর, নৃপপ্রমুখ সকলেই শারদানন্দকে প্রণাম করলেন। তখন মন্ত্রী পূর্ববৃত্তান্ত করলেন।

রাজা ভূয়োদর্শী মন্ত্রী বহুশ্রুতকে বললেন, হে মন্ত্রিবর, আপনার সংসর্গবশত আমার কীর্তিলাভ হয়েছে, দুর্গতি বিদায় নিয়েছে। তাই মানুষের সৎসঙ্গ করা একান্ত আবশ্যক। তাতে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়।

আরো কি না,

সৎসঙ্গ বর্তমান এবং আগামী উভয় প্রকার অনিষ্ট নিবারণ করে, যেমন গঙ্গাজল পান করলে তৃষ্ণার উপশম এবং দুর্গতির বিনাশ ঘটে।

আমার পুত্রও আপনার বুদ্ধিকৌশলে চরম বিপদ-জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এ রকম মহাবংশজাত সৎপুরুষদের সংগ্রহ করা রাজার কর্তব্য।

তাই তো বলে ঃ

বিষবৈদ্য (সাপের ওঝা) যেমন ভালো ভালো সাপ সংগ্রহ করে, তেমনি রাজাও কুলীন মন্ত্রী সংগ্রহ করবেন এবং এতে তিনি প্রশংসাই পাবেন।'

এইভাবে নানান্ মঞ্জুলমধুর প্রশংসায় মন্ত্রীর স্তুতি করে তাঁকে বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মানিত করে রাজা রাজ্য করতে লাগলেন।

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই আখ্যান শুনিয়ে পুনরায় বললেন, 'হে রাজন, যে-নৃপতি মন্ত্রীর পরামর্শ শোনেন, তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হন।'

৷৷ বহুশ্রুতের উপাখ্যান সমাপ্ত ৷৷

৷৷ প্রথম উপাখ্যান ৷৷

দানশক্তি-বর্ণনা

তারপর, ভোজরাজ নিজ মন্ত্রীর প্রশংসা করে এবং বস্ত্রাদি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে সেই সিংহাসন নগরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তারপর, সহস্র-স্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে শুভ মুহূর্তে মন্ত্রিবর্গ দ্বারা সেখানে পরিবেষ্টিত হয়ে, বেদবিদ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ এবং বন্দীদের স্তবে অভিনন্দিত রাজা দানে মানে চতুবর্ণকে তুষ্ট করে, দীন, বধির, পঙ্গু ও কুব্জদের প্রতি বদান্যতা দেখিয়ে, ছত্র-চামর-শোভিত হয়ে, সিংহাসনে আরোহণ করতে উদ্যত

হয়ে যেই পুত্তলিকা-শীর্ষে পাদপদ্ম স্থাপন করেছেন, অমনি পুত্তলিকা মানুষের ভাষায় রাজাকে বলল,—

'হে রাজন, শৌর্যে, ঔদার্যে ও সত্ত্বাদিগুণে যদি আপনি বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ হন, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা বললেন, 'হে পুত্তলিকা, তুমি যে ঔদার্যাদি গুণের কথা বললে, সে সবই আমার আছে। আমি কম কিসে? আমিও সমস্ত প্রার্থীদের কালোচিত দান দিয়ে থাকি।'

পুত্তলিকা বলল, 'হে রাজন, নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করছেন এটা আপনার অনুচিত। যে নিজগুণকীর্তন করে, সে তো দুর্জনমাত্র, সজ্জন কিন্তু এমন বলেন না।

শাস্ত্রে বলে :

সংসারে নিজের গুণ এবং পরের দোষ রটনা করতে পারে দুর্জন। পরের দোষ আর নিজের গুণের কথা সজ্জন সত্যি বলতে পারেন না।

অন্য দিকে,—

আয়ু, বিত্ত, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান—এই ন'টি বিষয় সর্বদা গোপন রাখতেই হয়।

অতএব, নিজমুখে নিজের গুণের প্রশংসা করতে নেই, অন্যদের নিন্দাও করতে নেই।'

পুত্তলিকার এই উক্তি শুনে বিস্ময়ান্বিত ভোজরাজ পুত্তলিকাকে পুনরায় বললেন, 'সত্য কথাই বলেছ তুমি—যে স্বগুণকীর্তন করে সে মূর্খই বটে। আমি আমার গুণের কথা বলেছি, সেটা অনুচিতই হয়েছে। এ সিংহাসন যাঁর, তুমি তাঁর ঔদার্যের কথা বল।'

পুত্তলিকা বলল, 'হে রাজন, এ সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি সন্তুষ্ট হলে যাচকদের কোটি সুবর্ণমুদ্রা দান করতেন।

চোখে পড়লেই যাচককে সহস্র, কাতরতা প্রকাশ করলে অযুত, মহাপুরুষকে লক্ষ এবং সন্তুষ্ট হলে কোটি সুবর্ণ দিয়ে বসতেন।

যদি আপনার মধ্যে যথার্থ ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা নীরব রইলেন।

॥ বিক্রমার্ক-চরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে প্রথম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দ্বিতীয় উপাখ্যান ॥

বিপ্রমনোরথ-পূরণ

আবার যেই ভোজরাজ পুতুলের মাথায় পা রেখে সিংহাসনে উঠতে যাচ্ছিলেন, অমনি দ্বিতীয় পুতুলটি বলে বসল, 'হে রাজন, বিক্রমাদিত্যের মতো শৌর্য, ঔদার্য এবং ধৈর্যাদি গুণ যদি আপনার থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।'

ভোজরাজ বললেন, 'ওহে পুতুল, বল সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের বৃত্তান্ত।'

পুতুল বলতে লাগল, 'শুনুন মহারাজ! রাজ্য পালন করতে করতে বিক্রমাদিত্য একদিন চরদের ডেকে বললেন :

এই যে দূতেরা, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে যেখানে যা মজার জিনিস বা

তীর্থবিশেষ দেখতে পাবে, আমাকে এসে বলবে। আমি সেখানে যাব।

এমনিভাবে কিছুকাল কেটে গেলে একদিন দেশান্তর পরিভ্রমণ সেরে এক দূত এসে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, চিত্রকূট পর্বতের নিকটে তপোবনের মধ্যে অতি সুন্দর এক দেবালয় আছে। সেখানে পর্বতের উপর থেকে স্বচ্ছ জলধারা পড়ে। সেখানে স্নান করলে সমস্ত মহাপাপ ক্ষয় হয়। যে মহাপাপ করে, তার গা থেকে অত্যন্ত কালো জল বেরোয়। যে সেখানে স্নান করার সৌভাগ্য পায়, সে পুণ্যাত্মা।

আর, সেখানে এক ব্রাহ্মণ বিরাট হোমকুণ্ডে হোম করছেন। কত বছর তার অমনি করে কেটেছে, কেউ জানে না। প্রতিদিন কুণ্ডের বাইরে রাখা ভস্ম পর্বতাকার ধারণ করেছে। সে ব্রাহ্মণ কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এমনি বিচিত্র এক স্থান আছে দেখেছি।'

তা শুনে রাজা একাকী তার সঙ্গে সেই স্থানে গিয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন। এ স্থান অতি পবিত্র, সাক্ষাৎ জগদম্বা এখানে বাস করেন। এ স্থান দর্শন করে আমার হৃদয় নির্মল হয়েছে।'—এই বলে উচ্চস্থান থেকে প্রস্রুত জলধারায় স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে যেখানে ব্রাহ্মণ হোম করছিলেন, সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, হোম আরম্ভের পর কত বৎসর গত হয়েছে?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতীনক্ষত্রের প্রথম চরণে অবস্থান করছিল, তখন আরম্ভ করেছি এই হোম ; এখন তো সপ্তর্ষি অশ্বিনীনক্ষত্রে অবস্থান করছে, হোম করতে করতে একশত বৎসর অতীত হয়ে গেছে, তবুও দেবতা প্রসন্ন হলেন না।'

তা শুনে রাজা স্বয়ং দেবতা স্মরণ করে হোমকুণ্ডে আহুতি নিক্ষেপ করলেন। তবুও দেবী প্রসন্ন হলেন না। এর পর রাজা স্থির করলেন, 'নিজের মস্তকাম্বুজ আহুতি দেব।' এই সংকল্প করে যে-মুহূর্তে গ্রীবায় খড়্গাঘাত করবেন, সেই মুহূর্তে দেবতা অদৃশ্য থেকে খড়্গ ধারণ করে বললেন, 'হে রাজন, প্রসন্না হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।' রাজা বললেন, 'হে দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল হোম করছেন, এঁর প্রতি কেন প্রসন্ন হচ্ছেন না? আমার প্রতিই বা শীঘ্র কেন প্রসন্ন হলেন?'

দেবী বললেন, 'হে রাজন, এ হোম করছে ঠিকই, কিন্তু এর চিত্তে একাগ্রতা নেই ; তাই প্রসন্না হচ্ছি না।

কথিত আছে :

আঙুলের আগায় জপ, মেরু পেরোতে জপ, ব্যগ্রচিত্তে জপ—তিন রকম জপই নিষ্ফল হয়।

মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেব, দৈবজ্ঞ, ঔষধ এবং গুরু—এদের প্রতি যার যেমন ভাবনা, তেমনি সিদ্ধি ঘটে থাকে।

বলতে গেলে, দেবতা কাষ্ঠেও থাকেন না, পাষাণেও থাকেন না, মৃন্ময়ী প্রতিমাতেও থাকেন না, থাকেন ভাবে। অতএব অন্তরের ভাবই হচ্ছে সিদ্ধির কারণ।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এই ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করুন।'

দেবী বললেন, 'হে রাজন, পরোপকারী মহামহীরুহের মতো নিজের দেহক্লেশ সহ্য করে তুমি পরের শ্রম অপনোদন করছ।

পদ্যে তো রয়েইছে :

অনকে ছায়া দেয়, নিজেরা থাকে রোদে এবং সত্যি মহাবৃক্ষেরা যে ফল ধারণ করে তাও পরের জন্যে।

নদীরা বয়ে যায় পরের জন্যে, গাভীরা দুধ দেয় পরের জন্যে, পরের জন্যে গাছে ধরে ফল—পরোপকারের জন্যেই এদের শরীরধারণ।'

এইভাবে রাজার প্রশংসা করে ব্রাহ্মণের অভিলাষ দেবী পূরণ করলেন। রাজাও নিজের নগরীতে ফিরে গেলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'রাজন, এই প্রকার ধৈর্য যদি আপনার থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।'

॥ দ্বিতীয় উপাখ্যান শেষ ॥

॥ তৃতীয় উপাখ্যান ॥

সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ

পুনরায় ভোজরাজ যেমন সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, অমনি আরেক পুতুল বলে উঠল, 'রাজন, এই সিংহাসনে তাঁরই বসা উচিত যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্য আছে।' ভোজরাজ বললেন, 'বেশ, পুতুল, তুমি তবে তাঁর ঔদার্যের কথা বল।' পুতুল বলল, 'শুনুন তবে মহারাজ। বিক্রমার্কের মতো রাজা ভূমণ্ডলে নেই। তাঁর মনে এ আপন, এ পর—এ রকম বিসদৃশ ভাবনার কোনো স্থান ছিল না। সমগ্র বিশ্বকেই তিনি আপন করেছিলেন।

শাস্ত্রে বলেছে না—

এ আপন, এ পর—এ রকম ভাবনা সংকীর্ণচিত্তেরা করে। উদারচিত্তদের কাছে সমস্ত বসুধাই আত্মীয়।

সাহস, উদ্যম ও ধৈর্যে তাঁর তুল্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাই ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁকে সাহায্য করতেন।

কেননা,

উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম—এই ছ'টি গুণ যাঁর থাকে, দেবতাও তাঁকে ভয় পায়।

রাজন, যিনি প্রার্থীদের মনোরথ পূর্ণ করেন, তাঁর অভিলাষ পূরণ করেন দেবতা।

সংকল্প সঠিক হলে মানুষের ইচ্ছা ভগবান বিষ্ণুই পূরণ করেন। যাঁর সংকল্পে এবং কার্যে দৃঢ়তাগুণে আছে, সে-ই যথার্থ মানুষ।

উৎসাহী, অদীর্ঘসূত্রী, ক্রিয়াবিধিকুশল, অব্যসনী, শূর, কৃতজ্ঞ এবং দৃঢ়নিশ্চয় পুরুষকে লক্ষ্মী স্বয়ং স্বীয় আশ্রয়রূপে মনোনীত করেন।

অনুরূপ সকল গুণের আশ্রয় সেই রাজা বিক্রমাদিত্য সর্বসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে এক সময় মনে মনে চিন্তা করলেন, 'হায়, এ সংসার অসার, কার যে কখন কী হয় জানা যায় না। যেহেতু, উপার্জিত বিত্ত দান ভোগ বিনা সফল হয় না, তাই সৎপাত্রে দান বিত্তের পরম ফল, অন্যথা বিত্তের বিনাশ ঘটে।

কথিত আছে :

দান, ভোগ এবং নাশ—বিত্তের তিন গতি। সম্পদ থাকতে যে কাউকে দেয় না বা

নিজে ভোগ করে না, সে তার সম্পদই নয়।

অতি বেগবান বায়ু-তাড়িত দীপশিখার মতো লক্ষ্মী চঞ্চলা। ফলে, দীঘির ভেতরের জল বাইরে তুলে এনে ফেলাই যেমন দীঘি-রক্ষার উপায়, তেমনি উপার্জিত বিত্তের ত্যাগই তার রক্ষার উপায়।

এই রকম বিচার করে 'সর্বস্বদক্ষিণ' যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তার জন্যে শিল্পীদের দিয়ে অতি মনোহর এক মণ্ডপ তৈরি করালেন।

সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী যোগাড় হল। দেব, মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ প্রমুখ সকলকে আমন্ত্রণ করা হল।

এমন সময় সমুদ্রকে আমন্ত্রণ জানাতে এক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রতীরে পাঠানো হল। সে সমুদ্রতীরে গিয়ে গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারে সমুদ্রকে পূজা করে বলল, 'হে সমুদ্র, বিক্রমাদিত্য রাজা রাজত্ব করছেন, তিনিই পাঠিয়েছেন আমাকে, আমি এসেছি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে'—এই বলে জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল। কেউ তার কথার কোনো উত্তর দিল না। তাই সে যখন উজ্জয়িনীতে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সমুদ্র জ্যোতির্ময়শরীর এক ব্রাহ্মণরূপে তার সামনে এসে বলল, 'হে ব্রাহ্মণ, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে আপনাকে পাঠিয়েছেন, এতে তিনি যে সম্মান আমাকে দিতে চেয়েছেন, তা আমি পেয়ে গেছি। এটাই সুহৃদের লক্ষণ যে তিনি সময়োপযোগী দান-মান করতে জানেন।

কথিত আছে ঃ

দান, প্রতিগ্রহ, গোপন কথা বলা, কুশল জিজ্ঞাসা করা, খাওয়া এবং খাওয়ানো—এই ছয়টি হল প্রীতির লক্ষণ।

সুহৃদ দূরে থাকলে মৈত্রী নষ্ট হবে, আর কাছে থাকলে মৈত্রী বাড়বে, এমন বলা যায় না। এক্ষেত্রে স্নেহই প্রমাণ।

মনের মধ্যে যার ঠাঁই, থাক না দূরে, তবু সে কাছে। কিন্তু, যার ঠাঁই মন থেকে দূরে, সে কাছে থাকলেও দূরে।

পাহাড়ে ময়ূর আকাশে মেঘ ; লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে সূর্য, নীচে জলে পদ্ম ; চাঁদে ও কুমুদে দুলক্ষ যোজন ব্যবধান ; তবু যে যার মিত্র, সে তো তার দূরের নয়।

সুতরাং সর্বদিক থেকেই যাওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু এখানে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। মহাযজ্ঞে ব্যয়ের জন্যে সেই রাজাকে আমি চারটি রত্ন দিচ্ছি এদের মাহাত্ম্য হল—প্রথম রত্ন, যা স্মরণ করবেন, তাই দান করবে। দ্বিতীয় রত্ন, অমৃত-তুল্য আহার্যাদি উৎপন্ন করবে। তৃতীয় রত্ন থেকে পাবেন অশ্ব-রথ-পদাতিকযুক্ত চতুরঙ্গ সেনা। চতুর্থ রত্ন থেকে জন্মাবে দিব্য অলংকারসমূহ।

তাই তুমি এই রত্নচারটি নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে দাও। তারপর, ব্রাহ্মণ সেই রত্নগুলি নিয়ে যখন উজ্জয়িনীতে ফিরল, তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। রাজা পুণ্যস্নান সমাপন করে অর্থীদের মনোরথ পূরণ করেছেন। ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রত্নগুলি দিয়ে তাদের প্রত্যেকের গুণ বর্ণনা করল।

তখন রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি যজ্ঞ-দক্ষিণার কাল অতিক্রান্ত হলে এসেছেন। আমি সমস্ত ব্রাহ্মণকেই দক্ষিণা-দানে তুষ্ট করেছি। তাই আপনি, এই চার রত্নের মধ্যে যেটা আপনার পছন্দ, তাই নিয়ে নিন।'

ব্রাহ্মণ বলল, গৃহে গিয়ে গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ—এদের জিজ্ঞেস করি। তারপর, সকলের যা পছন্দ, তাই নেব।'

রাজা বললেন, 'তাই করুন।'

ব্রাহ্মণ তখন নিজ গৃহে গমন করে পরিজনদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানালো। তা শুনে পুত্র বলল, 'যে-রত্নটি চতুরঙ্গসেনা দেবে, তাই নেব। তাতে সুখে রাজত্ব করা যাবে।'

পিতা বলল, 'যে বুদ্ধিমান সে রাজ্য চায় না। কারণ, রামের বনযাত্রা, বলির পাতাল-বাস, পাণ্ডবের বনবাস, বৃষ্ণিবংশীয়দের নিধন, নলরাজার রাজ্যচ্যুতি, সৌদাসের সেই শোচনীয় দশা, কার্তবীর্য-অর্জুনের হত্যা এবং লঙ্কেশ্বরের লাঞ্ছনা—রাজ্যের জন্যে এত বিড়ম্বনার কথা ভেবে বুদ্ধিমান রাজ্য চায় না।'

পুনরায় পিতা বললেন, 'যা ধন দেবে সেটিই নাও। ধন থাকলে সবই পাওয়া যায়।

বলে না—

জগতে তেমন কিছু নেই যা ধন দিয়ে পাওয়া যায় না। এটা বুঝেশুনে বুদ্ধিমান তাই অর্থটাই কেবল চায়।

ব্রাহ্মণের ভার্যা বলল, 'যে রত্ন ছয় প্রকার রসের আহার্য উৎপন্ন করে, তাই গ্রহণ করা উচিত। সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণ অন্নের সাহায্যেই হয়।

শাস্ত্রে বলছে : বিধাতা মর্তপ্রাণীদের জীবনধারণের জন্যে অন্ন সৃষ্টি করেছেন। তাই অন্ন ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা করা উচিত নয়।'

পুত্রবধূ বলল, 'যে-রত্নটি দিব্যরত্নালঙ্কার উৎপন্ন করে, সেটিই নিতে হবে।'

শাস্ত্রেই তো বলেছে :

যথাশক্তি যত্নসহ সুন্দর সুন্দর ভূষণ ধারণ করে নিজেকে সাজাবে। নির্মল শুভ্র বসন যেমন সৌভাগ্য, আয়ু এবং লক্ষ্মীবৃদ্ধির অনুকূল, তেমনি বাস-রূপ-বিভূষণ সুহৃদগণের কল্যাণকর। রত্নধারণে দেহের সজ্জাও হয়, দেবতাদের তুষ্টিও হয়।

এইভাবে চারজনের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধল। তখন ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে চারজনের বিবাদের বিষয় নিবেদন করল। রাজা তাই শুনে, সেই ব্রাহ্মণকে চারটি রত্নই দিয়ে দিলেন।'

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল রাজাকে বলল, 'হে রাজন, ঔদার্য সহজাত গুণ, কোনো উপাধির সহায়তায় তা পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ তা বহিরঙ্গ কোনো বস্তু-সাপেক্ষ নয়।

চম্পককুসুমে যেমন গন্ধ, মুক্তাফলে যেমন কান্তি, ইক্ষুদণ্ডে যেমন মাধুর্য, তেমনি মানুষের মধ্যে ঔদার্য স্বভাবতই হয়ে থাকে।

আপনার যদি এ রকম ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

তা শুনে ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন।

॥ অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে তৃতীয় উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্থ উপাখ্যান ॥

কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা

পুনর্বার সিংহাসনে উপবেশন-মুহূর্তে অন্য এক পুতুল বলল, 'রাজন, শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদা এক ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় বিচক্ষণ এবং সমস্ত গুণে

বিভূষিত হলেও পুত্রলাভে বঞ্চিত হলেন। একদিন তাঁর ভার্যা বললেন, 'প্রাণবল্লভ, পুত্র বিনা গৃহস্থের গতি নেই—স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা এ কথা বলেন। যেমন—
অপুত্রকের গতি নেই, স্বর্গ 'নৈব নৈব চ'। অতএব পুত্রমুখ দেখা চাই-ই। পুত্রলাভ করে মানুষ তারপর তপস্বী হয়। রাতকে আলোকিত করে চাঁদ, প্রভাতকে আলোকিত করে সূর্য, ত্রিভুবনকে উজ্জ্বল করে ধর্ম। সেইরকম বংশের প্রদীপ হল সৎপুত্র। গজের শোভা মদবারিতে, জলের শোভা পদ্মে, রাতের শোভা পূর্ণিমার চাঁদে, নারীর শোভা স্বভাবে, অশ্বের শোভা গতিতে, মন্দিরের শোভা নিত্য উৎসবে, বাক্যের শোভা ব্যাকরণ-সংস্কারে, নদীর শোভা হংসমিথুনে, সভার শোভা পণ্ডিতসমাবেশে, ত্রিলোকের শোভা সূর্যে, তেমনি বংশ এবং বসুমতীর শোভা সৎপুত্রে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'প্রিয়ে, সত্যকথা বলেছ তুমি। কিন্তু উত্তম অধ্যবসায় বলে দুর্লভ দ্রব্যও লাভ করা যায়। গুরুশুশ্রূষার ফলে বিদ্যাও লাভ করা যায়। কিন্তু যশ ও সন্ততি পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

হৃদয়ে যদি নিরন্তর সুখাভিলাষ থাকে তবে অতি দৃঢ় নিষ্ঠাভরে ভবানীবল্লভকে ভজনা করতে হবে।'

ভার্যা বলল, 'আপনি সব শাস্ত্রজ্ঞ, সুতরাং পরমেশ্বরের অনুগ্রহের জন্যে কোনো ব্রতাদির অনুষ্ঠান করুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমিও তোমার বাক্যে স্বীকৃতি দিলাম। কারণ, বালকের নিকট থেকেও বিদ্বান ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু যুক্তিহীন বাক্য বৃদ্ধের কাছ থেকেও গ্রাহ্য নয়।'—এই বলে ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের প্রীতিলাভের জন্যে রুদ্রানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তারপর একদিন রাতে জটামুকুটধারী বৃষবাহন পরমেশ্বর সেই ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তুমি প্রদোষব্রতের আচরণ কর। ঐ ব্রত আচরণ করলে তোমার পুত্র হবে।' পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদের কাছে নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন।

তাঁরা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এ স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। স্বপ্নাধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ধেনু, পিতৃপুরুষ, সন্ন্যাসী ও রাজা স্বপ্নে যা বলেন, সত্য বলেই জানবে। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করলে তোমার পুত্রলাভ হবে।'

তাঁদের পরামর্শমতো ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবারে কল্পশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধানানুসারে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তার ফলে পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুত্র দান করলেন।

পুত্র জন্মালে ব্রাহ্মণ তার জাতকর্ম সংস্কার সমাপন করে দ্বাদশ দিবসে তার 'দেবদত্ত' এই নামকরণ করলেন। তারপর যথাকালে অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি সংস্কার সম্পাদন করলেন। উপনয়নের পর বেদশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়ে ষোল বৎসর বয়সে গোদান করে তার বিবাহ দিয়ে নিজে তীর্থযাত্রা করতে ইচ্ছুক হয়ে পুত্রকে বুদ্ধিপ্রদ উপদেশ দিলেন ঃ

'হে পুত্র, অতি কষ্টে পড়লেও স্বধর্মাচরণ ছেড়ো না। অন্যের সঙ্গে বিবাদ কোরো না। সর্বজীবে দয়া করবে। পরমেশ্বরে ভক্তি করবে। বলবানের সঙ্গে বিরোধ কোরো না। ধর্মজ্ঞদের অনুসরণ করবে। প্রস্তাব অনুসারে বক্তব্য রাখবে। নিজ বিত্ত অনুযায়ী

ব্যয় করবে। সজ্জনদের সেবা করবে। দুর্জনদের পরিহার করবে। স্ত্রীদের নিকট গোপন তথ্য বলবে না।'

এইভাবে অনেক প্রকারে পুত্রকে হিতোপদেশ দান করে ব্রাহ্মণ বারাণসী গমন করলেন। দেবদত্তও পিতার উপদেশ পরিপালন করে সেই নগরেই অবস্থান করতে লাগল। একদিন যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে যখন সমিধ ছেদন করছিল, তখন রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়া করতে সেই অরণ্যে এসেছিলেন। একটি শূকরের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট রাজা পথ চিনতে না পেরে দেবদত্তকে নগরের পথ জিজ্ঞেস করলেন। দেবদত্ত তখন নিজে আগে আগে চলে রাজাকে নগরে নিয়ে এলো। দেবদত্তকে রাজা বহু প্রকারে সম্মানিত করে একটি বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করলেন। তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। একদিন রাজা বললেন, 'কেমন করে আমি দেবদত্তের কৃত উপকার থেকে ঋণমুক্ত হব, যেহেতু এ আমাকে গভীর অরণ্যের মধ্য থেকে লোকালয়ে নিয়ে এসেছিল।' সেই সময়ে একজন বললেন, 'সত্যি, এই সৎপুরুষ কৃতোপকার ভোলেন না।

কথিত আছে ঃ

প্রথম বয়সে সামান্য জল পান করেছে—এই কথাটা মনে রেখে নারকেল গাছ মাথায় ফলের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যাবজ্জীবন অমৃততুল্য জল দান করে থাকে। সাধু ব্যক্তিরা জীবনে কৃতোপকার কখনও ভোলেন না।'

ব্রাহ্মণ রাজার সেই বাক্য শুনে ভেবে দেখল, 'তাই তো, রাজা এ রকম বলছেন। কিন্তু তা সত্য কি মিথ্যা তার প্রমাণ পেতে হবে।' এই ভেবে, সকলের অগোচরে রাজকুমারকে এনে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে ভৃত্যের হাতে তার অলংকারগুলি দিয়ে বিক্রয়ের জন্যে নগরে পাঠিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে রাজবাড়িতে 'রাজপুত্রকে কোনো চোর হত্যা করেছে'—এই মহা কোলাহল শুরু হল। রাজাও নিজপুত্রের অন্বেষণে সমস্ত রাজপুরুষকে পাঠালেন। তারপর, তারা যখন বিপণিতে সন্ধান করছিল, তখন অলঙ্কার হাতে দেবদত্তের ভৃত্যকে দেখতে পেল। এরপরে, সেই অলংকার রাজপুত্রের—এটা জানতে পেরে তাকে বন্দী করে রাজার কাছে তারা নিয়ে এলো। পরে রাজভৃত্যেরা বলতে লাগল, 'রে পাপিষ্ঠ, বল্ কী করে এ অলঙ্কার তোর হাতে এলো?'

সে বলল, 'আমার হাতে ব্রাহ্মণ দেবদত্ত দিয়েছেন। আমি তাঁর ভৃত্য। তিনি বললেন—এই অলঙ্কার বিপণিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে অর্থ নিয়ে এসো।'

তখন রাজা দেবদত্তকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে দেবদত্ত, এই অলংকার তোমার হাতে কে দিল?'

দেবদত্ত বলল, 'কেউ দেয় নি। আমিই ধনলোভে কুমারকে হত্যা করে তার সমস্ত অলংকার নিয়ে তার মধ্যে থেকে এই একটি অলঙ্কার এর হাতে বিক্রয়ের জন্যে দিয়েছিলাম। এখন আপনার যা অভিরুচি তাই করুন, কর্মবশে আমার এমন বুদ্ধি ঘটেছে।' এই বলে অধোমুখ হয়ে রইল সে। তার কথা শুনে রাজা নিশ্চুপ রইলেন। তখন সভাস্থ কেউ কেউ বলল, 'আশ্চর্য! সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ হয়েও এ লোকের কেমন করে এমন পাপকর্মে মতি হল?' অন্য একজন বলল, 'আশ্চর্যের কী আছে, নিজ কর্মবশে এর এমন মতি হয়েছে।

বলে না—প্রাজ্ঞজনও প্রাক্তন কর্ম দ্বারা চালিত হয়ে কী না করে? মানুষের বুদ্ধি প্রায়শই কৃতকর্মের অনুযায়ী হয়।'

সেখানে সমাগত সভাসদেরা বললেন, 'মহারাজ, এ ব্যক্তি শিশুহত্যাকারী এবং স্বর্ণ-চোর। অতএব খদিরকাষ্ঠনির্মিত শূলে আরোহণ করিয়ে একে হত্যা করা উচিত।' তখন অন্য মন্ত্রীরা বললেন, 'ওকে শতখণ্ড করে কেটে ওর মাংস শকুনিদের উপহার দেওয়া হোক।' তাঁদের মন্তব্য শুনে রাজা বললেন, মাননীয় সভাসদগণ, এ ব্যক্তি আমার আশ্রিত এবং অতীতে নগরের পথ প্রদর্শন করায় আমার উপকারীও। অতএব সজ্জনের উচিত নয় আশ্রিতজনের গুণ-দোষ বিচার করা।

তাই বলা হয়েছে ঃ

যে-চন্দ্র ক্ষয়রোগী (ক্ষয়শীল), স্বভাবত বক্রতনু (বর্তুল), জড়াত্মা (জলময়) এবং মিত্রবিপৎকালে (সূর্যের অস্তসময়ে) দোষের আকর (রাতের প্রদীপ), তাকেও মহাদেব মাথায় ঠাঁই দিয়েছেন। আশ্রিতদের বেলায় মহান পুরুষেরা গুণ-দোষ চিন্তা করেন না।

আরও কথা—উপকারীর সঙ্গে যাঁর সদ্ভাব, তাঁর সাধুত্বের মাহাত্ম্য কোথায়? অপকারীর প্রতিও যে সদ্ব্যবহার করে, সজ্জনেরা তাঁকেই বলেন সাধু।'

এই কথা বলে দেবদত্তকে বললেন, 'হে দেবদত্ত, তুমি মনে কোনো ভয় কোরো না। আমার পুত্র পূর্বজন্মকৃত প্রবলতর কর্মফলদোষে মারা গিয়েছে। তুমি কী করবে? যেহেতু, প্রাক্তন কর্ম কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না।

তা যেমন ঃ

মাতা লক্ষ্মী, পিতা বিষ্ণু, স্বয়ং বিষমায়ুধ (পঞ্চবাণ), তবুও মদন শম্ভুর ক্রোধানলে দগ্ধ হলেন। প্রাক্তন কে লঙ্ঘন করতে পারে?

মহারণ্যে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে নগরে এনে যে মহা-উপকার করেছ, সহস্র প্রত্যুপকার করেও আমি তা পরিশোধ করতে পারব না।' এইভাবে আশ্বস্ত করে বস্ত্র-অলংকার প্রভৃতি দিয়ে সম্মানিত করে দেবদত্তকে বিদায় জানালেন।

তখন দেবদত্ত সেই রাজকুমারকে এনে রাজার কাছে দিল। সবিস্ময়ে রাজা বললেন, 'এ কী!' দেবদত্ত বলল, 'আপনি পূর্বে একদিন বলেছিলেন, 'দেবদত্তের কৃত উপকারের ঋণ থেকে আমি কিছুতেই মুক্ত হতে পারব না।' তাই আপনার স্বভাব পরীক্ষা করতে আমি এ কাজ করেছি। আপনার উপর আমার অটুট আস্থা জন্মেছে।'

রাজা বললেন, 'যে কৃতোপকার বিস্মৃত হয়, সে তো নরাধম।'

দেবদত্ত বলল, 'মহারাজ, বিনা কারণেই আপনি সকল জগতের উপকারী। অতএব জগতে আপনিই যথার্থ সুজন।

তাই বলা হয়েছে ঃ

পরের হিতৈষণা নিয়ে যাঁরা বেঁচে থাকেন, তাঁরাই সুজন, তাঁরাই সুধন, তাঁরাই কৃতী, তাঁরাই সুখী।'

এই কাহিনী শেষে পুতুল রাজাকে বলল, 'এই রকম পরোপকার-ধৈর্য-ঔদার্যাদি গুণ যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

ভোজরাজ নীরব রইলেন।

॥ চতুর্থ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

। পঞ্চম উপাখ্যান ।

মণিকার-পঞ্চরত্ন-দান-কথা

এবার আরেক পুতুল বলল, 'রাজন, শুনুন। বিক্রমার্কের রাজত্বকালে একদিন জনৈক রত্নবিক্রেতা বণিক এসে একটি অমূল্য রত্ন রাজার হাতে দিলেন। রাজা দেদীপ্যমান সেই রত্নটি দেখে পরীক্ষকদের ডেকে এনে বললেন, 'এই-যে পরীক্ষক মহোদয়গণ! এই রত্নটি কেমন—উৎকৃষ্ট না অপকৃষ্ট এবং এর মূল্য কত হতে পারে তা নির্ণয় করুন।' তারা সেই রত্ন পরীক্ষা করে বলল, 'মহারাজ, এ রত্ন অমূল্য। এর সঠিক মূল্য না জেনে যদি আমরা মূল্য নির্ধারণ করি, তবে সেটা আমাদের পক্ষে গর্হিত অন্যায় হবে।'

তাদের কথা শুনে রাজা বণিককে অনেক অনেক দ্রব্য দিয়ে বললেন, 'হে বণিক, এ রকম রত্ন আর আছে কি?' বণিক বললেন, 'মহারাজ, এ রকম রত্ন এখানে আনা হয় নি। তবে, আমার আবাসে এ রকম দশটি রত্ন আছে। যদি প্রয়োজন থাকে, তবে তাদের মূল্য নির্ধারণ করে, নিয়ে নিন।' তারপর পরীক্ষকেরা সেই এক-একটি রত্নের মূল্য নির্ধারণ করলেন ছ'কোটি সুবর্ণ মুদ্রা। রাজা সেইমতো স্বর্ণমুদ্রা সেই বণিককে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসী এক মণিকারকে পাঠালেন। আর বললেন 'হে মণিকার, আট দিনের মধ্যে রত্নগুলো নিয়ে যদি ফিরে আসো, তবে উচিত পারিতোষিক তোমাকে দেব।'

সে বলল, মহারাজ, আট দিনের মধ্যেই আপনার চরণ দর্শন করব। অন্যথায় আমাকে দণ্ড দেবেন।' এই বলে মণিকার সেই বণিকের সঙ্গে তাঁর বাস যে-নগরে, সেখানে গেল। সেখানে বণিক তাকে দশটি রত্ন দিলেন। সেগুলো নিয়ে মণিকার যখন পথ দিয়ে আসছিল তখন প্রবল বৃষ্টি এলো। সেই বৃষ্টিতে নদীর দুই পার উপচে জল বইতে লাগল। তাই সে অপর পারে যেতে না পেরে নাবিককে বলল, 'ওহে কাণ্ডারী, আমাকে নদীটা পার করিয়ে দাও।' কাণ্ডারী বলল, 'এ নদী কূলপ্লাবিনী হয়েছে। কেমন করে পার করি? প্রবল নদী পেরোবার চেষ্টা বুদ্ধিমান করে না।

কথিত আছে-মহানদী পেরোনো, মহাপুরুষের মূর্তি ও মহাজনের সঙ্গে বিরোধ—এ তিনটিকে দূর থেকে ত্যাগ করা কর্তব্য।

আর, নারীদের চরিত্রে, পূর্ণ নদীর প্রবাহে, রাজার আদরে এবং বণিকের স্নেহে—কোনোটাতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। এ তো বলাই আছে ঃ

নখযুক্ত প্রাণী, নদী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রধারী তথা স্ত্রী ও রাজকুলে কখনই বিশ্বাস করা সমীচীন নয়।'

মণিকার বলল, 'ওহে কর্ণধার, তুমি যা বলেছ তা সত্য। তবুও, আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, সাধারণ কাজ থেকে বিশেষ কাজের গুরুত্ব বেশি।

কথিত আছে—

সামান্য কার্য থেকে বিশেষ কার্য বলবত্তর হয়। কিংবা, বিশেষ কার্য, প্রায়শ দেখা যায়, সামান্য কার্যকে বাধা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

আমার ক্ষেত্রে নদী পার হবার প্রয়াস পরিহার সামান্য কার্য। রাজকার্যই বলবান।'

কাণ্ডারী বলল, 'মহৎ রাজকার্যটা কী?' মণিকার বলল, 'আজ দশটি রত্ন নিয়ে রাজার কাছে যদি না যাই, তবে আজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে তিনি আমাকে দণ্ড দেবেন।'

নাবিক বলল, 'তাহলে, ঐ রত্নগুলি থেকে আমাকে যদি পাঁচটা দিয়ে দাও, তবে আমি তোমাকে নদীপার করিয়ে দেব।'

অগত্যা মণিকার সেই নাবিককে পাঁচটি রত্ন দিয়ে নদী পার হয়ে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পাঁচটি রত্ন দিল।

রাজা বললেন, 'ওহে মণিকার, পাঁচটি রত্নই কি এনেছ ? আর পাঁচটি কী করলে ?'

মণিকার বলল, 'মহারাজ, আমার নিবেদন শুনুন—এই নগর থেকে বেরিয়ে সেই বণিকের সঙ্গে তাঁর নগরে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি দশটি রত্ন দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, পথে প্রবল বৃষ্টিতে নদীর দুকূল ছাপিয়ে স্রোত বইছিল। আট দিনের মধ্যে প্রভুর চরণ দর্শন করব প্রতিশ্রুত আছি। অথচ নদী দুস্তর। এমতাবস্থায় নদী পেরোবার জন্যে নাবিককে বাধ্য হয়ে পাঁচটি রত্ন দিতে হল, বাকি পাঁচটি মহারাজের কাছে এনেছি। আট দিনের মধ্যে যদি না আসতে পারতাম, তবে আজ্ঞাভঙ্গ হেতু প্রভুর মনে দুঃখ হত নিশ্চয়ই।

শাস্ত্রে বলে :

নৃপতিদের আজ্ঞাভঙ্গ, ব্রাহ্মণদের মানহানি এবং ভার্যাদের (পতি থেকে) পৃথক শয্যা —এগুলিকে বিনা শস্ত্রে বধ বলে বিবেচনা করা হয়। এ রকম ভেবেই তাকে ওগুলি দিয়েছি।'

রাজাও তা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে অবশিষ্ট পঞ্চরত্ন সেই মণিকারকে দান করলেন।'

কাহিনী শেষ করে পুতুল পুনরায় ভোজরাজকে বলল, 'পরম ঔদার্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন মহাজন বিক্রমাদিত্য। আপনার মধ্যে যদি এইপ্রকার ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

॥ পঞ্চম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ষষ্ঠ উপাখ্যান ॥

ব্রহ্মচারীকে রাজ্যদান

এবার আরেক পুতুলের পালা। সে বলল, 'শুনুন মহারাজ : রাজত্ব করতে করতে বিক্রমাদিত্য একবার চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবে সমস্ত অন্তঃপুর-বধূদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে শৃঙ্গারবনে গেলেন। বিবিধ তরুর সমারোহে সে বন ছিল রমণীয়। ইন্দ্রনীলখচিত ছিল বিহারাঙ্গনের ভিত্তি, চন্দ্রকান্তশিলায় নির্মিত ছিল তার চত্বর। নানারকম ধূপের সুগন্ধে আমোদিত ছিল ক্রীড়াগৃহ। বসনভূষণ-তাম্বূল-পুষ্প-মাল্যাদিতে অলংকৃত পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী—এই চতুর্বিধ বনিতাজনসঙ্গে রাজা রঙ্গরসে বিহার করতে লাগলেন।

সেই শৃঙ্গারবনের কাছে একটি চণ্ডিকায়তন ছিল। সেখানে থাকতেন এক ব্রহ্মচারী। রাজাকে ঐ বনে আসতে দেখে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, 'তপস্যা করে করে জন্মটাকে বৃথাই কাটালাম। স্বপ্নেও বিষয়সঙ্গসুখ কাকে বলে জানলাম না।

কথিত আছে :

বিষয়সঙ্গ থেকে যে যে সুখ পাওয়া যায়, তা দুঃখের নিদান রূপেই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন—এরূপ ধারণা মূর্খেরাই করে থাকে। শুভ্র তণ্ডুল পেতে গেলে কষ্ট পেতে হবে এই ভয়ে কেউ কি তুষমিশ্র ধান্যকণা ভক্ষণ করে ?

তাই, মহৎ কৃচ্ছ্রসাধন করেও সংসারে স্ত্রীসুখ অনুভব করা কর্তব্য।

অসার সংসারে মৃগলোচনা রমণীরাই আদরের বস্তু। তাদের জন্যে মানুষ ধন চায়, তারা না থাকলে ধন দিয়ে কী হবে? অসার সংসারে নিতম্বিনীরাই সারভূতা—এই ভেবেই না শম্ভু অর্ধাঙ্গে পার্বতীকে ধারণ করেছেন।

আমার সৌভাগ্য যে রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে এসেছেন। তাঁর কাছে একটি ব্রহ্মত্র ভূমি চেয়ে নিয়ে কোনো রমণীকে বিবাহ করে সংসারসুখ অনুভব করব।

এইরকম চিন্তা করে রাজার কাছে গিয়ে—রত্যুৎসবে পঞ্চাননের পঞ্চ আজন পার্বতীর মুখমধু পানে যুগপৎ প্রবৃত্ত হলে তাঁর সংকলিত সুশোভন কর্ণভূষণের গন্ধলোভে ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরের মতো শোভাযুক্ত পার্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুন। —এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

তখন রাজা তাঁকে আসনে উপবেশন করতে বললেন। উপবিষ্ট ব্রহ্মচারীকে রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমি এখানেই জগদম্বার অর্চনা করে থাকি। এঁর নিত্য সেবা করতে করতে পঞ্চাশ বছর আমি কাটিয়েছি। এ যাবৎ আমি ব্রহ্মচারী। আজ রাত্রিশেষে দেবতা এসে আমাকে প্রত্যাদেশ দিলেন ঃ হে ব্রাহ্মণ! তুমি এতকাল ধরে আমার পরিচর্যা করে শ্রান্ত হয়েছ, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। এখন তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করো, পুত্রোৎপাদন করো। পরে মোক্ষে মন দিও। অন্যথা তোমার গতি নেই।

শাস্ত্রে বলা আছে ঃ পূর্ব পূর্ব তিন আশ্রমকে অস্বীকার করে যে মোক্ষে মনোনিবেশ করে, তার অনুরূপ করার ফলে মোক্ষ তো হয়ই না, পরন্তু অধঃপতন হয়।

প্রথমে ব্রহ্মচারী, তারপর গৃহী, তারপর বানপ্রস্থী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। সম্প্রতি, রাজা বিক্রমাদিত্যকে তুমি যদি বলতে পারতে, তবে তিনি তোমার অভিলাষ পূরণ করতেন।

দেবী আমাকে স্বপ্নে এইসব বললেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।'—এমনি করে কপট বাক্যে রাজাকে নিজের ইচ্ছা জানালে রাজা শুনে মনে মনে ভাবলেন, 'এ লোক তো মিথ্যা বলছে। যা হোক, তবুও সে যাচক। যেভাবেই হোক এর প্রার্থনা পূরণ করতে হবে।

কথিত আছে ঃ

যাচককে দান করে, শূন্য লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা করে এবং নিরত আশ্রিতদের পরিপালন করে রাজা অশ্বমেধের ফল লাভ করেন।'

—এই ভেবে সেখানে একটি নগর নির্মাণ করিয়ে তাঁকে সেই নগরে অভিষেক-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে একশত বিলাসিনী রমণী—দান করলেন। এবং, পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচ শ' ঘোড়া, চার হাজার সৈনিক তাঁকে দিয়ে সেই নগরের নাম দিলেন 'চণ্ডিকাপুর'। তখন পূর্ণকাম ব্রহ্মচারী রাজাকে ভূয়সী আশীর্বাণী বর্ষণে অভিনন্দিত করলেন। অতঃপর রাজা নিজ নগরীতে ফিরে গেলেন।'

আখ্যান শেষ করে পুতুল রাজাকে বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

॥ ষষ্ঠ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তম উপাখ্যান ॥

মৃতের উজ্জীবন

পুনর্বার অন্য-এক পুতুল ভোজরাজকে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বলতে লাগল।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন-কালে সমস্ত প্রজাই সুখে ছিল। সংসারে দুর্জনকণ্টক ছিল না। সমস্ত লোক ছিল সদাচারবান, ব্রাহ্মণেরা বেদ, শাস্ত্রাভ্যাস, স্বধর্মাচরণ এবং যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্মে নিরত ছিল। সমস্ত বর্ণের মানুষেরই কার্যসিদ্ধি ও যশে অভিরুচি ছিল। সকলেই চাইত পরোপকার করতে। অসত্য কেউ পছন্দ করত না। লোভে ছিল তাদের ঘৃণা, পরনিন্দায় অনাদর, জীবদয়ায় অনুরাগ, পরমেশ্বরে ভক্তি, দেহে অনাসক্তি, নিত্যানিত্য বিষয়ে বিচার, পারলৌকিক প্রসঙ্গে বুদ্ধি, বাক্যে সত্যনিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতিপালনে দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্যগুণ। এইভাবে সমস্ত লোকই সদাশয় ও শুদ্ধচিত্তে রাজার অনুগ্রহে সুখে ছিল।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। তার সম্পত্তির সীমা ছিল না। যে যে-বস্তুর সন্ধান করত, সে সেই-বস্তুই তার গৃহে পেত। এইরূপ সকল সম্পদের আশ্রয়ভূত বণিকের সর্ববস্তুতে অনিত্যত্ব-বুদ্ধি জন্মাল। সে বুঝতে পারল, এ সংসার অসার, সুদুর্লভ বস্তুসমূহও অনিত্য।

কথিত আছে ঃ

রমণী-সংসর্গ শূন্য সৌধের মতো, ধন কিংবা যৌবন (শরতের) মেঘপটলের মতো, স্বজন, পুত্র, শরীরাদি বিদ্যুতের মতো চঞ্চল, সমস্ত সংসার ব্যাপারটাই ক্ষণিক বলে জানবে।

সহায় বা অসহায় যাই হোক, আত্মীয়বন্ধু সংসার বন্ধনের মূল। সহায়ভূত হলেও বান্ধব আপদ্‌গ্রহগণের নিকটস্থ দ্বার ; এ পুত্র, এ শত্রু—এ রকম ভাবনা বিকল বুদ্ধিরই পরিচায়ক। অতএব এ সকল কর্মপাশ ত্যাগ কর এবং নির্মল ধর্ম পালন কর।

তাই সংসারীদের ধর্মই একমাত্র আশ্রয়।

শাস্ত্রেও তাই বলেছে ঃ

ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্ম প্রাণীদের অবশ্যই রক্ষা করে, রক্ষা না করলে (নাশ করলে) ধর্ম নিশ্চিত প্রাণীদের নাশ করে। তাই ধর্মকে নাশ করতে নেই। সর্বভাবে সেই তো সংসারীদের শরণ। যোগীরা যার জন্যে ধ্যান করে, ধর্ম এ সংসারে সেই সম্পদেরও প্রাপ্তি ঘটায়। ধর্ম ছাড়া সুহৃদ নেই। ধার্মিকের অপেক্ষা সুখী নেই, ধার্মিকের অপেক্ষা পণ্ডিতও নেই।

আরও যেমন ঃ

ধর্ম পাতালপুরীটার চির সুখ বিধান করতে সক্ষম, ধর্ম মর্ত্যজনের শাশ্বত আনন্দ বিধান করে, ধর্ম স্বর্গনগরীর নিরন্তর সুখাস্বাদরূপ সৌভাগ্যের মূল, ধর্ম দেহটাকে পর্যন্ত মুক্তিরূপিণী বণিতার সম্ভোগের যোগ্য করে তোলে না কি ?

অতএব ধর্মসংগ্রহের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের উপার্জিত ধন সৎপাত্রে দান করা উচিত। সৎপাত্রে অর্পণ করলে সেই ধন বহুগুণ হয়।

বলে না—

পাত্রবিশেষে ন্যস্ত করলে দাতার চিত্ত গুণবাহুল্যের সুযোগ পায় ; মেঘের জল

সমুদ্রশুক্তিতে পড়লে মুক্তাফলের রূপ নেয়। বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রবীজ যেমন সুক্ষেত্রভূমিতে পড়লে পরিণামে বিরাটত্ব লাভ করে, তেমনি দানও সুপাত্রে পড়লে বহু বিস্তার লাভ করে।'

এমনিভাবে বহু বিচারবিবেচনা করে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে হেমাদ্রি নামক স্মৃতিশাস্ত্রের দানখণ্ডের অন্তর্গত গোদান, কন্যাদান, বিদ্যাদান, ভূদান, জলদান প্রভৃতির বিধি ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করে সৎপাত্রে সেই সেই দান সম্পন্ন করে পূতচিত্ত হয়ে আবার ভাবল, 'আমার অনুষ্ঠিত এই দান-ব্রতাদি তখনই সফল হবে, যখন দ্বারাবতী গিয়ে আমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করব।' এই ভেবে দ্বারকাধাম অভিমুখে যাত্রা করল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে নাবিককে ডেকে প্রচুর ধন তাকে দিয়ে ভিক্ষুক, যোগী, বিদেশস্থ দীন-দরিদ্র-অনাথদের তার নৌকায় তুলে তাদের সঙ্গে মধুর আলাপ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যখন যাচ্ছিল, তখন সমুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্বত দেখা গেল। সেই পর্বতে ছিল এক বড়ো দেবালয়। তারপর, ঐ দেবালয়ে গিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীকে ষোড়শোপচারে পুজো ও প্রণাম করে যেই তাঁর বামভাগে দৃষ্টি দিয়েছে, অমনি তার চোখে পড়ল ছিন্নশির এক মনুষ্যদম্পতি। সম্মুখের ভিত্তিভাগে, দেখতে পেল, লেখা রয়েছে : কোনো মহাধৈর্যবান পরোপকারী পুরুষ নিজকণ্ঠরুধিরে যদি দেবী ভুবনেশ্বরীর অর্চনা করেন, তবেই এই নারী-পুরুষ যুগল জীবন ফিরে পাবে।

অনুরূপ লিখিত অক্ষরগুলি পাঠ করে বিস্ময়াভিভূত ধনদ আবার নৌকায় উঠে দ্বারাবতী গেল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করে প্রণাম করে স্তব করল :

শ্রীকৃষ্ণকে একবারের মাত্র একটি প্রণাম দশবার অশ্বমেধশেষে পুণ্যস্নানের সমান। পরন্তু, দশাশ্বমেধী পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, কৃষ্ণপ্রণামকারীর পুনর্জন্ম হয় না।

স্তব করে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ উপচারে পুজো দিয়ে নিজ নগরে ফিরে চলল। ফিরে গিয়ে সমস্ত বন্ধুবর্গকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দিয়ে প্রীত করে অপূর্ব একটি বস্তু নিয়ে রাজদর্শনে গেল।

কেন না, রিক্ত হস্তে রাজা, দেবতা ও গুরুদর্শন করতে নেই। বিশেষ কোনো ফল দান করে নৈমিত্তিক ফলের সূচনা করা কর্তব্য।

আরও বলা হয়েছে :

প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয় মিত্র এবং অতি অল্পবয়সের পুত্রের কাছে শূন্য হাতে যেতে নেই। তেমনি, কোনো উপলক্ষ্যে আগত ব্যক্তিকেও শূন্য হাতে সম্ভাষণ করতে নেই।

তাই, রাজার হাতে কৃষ্ণপ্রসাদ এবং অপূর্ব সেই বস্তু ভেট দিয়ে সে রাজার আজ্ঞায় উপবেশন করল। তখন রাজা তার মঙ্গলযাত্রার কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং অপূর্ব কোনো বৃত্তান্ত তার অভিজ্ঞতায় এসে থাকলে তাও বলতে বললেন। সেও সমুদ্রমধ্যস্থ ভুবনেশ্বরী-দেবীর মন্দিরের বৃত্তান্ত বলল।

তা শুনে বিস্মিত রাজা সেই ধনদের সঙ্গে সেই স্থানে গিয়ে দেবালয়ে দেবতার বামভাগে অবস্থিত কবন্ধদুটিকে দেখতে পেলেন। তারপর, মনে মনে দেবতা স্মরণ করে যেই নিজ কণ্ঠে খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি কবন্ধ দুটি মস্তকসহ জীবন ফিরে পেল। দেবতাও রাজার হাত থেকে খড়্গ টেনে নিয়ে বললেন, 'হে রাজন, প্রসন্ন হয়েছি, বর চাও।' রাজা বললেন, 'হে দেবী, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই দম্পতিকে রাজ্যদান করুন।' তখন দেবী সেই মনুষ্যদম্পতিকে রাজ্যদান করলেন। রাজাও ধনদের সঙ্গে নিজ নগরে ফিরে গেলেন।'

এই আখ্যান বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'হে রাজন, আপনাতে যদি পরোপকার করার এমন শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

॥ সপ্তম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ অষ্টম উপাখ্যান ॥

সরোবর পূরণ

আবার আরেকটি পুতুল বলল, 'শুনুন মহারাজ, ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য নানা আমোদ-কৌতুক-রসে পূর্ণ ছিলেন। চরদের মুখ থেকেও বিশেষ বিশেষ কৌতুকপ্রদ বৃত্তান্ত তিনি অবগত হতেন।

কেন না—

পশুরা গন্ধের মাধ্যমে বস্তুর স্বরূপ অবগত হয়, ব্রাহ্মণেরা বেদের মাধ্যমে, রাজারা চর-মাধ্যমে এবং অন্যেরা চক্ষুদ্বয়-মাধ্যমে।

শুনুন মহারাজ, যিনি রাজা হন, সমস্ত লোকস্থিতিই তাঁকে জানতে হবে। সকলের মানসিকতা জানতে হবে, প্রজাদের সুষ্ঠু পালন করতে হবে, দুষ্টদের দণ্ড দিতে হবে, ন্যায়পথে ধন উপার্জন করতে হবে যাচকদের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করতে হবে। ঐগুলিই রাজার পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান।

বলেছে না—

দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায় অনুসারে রাজকোষের পরিবৃদ্ধি, প্রার্থীদের প্রতি অপক্ষপাত এবং রাজ্যরক্ষণ—এই হল রাজাদের পঞ্চ মহাযজ্ঞ। রাজাদের দেবকার্যই বা কি, আর শত্রুদের সঙ্গে বিরোধই বা কি? সেই কটিই তাঁদের দেবকার্য তথা জপ-যজ্ঞ-হোম যাতে রাষ্ট্রে অশ্রুপাত না ঘটে।

এই ভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করছিলেন, এমন সময়, একদিন চরেরা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে রাজার কাছে এলে, রাজা তাদের উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে বললেন। তাঁরা বলল, 'মহারাজ, কাশ্মীরদেশে মহাধনাঢ্য এক বণিক আছে। সেই বণিক পাঁচক্রোশ লম্বা এক পুকুর খুঁড়িয়েছে। তার মধ্যে জলশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নগৃহ নির্মাণ করিয়েছে, কিন্তু জল উঠছে না। তখন সেই বণিক জল যাতে ওঠে তার জন্যে নারায়ণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদের দিয়ে জপ, পূজা, হোম, অভিষেক প্রভৃতি করালো। তবুও জলের দেখা নেই। তখন অতিখেদে পুকুরের পাড়ে বসে বণিক প্রতিদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, 'হায়, কোনো উপায়েই জলোদ্গম হল না, এত কষ্ট আমার বৃথা গেল।'

একদিন পুকুরের পাড়ে বসে আছে বণিক, হঠাৎ আকাশ থেকে অশরীরী কণ্ঠ শুনতে পেল : কী হয়েছে, বণিকপুত্র? কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ? দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণ যুক্ত পুরুষের কণ্ঠরক্তে তড়াগের মৃত্তিকা সিক্ত হবে, তখন বিমল উদকে তড়াগ পূর্ণ হবে, অন্যথা নয়।

তা শুনে বণিক তড়াগের তটে বিরাট অন্নসত্রের আয়োজন করল। সেই সত্রে আহার করতে বিভিন্ন দেশবাসী লোকেরা সব আসতে থাকল। দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারী পুরুষেরা তাদের বলল : যে কেউ নিজের কণ্ঠ-শোণিতে তড়াগ সিক্ত করবে, তাকে শতকলস

স্বর্ণমুদ্রা দান করা হবে।

সেই ঘোষণা সকলে শুনল, কিন্তু সহসা কেউ এগিয়ে এসে স্বীকৃতি জানালো না। অতি বিচিত্র এ বৃত্তান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।'

তাদের কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য স্বয়ং সেখানে গেলেন। জলাশয়ের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর বিরাট মনোরম মন্দির এবং সেই বিশাল পুষ্কর দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত রাজা আপন মনে ভাবলেন, 'যদি নিজ কণ্ঠশোণিতে এই পুষ্করকে আমি অভিষিক্ত করি, তবে তা জলে পরিপূর্ণ হবে। তাতে সকলের উপকার হবে। আমার এই শরীর না-হয় খুব বেশি হলে শত বৎসর থাকবে, কিন্তু তারপর বিনষ্ট তাকে হতেই হবে। সেইজন্যে, মহাপুরুষের শরীরে মমত্ব রাখতে নেই। পরোপকারের জন্যে শরীরও দান করা কর্তব্য।

সুধীরা তাই বলেছেন :

শত শরৎ মানুষ দেহধারণ করুক বা শয্যায় শয়নই করুক, নাশ তাকে পেতেই হয়। তাই, লোকোত্তর পুরুষেরা শরীরের বিপত্তিসুলভ বিবেচনা করে শরীরের প্রতি সর্বজন-গর্হিত মমত্ব পোষণ করেন না।

দেহীদের দেহপিঞ্জর সর্বদাই ব্যাধিগ্রস্ত, সতত শোকের আলয়, যে-কোনো-মুহূর্তে পতনশীল। পুণ্যকর্মের দ্বারা তাঁরাই এর সাফল্য সাধন করেন, যাঁরা সর্বভাবে স্বার্থ-ত্যাগ করে পরার্থে শরীর ব্যয়িত করেন।'

এই ভেবে সম্মুখস্থিত প্রাসাদে জলশায়ী বিষ্ণুর পূজা করে প্রণত হয়ে বললেন, 'হে জলদেবতা, আপনি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠরক্ত কামনা করেন, সুতরাং আমার এই কণ্ঠরক্তে তৃপ্ত হয়ে এই তড়াগকে জলপূর্ণ করুন।' —এই বলে যেমনি কণ্ঠচ্ছেদ করতে খড়্গ তুলেছেন, তখনি দেবতা খড়্গ ধরে বললেন, "হে বীর, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে থাকেন, তবে এই পুকুরকে জলে ভরিয়ে দিন।' দেবী তখন আবার বললেন, 'হে রাজন, তুমি সত্বর এ স্থান থেকে নির্গত হও। তারপর যেমনি দৃষ্টিপাত করবে, দেখবে পুকুর জলে ভরে গেছে।' শোনামাত্র রাজা সত্বর উঠে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন পুকুর জলে ভরে গেছে। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ নগরীতে ফিরে গেলেন।'

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এ রকম ঔদার্য, পরোপকার, সত্ত্বাদি শ্রেষ্ঠ গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

॥ অষ্টম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ নবম উপাখ্যান ॥

রাক্ষসবধ

এবার আরেক পুতুল বলল :

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে মন্ত্রী ছিলেন ভট্টি, উপমন্ত্রী গোবিন্দ, সেনাপতি চন্দ্রশেখর এবং পুরোহিত ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম ছিল কমলাকর। সে পৈতৃক সম্পত্তির সৌভাগ্যে ঘৃতান্ন ভোজন করে বস্ত্র-ভূষণ-তাম্বূলাদি সুখসম্ভোগে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বিষয়সুখে

কাল কাটাচ্ছিল। একদিন পিতা বলল, 'পুত্র, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মে কেন এমন স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েছ ?

এই আত্মা শত জন্ম ধরে নানা যোনি ভ্রমণ করে। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম বহু পুণ্যের ফলে হয়। ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করেও তুমি দুরাচার হয়েছ। সর্বদা বাইরেই থাক, খাবার সময় বাড়িতে আস। তুমি অনুচিত কাজ করছ। এটা তোমার লেখাপড়ার সময়। এ সময় যদি বিদ্যাভ্যাস না কর, পরবর্তী কালে ভীষণ দুঃখে পড়বে।

বাল্যে যারা লেখাপড়া করে না, যৌবনে কামাতুর হয়ে মনোবল নষ্ট করে, শীতকালে বস্ত্রহীনের মতো বৃদ্ধকালে তারা কষ্ট পায়।

যাদের বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দান নেই, চরিত্র নেই, গুণ নেই, ধর্ম নেই তারা পৃথিবীর ভারভূত নররূপী পশু হয়ে সংসারে বিচরণ করে।

এ জগতে পুরুষের বিদ্যার চেয়ে বড় অলংকার নেই। বিদ্যা হচ্ছে মানুষের বিশিষ্ট সৌন্দর্য, অন্যের দৃষ্টির অগোচর সুরক্ষিত ধন, বিদ্যা ভোগ, যশ ও সুখের সাধন, বিদ্যা গুরুদেব গুরু। বিদেশযাত্রায় বিদ্যা বন্ধুজন, বিদ্যা পরম দেবতা, রাজাদের কাছে বিদ্যাই পূজা পায়, ধন নয়। বিদ্যাবিহীন মানুষ পশুর সমান। বিদ্যাহীন ব্যক্তির বিশাল বংশ দিয়ে কী হবে ? অকুলীন হয়েও যে বিদ্বান, সে সকলের সম্মানের পাত্র।

হে পুত্র, আমি যতদিন জীবিত আছি, তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করতেই হবে। অভ্যস্ত বিদ্যা তোমার সমস্ত বন্ধুকার্য নির্বাহ করবে।

কথিত আছে ঃ

জননীর মতো রক্ষা করে, পিতার মতো হিতকর্মে নিযুক্ত করে, ভার্যার মতো খেদ অপনোদন করে মনোরঞ্জন করে, দিকে দিকে কীর্তি বিস্তার করে, বিত্তলাভ সুগম করে ; কল্পলতার মতো বিদ্যা কী-ই না করে ?'

তার পিতার মুখ থেকে এইসব কথা শুনে কমলাকর অনুতপ্ত হল। 'যখন আমি সর্বজ্ঞ হব, তখন এই পিতার মুখদর্শন করব'–এই প্রতিজ্ঞা করে সে কাশ্মীরদেশে যাত্রা করল। সেখানে চন্দ্রমৌলি ভট্টোপাধ্যায়ের নিকট গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমি মূর্খ, আপনার সুখ্যাতি শুনে বিদ্যাভ্যাস করতে এসেছি। কৃপা করে, আমার যাতে বিদ্যালাভ হয়, সেই ব্যবস্থাই আচার্যদেব করুন।' –এই কথা নিবেদন করে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করল। উপাধ্যায়মহাশয় তাকে বিদ্যাদানে সম্মত হলেন। কমলাকর দিবারাত্রি গুরুর শুশ্রূষা করতে লাগল।

সুভাষিত রয়েছে ঃ

গুরুর সেবায় বিদ্যা হয়, প্রচুর অর্থের বিনিময়েও হয়। আবার বিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যা লাভ করা যায়। এতদ্‌ভিন্ন চতুর্থ কোনো উপায়ে বিদ্যালাভ হয় না।

এইভাবে নিষ্ঠাসহ গুরুর শুশ্রূষায় তার বহুকাল গত হল।

একদিন উপাধ্যায় তার উপর কৃপাপরবশ হয়ে তাকে সিদ্ধ-সারস্বত মন্ত্রের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে স্বনগরে প্রস্থান করল। পথে যেতে যেতে সে কাঞ্চীনগরে গেল। সেখানে রাজা ছিলেন নরসেন। তাঁর নগরে নরমোহিনী নামে এক বনিতা ছিল। রূপে সে অদ্বিতীয়া। তাকে যে-ই দেখে, সে-ই কামজ্বরে পীড়িত হয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়। আর যে সম্ভোগেচ্ছায় তার সঙ্গে শয়ন করে,

তার রক্ত বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস পান করে, ফলে সে নিষ্প্রাণ হয়। কমলাকর এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে নিজ নগরে গেল। তাকে আসতে দেখে জনক-জননীদের এত আনন্দ হল যে বাড়িতে বিরাট উৎসব দেখা দিল। পরের দিন তার পিতার সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করল এবং সভায় নিজের বিদগ্ধতার পরিচয় দিল। তখন বস্ত্রাদিদানে সম্মানিত করে বিক্রমাদিত্য তাকে বললেন, 'ওহে কমলাকর, তুমি যে-দেশে গিয়েছিলে সেখানে বিচিত্র কিছু দেখলে ?' সে বলল, 'হে রাজন, সে-দেশে তেমন কিছু দেখি নি। কিন্তু ফেরার সময় কাঞ্চী নগরে অপূর্ব এক কৌতুক দেখলাম।'

রাজা বললেন, 'কী দেখলে বল।'

কমলাকর বলল, 'কাঞ্চীনগরে নরমোহিনী নামে এক রমণী আছে। যে তাকে দেখে, সে তার রূপের মোহে উন্মাদগ্রস্ত হয়। যে তার সঙ্গে নিদ্রা যায়, বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে সেই নিদ্রাসঙ্গীর রক্ত পান করে। ফলে সে নিষ্প্রাণ হয়। এই অদ্ভুত কাণ্ড আমি দেখেছি।'

তখন রাজা বললেন, 'তবে তুমি এসো। ঐখানে আমরা দুজনে যাব।'

সেইমতো তার সঙ্গে রাজা কাঞ্চীনগরে এসে নরমোহিনীর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে তার বাড়ি গেলেন। সে পাদোদক-তৈল, অঙ্গরাগ-সুগন্ধ প্রসাধনসামগ্রী-পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করে বলল, 'হে রাজন, আজ আমি ধন্য। আমার গৃহ আপনার চরণ-প্রসাদে আজ পবিত্র।

বহু-বহু কাল পরে আজ আমার গৃহ ধন্য, কেননা আপনার পাদপদ্ম-সংস্পর্শে এ গৃহ অনুগৃহীত।

প্রভু, আমার গৃহে আপনি ভোজন করুন।'

রাজা বললেন, 'এইমাত্র ভোজন করে আমি এসেছি।' তখন সে তাম্বুল দিল। এমনিভাবে রাত্রি এক প্রহর অতিবাহিত হলে নরমোহিনী নিদ্রা গেল। দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষস এল। রাক্ষসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজা পিছনের দিকে গেলেন।

রাক্ষস যেই এল, অমনি প্রদীপের আলো প্রবল হল। কেবল নরমোহিনীকেই সে দেখতে পেল। (পদ্যে)

আর কিছু দেখতে না পেয়ে রাক্ষস চলে যাচ্ছিল। নরমোহিনীর মঞ্চ-শয্যায় তার দৃষ্টি পড়লে সে দেখল—বনিতা একাকী নিদ্রিতা। দ্বিতীয় কেউ নেই। বেরিয়ে যাবার সময় রাজা তাকে ধরে মেরে ফেললেন। সেই কোলাহল শুনে নরমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হল। সে উঠে নিহত রাক্ষসকে দেখে রাজাকে বলল, 'হে রাজন, আপনার অনুগ্রহে আমি নির্ভয় হলাম, আজ থেকে রাক্ষসের উপদ্রব গেল। আপনার কৃত এই উপকার থেকে কেমন করে আমি উত্তীর্ণ হব ?

আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি আপনার অনুসরণ করি। আপনি যা বলবেন, তাই করব।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি হও, তবে ঐ কমলাকরকে পরিচর্যা কর।'

নরমোহিনী কমলাকরকে পরিচর্যা করল। রাজা বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে ফিরলেন।

এই উপাখ্যান বিবৃতি করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে এ জাতীয় ধৈর্য যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

॥ নবম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দশম উপাখ্যান ॥

যজ্ঞ-লব্ধ-ফল-দান

পুনরায় অন্য এক পুত্তলিকা উপাখ্যান আরম্ভ করল ঃ শুনুন মহারাজ। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে এক যোগী এলেন উজ্জয়িনীতে। তিনি বেদ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, নাট্যশাস্ত্রাদি সকল কলাশাস্ত্রে বিচক্ষণ। অধিক কি, তাঁর তুল্য সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ দ্বিতীয় কেউ নেই। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে ডাকতে পুরোহিতকে পাঠালেন। তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার করে পুরোহিত বললেন, 'প্রভু, রাজা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চলুন সেখানে।'

যোগী বললেন, 'চলুন, তবে যাওয়া যাক।' সেখানে গিয়ে রাজাকে বললেন, 'হে রাজন, আপনি যদি মন্ত্রসাধন করেন, তাহলে জরা-মৃত্যু-রহিত হবেন।'

রাজা বললেন, 'আপনি আমাকে মন্ত্র-উপদেশ দিন। আমি মন্ত্র সাধনা করব।'

তখন যোগী তাঁকে মন্ত্রোপদেশ দিয়ে বললেন, 'হে রাজন, এই মন্ত্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এক বৎসর পাঠ করতে হয়, তারপর দূর্বাঙ্কুর দিয়ে জপসংখ্যার দশমাংশ হোম করতে হয়। অতঃপর, পূর্ণাহুতি সময়ে হোমকুণ্ড থেকে এক পুরুষ একটি ফল হাতে নিয়ে উঠে এসে আপনাকে সেই ফল দেবেন। সেই ফল ভক্ষণ করলে আপনি জরা-মরণ-রহিত ও বজ্রদৃঢ় দেহের অধিকারী হবেন।' এই বলে রাজাকে মন্ত্র দিয়ে যোগী স্বস্থানে চলে গেলেন।

রাজাও লোকালয়ের বাইরে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে মন্ত্রজপ ও দূর্বাঙ্কুর দিয়ে দশমাংশ হোম করে যখন অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে যাচ্ছেন, সেই সময় হোমকুণ্ড থেকে এক পুরুষ উঠে এসে রাজাকে একটি দিব্য ফল দিলেন। রাজাও সেই ফল নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করে যখন রাজপথে পা দিয়েছেন, তখন কুষ্ঠব্যাধিতে বিশীর্ণশরীর এক ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলল, 'মহারাজ, রাজা হলেন লোকের মা-বাবার সমস্থানীয়। বলেছে না—

রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু, চক্ষুহীনের চক্ষু। রাজা মাতা, রাজা পিতা, রাজা সকলের আর্তিহরণকারী গুরু।

যেহেতু আপনি বিশ্বের আর্তি হরণ করেন, সেই হেতু আমারও আর্তিনাশ করুন। এই ব্যাধিতে আমার শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শরীরনাশ হলে কোনো অনুষ্ঠান তো করা যায় না ; কেন না, সমস্ত ধর্মকর্মের শরীরই সাধন।

মহাকবি বলেছেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'—শরীরই হচ্ছে ধর্মসাধনার প্রথম উপকরণ (সাধন)।

তাই আমার এই শরীর যাতে নিরাময় ও ভোগসুখের উপযোগী হয় তাই আপনি করুন।'

ব্রাহ্মণের সেই অনুরোধ শুনে রাজা তাকে সেই ফল দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম সন্তোষ লাভ করে স্বস্থানে গমন করলেন। রাজাও নিজ ভবনে গেলেন।

এই উপাখ্যান শুনিয়ে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, 'এ রকম ঔদার্য ও ধৈর্য যদি আপনার থাকে, এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

তা শুনে রাজা মৌনী হয়ে রইলেন।

॥ দশম উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ একাদশ উপাখ্যান ॥

রাক্ষস-ভীতি-বিনাশ

আরেক পুতুল বলল, 'হে রাজন, শুনুন। বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে পৃথিবীতে খল, চোর, পাপাচারী কেউ ছিল না। অন্যদিকে, যে রাজাকে সর্বদা রাজ্যভারের ভাবনা কিংবা প্রবল-শত্রু-বিজয়ের চিন্তা করতে হয়, সে দিনে রাতে কখনো ঘুমোতে পারে না।

কথিত আছে ঃ

অর্থের জন্যে লালায়িত যে, তার পিতাও নেই, বন্ধুও নেই, কামার্তের ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। চিন্তাতুরের সুখও নেই, নিদ্রাও নেই; ক্ষুধাতুরের বলও নেই, তেজও নেই।

এই বিক্রমাদিত্য রাজা সেরূপ ছিলেন না। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের নিজ পাদ-পদ্মের আশ্রিত করে তাদের উপর আজ্ঞা দান করে রাজ্য করতেন।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

রাজ্যর ফল আজ্ঞাপরিপালন, তপস্যার ফল ব্রহ্মচর্য-রক্ষা, বিদ্যার ফল জ্ঞানলাভ, ধনের ফল দান ও ভোগ।

একদা রাজ্যভার মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করে রাজা নিজে যোগীর বেশ ধারণ করে দেশান্তরে গমন করলেন। যেখানে আশ্চর্য কিছু দেখেন, সেখানে কিছু কাল থেকে যান। এমনিভাবে পর্যটন করছেন। একদিন সূর্য অস্ত গেলে রাজা মহারণ্যমধ্যে বৃক্ষমূল আশ্রয় করে রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। সেই বৃক্ষের উপরে চিরঞ্জীবী নামে এক বৃদ্ধ পাখি বাস করত। তার পুত্র পৌত্রেরা প্রতিদিন দেশান্তরে গিয়ে নিজ নিজ উদরপূরণ করে সন্ধ্যায় প্রত্যেকে এক-একটি ফল এনে সেই বৃদ্ধকে দিত।

বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বী ভার্যা এবং শিশু পুত্র—প্রয়োজন হলে শত অপকার্য করেও এদের ভরণপোষণ করতে হবে—ভগবান মনু বলেছেন এ কথা।

সেই রাতে পাখিরা আরামে বসলে চিরঞ্জীবী তাদের জিজ্ঞেস করল—রাজাও বৃক্ষমূলে থেকে তার কথা শুনতে লাগলেন—'এই যে বাছারা, তোমরা তো নানা দেশে ঘুরে বেড়াও, আশ্চর্য কিছু দেখেছ কি ?'

তাদের মধ্যে একটি পাখি বলল, 'আমি আশ্চর্য কিছুই দেখি নি। কিন্তু আজ আমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে।'

চিরঞ্জীবী বলল, 'বল তবে কী জন্যে এই দুঃখ।'

সে বলল, 'শুধু বলে কী হবে ?'

বৃদ্ধ বলল, 'বৎস, যে দুঃখী, সে সুহৃদজনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে সুখী হয়।'

তার কথা শুনে দুঃখের কারণ বলতে লাগল, 'শুনুন, তাত। উত্তর দেশে শৈবাল-ঘোষ নামে এক পর্বত আছে। তার নিকটে পলাশনগর। সেই পর্বতে এক রাক্ষস থাকে। সে প্রতিদিন নগরে এসে সম্মুখে যে কোনো মানুষকে পায়, তাকে পর্বতে ধরে নিয়ে গিয়ে ভক্ষণ করে।

একদিন নগরবাসীরা মিলে তাকে বলল—হে বকাসুর, তুমি সম্মুখে কাউকে পেলে যথেচ্ছ ভক্ষণ কোরো না, বরং প্রতিদিন তোমার আহারের জন্যে আমরা একজন করে মানুষ দেব।

রাক্ষস তাতে রাজি হল।

তারপর সেখানকার লোক এক-একদিন এক-একটি বাড়ি থেকে তার কাছে একজন করে মানুষকে পাঠাতে থাকল। এইভাবে বহুদিন কেটে গেল।

আজ আমার পূর্বজন্মের সুহৃদ এক ব্রাহ্মণের পালা। তার একটি মাত্র পুত্র। পুত্রকে দিলে বংশনাশ হয়। নিজে গেলে ভার্যা বিধবা হয়। বৈধব্য অতি শোচনীয় দশা। আর যদি ভার্যাকে দেয়, তবে গার্হস্থ্য আশ্রম ভেঙে দেয়।

তাদের দুঃখে আমি মহাদুঃখী। এই হল আমার গভীর দুঃখে কারণ।

তার কথা শুনে গাছের পাখিরা বলল ঃ

এই তো প্রকৃত সহৃদ যে-সুহৃদের দুঃখে স্বয়ং দুঃখিত হয়। এই হল বন্ধুত্ব ঃ

সুহৃদের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হলে তবেই তো সৌহার্দ্য। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র স্ফীত হয়, চন্দ্র অস্তমিত হলে সে ক্ষীণ হয়।

আরো দেখ ঃ

জলের সঙ্গে থাকায় দুধ গোড়ায় তার সব গুণ হারাল। পরে আগুনের মুখোমুখি হয়ে দেখল, জল আগুনের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুর প্রতি সহানুভূতিতে দুধ উথলে উঠে নিজে আগুনে পড়তে লাগল। আবার যখন জল দেওয়া হল, বন্ধুর আগমনে দুধ স্থির হয়ে রইল। সজ্জনদের মৈত্রীর প্রকৃতি এ রকমই।'

পাখিদের পরস্পরের এই আলাপন শুনে রাজা সেই নগরে গেলেন। তারপর বধ্যশিলা দেখে ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়ে সমীপস্থ সরোবরে স্নান করে তিনি বধ্যশিলায় উপবেশন করলেন। সেই সময়ে রাক্ষস এসে দেখে—হাসি-হাসি-মুখে একটি লোক সেখানে বসে আছে। তা দেখে বিস্মিত রাক্ষস তাকে বলল, 'হে মহাসত্ত্ব পুরুষ, আপনি সকলের আর্তিনাশন গুরু। যেহেতু আপনি বিশ্বের আর্তি হরণ করছেন, তাই এই পাপকর্মের পরিণামে আমার শরীর নষ্ট হবে। শরীর নাশ হলে অনুষ্ঠানও শেষ। কেন না, সমস্ত ধর্মকার্যের শরীরই হচ্ছে সাধন। এই শিলায় প্রতিদিন যে বসে, সে আমার আসার আগেই মরে থাকে। আপনি মহাধৈর্যসম্পন্ন পুরুষ, তাই আপনার মুখে এমন হাসি দেখছি। যার মৃত্যুকাল সমাসন্ন হয়, তার ইন্দ্রিয়গুলি অবসন্ন হয়। আপনি কিন্তু অধিকতর কান্তিমণ্ডিত হয়ে সহাস্য বদনে বিরাজমান। অতএব বলুন আপনি কে।'

রাজা বললেন, 'এ বিচারে কাজ কী? পরের জন্যে এ শরীর আমি দান করছি! তুমি তোমার সংকল্প সাধন কর।'

রাক্ষস তখন নিজ মনে বিচার করতে লাগল ঃ সত্যি, ইনি একজন সাধুপুরুষ যিনি নিজের সুখভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করে পরদুঃখে দুঃখী হয়ে এখানে এসেছেন।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ সাধুগণ সর্বপ্রাণীর সুখ কামনা করেন, নিজ সুখ-দুঃখ চিন্তা ভুলে তাঁরা পরের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন।'

সে রাজাকে বলল, 'হে মহাপুরুষ, পরের জন্যে যে-শরীর আপনি ত্যাগ করতে উদ্যত, সেই শরীরই যথার্থ শ্লাঘ্য।

কারণ,

নিজ নিজ উদর পূরণ করতে পশুরাও কি বেঁচে থাকে না? তাঁর বেঁচে থাকাই প্রশংসার যিনি পরের জন্য শরীর ধারণ করেন।

আপনার মতো পরোপকারীদের ক্ষেত্রে এটা আশ্চর্য নয়।

সজ্জনেরা অন্যের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে তৎপর, এতে আশ্চর্যের কী আছে ? চন্দন-তরু নিজ শরীর শীতল করতে জন্মায় না।

হে মহাসত্ত্ব, এই পরোপকারের বিনিময়ে আপনি সকল সম্পদের অধিকারী।

কথিত আছে ঃ পরোপকার করতে যাঁর জন্ম, তিনি ইহলোকে সকল সম্পদ লাভ করেন এবং পরলোকে পরম পদ প্রাপ্ত হন।

স্বার্থ-সুখ-নিঃস্পৃহ পরোপকারব্রতী আপনার মতো সাধুপুরুষদের বিধাতা জগতের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

এইভাবে প্রশংসা করে রাক্ষস রাজাকে বলল ঃ হে মহাসত্ত্ব ! আপনার প্রতি আমি প্রীত হয়েছি। বর কামনা করুন।'

রাজা বললেন, 'হে রাক্ষস, আমার প্রতি যদি তুমি প্রসন্ন হয়ে থাক তবে আজ থেকে মনুষ্যভক্ষণ ত্যাগ কর।

আর একটি উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি, শোন ঃ

তোমার প্রাণ যেমন তোমার নিজের কাছে প্রিয়, সমস্ত প্রাণীদের পরিত্রাণ করাই পণ্ডিতদের কর্তব্য।

আরো দেখ ঃ

ঘোর সংসারসাগরে পতিত জীবগণ জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখে অহরহ কষ্ট পায়, মৃত্যুর অধীন বলে সদা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। 'মরে যাব'—এ ভাবনায় মানুষের মনে যে দুঃখ জন্মায়, তা কেউ কখনো অনুমান করে বলে বোঝাতে পারে না।

তা ছাড়া, আপনার জীবন যেমন প্রিয়, পরের জীবনও তেমনি প্রিয়। অতএব আপনার জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখবে, পরের জীবনকেও সেই দৃষ্টিতে দেখে রক্ষা কর !'

রাজা এরূপ উপদেশ দিলে তদনুসারে রাক্ষস সেই দিন থেকে জীবহত্যা ত্যাগ করল। রাজাও স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।'

এই আখ্যায়িকা বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'আপনার মধ্যে এইপ্রকার পরোপকার দয়া প্রভৃতি গুণ যদি থাকে, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা নিরুত্তর রইলেন।

॥ একাদশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাদশ উপাখ্যান ॥

ব্রাহ্মণীর শাপ-মুক্তি

পুনরায় অন্য পুতুল বলল, 'হে রাজন, শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন-কালে, তাঁর রাজধানীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক ছিল। সেই ভদ্রসেনের সম্পত্তির সীমা ছিল না। কিন্তু ব্যয় করত না। তারপর কালক্রমে ভদ্রসেন মারা গেল। তার পুত্র পুরন্দর কিন্তু পিতার সর্বস্ব পেয়ে বিলোতে শুরু করল।

তারপর, একসময় তার প্রিয় মিত্র ধনদ বলল, 'ওহে পুরন্দর, তুমি বণিকের পুত্র হয়েও মহাক্ষত্রিয়কুমারের মতো ধনব্যয় করছ। এটা বণিক-বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ নয়, যে-কোনো উপায়ে ধন সংগ্রহ করাই হচ্ছে বণিকসন্তানের কর্তব্য। এক কপর্দকও অপচয়

করা উচিত নয়। উপার্জিত বিত্ত একদিন কোনো-না-কোনো বিপদে মানুষের খুব কাজে লাগে। তাই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসময়ের জন্যে ধন সংগ্রহ করবেই।

শাস্ত্রে বলা আছে ঃ

আপদের জন্যে ধন সঞ্চয় করবে, ধন দিয়েও স্ত্রীদের রক্ষা করবে। স্ত্রী দিয়েই হোক আর ধন দিয়েই হোক নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করবে।'

এ কথা শুনে পুরন্দর বলল, 'হে ধনদ, উপার্জিত বিত্ত একদিন কোনো-না-কোনো আপদে লাগবে—এ কথা যে বলে সে বিচারহীন। যখন আপদ আসবে, তখন উপার্জিত ধনও নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, বুদ্ধিমান ব্যক্তির অতীত বিষয়ের জন্যে শোক বা আগামী বিষয়ের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়।

শাস্ত্রে তো আছে—

গত দ্রব্যের জন্যে শোক এবং ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা করা সঙ্গত নয়। বর্তমান বিষয়সমূহের কথাই বিচক্ষণগণ ভেবে থাকেন।

যা ভবিতব্য, তা বিনা আয়াসেই হবে। যা যাবার, তা যাবেই।

কথায় বলে,

যা হবার তা নারকেল ফলের ভিতরে জলের প্রবেশের মতো হবেই। যাবার হলে তা গজভুক্তকপিত্থবৎ গত হবেই—সুধীরাই বলেছেন এ কথা। যা হবার নয়, তা হয়ই না, যা হবার তা বিনা যত্নেও হয়। যার টিকে থাকার কথা নয়, তা করতলগত হলেও নষ্ট হয়ে যায়।

পুরন্দরের এ কথা শুনে ধনদ উত্তর দিল না। এরপর পুরন্দর একে একে পিতার সমস্ত ধন ব্যয় করে ফেলল। তখন নির্ধন পুরন্দরকে বন্ধুবান্ধব আর খাতির করে না। তার সঙ্গে মেলামেশাও করে না।

আপনার মনে পুরন্দর ভাবতে লাগল ঃ আমার হাতে যখন ধন ছিল, তখন এইসব বন্ধুবান্ধব আমার কথায় উঠত বসত। এখন আমার সঙ্গে কথাও বলে না। অথবা, যার টাকা আছে, তার বন্ধুবান্ধবও আছে।

কথায় বলে ঃ

যার অর্থ তারই মিত্র, যার বিত্ত তারই বান্ধব।
যার অর্থ আছে সেই পুরুষই পুরুষ,
যার অর্থ আছে সেই পুরুষই পণ্ডিত।

ধনক্ষয় হলে বান্ধবেরা আগের মতো ব্যবহার আর করে না, বৃত্তিবশে অধীন হলেও পরিজনেরা আর আগের মতো অনুগত থাকে না। সুহৃদরাও প্রায়শঃ সম্পর্ক শিথিল করে। অন্যদের কথা বেশি কি ? নির্ধন ব্যক্তির সঙ্গে তার ভার্যা পর্যন্ত প্রায়ই বিশ্রী কলহ করে। যার বিত্ত আছে, সে-ই লোকই কুলীন, সে-ই পণ্ডিত, সে-ই শাস্ত্রজ্ঞ, সে-ই গুণজ্ঞ, সে-ই বাগ্মী, সে-ই সুদর্শন, সমস্ত গুণ কাঞ্চনকে আশ্রয় করে।

যে বায়ু বনদহনকালে বহ্নির সখা হয়, সেই বায়ুই (নিস্তেজ) প্রদীপ-বহ্নিকে নির্বাপিত করে। ক্ষীণ জনের সঙ্গে কারই বা সৌহার্দ্য ?

অতএব দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

ওঠ, বন্ধু, এক মুহূর্ত আমার এই দারিদ্র্যের ভার বহন কর। এ ভার বয়ে

বয়ে বহুদিন আমি শ্রান্ত, একবার তোমার মরণের সুখটুকু আমাকে ভোগ করতে দাও।

ধনহীনের এই আকুতি শুনে শ্মশানে নীত মুমূর্ষু ব্যক্তি দারিদ্র্যের চেয়ে মৃত্যুই ভালো—এ সত্য উপলব্ধি করে মৌন অবলম্বন করে।

হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার। তোমার অনুগ্রহে, আমি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছি, কারণ পৃথিবীর কোনো লোকই আমাকে কদাচিৎ দেখতে পায় না।

দরিদ্র পুরুষ (জীবিত থাকলেও) মৃত, সন্তানহীন দম্পতি মৃত, অপাত্রে দান মৃত, দক্ষিণাহীন যাগও মৃত।

এরূপ বিচার করে দেশান্তরে গিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে হিমাচলের নিকটে এক নগরে উপস্থিত হল। সেই নগরের অনতিদূরে ছিল বেণুবন। পুরন্দর নিজে গ্রামের ভিতরে গিয়ে জনৈক গৃহস্থের বাড়ির বেদীর উপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে বেণুবনে রোরুদ্যমানা কোনো রমণীর হাহাকার শোনা গেল ঃ

হে মহাজনগণ, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। একটা রাক্ষস আমাকে মেরে ফেলছে। —এই আর্তনাদ পুরন্দর শুনতে পেল।

পরদিন প্রভাতে গ্রামের লোকদের সে জিজ্ঞেস করল, 'মহাশয়েরা, কী ব্যাপার বলুন তো—রাতে শুনলাম বাঁশের বনে কে এক মহিলা কাঁদছে।'

তারা বলল ঃ এই বেণুবনে প্রতিদিন এমনিভাবে রাত্রিবেলা কান্নার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেউ আসেও না, কোনো খোঁজখবরও নেয় না।

অনন্তর, পুরন্দর নিজ নগরে ফিরে এসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে পুরন্দর, দেশান্তরে গিয়ে তুমি অপূর্ব কিছু দেখেছ কি ?'

পুরন্দর তখন রাজার কাছে বেণুবনের ঘটনার কথা বলল। সেই কৌতুককর বৃত্তান্ত শুনে রাজা তার সঙ্গে সেই নগরে গিয়ে রাত্রিতে বেণুবনের মধ্যে নারীর রোদনধ্বনি শুনে যেমনি বনের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, অমনি ক্রন্দনরত অসহায় এক নারীকে প্রহার করতে উদ্যত অতিভয়ংকর-দর্শন এক রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। রাজা বলে উঠলেন, 'ওরে পাপিষ্ঠ, অনাথা স্ত্রীকে কেন মারছিস ?'

রাক্ষস বলল, 'তোমার সে বিচারে প্রয়োজন কী ? তুমি যে-পথে যাচ্ছ যাও, অন্যথা বৃথা আমার হাতে মারা পড়বে।'

এরপর শুরু হল উভয়ের যুদ্ধ। রাজা বধ করলেন ঐ রাক্ষসকে। তখন সেই মহিলা এসে রাজার দুটি পায়ে পড়ে বলল, 'হে প্রভু, আপনার কৃপায় আমার শাপের সমাপ্তি হল, আপনি আমাকে দুঃখের মহাসাগর থেকে উদ্ধার করলেন।'

রাজা বললেন, 'তুমি কে ?'

সে বলল, 'এই নগরেই মহাধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁর ভার্যা। ব্যভিচারিণী হওয়ায় তাঁর উপর আমার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। রূপযৌবনের গর্বে উদ্ধত হয়ে আমি তাঁর সম্ভোগের আহ্বানে সাড়া দিতাম না। ফলে যাবজ্জীবন কামসুখে বঞ্চিত স্বামী বড়ো দুঃখে মৃত্যুকালে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ঃ দেখে নিস দুশ্চরিত্রা, তুই যেমন সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছিস, তেমনি বেণুবনবাসী অতি-ভয়ংকর-দর্শন এক রাক্ষস প্রতি রাত্রে তোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গম-অভিলাষে তোকে প্রহার করবে।

এই হল আমার অভিশাপ। আমি তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করলাম, কিসে

আমার শাপ শেষ হবে বলে দিন, স্বামী।

তিনি বললেন ঃ যখন কোনো পরোপকারী মহা-ধৈর্যশীল পুরুষ এসে সেই রাক্ষসকে হত্যা করবেন, তখন তাঁর পায়ে প্রণত হয়ে তুমি শাপমুক্ত হবে। আমার এই সম্পদ তাঁকেই দেবে—আমাকে এইটুকু বলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এখন আমি আপনার অধীন। আর এই ধনকুম্ভও আপনি গ্রহণ করুন।'

এ ঘটনা শুনে রাজা সেই ধনকুম্ভ গ্রহণ করলেন এবং ধনকুম্ভসহ সেই মহিলাকে পুরন্দর বণিকের হস্তে সমর্পণ করে একসঙ্গে উজ্জয়িনী ফিরে গেলেন।

পুতুল এ বৃত্তান্ত উপন্যস্ত করে ভোজরাজকে বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে ঈদৃশ ধৈর্য ও ঔদার্য যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা নিরুত্তর রইলেন।

॥ দ্বাদশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ত্রয়োদশ উপাখ্যান ॥

ব্রহ্মরাক্ষসের উদ্ধার

এরপর আরেক পুতুল বলতে লাগল, 'শুনুন, রাজন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর্গের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে, স্বয়ং যোগীর বেশে পৃথিবী পর্যটন করতে উদ্যত হলেন।

গ্রামে কাটান এক রাত, নগরে কাটান পাঁচ রাত।

এইভাবে পর্যটন করতে করতে এক নগরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই নগরের নিকটে ছিল এক নদী, সেই নদীর তটে ছিল এক দেবালয়। সেই দেবালয়ে মহৎ ব্যক্তিরা সকলে পুরাণকথকের কাছ থেকে পুরাণ শুনতেন। রাজাও নদীতে স্নান করে দেবালয়ে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে মহাজনদের কাছে গিয়ে বসলেন। সে সময়ে পুরাণকথক পুরাণের কথা পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন :

শরীর অনিত্য, বিভব—সেও শাশ্বত নয়, মৃত্যু সর্বদা সন্নিহিত, অতএব ধর্মার্জনই কর্তব্য। কোটি কোটি গ্রন্থে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তার সারনির্যাস শ্রবণ কর—পরোপকারে পুণ্য হয়, পরপীড়নে পাপ।

যে জন জীবসকলকে দুঃখিত দেখে দুঃখ, সুখিত দেখে সুখ অনুভব করেন, তিনিই সনাতন ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

ভয়ার্ত প্রাণীদের যিনি অভয় দান করেন, সেই পুরুষের কাছে তার চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম যে আর নেই, তা আমি জানি।

একজন ত্রস্ত ব্যক্তিকেও অভয় দান করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলে যে ফল, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে সহস্র সহস্র গাভী দান করেও সেই পুণ্যফল লাভ সম্ভব নয়।

যিনি দয়াপরবশ হয়ে সর্বভূতে অভয় দান করেন, তাঁর পুণ্য কল্পান্তেও ক্ষয় হয় না।

স্বর্ণ, ধেনু ও ভূমির দাতারা পৃথিবীতে সুলভ, সর্বজীবে দয়াশীল পুরুষ পৃথিবীতে দুর্লভ।

মহা-মহাযজ্ঞের ফল কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব অভয়প্রদানজনিত পুণ্যফলের ষোল

ভাগের এক ভাগের সমানও তা নয়।

চারি-সমুদ্র-বেষ্টিত এই বসুধা যিনি দান করবেন, আর যিনি জীবদের অভয় দান করবেন,—এ দুইয়ের মধ্যে অভয়দাতাই বড় দানশীল।

যে ব্যক্তি প্রতিক্ষণে বিনাশশীল এই অনিত্য দেহের দ্বারা নিত্য ধর্ম অর্জন না করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কৃপার পাত্র।

প্রাণীদের উপকারে যদি এ দেহ না লাগল, তা হলে বৃথা এ জীবনধারণ করে মানুষের কাজ কী?

একদিকে সর্বপ্রকার ভালো ভালো দক্ষিণাসহ যজ্ঞ এবং আর একদিকে ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা—দ্বিবিধ কর্মই তুল্যমূল্য।

এইভাবে পুরাণপাঠের সময় জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীসহ নদী পেরোতে গিয়ে প্রবল স্রোতে ভাসতে ভাসতে হাহাকার করছিল। বহু লোক দেখতে পেয়ে তাদের উদ্দেশে সে বলল, হে মহাশয়গণ, শীঘ্র ছুটে আসুন, শীঘ্র, শীঘ্র আসুন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীসহ নদীস্রোতে দ্রুত ভেসে চলেছি। মহাসত্ত্ব কোনো ধার্মিক পুরুষ পত্নীসহ আমার জীবন দান করুন।

জলে ভাসমান ব্রাহ্মণের আর্তধ্বনি শুনে কুতূহলী হয়ে মহাজনেরা সবাই দেখতে লাগলেন। কিন্তু কেউই নদীতে নেমে জলপ্রবাহ থেকে উদ্ধার করতে ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন না।

তখন রাজা বিক্রমাদিত্য 'ভয় পেয়ো না' বলে তাকে অভয় দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পত্নীসহ সেই ব্রাহ্মণকে প্রবল স্রোত থেকে আকর্ষণ করে তটে নিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণও সুস্থ হয়ে রাজাকে বলল, 'হে মহাসত্ত্ব, আমার এই শরীর পূর্বে মাতাপিতা সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রতি আপনার কাছ থেকে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হল। অতএব, প্রাণদান করে যে মহা-উপকার আপনি করলেন, তার প্রতিদানে কিছুমাত্র প্রত্যুপকারও যদি আমি না করি, তবে আমার জীবন ব্যর্থ হবে। সুতরাং গোদাবরী-জলমধ্যে দ্বাদশ বৎসর মন্ত্রজপের পুণ্যফল আপনাকে সমর্পণ করলাম। আর, চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে যদি কিছু সুকৃত উপার্জিত হয়ে থাকে, তাও সবটুকুই আপনি গ্রহণ করুন।'

এই বলে সেই পুণ্য রাজাকে সমর্পণ করে আশীর্বাদ দান করে ব্রাহ্মণ পত্নীসহ স্বস্থানে গমন করল।

সেই সময় অতিঘোররূপধারী এক ব্রহ্মরাক্ষস রাজার কাছে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাজা বললেন, 'হে মহাশক্তিধর, তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি এই নগরেই এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। সর্বদা নিন্দনীয় দান গ্রহণ করে এবং গর্হিত যাজনকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। আর, গুরু-বৃদ্ধ-সাধু-মহাপুরুষদের নিন্দা করতাম। সেই পাপে এই অশ্বত্থবৃক্ষে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে অত্যন্ত কষ্টে দশ সহস্র বৎসর অবস্থান করছি। আজ আপনার প্রসাদে আমি পাপসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হব।'

ব্রহ্মরাক্ষসের এই বাক্য শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ-দত্ত সব পুণ্য তাকে দান করলেন। সেও সেই পুণ্যবলে পূর্বোক্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে রাজার স্তুতি করতে করতে স্বর্গে প্রস্থান করল। রাজাও নিজ নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই উপাখ্যান উপন্যস্ত করে পুতুল ভোজরাজাকে বলল, 'আপনার মধ্যে ঈদৃশ

পরোপচিকীর্ষা, ধৈর্য ও ঔদার্য যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা তা শুনে অধোমুখ হয়ে রইলেন।

॥ ত্রয়োদশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্দশ উপাখ্যান ॥

কাশ্মীর-লিঙ্গ-দান

আবার আরেক পুতুল বলল ঃ

বিক্রমাদিত্য রাজা একসময় পৃথিবীতে কোথায় কী আশ্চর্য বিষয় আছে, কারা সাধুপুরুষ, কোন্ কোন্ স্থানে তীর্থ আছে, কোথায় কোন্ দেবতা আছেন—এই সব খুঁজতে খুঁজতে স্বয়ং যোগিবেশে পরিভ্রমণ করতে করতে এক নগরে এসে পৌঁছলেন। তার নিকটে ছিল এক তপোবন। সেই তপোবনে জগদম্বার বিরাট প্রাসাদ ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে সেই দেবালয়ে বসে আছেন, এমন সময় দেখেন—এক যোগী সেখানে এলেন, নাম তাঁর অবধূতসার। কুশল প্রশ্নের উত্তরে আপনার কুশল জ্ঞাপন করে তিনি রাজার সঙ্গে সেই দেবালয়ে উপবেশন করলেন। যোগী জিজ্ঞেস করলেন : কোথা থেকে এসেছেন আপনি ?

রাজা বললেন : আমি একজন তীর্থযাত্রী পথিক।

যোগী বললেন : আপনি বোধহয়, রাজা বিক্রমাদিত্য। আমি একদিন উজ্জয়িনীতে আপনাকে দেখেছিলাম, তাই চিনতে পেরেছি। কী জন্যে এসেছেন ?

রাজা বললেন : হে যোগিবর! আমার মনে এ রকম ইচ্ছা হয়েছে যে, পৃথিবী পর্যটন করে যা কিছু আশ্চর্য দ্রষ্টব্য আছে দেখব এবং তাতে করে সাধুদর্শনও হবে।

অবধূতসার বললেন ঃ হে রাজন, আপনি এরূপ বিচক্ষণ হয়েও ভুল করে বিদেশে এসেছেন। রাজ্যের মধ্যে যদি বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাহলে কী করবেন ?

রাজা বললেন ঃ আমি সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত করে এসেছি।

যোগী বললেন ঃ রাজন, তবুও আপনি নীতিশাস্ত্রবিরোধী কাজ করেছেন।

কথিত আছে—

রাজকর্মচারীদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে যাঁরা শৈলবিহারে ব্যস্ত থাকেন, সেই মূঢ়ধী নৃপতিগণ বিড়ালের কাছে দুধের কলস রেখে নিদ্রা যান।

তাছাড়া, বংশপরম্পরাগত বলে রাজ্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, পুনর্বার রাজ্যকে সুদৃঢ় করা কর্তব্য।

কৃষি, বিদ্যা, বণিক, ভার্যা, নির্জবিত্ত ও রাজ্যসম্পদ—এ সকলই কৃষ্ণসর্পের মুখের মতো সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করা কর্তব্য।

তা শুনে রাজা বললেন : যোগিরাজ, এ সবই অনর্থক। এ সব ক্ষেত্রে দৈবের ক্ষমতাই বলীয়সী। সমস্ত সামগ্রী সমেত রাজ্যকে সুদৃঢ় করলেও পৌরুষবান পুরুষ পর্যন্ত দৈব বিমুখ হওয়ায় পরাভব বরণ করেন।

তাই তো বলে :

নেতা যাঁর বৃহস্পতি, বজ্র যাঁর অস্ত্র, দেবগণ যাঁর সৈনিক, স্বর্গ যাঁর দুর্গ, শ্রীহরি যাঁর সহায়, ঐরাবত যাঁর বাহন—আশ্চর্য বলসমন্বিত সেই ইন্দ্রও প্রবল শত্রুদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ

দেন। তাই এটা স্পষ্ট যে, দৈবই সকলের শরণ, বৃথা পুরুষকারকে ধিক্।

আরও,

আকৃতি, বংশ চরিত্র, বিদ্যা কিংবা সযত্ন সেবাও সফল হয় না। কিন্তু বৃক্ষ যেমন যথাকালে ফলপ্রসূ হয়, পূর্ব তপস্যা-অর্জিত ভাগ্যও তেমনি সময়ে সুফল দেয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে হিরণ্যকশিপুর বক্ষে ইন্দ্র-হস্তীর দন্ত কুমুদ আকুঞ্চিত হয়েছিল এবং যাতে পিনাকপাণির পরশুর অগ্রভাগ প্রতিহত হয়ে কুণ্ঠিত হয়েছিল, পরে সেই বক্ষ নৃসিংহের হাতের নখে ছিন্নভিন্ন হল। দৈব দুর্বল হলে তৃণও যে বজ্রায়িত হয়—এ কথাটা তাই সত্য বটে।

'বটবৃক্ষস্থিত যক্ষগণ যেমনটি দিচ্ছেন, তেমনি নিয়েও নিচ্ছেন। অতএব হে কল্যাণি—ঘুঁটিগুলো ফেলো, যা হবার তাই হবে।'

যোগী বললেন ঃ এ আবার কী ?

রাজা বললেন ঃ

উত্তরদেশে নদীপর্বতবর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেখানে রাজশেখর নামে রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন দেবদ্বিজপরায়ণ অতীব ধার্মিক। এক সময় তাঁর জ্ঞাতিরা সবাই মিলে তাঁর সঙ্গে বিবাদ করল, তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে সপত্নীক নগর থেকে বহিষ্কার করল।

তারপর সেই রাজা পত্নীপুত্রসহ দেশান্তরে ভ্রমণ করতে করতে এক নগরের উপবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সূর্যও গেলেন অস্ত। পত্নী-পুত্রসহ তিনি বটবৃক্ষতলে গিয়ে বসলেন। সেই বৃক্ষে পাঁচটি পাখি ছিল। তারা পরস্পর আলাপ করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ

এই নগরে রাজা মারা গেছেন। তাঁর সন্তান নেই। কে বা রাজা হবে ?

দ্বিতীয় জন বলল ঃ এই বটবৃক্ষমূলে যে রাজা রয়েছেন, এ রাজ্য তাঁরই হবে।

অন্যেরা বলল ঃ তাই হোক।

রাজাও শুনলেন পাখিদের সেই সংলাপ।

পরদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয় হল। সকলেই যে-যার কাজে লেগে পড়ল। রাজাও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম করে সূর্যার্ঘ্য দিয়ে সূর্যকে প্রণাম করে রাজপথ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে তখন রাজা খোঁজার জন্যে মন্ত্রীরা মালাসহ একটি হাতিকে পথে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁকে পথে দেখতে পেয়ে হস্তিনী তাঁরই কণ্ঠে মাল্যদান করে তাঁকে পিঠে বসিয়ে রাজভবনে নিয়ে গেল। তখন সমস্ত মন্ত্রী মিলে অভিষেক অনুষ্ঠান করে রাজা রাজশেখরকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এক সময় বিপক্ষের রাজারা সব দলবদ্ধ হয়ে রাজশেখরকে উন্মূলিত করতে নগর আক্রমণ করল। তখন রাজা রাজমহিষীর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। মহিষী বললেন ঃ মহারাজ, আপনি কীভাবে নিশ্চেষ্ট রয়েছেন ? শত্রু রাজারা যে নগর ঘিরে ফেলেছে। সকাল হলে নগর অধিকার করে নেবে, আমাদেরও বন্দী করে ফেলবে।

রাজা বললেন ঃ হে মুগ্ধাননা, চেষ্টা করে কী হবে ? দৈব যদি অনুকূল হয় তবে সব কাজই আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দৈব যদি প্রতিকূল হয়, তবে সবই আপনা-আপনি নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি এটা প্রত্যক্ষ কর নি ? অতএব বুদ্ধি বল, ক্ষয় বল—দৈবই সর্বত্র পরম কারণ।

যখন গাছের তলায় ছিলাম, তখন যিনি আমাকে রাজ্য দিলেন—চিন্তাটা ছিল তাঁরই। তিনি চিন্তা করেছিলেন। তিনি রয়েছেন আমারই মধ্যে। আমার বিষয়ে চিন্তা তিনিই করুন। জানি, আমার ভাবনা তিনিই ভাববেন।

তাঁর এই কথা শুনে যিনি রাজশেখরকে রাজ্য দিয়েছিলেন, তাঁর চিন্তার উদয় হল : আমি এঁকে বিশ্বের রাজ্যভার দিয়েছিলাম। এখন যদি এ বিষয়ে আমি যত্নবান না হই, তবে বিরাট অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। —এই বিচার করে সেই দেবতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে সমস্ত শত্রুকে তর্জন করতে লাগলেন। তারা সকলে পরাজিত হল। তারপর থেকে রাজা রাজশেখর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

বিক্রমাদিত্য এই কাহিনী বললেন। তখন যোগিরাজ এই কাহিনী শুনে অতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি কাশ্মীরলিঙ্গ দান করে বললেন : হে রাজন, এই কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তা-মণির মতো যা চিন্তা করবেন তাই দান করবে। একে ঠিক ঠিক পূজা করবেন।

রাজা বললেন, 'তথাস্তু'।

তারপর যোগিবরকে প্রণাম করে যখন নগরের পথে আসছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল : হে রাজন, শিবলিঙ্গের নিয়মিত পূজা আমার ব্রত। পথে লিঙ্গটি হারিয়ে গেছে। তিন দিন উপবাস করে আছি। তাই যদি দয়া করে এই শিবলিঙ্গটি আমায় দান করেন—

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরলিঙ্গ দান করে নিজ নগরে চলে গেলেন।

এই উপাখ্যান শুনিয়ে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'আপনার মধ্যে এ জাতীয় ঔদার্যাদি গুণ যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।

॥ চতুর্দশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ পঞ্চদশ উপাখ্যান ॥

মন্মথসঞ্জীবনী কথা

এবার আর এক পুতুল বলল :

শুনুন মহারাজ। বিক্রমাদিত্য রাজার পুরোহিত ছিলেন বসুমিত্র। অত্যন্ত রূপবান সকল কলাশাস্ত্রজ্ঞ, মহাধনসম্পন্ন এই ব্রাহ্মণ রাজার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন; সমস্ত লোকের তিনি খুব উপকার করতেন।

অনন্তর একদিন তিনি বিচার করলেন, উপার্জিত পাপের ক্ষয় গঙ্গাস্নান ভিন্ন হবার নয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে : তীর্থস্নান ছাড়া পবিত্র হবার বড়ো উপায় নেই।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ বা দানের ফলে যে সদ্‌গতিলাভ না হয়, গঙ্গাস্নান করে জীব সেই গতি লাভ করতে পারে।

সংযতচিত্ত পুরুষেরা গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে যে শুদ্ধি লাভ করে, তা শত শত যজ্ঞেও লাভ করা যায় না।

অন্ধকার অপহরণ করে যেমন সূর্য উদিত হয়, তেমনি গঙ্গাজলধারায় আপ্লুত ব্যক্তি পাপমুক্তির পরে সুন্দর শোভা পায়।

অগ্নি সংযোগে তূলারাশি যেমন সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়, তেমনি গঙ্গাধারায় সব পাপ বিনষ্ট হয়।

সূর্যকিরণে তপ্ত গঙ্গাজল যে পান করে, সে বিধিসম্মত পঞ্চগব্য পানের ফলস্বরূপ পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

যে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা কায় শোধন করেছে, এবং যে গঙ্গাজল পান করেছে—তারা উভয়েই সমফলভাগী।

দুঃখসন্তপ্ত জীবেরা যারা প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করছে, তাদের সবার পক্ষে গঙ্গাসম গতি নেই।

মহাপাতকের কবলে পড়ে বহু মানুষ যখন দীনচিত্তে ঘোর নরকে পতিত হতে থাকে, তখন গঙ্গার শরণ নিলে গঙ্গা তাদের ত্রাণ করেন।

গঙ্গাজলে অবগাহন করলে মানুষ ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষকেও অবশ্যই উদ্ধার করে।

গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান তথা গঙ্গানামকীর্তন করলে যে পুণ্য হয়, তা শত সহস্র মানুষকে পবিত্র করে।

শক্তি থাকতে যারা পাপনাশিনী গঙ্গা দর্শন না করে, তারা জন্মান্ধ মৃগ-পশুদের তুল্য।

একথা বিচার করে বারাণসী গিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করে প্রয়াগে পুনরায় মাঘস্নান সমাপন করে নিজ নগরের দিকে যাত্রা করলেন। পথে একটি নগর পড়ল। সেই নগরে রাজত্ব করছিলেন এক শাপভ্রষ্টা সুরাঙ্গনা। তাঁর স্বামী ছিলেন না। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের এক বিরাট প্রাসাদ ছিল। তার মধ্যে নির্মিত হয়েছিল একটি বিবাহ-মন্ডপ। সেই দেবপ্রাসাদের দরজায় লোহার কড়ায় তেল ফোটানো হচ্ছিল। সেখানে যারা দায়িত্বে ছিল, ভিন্‌দেশ থেকে আসা লোকদের তারা বলছিল ঃ যদি কোনো অধিক সত্ত্বশালী পুরুষ ফুটন্ত তেলের মধ্যে নিজেকে ফেলে দিতে পারেন, তবে এই মন্মথসঞ্জীবনী নামে অপ্সরা তাঁর কণ্ঠে মালা দেবেন।

বসুমিত্র সব দেখেশুনে নিজের নগরে ফিরে গেলেন। বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি মঙ্গলমতো ফিরে এসেছেন শুনে বন্ধুরা সকলে আনন্দ প্রকাশ করল। প্রভাতে তিনি গেলেন রাজবাটী। রাজদর্শন করে গঙ্গাজল এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ দিয়ে তিনি বসলেন।

তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ‘আর্য বসুমিত্র, আপনার তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্ন তো?’

তিনি বললেন, ‘হে রাজন, আপনার অনুগ্রহে তীর্থযাত্রা সেরে নিরাপদে ফিরে এসেছি।’

রাজা বললেন, ‘সেই সব দেশান্তরে গিয়ে অপূর্ব কিছু দেখলেন?’

বসুমিত্র সুরাঙ্গনা এবং ফুটন্ত তেলের ঘটনা নিবেদন করলেন।

এরপর রাজা তাঁর সঙ্গে সেখানে গেলেন। সেখানে স্নানান্তে লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেখানকার লোকেরা সব হাহাকার করে উঠল। তখন রাজার শরীর মাংসপিন্ডের মতো রূপ নিয়েছে। তা শুনে মন্মথ-সঞ্জীবনী অমৃত এনে ঐ মাংসপিন্ডে সিঞ্চন করলেন।

দেখতে দেখতে রাজা হলেন দিব্যরূপধারী এক পুরুষ। তারপর মন্মথসঞ্জীবনী যখন রাজার গলায় মালা দিতে এলেন, তখন রাজা বললেন, ‘অয়ি মন্মথসঞ্জীবনী, তুমি যদি আমার অনুগত হও, তবে আমার কথা শোন।’

তিনি বললেন, 'হে প্রভু, আপনি আজ্ঞা করুন। যেভাবেই হোক, আপনার আজ্ঞা আমি পালন করব।

রাজা বললেন, 'আমার কথা যদি রাখ, তবে আমার পুরোহিতকে বরণ কর।'

সেই অপ্সরাও 'তথাস্তু' বলে পুরোহিতের কণ্ঠে মাল্য দান করে তাঁকে বিবাহ করলেন। অনন্তর রাজা ফিরলেন তাঁর রাজধানীতে।

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'আপনার মধ্যে এরূপ ধৈর্য যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।'

॥ পঞ্চদশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ষোড়শ উপাখ্যান ॥

কন্যার ওজনে সোনা দান

পুনরায় অন্য পুতুল বলল :

শুনুন রাজন, রাজা বিক্রমাদিত্য সেবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক এবং বিদিক সকল পরিভ্রমণ করে, সেখানকার নৃপতিদের নিজপদতলাশ্রিত করে, তাঁদের প্রদত্ত অন্যের অনাস্বাদিত বস্তু সকল গ্রহণ করে, নিজ নিজ পদে তাঁদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে রাজধানীতে ফিরে এলেন। নগরে প্রবেশের মুখে দৈবজ্ঞ বললেন, 'হে দেব, চারদিন নগর প্রবেশের পক্ষে শুভ কোনো মুহূর্ত নেই।' তাঁর কথা শুনে রাজা নগরের বাইরে অবস্থান করলেন। উদ্যানস্থ বৃক্ষবাটিকায় পটমণ্ডপ (তাঁবু) নির্মাণ করে তার মধ্যে চারদিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। সেই সময় ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম ঘটল।

অনন্তর বসন্তের শোভা দেখে সুমন্ত্রী নামে অমাত্য রাজার কাছে এসে বললেন, 'মহারাজ, ঋতু-রাজ বসন্ত সমাগত! আজ বসন্তপূজা করা কর্তব্য। এ পূজা করলে সকলে আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকবে। সমস্ত লোক সুখী হবে। সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।'

তাঁর কথা শুনে রাজা, 'ঠিক আছে, তাই হোক', বলে প্রস্তাব অনুমোদন করে বসন্তপূজা সম্পাদনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত করলেন।

তারপর সেই অমাত্য সুমনোহর এক সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গীতবাদ্যনিপুণ কুশীলব, অন্যান্য কলাকুশল নর্তকীদের আমন্ত্রণ করলেন। আর, দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি অসহায় মানুষ বিনা আহবানেই এসে ভিড় জমালো। সেই সভামণ্ডপে নবরত্নখচিত সিংহাসন বসানো হল। তদুপরি প্রতিষ্ঠিত হল লক্ষ্মী-নারায়ণের দুটি বিগ্রহ। পূজার জন্যে কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্দ দ্রব্য-সামগ্রী এবং জাতী, যূথী, মল্লিকা, কুন্দ, শতদল, মদন, চম্পক, কেতকী প্রভৃতি পুষ্প সংগ্রহ করা হল। আয়োজন সম্পূর্ণ হলে রাজা বিধিসম্মত ভাবে নিজে নারায়ণের স্নানাদি সম্পন্ন করে ষোড়শোপচারে পূজার শেষে ব্রাহ্মণাদি কলাকুশল ব্যক্তিদের বস্ত্রাদি দানে সম্মানিত করলেন। এর পর গায়কগণ বসন্তরাগের আলাপ দিয়ে বসন্তের স্তুতি করতে লাগল। রাজা তাদের তাম্বূলদানের ব্যবস্থা করলেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে—

'পিনাকপাণির পাণিগ্রহণকালে ভুজঙ্গ-কঙ্কন-ভূষিতা অম্বিকার সহসা উচ্চারিত 'নমঃ শিবায়'—এই অর্ধোক্তিজনিত-লজ্জানত-চকিতদৃষ্টি মুখমণ্ডল আপনার কল্যাণ করুক।'—এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বললেন, 'হে রাজন, আমার কিছু বক্তব্য আছে।'

রাজা বললেন, 'বলুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি নন্দিবর্ধননগরবাসী ব্রাহ্মণ। আমার আটটি পুত্র, কন্যা নেই। তাই সপত্নীক আমি জগদম্বার সম্মুখে এই সংকল্প করেছি—হে অম্বিকা, যদি আমার কন্যা হয়, তবে আপনার নামেই তার নামকরণ করব। আর কন্যার ওজনে সুবর্ণ দান করব এবং কন্যাকে কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিশেষের হাতে সম্প্রদান করব।'

এখন তার বিবাহের সময় হয়েছে, বৃহস্পতি রয়েছেন একাদশ স্থানে, আগামী বৎসরে অনুষ্ঠান হবে না। অথচ—আমার প্রতিশ্রুতি এখন পালন করতে হলে কন্যার দেহভার-পরিমিত সুবর্ণ দান করা চাই। ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য ব্যতিরেকে অন্য কোনো রাজা নেই যিনি আমাকে এই দায় থেকে মুক্ত করতে পারেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনি ঠিকই করেছেন। আপনার যতটা ধনের প্রয়োজন আপনি গ্রহণ করুন।' এই বলে কোষাগারিককে ডেকে বললেন, 'হে ভাণ্ডারী, এই ব্রাহ্মণকে এঁর কন্যার ওজনের সমান সুবর্ণ দাও এবং পৃথকভাবে অষ্টবর্গের অর্ধেক আরও আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা দাও।'

রাজার আদেশমতো কোষাগারিক সেই ব্রাহ্মণকে সেই পরিমাণ সুবর্ণ ও সুবর্ণমুদ্রা দান করলেন। ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হয়ে কন্যা-সহ স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজাও শুভক্ষণে নগরে প্রবেশ করলেন।

এর পর পুতুল বলল ঃ 'দেব, আপনার মধ্যে এবংবিধ ঔদার্য যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা নির্বাক রইলেন।

॥ ষোড়শ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তদশ উপাখ্যান ॥

পরার্থে স্বদেহ-আহুতি

এবার আর এক পুতুল বলল ঃ

শুনুন, রাজন। ঔদার্যে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সেই ঔদার্য-গুণের মহিমায় ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করেছে তাঁর কীর্তি। সমস্ত যাচকই তাঁর স্তুতি করে। স্বস্তিবচন সর্বদা দাতাদের প্রীতির জন্যেই লোকে করে, বীরদের নয়।

বলা হয়েছে ঃ ধনার্থীদের স্বস্তিবচন দাতাদের প্রীতির জন্যে, আর রণদুন্দুভির ধ্বনি বীরদের যুদ্ধারম্ভের জন্যে।

বীর্য, ধৈর্য, জ্ঞানানুষ্ঠানাদি গুণ সকলেরই থাকে। কিন্তু যা থাকে না, তা হল ত্যাগগুণ।

তাই বলেছে ঃ

পশুরাও তো সব যুদ্ধ করে, শুকেরাও করে পাঠ। দান করে কয় জনা ? যে করে সে-ই শূর, সে-ই তো পণ্ডিত।

কেউ কেউ স্বভাবত বীর, কেউ কেউ দয়াবীর। তারা সকলে দানবীরের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নয়।

ত্যাগই একমাত্র গুণ যার প্রশংসা করতে হয়, অন্য গুণরাশি দিয়ে কী হবে? ত্যাগের জন্যেই পশু, পাষাণ ও বৃক্ষও পূজা পেয়ে থাকে।

ত্যাগ গুণ শত শত গুণ থেকেও অধিক—এটা আমার ধারণা। বিদ্যা যদি তাকে অলংকৃত করে—তবে আর কী বলব! তার মধ্যে যদি আবার যুক্ত হয় শৌর্য, তবে তো সেই গুণত্রয়বানকে নমস্কার।

এই তিনটি গুণ এবং নিরহংকার ভাব—এই চারটির বিরল সমন্বয় ঘটেছে বিক্রমাদিত্যের মধ্যে।

একদা পররাজ্যের এক নৃপতির সম্মুখে জনৈক স্তুতিপাঠক বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী পাঠ করছিল। তা শুনে সেই রাজার মনে স্পর্ধার উদয় হল। স্তুতিপাঠককে ডেকে রাজা বললেন, 'ওহে বন্দী, এই সব স্তুতিপাঠকেরা রাজা বিক্রমাদিত্যেরই স্তুতি করে, অন্য রাজা কি নেই?"

বন্দী বলল, 'হে রাজন, ত্যাগে, উপকারে, সাহসে, শৌর্যে, ধৈর্যে তাঁর মতো রাজা ত্রিভুবনেও নেই। পরোপকার করতে গিয়ে তিনি নিজ দেহের প্রতিও মমত্ব করেন না।'

তার ঐ কথা শুনে সেই নৃপতি 'আমিও পরোপকার করব'—মনে মনে এই বিচার করে এক যোগীকে ডেকে বললেন, 'হে যোগিরাজ, পরোপকার করবার জন্যে প্রতিদিন নূতন নূতন দ্রব্য যাতে হয়, সে-রকম কোনো উপায় আছে কি নেই?'

যোগিরাজ বললেন, 'হে রাজন, কিছুই তো নেই।' রাজা বললেন, 'যদি কোনো উপায় থাকে আমাকে বলুন, আমি তাই করব।'

যোগী বললেন, 'কৃষ্ণচতুর্দশীর দিনে চতুঃষষ্টি যোগিণীচক্রের পূজা করতে হবে। তারপর মন্ত্র-পুরশ্চরণ করে দশাংশ হোম করতে হবে।

হোমশেষে পূর্ণাহুতি দেবার সময় নিজের দেহ অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। অতঃপর রাজাও ঐরূপ অনুষ্ঠান করলেন।

যোগিনীচক্র প্রসন্ন হয়ে রাজাকে নূতন শরীর দান করে বললেনঃ হে রাজন, বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেনঃ হে মাতৃকাগণ, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমার গৃহে যে সাতটি মহাকলস আছে, তাদের প্রতিদিন সুবর্ণপূর্ণ করুন।

যোগিনীগণ বললেনঃ আপনি এইভাবে তিনমাস প্রতিদিন নিজদেহকে যদি অগ্নিতে আহুতি দেন, তবে আমরা তা করব।

রাজাও 'তাই হোক' বলে প্রতিদিন নিজ শরীর অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন এই ঘটনার কথা শুনতে পেয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে পূর্ণাহুতির সময়ে স্বয়ং অগ্নিতে পতিত হলেন। তখন যোগিনীরা পরস্পর বলতে লাগলেনঃ আজ এ মাংস অন্য দেহের বলে প্রতীত হচ্ছে, এর স্বাদ আরো বেশি। এ ব্যক্তির হৃদয় নিশ্চয় মহাসারসম্পন্ন।

এই বলে তাঁকে পুনরায় জীবিত করে তাঁরা বললেনঃ হে মহাসত্ত্ব, কে আপনি? শরীরত্যাগে আপনার কী প্রয়োজন?

তিনি বললেন ঃ আমি পরোপকারের জন্যে এ দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি।

যোগিনীরা বললেন ঃ সেজন্যে আমরা প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন ঃ আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই রাজা প্রতিদিন মৃত্যু-জনিত যে মহাকষ্ট ভোগ করেন, তা দূর করে দিন। এঁর সাতটি মহাকলস নিত্য সুবর্ণে পূর্ণ করে দিন।

যোগিনীরা বললেন ঃ তাই করব। —এই অঙ্গীকার করে রাজার মৃত্যু নিবারণ করলেন। কলসগুলিও সুবর্ণপূর্ণ করে দিলেন। এরপর বিক্রমাদিত্য নিজনগরে ফিরে এলেন।

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এ রকম পরোপকার চিকীর্ষা, ধৈর্য এবং দয়া থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।'

সপ্তদশ উপাখ্যান সমাপ্ত

॥ অষ্টাদশ উপাখ্যান ॥

সুবর্লোক গমন

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করতে উদ্যত হলেন, অন্য এক পুতুল তখনই বলতে লাগল ঃ

হে রাজন, বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যাদিগুণের মতো গুণসম্পদ যদি আপনার থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা বললেন ঃ নীতিমার্গ কি রকম তা বলা হোক।

পুতুল বলল ঃ হে রাজন, শুনুন। মণিপুরে গোবিন্দশর্মা নামে সকল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যখন নিজের পুত্রকে নীতিশাস্ত্র বলছিলেন, তখন আমিও তা শুনেছিলাম। তাই আপনার কাছে নিবেদন করছি।

রাজা বললেন ঃ বেশ, বল।

পুতুল বলতে লাগল ঃ শুনুন, রাজন। বুদ্ধিমান পুরুষের দুর্জন সংসর্গ করা উচিত নয়। কারণ তাতে একের পর এক অনর্থের সৃষ্টি হয়।

কথিত আছে ঃ

দুষ্টদের সঙ্গে মেলামেশা অনর্থসমূহের হেতু, তাতে সজ্জনদের নিন্দা হয়। লঙ্কেশ্বর হরণ করল দাশরথির পত্নীকে, বন্ধনদুঃখ ভোগ করতে হল দক্ষিণ সমুদ্রকে।

অধিকন্তু, এ জগতে অসতের সঙ্গে সংসর্গ ও সৎপুরুষদের নম্রতা দূর করে, ঔদ্ধত্যের উপক্রম ঘটায়, যশ নাশ করে এবং ক্ষিপ্র নরকের পথ পরিষ্কার করে।

সঙ্গ করতে হবে সজ্জনদের। জগতে সৎসঙ্গের চেয়ে বড়ো লাভ নেই, কারণ এ থেকে মহৎ আনন্দ প্রভৃতি গুণের উল্লাস ঘটে।

কথিত আছে ঃ

সৎসঙ্গ আনন্দ উৎপন্ন করে, মৃদুমন্দ দক্ষিণ বায়ু, চন্দ্র ও চন্দনকেও হার মানায়, মন্দভাবকে দমন করে এবং সম্পদেরও সন্ধান দেয়।

তাছাড়া, কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। পরের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। বিনা অপরাধে ভৃত্যদের দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। মহাদোষ বিনা স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত

নয়, কারণ তাতে নরকের ভাগী হতে হয়।

শাস্ত্রে বলেছে ঃ

কথার বাধ্য, দক্ষ, সুন্দরী ও সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে কোনো দোষ না দেখে যে ত্যাগ করে, সে অনন্ত নরকে যায়।

লক্ষ্মীকে স্থির মনে করা উচিত নয়, কারণ সে পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মতো চঞ্চল। কথায় বলে ঃ

সম্পদ ভোগ কর, দান কর, মানীদের সম্মান কর, সজ্জনদের সঙ্গ লাভ কর। অতিপ্রবল পবনবেগে আন্দোলিত দীপশিখার মতো লক্ষ্মী চঞ্চলা।

স্ত্রীদের কাছে গুহ্য কথা বলা উচিত নয়। ভবিষ্যতের জন্যে দুশ্চিন্তা করতে নেই। বৈরীদেরও হিতবাক্যই বলা প্রয়োজন। নিত্য দান-অধ্যয়নাদি বিনা দিন যাপন করা উচিত নয়। মাতা-পিতার সেবা করতে হবে। চোরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নেই। সর্বদা কর্কশ উত্তর দেওয়া ঠিক নয়। সামান্য কারণে বহু কিছু করতে নেই।

বলা হয়েছে ঃ

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পের জন্যে বহু হারাতে রাজি নন। অল্প দিয়ে যাতে অনেক রাখা যায়—সেটাই পাণ্ডিত্য।

দান করতে হবে আর্তকে। ধর্মস্থানে মনে, কাজে ও কথায় পরোপকার করা কর্তব্য। মানুষের কাছে সাধারণভাবে এই হল নীতিশাস্ত্রের উপদেশ।

সেই বিক্রমাদিত্য রাজা স্বভাবতই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

এমনি করে কিছুকাল কেটে গেলে একজন বিদেশী পর্যটক রাজাকে দর্শন করে সভায় উপবেশন করলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‌ভদ্র, আপনার নিবাস কোথায়?' পর্যটক বললেন ঃ মহারাজ, আমি একজন বৈদেশিক, আমার নিবাস বলতে কিছু নেই, সর্বদা ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

রাজা বললেন ঃ পৃথিবীতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কী কী আশ্চর্য বস্তু দেখেছেন?

তিনি বললেন ঃ মহারাজ, এক মহৎ আশ্চর্য আমি দেখেছি।

রাজা বললেন ঃ কী দেখলেন?

তিনি বললেন ঃ উদয়াচল পর্বতে সূর্যদেবের বিরাট মন্দির আছে। সেখান দিয়ে গঙ্গা বয়ে যায়। গঙ্গার তীরে ‘পাপবিনাশন' নামে শিবালয় আছে। সেখানে গঙ্গাপ্রবাহ থেকে প্রতিদিন একটি করে সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়, তার উপর নবরত্ন-খচিত সিংহাসন আছে।

সেই সুবর্ণস্তম্ভ সূর্যোদয়ের পর পূর্ণ বৃদ্ধি লাভ করে, মধ্যাহ্নে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। তারপর, সূর্য যখন অস্ত গমন করে, তখন নিজে থেকেই সূর্যমণ্ডল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গঙ্গাপ্রবাহে নিমজ্জিত হয়। প্রতিদিন সেখানে এ রকম ঘটে থাকে। এই মহাশ্চর্য বিষয় আমি দেখেছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য তাই শুনে তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে রাত্রিতে নিদ্রা গেলেন। প্রভাত-কালে যখন সূর্যের উদয় হল, তখন গঙ্গাপ্রবাহ থেকে রত্নসিংহাসনযুক্ত সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হল। সেই সময়ে রাজা স্বয়ং সেই স্তম্ভের উপরে উপবিষ্ট হলেন। স্তম্ভটিও দেখতে দেখতে সূর্যমণ্ডলের দিকে চলতে শুরু করল। যখন তিনি সূর্যের কাছাকাছি গেলেন, তখন অগ্নিকণাসদৃশ সূর্যকিরণের তাপে রাজার শরীর মাংসপিণ্ডের আকার নিল।

ঐরূপ পিণ্ডাকারে পরিণত হয়ে তিনি সূর্যমণ্ডলে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে—সবিতাকে নমস্কার; জগতের একমাত্র চক্ষুকে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-হেতুকে নমস্কার; ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মক, বিরিঞ্চি, নারায়ণ ও শঙ্কররূপী তোমাকে নমস্কার।—এইরূপ প্রণামবাক্যে সূর্যের স্তব করলেন।

তখন সূর্যদেব অমৃত দ্বারা সেই স্তম্ভের অভিষেক করলে রাজা দিব্যদেহ লাভ করলেন। সূর্যদেব বললেন: হে রাজন, তুমি মহাসত্ত্বশালী পুরুষ, আমার এ মণ্ডলে কেউ আসতে পারে না। সেখানে তুমি এসে গিয়েছ। আমি এতে তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন: আমার চেয়ে বড়ো ভাগ্যবান আর কে আছেন। কেননা, মুনিদেরও অগম্য আপনার এই মণ্ডলে আমি প্রবেশ করতে পেরেছি। আপনার অনুগ্রহে আমার সব কিছুই আছে।

তাঁর এই বাক্যে সূর্যদেব আরও সন্তুষ্ট হয়ে নবরত্নখচিত স্বীয় কুণ্ডল দুটি তাঁকে দিয়ে বললেন, 'হে রাজন, এই কুণ্ডল দুটি প্রতিদিন একভার (আট হাজার তোলা) সুবর্ণ দান করে।'

রাজা তখন সেই কুণ্ডল দুটি গ্রহণ করে সূর্যদেবকে পুনর্বার প্রণাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যখন উজ্জয়িনীর দিকে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ পথে এসে—

বেদান্তশাস্ত্রে যাঁকে ভূলোক-দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত অদ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর'—এই শব্দ অনন্য বিষয়রূপে যাঁর মধ্যে যথার্থতা লাভ করেছে, মুক্তিকামী যোগীরা প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাঁকে অন্তরে ধ্যান করেন, একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে যিনি সুলভ, সেই মহাদেব আপনার নিঃশ্রেয়স সাধন করুন।—এই আশীর্বাদ করে বলল: হে যজমান, আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, বহু পোষ্য, কিন্তু আমি দরিদ্র। সর্বত্র ভিক্ষা করি, তবু পেট ভরে না।

তা শুনে রাজা কুণ্ডলদুটি তাকে দিয়ে বললেন: হে ব্রাহ্মণ, এই কুণ্ডল দুটি প্রতিদিন তোমাকে একভার করে সোনা দেবে।

তা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাজার প্রশংসা করে স্বস্থানে গমন করল। রাজাও উজ্জয়িনী গমন করলেন।

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল বলল, 'হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এ রকম ঔদার্য ও ধৈর্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

রাজা নীরব রইলেন।

॥ অষ্টাদশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ঊনবিংশ উপাখ্যান ॥

পাতালে বলিদর্শন

পুনরায় যেমন সিংহাসনে উপবেশন করতে যাচ্ছিলেন, অমনি অপর একটি পুতুল বলল: হে রাজন, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদিগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা বললেন: ওহে পুতুল, বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যাদিগুণের বৃত্তান্ত বল।

পুতুল বলতে লাগলঃ শুনুন রাজন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করছিলেন, তখন সুবিশাল ভূমণ্ডলে সমস্ত মানুষ আনন্দে ছিল। ব্রাহ্মণগণ ষট্‌কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, স্ত্রীগণ ছিল পতিব্রতা, মানুষ ছিল শতায়ুঃ, বৃক্ষরা ছিল সদাফলপূর্ণ। প্রয়োজন মতো মেঘ বারিবর্ষণ করত, পৃথিবী ছিল সদা শস্যশালিনী লোকের পাপে ছিল ভয়। অতিথি-সংকার, জীবে দয়া, গুরুজনদের সেবা, সতত দানশীলতা—এইসব সদাচার প্রজাদের মধ্যে দেখা যেত।

বিক্রমাদিত্য একদিন সিংহাসনে বসে আছেন, সেই সভায় বিভিন্ন সামন্তরাজকুমার ছিলেন। কেউ কেউ স্তুতিপাঠকদের দিয়ে নিজবংশের মহিমা পাঠ করাচ্ছেন; কোনো কোনো উদ্ধতপ্রকৃতির সামন্তকুমার নিজভুজ পরাক্রম নিজেই প্রশংসা করছে; ছাব্বিশ প্রকার দণ্ড ও অস্ত্র সাধনায় অভিজ্ঞ শুশ্রূধারী কোনো কোনো যুবক পরস্পর হাসাহাসি করছে, কেউ কেউ শরণাগতের পরিপালনে মনোযোগী, অন্য কেউ কেউ পারলৌকিক বিষয়ে সাধনায় অভিনিবিষ্ট, কেউ কেউ আবার ধর্মানুশীলনে তৎপর—এমনি সব সামন্ত-কুমারেরা সভায় বসে ছিলেন।

এমন সময় এক ব্যাধ এসে রাজাকে প্রণাম করে বললঃ মহারাজ! অরণ্যের মধ্যে অঞ্জন পর্বতাকার এক মহাবরাহ এসে পড়েছে। আপনি এসে তাকে দেখুন।

তার কথা শুনে রাজা ঐ রাজকুমারদের সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে গিয়ে নদীতটে কুঞ্জবনের ভিতর সেই বরাহকে দেখলেন।

তারপর সেই বরাহ বীরদের কোলাহল শুনে সেই কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। তখন সমস্ত রাজকুমারের সঙ্গে ছাব্বিশপ্রকার আয়ুধ প্রয়োগের সুমহৎ নৈপুণ্য স্বহস্তে দেখিয়ে বিক্রমাদিত্য সেই আয়ুধসকল বরাহের উপর প্রয়োগ করলেন। বরাহ সেই আয়ুধ-প্রহার গ্রাহ্য না করে পর্বতের গুহায় প্রবেশ করল। রাজাও তার পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে পর্বতে একটি গর্তমুখ দেখে নিজেও সেই গর্তে প্রবিষ্ট হয়ে গভীর অন্ধকারের মধ্যে কিয়দ্দূর যেতে পারলেন। তারপর দেখতে পেলেন বেশ আলো। আরো কিছুদূরে সুবর্ণময় প্রাচীর বেষ্টিত, শুভ্র আকাশচুম্বী—প্রাসাদবিশিষ্ট এক অতিমনোহর নগর দেখতে পেলেন। সেই নগরের শোভাস্বরূপ রয়েছে বহু দেবালয়, উপবন, নানা সামগ্রীপূর্ণ সুসজ্জিত বিপণি, ধনাঢ্য পুরুষ, বিলাসীদের চিত্তবিনোদনতীর্থ বিলাসিনীভবন ইত্যাদি। সেখানে প্রবেশ করে যেই একটি বিপণিতে পদক্ষেপ করলেন, অমনি অতি মনোরমমণ্ডপযুক্ত রাজভবন দেখতে পেলেন।

সেখানে তখন রাজত্ব করছিলেন বিরোচনপুত্র বলি। রাজভবনে প্রবেশমাত্র বলি এসে সত্বর তাঁকে আলিঙ্গন করে অতিরমণীয় সিংহাসনে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মান্যবর, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

বিক্রমাদিত্য বললেনঃ আমি আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

বলি রাজাকে বললেনঃ আজ আমার বংশ পবিত্র ও চরিতার্থ হল। আমার বহু পুণ্যের ফলে আজ আমার গৃহে আপনার শুভাগমন হয়েছে।

বহুদিন পরে আমার এই বাড়ি আপনার পাদপদ্মের স্পর্শ পেয়ে ধন্য, আমার এই বাড়ি আজ পবিত্র।

বিক্রমাদিত্য বললেনঃ হে রাজন, আপনার হৃদয় পবিত্র, আপনারই জন্ম প্রশংসনীয়, কারণ স্বয়ং বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ আপনার মন্দিরে নিত্য বিরাজ করছেন।

তখন বলি বললেন ঃ প্রভু, কী নিমিত্ত আপনার আগমন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ হে দানবেন্দ্র, আপনার দর্শনার্থী হয়েই আমি এখানে এসেছি, অন্য কোনো কারণ নেই।

এরপর বলি বললেন ঃ প্রভু যদি আমাকে মিত্র ভেবে এসে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আমার কাছ থেকে কিছু একটা চেয়ে নিন।

বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ আমার কোনো অভাব নেই, আপনার দয়ায় আমার সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণতা রয়েছে।

বলি বললেন ঃ প্রভু, আপনার অভাব আছে এ কথা বলছি না, কিন্তু মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ দিতে চাইছি, পণ্ডিতেরা মিত্রের লক্ষণ এ রকমই তো দিয়েছেন ঃ

দান করে, প্রতিগ্রহ করে, গোপন কথা বলে ও জিজ্ঞেস করে, ভোজন করে এবং করায়—এই ছয় প্রকার হল প্রীতির লক্ষণ। উপকার বিনা কারও কখনো প্রীতি জন্মায় না। উপযাচক হলেও দেবতারা অভীষ্ট প্রদান করেন। আরও, নিয়ত দান করলে বিবেকবর্জিত পশুরও পুত্রাপেক্ষা অধিক প্রীতি হয়, ফলে দান করলেও তা বিফল হয় না। সন্তান না থাকলেও মহিষী নিত্য দুগ্ধ দান করে।

এই বলে তিনি বিক্রমাদিত্যকে রসায়ন ও রস দান করলেন। তারপর রাজা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেই রাজপথে এসে পড়েছেন, অমনি মহাদৈন্যদশাগ্রস্ত রুগ্ন দরিদ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রসহ এসে—

'যাঁর উদরের বলিরেখা যশোদার হাতে তাঁর দৃঢ়তর রজ্জু বন্ধনের চিহ্ন বলে সন্দেহ জন্মায়, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন'—এই আশীর্বাদ বাক্য উচ্চারণ করে বললেন ঃ হে যজমান, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, আমার পোষ্যও অনেক। আজ আমাকে এমন কিছু ধন দান করুন যাতে সপরিবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারি। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

রাজা বললেন ঃ হে ব্রাহ্মণ, এখন আমার হাতে কোনো ধন নেই, আছে রস ও রসায়ন—এই দুটি জিনিস। এই রসসংস্পর্শে সাত ধাতু সোনায় পরিণত হয়, আর এই রসায়ন যে সেবন করে, সে জরামৃত্যুরহিত হয়। দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি গ্রহণ করুন।

তখন পিতা বললেন ঃ যে রসায়ন সেবন করলে জরামৃত্যু রহিত হব, তাই দিন।

পুত্র বলল ঃ রসায়ন দিয়ে কী হবে ? জরামরণ না থাকলেও দারিদ্র্যদুঃখ তো ভোগ করতে হবে। যে রস-সংযোগে সুবর্ণোৎপত্তি হয় তাই গ্রহণ করা কর্তব্য।

এইভাবে পিতা-পুত্রে মতান্তর হল। রাজা দুজনের মতান্তর দেখে রস এবং রসায়ন-দুটিই তাঁদের দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। রাজাও স্বভবনে প্রস্থান করলেন।

এই কাহিনী উপন্যস্ত করে পুতুল বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এরূপ ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।

॥ ঊনবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ বিংশ উপাখ্যান ॥

ঘুঁটি, লাঠি ও কাঁথার কাহিনী

পুনরায় রাজা যেমন সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন, অমনি আরেক পুতুল বলে উঠল : হে রাজন, যদি আপনার মধ্যে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে এই সিংহাসনে বসুন।

রাজা বললেন : ওহে পুতুল, সেই বিক্রমাদিত্য রাজার ঔদার্যাদি গুণাবলীর বৃত্তান্ত বল।

পুতুল বলল : শুনুন রাজন। বিক্রমাদিত্য রাজা রাজত্ব করতেন ছ'মাস আর দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতেন ছ'মাস।

একবার দেশান্তরে গিয়ে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে পদ্মালয় নামে এক নগরে তিনি উপস্থিত হলেন। সেই নগরের বাইরের উদ্যানে অতি স্বচ্ছ সরোবর দেখে সেখানে জল পান করে বসলেন। তারপর অন্য দিক থেকে আরও কয়েকজন বৈদেশিক এসে জলপান করে বসে পরস্পর কথোপকথন করতে লাগল। একজন বলল : আশ্চর্য, আমরা অনেক দেশ দেখলাম, বহু তীর্থ দর্শন করলাম, অতি দুর্গম অপরের দুরধিগম্য পর্বতে আরোহণ করলাম, কিন্তু কোনো স্থানেও মহাপুরুষের দর্শন হল না।

আর একজন বলল : কেমন করে মহাপুরুষ দর্শন হবে? যেখানে মহাসিদ্ধ পুরুষ আছেন, সেখানে যাওয়া যায় না। কেননা, পথ অতি দুর্গম, মধ্যে কতো বিঘ্ন, শরীর টেকে না। যে উদ্যমে প্রথমে নিজেকেই শেষ হতে হয়, তার ফল কে ভোগ করবে? তাই বুদ্ধিমানের প্রথমে নিজেকে রক্ষা করাই কর্তব্য।

শাস্ত্রে বলেছে : স্ত্রী গেলে আবার হয়, বিত্ত গেলে আবার হয়, শস্যক্ষেত্র গেলে আবার হয়, শুভাশুভ কর্ম বারবার হয়, কিন্তু শরীর গেলে আর হয় না।

তাই প্রাজ্ঞজন অকার্য করেন না।

আরো বলা হয়েছে :

বিচক্ষণ ব্যক্তি বহু ব্যয়সাধ্য দুরন্ত ব্যসন কিংবা যে-কার্য বৃথাচেষ্টা মাত্র, তাকে কখনও প্রবৃত্ত হন না।

তাই তো, বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণসংশয় হলেও কখনো ভয়ঙ্কর শ্বাপদসংকুল দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করবেন না।

রাজা তার এই কথা শুনে বললেন : ওহে বৈদেশিক, এ কথা কেন বলছেন? পুরুষের পৌরুষ এবং সাহস যদি যথার্থ প্রয়োগ করা যায়, তবে কোনো কার্যই দুঃসাধ্য থাকে না।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে :

স্থিরসংকল্প পুরুষেরা কার্যসিদ্ধি সম্পর্কে দ্বিধা অতিক্রম করে দুষ্প্রাপ্য বাঞ্ছিত বিষয় লাভ করেন, অলসেরা কদাচ নয়।

যেমন কিনা :

আকাশের খাতেও কদাচিৎ পাতাল থেকে জল উঠতে পারে, কারণ দৈব অচিন্ত্য-শক্তিশালী। এ জগতে ফলবান হয় সাহসী। কষ্ট যথেষ্ট না করলে সুখের মুখ দেখা যায় না, মন্থনের বহুতর প্রয়াসের ফলে বিলম্বে মধুসূদন লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন।

নৃসিংহাকার নারায়ণ কী না করেছেন? অথচ তিনিই যখন চার মাস সাগরে শুয়ে নিদ্রা যান, তখন কিছুই করেন না।

পৌরুষ প্রকাশ না করলে সৌভাগ্য সুদূরেই থাকে। তুলারাশিতে আরোহণ করে সূর্যদেব নিজের আচ্ছাদক মেঘরাশিকে অপসারিত করেন।

রাজার এই বাক্য শুনে বৈদেশিক বলল : হে মহাসত্ত্ব, সেই কার্যটি কী বলুন।

রাজা বললেন : এই স্থান থেকে যদি বারো যোজন পথ যাওয়া যায়, তবে তারপরে মহারণ্যের মধ্যে বিরাট এক পর্বত দেখতে পাওয়া যাবে, সেখানে থাকেন যোগীশ্বর ত্রিকালনাথ। যদি তাঁর দর্শন লাভ করা যায়, তবে তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন। আমি সেখানে যাচ্ছি।

ওরা বলল : আমরাও যাব।

রাজা বললেন : স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।

এরপর তারা রাজার সঙ্গে বেরিয়ে মহারণ্যের পথ অতি দুর্গম দেখে রাজাকে বলল : হে মহাসত্ত্ব, পর্বত কত দূরে?

রাজা বললেন : এখান থেকে আট যোজন দূরে।

'তবে আমরা যাব, যদিও অনেকটা দূর এবং পথও অত্যন্ত দুর্গম'—এই বলতে বলতে ছয় যোজন পথ অতিক্রম করে যখন তারা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন দেখতে পেল—মহাকালের মতো মুখবিশিষ্ট, বিষাগ্নি-উদ্বমনরত অতি ভয়ঙ্কর এক সাপ পথ রোধ করে পড়ে আছে। সেই সাপ দেখামাত্র তারা ভয়ে পলায়ন করল। রাজা কিন্তু আবারও পথে চলতে থাকলেন। অনন্তর সাপ ছুটে এসে রাজাকে বেষ্টন করে দংশন করল।

তিনি তখন বিষাক্ত অঙ্গে বস্ত্রের শক্ত বাঁধন দিয়ে দুর্গম পর্বতে আরোহণ করে ত্রিকালনাথ যোগীকে দর্শন করে প্রণাম করলেন। যোগীকে দর্শন করা মাত্র সর্পবিষের জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে রাজা সুস্থ বোধ করলেন।

যোগিরাজ বললেন : হে মহাসত্ত্ব, মানুষের অগম্য মহাবিপৎসংকুল এই স্থানে এত দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করে কেন এসেছেন আপনি?

রাজা বললেন : হে প্রভু, আমি আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

যোগিরাজ বললেন : অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে আপনার।

রাজা বললেন : এখন কোনো কষ্ট নেই, আপনার দর্শন লাভ করা মাত্র সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। কষ্ট করে আজ আমি ধন্য হয়েছি। কেননা, মহাপুরুষদর্শন অতীব দুর্লভ।

তা ছাড়া :

যতদিন শরীর সুদৃঢ়, ইন্দ্রিয়রা পটু, ততদিন কল্যাণ কর্ম করাই মানুষের কর্তব্য।

কথিত আছে :

যতদিন এই শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, যতদিন জরা দূরে থাকে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি যতদিন অটুট থাকে, যতদিন না আয়ু ক্ষীণ হয়, ততদিন আত্মকল্যাণের জন্যে প্রভূত প্রযত্ন করা বিদ্বানদের একান্ত কর্তব্য। গৃহে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে কূপখননের প্রচেষ্টায় আর কী হবে?

তখন যোগী প্রসন্ন হয়ে একটি ঘুঁটি, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কন্থা প্রদান করে বললেন : হে রাজন, এই ঘুঁটি দিয়ে ভূমিতে যতগুলি রেখা টানা যায়, একদিন তত

যোজন পথ যাওয়া যায়। এই যোগদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে স্পর্শ করালে মৃত সৈন্য সঞ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, আর বাম হস্তে ধারণ করে যদি স্পর্শ করানো যায়, তবে সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর এই-যে কন্থা, এ ঈপ্সিত বস্তু দান করে।

রাজা ঐ তিনটি বস্তু নিয়ে যোগীকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন দেখেন রাজপথে এক রাজকুমার সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করে কাষ্ঠসংগ্রহ করছে।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে সৌম্য, কেন এ রকম করছ?

সে বলল : আমি এক রাজার পুত্র। আমার রাজ্য জ্ঞাতিরা কেড়ে নিয়েছে। আমি দরিদ্র, তাই জীবন ধারণ করতে অক্ষম হয়ে অগ্নিতে প্রবেশের জন্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করছি।

রাজা তখন তাকে অভয় দিয়ে ঘুঁটি, যোগদণ্ড এবং কাঁথাটি দিয়ে দিলেন। তাদের গুণের কথাও বললেন।

অনন্তর, অতি সন্তুষ্ট রাজকুমার রাজাকে প্রণাম করে স্বদেশে গমন করল। রাজা বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে ফিরে চললেন।

এই বৃত্তান্ত বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল : হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি ঈদৃশ ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা চুপ করে রইলেন।

॥ বিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ একবিংশ উপাখ্যান ॥

অষ্ট-সিদ্ধি-লাভ

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করলেন, তখন অন্য এক পুতুল বলল : এ সিংহাসনে তাঁরই বসা উচিত যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতা আছে।

সে বলল : শুনুন, রাজন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বুদ্ধিসিন্ধু নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর এক পুত্র ছিল, নাম অনর্গল। সে ঘি-ভাত খেতো এবং ছেলে-মানুষের মতো খেলাধুলা করত। কিছুমাত্র লেখাপড়া করত না।

একদিন পিতা তাকে বললেন : অনর্গল, তুমি আমার ঔরসে জন্মেও অত্যন্ত দুর্বিনীত, বিদ্যাভ্যাস কর না, হৃদয়হীন মূর্খ হয়ে রইলে। যে হৃদয়হীন, সে-ই মূর্খ।

শাস্ত্রে বলেছে :

অপুত্রকের গৃহ শূন্য, বান্ধবহীন দেশ শূন্য মূর্খের হৃদয় শূন্য, দরিদ্রের তা সবই। তা ছাড়া, সে পুত্রের জন্ম হওয়ায় কী লাভ যে না বিদ্বান, না ধার্মিক? সেই গাভী দিয়ে কী হয় যে না দেয় দুধ, না দেয় বাছুর?

আর, অজাত, মৃত ও মূর্খ—এই তিন পুত্রের মধ্যে মৃত ও অজাত পুত্র বরং ভালো, কারণ তারা স্বল্প দুঃখ দেয়, কিন্তু মূর্খ যতদিন বাঁচে ততদিন জ্বালায়।

কথিত আছে : যে পুত্রকে দিয়ে বংশদণ্ডের অগ্রভাগে পতাকাবস্ত্রের ন্যায় বংশের উন্নতি হয় না, মাতার যৌবনবিনাশী সেই পুত্রে কী প্রয়োজন?

পিতার এই বাক্য শুনে অনর্গলের অন্তরে অনুতাপ হল। বৈরাগ্য অবলম্বন করে সে দেশান্তরে গমন করল।

সেখানে এক নগরে জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট সকল নীতিশাস্ত্র পাঠ করে নিজ নগরে প্রত্যাগমন করল ; পথের মধ্যে অরণ্যে সে একটি দেবালয় দেখতে পেল। সেই দেবালয়ের নিকটে পদ্মবনশোভিত, চক্রবাক-মিথুন-মণ্ডিত, স্বচ্ছজলপূর্ণ এক সরোবর ছিল। সেই সরোবরের একাংশের জল ছিল বেশ উত্তপ্ত। এই সব দেখে অনর্গল সেখানে বসে পড়ল। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেল। তারপর, রাত্রিবেলা সেই তপ্তজলের মধ্য থেকে আটজন দিব্য রমণী বেরিয়ে এসে দেবালয়ে গিয়ে ষোড়শোপচারে দেবতার অভিষেকাদি পূজা সমাপন করে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করল। তখন দেবতা প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রসাদ দিলেন।

অনর্গল এ সবই দেখছিল। প্রভাতে প্রস্থান সময়ে তারা অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে একজন দিব্যাঙ্গনা বলল : 'হে সৌম্য, এসো, আমাদের নগরে এসো।'

এই বলে তপ্তজলের মধ্যে প্রবেশ করল। সেও তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তপ্ত জলের মধ্যে সেই দিব্যস্ত্রী প্রবেশ করলে পর ভয়ে অনর্গল আর প্রবেশ করল না।

তারপর অনর্গল নিজ নগরে ফিরে এসে পিতা-মাতা-বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করল, তাঁদেরও খুব আনন্দ হল। পরদিন রাজদর্শন করতে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে উপবেশন করল। রাজা কুশলপ্রশ্নের পর বললেন : ওহে অনর্গল, এতদিন ধরে কোথায় ছিলে ?

সে বলল : লেখাপড়া করতে বিদেশে গিয়েছিলাম।

রাজা বললেন : সেখানে বিদেশে কী কী আশ্চর্য বিষয় দেখলে ?

অনর্গল রাজার কাছে তপ্তোদকবৃত্তান্ত নিবেদন করল। তা শুনে রাজা তার সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন। সূর্যও অস্ত গেল। মধ্যরাত্রে সেই দিব্যরমণীরা এসে ষোড়শ উপচারে দেবতার পূজাদি সমাপন করে নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করে দেবতাকে তুষ্ট করে প্রভাতে যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে একজন রাজাকে দেখে বলল : 'হে সৌম্য, আসুন আমাদের নগরে।' তা শুনে রাজা তার সঙ্গে গেলেন। সমস্ত দিব্যাঙ্গনা তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করে সপ্ত পাতালে নিজেদের নগরে গেল, রাজাও তপ্ত জলমধ্যে নিমগ্ন হয়ে তাদের সঙ্গে গেলেন। তারপর সমস্ত দিব্যস্ত্রী মিলে তাঁকে আরতি প্রভৃতি নানা প্রকারে সম্বর্ধিত করে বলল : হে মহাসত্ত্ব ; আপনার তুল্য শৌর্যাদিসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব এই রাজ্যের অধিপতি হোন, আমরা সমস্ত স্ত্রী মিলে আপনার সেবা করব।

রাজা বললেন : আমার এ রাজ্যে প্রয়োজন নেই। আমি এই কৌতূহলের বিষয় দেখতে এসেছি।

তারা বলল : হে মহাপুরুষ, আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন : আপনারা কারা ?

তারা বলল : আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধি।

রাজা বললেন : তাহলে, আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি দান করুন।

তখন সেই দিব্যস্ত্রীগণ রাজাকে আটটি রত্ন দান করল। তারাই অণিমাদি অষ্টগুণান্বিত। রাজা সেই রত্ন আটটি নিয়ে যখন ফিরছিলেন, তখন পথে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে 'যিনি শ্রীহরির নাভিপদ্মে বাস করেন, বেদসমূহের প্রথম প্রবাচক সেই চতুরানন আপনাদের সর্বদা রক্ষা করুন'—এই আশীর্বাদ করলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন : হে ব্রাহ্মণ, কোথা থেকে আপনার আগমন ?

সেই ব্রাহ্মণ বললেন : আমার নিবাস চম্পাপুরে। পরিবারে আমার বহু পোষ্য। কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র। ভার্যার কুৎসিত ভর্ৎসনায় দেশান্তরী হয়েছি। হে রাজন, লোকেও বলে, নীতিশাস্ত্রেও কথিত আছে যে, নির্ধন পুরুষকে ভার্যারাও পরিত্যাগ করে।

বলে না—উত্তমবেশভূষায় সজ্জিত, সদ্‌বান্ধবদের বহুপ্রশংশিত ও সুদর্শন হলেও নির্ধন স্বামীকে গুণবতী স্ত্রীরা ত্যাগ করে। যাদের অর্থ নেই, বহু বিপদ তাদের কাছে প্রকটতর হয়। সদ্বংশজা ভার্যারাও তাদের সম্যক সেবা করে না, যথাযথ বিক্রমশালী হলেও মিত্রগণ তাদের কাছে যায় না।

তা ছাড়া, গুরুই হোন, কুরূপই হোন, সুশীলই হোন আর বাগ্মীই হোন, শাস্ত্রজ্ঞই হোন কিংবা শস্ত্রজ্ঞই হোন, অর্থ ব্যতিরেকে মর্ত্য মানুষ মনুষ্য-সমাজে বৈদগ্ধ্যের সমাদর পান না।

এমন কি, অবিকল ইন্দ্রিয়গুলি তাই রয়েছে, নামও সেই একই, বুদ্ধি পূর্ববৎ অপ্রতিহতই রয়েছে, বাক্যও সেই এক ; কিন্তু কী বিচিত্র। অর্থের উষ্মা না থাকার দরুন মুহূর্তমধ্যেই সেই মানুষই অন্য হয়ে যায়।

রাজা তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে আটটি রত্ন তাঁকে দিয়ে দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা করে নিজ নগরে ফিরে গেলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন।

এই কাহিনী বলে পুতুল রাজাকে বলল, 'হে রাজন, আপনার যদি ঈদৃশ ধৈর্য ও শৌর্যাদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

তা শুনে রাজা চুপ করে রইলেন।

॥ একবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাবিংশ উপাখ্যান ॥

দেবী কামাক্ষীর অনুগ্রহ লাভ

পুনরায় রাজা যেমন সিংহাসনে উপবেশন করতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি অপর একটি পুতুল বলল : হে রাজন, এই সিংহাসনে তিনিই বসতে পারবেন যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদি গুণ আছে।

রাজা বললেন : ওহে পুতুল, সেই বিক্রমাদিত্য রাজার ঔদার্যবৃত্তান্ত বল।

পুতুল বলতে লাগল : হে রাজন, শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য পালন করতে করতে এক সময় পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে নানা তীর্থ, দেবালয়, নগর, পর্বত প্রভৃতি দেখছিলেন। একদিন তিনি মহারত্নরাজি শোভিত প্রাকারবেষ্টিত একটি নগর দেখতে পেলেন। প্রাসাদগুলি তার গগনচুম্বী, তার মধ্যে রয়েছে বহু শিবায়তন ও বিষ্ণুমন্দির। সেই নগরের বাইরে রয়েছে একটি বিষ্ণুমন্দির, সেখানে গিয়ে রাজা পার্শ্বস্থিত সরোবরে স্নান করে দেবতাপ্রণাম করে—

হে নাথ, আপনার পরম মহিমা আমি কী জানব ? বাক্যের অগোচর শ্রীহরিকে স্বয়ং ব্রহ্মাও জানতে পারেন না।

আর কারো ভজনা করি না, অন্য কাউকে আশ্রয় করি না, অন্যের নাম শুনি না,

অন্যের মাহাত্ম্য পাঠ করি না, চিন্তাও করি না। ভক্তিসহ আপনারই পাদপদ্ম ভজনা করি, হে শ্রীনিবাস, হে পুরুষোত্তম, আমাকে আপনার শ্রীচরণের দাস করে নিন।

ইত্যাদি স্তুতি-বাক্যে দেবতার বন্দনা করে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে রাজা বললেন ?

হে ব্রাহ্মণ, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

ব্রাহ্মণ বলল, আমি তীর্থযাত্রী, পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াচ্ছি। আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

রাজা বললেন ঃ আমি আপনারই মতো এক তীর্থযাত্রী। ব্রাহ্মণ তাঁকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললেন ঃ তা তো নয়। আপনাকে অত্যন্ত তেজস্বী দেখাচ্ছে। সমস্ত রাজলক্ষণই আপনার মধ্যে বিদ্যমান। রাজরাজেশ্বর সিংহাসনে উপবেশন না করে কী জন্য পৃথিবী পর্যটন করছেন ? অথবা ললাট-লিখন কে করে লঙ্ঘন ?

যেমন দেখুন না, হরিই হোন আর হরই হোন, ব্রহ্মাই হোন আর দেবগণই হোন, কেউই পারেন না ললাটের রেখা অন্যথা করতে।

তাঁর কথা রাজাও স্বীকার করলেন। কারণ, যুক্তিযুক্ত কথাই তিনি বলেছেন। সুধীবাক্য রয়েছে ঃ

প্রভাবশালী ব্যক্তিও সর্বদা যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট থেকে হলেও গ্রহণ করবেন, কিন্তু যুক্তিহীন কুবাক্য কখনও বৃদ্ধের কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করবেন না।

হে ব্রাহ্মণ, আপনাকে কেন অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ শ্রমের কারণ কী বলি ?

রাজা বললেন ঃ বলুন আপনার কষ্টের কারণ।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ শুনুন তাহলে, রাজন। এখান থেকে নিকটে নীল নামে এক পর্বত আছে। সেখানে রয়েছে দেবী কামাক্ষীর অধিষ্ঠান। ঐখান থেকে পাতালে প্রবেশের একটি বিবরপথ রয়েছে। কিন্তু বিবরের মুখ রুদ্ধ।

কামাক্ষী মন্ত্র জপ করলেই সেই দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তার মধ্যে রয়েছে রসের কুণ্ড। সেই রসের সংস্পর্শে অষ্ট ধাতু সুবর্ণাদিতে পরিণত হয়। আমি দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত কামাক্ষী মন্ত্র জপ করেছি। কিন্তু বিবর-দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নি।

এই পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজা যেই নিজের কণ্ঠ লক্ষ্য করে খড়্গ তুলেছেন, সেই মুহূর্তে দেবতা বলে উঠলেন, 'তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন ঃ হে দেবী, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করুন।

দেবীও 'তথাস্তু' বলে বিবর-দ্বার উন্মুক্ত করে ব্রাহ্মণকে রস দান করলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা করে নিজ নগরে প্রস্থান করলেন। রাজাও ফিরলেন তাঁর নগরে।

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এরূপ ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা নির্বাক রইলেন।

॥ দ্বাবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান ॥

দুঃস্বপ্ন-দর্শন

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে বসতে যাবেন, তখন আরেক পুতুল বলল : হে রাজন, এই সিংহাসনে তিনিই বসার যোগ্য যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্য আছে।

রাজা বললেন : ওহে পুতুল, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের কথা বল।

পুতুল বলল : শুনুন, মহারাজ। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পরিক্রমা সেরে নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন।

নগরবাসী সমস্ত মানুষের অসীম আনন্দ হল। রাজা নিজ ভবনে প্রবেশ করে মধ্যাহ্নকালে তৈল-মর্দন ও স্নানাদি সমাপন করে চন্দন-বস্ত্রাদি-ভূষিত হয়ে দেবালয়ে প্রবেশ করলেন। দেবতাকে ষোড়শ উপচারে অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন :

তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা। তুমিই বিদ্যা, তুমিই বিত্ত, দেবাদিদেব, তুমিই আমার সর্বস্ব—

এইভাবে স্তুতি-শেষে দেবতাকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণদিগকে কপিলবর্ণ গাভী, ভূমি ও তিল প্রভৃতি দান করে, তারপর দীন, অন্ধ, বধির, কুব্জ, পঙ্গু অনাথ প্রভৃতিকে প্রভূত দান করে ভোজনগৃহে প্রবেশ করে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভোজন করিয়ে নিজে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন করলেন।

তাই তো বলে : বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, আতুর, কন্যকা, অতিথি ও ভৃত্যদের খাইয়ে তবে গৃহস্থ ও গৃহিণীর খাওয়া কর্তব্য। যে আপনার সিদ্ধি কামনা করে, সে কখনো একা ভোজন করবে না, অন্ততঃ দুই, তিন বা আরো বেশি লোকের সঙ্গে ভোজন করলে অভীষ্ট ফললাভ, সন্তোষ ও কাম্য সৌভাগ্য সম্পদ লাভ হয়ে থাকে।

তারপর, ভোজনশেষে কিছুকাল বিশ্রাম করে উপবেশন করলেন।

বলা হয়েছে : ভোজনান্তে উপবেশন এবং ভেজনান্তে সুখে শয়ন করলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভোজনান্তে যে ধাবিত হয়, মৃত্যুও তার পিছনে ধাবমান হয়।

আর,

অত্যধিক জলপান, অতিরিক্ত বা অত্যল্প আহার, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এবং মূত্র ও পুরীষের বেগরোধ—এই ছয় প্রকার অত্যাচারে বহু ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

তারপর, সন্ধ্যাবেলা তিনি সায়ন্তন কর্ম সমাপন করে ভোজনান্তে শয়নকক্ষে গমন করলেন। সেখানে চন্দ্রকিরণ-ধবল-মসৃণ-প্রচ্ছদাস্তীর্ণ কুন্দ-মল্লিকা-পঙ্কজাদি কুসুমাকীর্ণ পালঙ্কে শয়ন করে তিনি নিদ্রামগ্ন হলেন। শেষ রাতে রাজা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি স্বয়ং মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। বিষ্ণু-স্মরণ করে তিনি সহসা গাত্রোত্থান করলেন। প্রভাতে সন্ধ্যাকর্মাদি অনুষ্ঠান সেরে সিংহাসনে উপবেশন করে ব্রাহ্মণদের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বললেন। তা শুনে সর্বজ্ঞভট্ট বললেন, 'হে রাজন্, স্বপ্ন দুই প্রকারের। কতকগুলি শুভফলপ্রদ, আর কতকগুলি অনিষ্টকর। তাদের মধ্যে শুভ স্বপ্ন হল : স্বপ্নে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, অগম্যা রমণীর সঙ্গে সহবাস, ছত্র, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা নারী, শঙ্খ, সুবর্ণাদির দর্শন প্রভৃতি।

বলেছে না—

স্বপ্নে গো, বৃষ, হস্তী, প্রাসাদ, পর্বতাগ্র, বনস্পতি-শীর্ষে আরোহণ, বিষ্ঠানুলেপ, রোদন, মৃত্যু, অগম্যাগমন সৌভাগ্যের কারণ হয়।

যাদের ফল অশুভ তারা হল : স্বপ্নে মহিষ-পৃষ্ঠে আরোহণ, গর্দভ-পৃষ্ঠে আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কার্পাস, ধূম, ব্যাঘ্র, সর্প শূকর, বানরাদির দর্শন।

কথিত আছে :

যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দভ, উষ্ট্র, মহিষ ও ব্যাঘ্র দর্শন করে, ছয় মাসের মধ্যে তার মৃত্যু অবধারিত।

তা ছাড়া,

রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখলে এক বৎসরে, দ্বিতীয় প্রহরে দেখলে আট মাসে, তৃতীয় প্রহরে দেখলে তিন মাসে, আর প্রত্যূষে দেখলে সেদিনই সেই স্বপ্নের ফল ফলে থাকে।

বেশি বলে কাজ নেই, হে রাজন, এই স্বপ্ন আপনার অনিষ্টকারী।

রাজা বললেন : হে ব্রাহ্মণ, এই দুঃস্বপ্নের প্রতিবিধান কী করলে সম্ভব ?

সর্বজ্ঞ ভট্ট বললেন : আপনি স্নান করে যজ্ঞাগ্নি-প্রদক্ষিণ করে বস্ত্রাদিসহ সমস্ত অলংকার ব্রাহ্মণদের দান করুন। তারপর পুনরায় বস্ত্র পরিধান করে দেবতার অভিষেক এবং নবরত্ন-সজ্জান্তে পূজার পর ব্রাহ্মণদের গাভী, ধান্য প্রভৃতি দশবিধ দ্রব্য দান করুন এবং অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ, অনাথ প্রভৃতি প্রার্থীদের পর্যাপ্ত দান করে সন্তুষ্ট করুন।

এইসকল অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের আশীর্বচনের ফলে আপনার দুঃস্বপ্নজনিত অনিষ্ট নিবারিত হবে, ফলে আপনার কল্যাণ হবে।

রাজা সর্বজ্ঞ ভট্টের এইসব উক্তি শুনে যথাযথ অনুষ্ঠান করে তিনদিন ধরে পর্যাপ্ত দানের জন্যে কোষাগারিককে আদেশ দিলেন।

অনন্তর যার যত ধনে তৃপ্তি, সে সেই পরিমাণ ধন গ্রহণ করল।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল রাজাকে বলল : হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এমন উদারতা ও ধীরতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা নিরুত্তর রইলেন।

॥ ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্বিংশ উপাখ্যান ॥

শালিবাহনের সঙ্গে যুদ্ধ

রাজা আবার সিংহাসনে বসতে যাবেন, এমন সময় আরেক পুতুল বলে উঠল : হে রাজন, যাঁর বিক্রমাদিত্যের সমান ঔদার্যাদিগুণ আছে, তিনিই এ সিংহাসনে বসবার যোগ্য।

রাজা ভোজ বললেন, 'বল পুতুল, বল সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের কথা।'

পুতুল বলতে লাগল : শুনুন, মহারাজ। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দরপুরী নামে একটি নগরী ছিল। সেখানে প্রচুর ধনশালী এক বণিক বাস করত। সে তার চার পুত্রকে ডেকে বলল : ওহে পুত্রগণ, আমি মারা গেলে তোমাদের চারজনের একত্র বসবাস হতেও পারে না-ও পারে। পাছে বিবাদ বাধে, তাই আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই তোমাদের চারজনের মধ্যে বড়ো-ছোটো অনুসারে সম্পত্তি ভাগ করে দেব।

অনন্তর, চারজনের ভাগ ঠিক করে বণিক বলল : খাটের নিচে চারটি ভাগ করে

আমার ধন রেখে দিলাম, বড়ো-ছোটো অনুসারে তোমরা তা নিয়ে নেবে। পুত্রেরা তা মেনে নিল।

তারপর, বণিকের মৃত্যু হলে চার ভাই এক মাস একত্র থাকল। তারপর তাদের স্ত্রীদের মধ্যে পরস্পর কলহ দেখা দিল। তা দেখে তারা বিচার করল ঃ কিসের জন্যে এই কলহ? পিতা জীবিত থাকতেই চারজনের মধ্যে ধন ভাগ করে দিয়েছেন। সুতরাং, খাটের নিচে রাখা সেই ধন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে গ্রহণ করে আমরা প্রত্যেকে পৃথক হয়ে সুখে থাকব।

এই সিদ্ধান্ত করে যখন তারা খাটের নিচে মাটি খুঁড়ল, তখন চারটি ভাঁড়ের নিচে চারটি কৌটা দেখতে পেল। তাদের মধ্যে একটি কৌটায় রয়েছে মাটি, একটিতে অঙ্গার, আরেকটিতে অস্থি এবং অন্যটিতে কিছু খড়।

এ রকম চারটি পাত্র দেখে তারা বিস্মিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করল ঃ হায়, পিতার পরিকল্পিত এই বিভাগের রীতি অনুসরণ করে ধন বিভাগের নির্দেশ কে করতে জানে?

এই বলে তারা রাজসভায় গেল। সভার সামনে ধন ভাগের বৃত্তান্ত তারা নিবেদন করল, কিন্তু সভাসদ্‌রা বিভাগের স্বরূপ বুঝতে পারল না।

চার ভাই তখন যেখানে যেখানে ধনবিভাগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকেন, তাদের কাছে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করল, কিন্তু কেউই মীমাংসা করতে পারলেন না।

পরে, একসময় তারা এল উজ্জয়িনীতে। রাজসভায় এসে রাজা এবং সভাসদদের সম্মুখে সেই বিভাগবৃত্তান্ত নিবেদন করল। রাজসভা পারল না ঐ বিভাগের স্বরূপ অবধারণ করতে। এরপর তারা গেল আরেক নগরে। সেখানকার মহা মহা পণ্ডিতদের কাছে বিষয়টি বলে বেড়ালেও তারা পারলেন না কোনো সমাধান দিতে।

সেই সময় কুমোরপাড়া থেকে শালিবাহন সেই বৃত্তান্ত শুনে সেখানে উপস্থিত মহৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলল ঃ হে সভ্যগণ! এতে দুর্বোধ্য বা আশ্চর্য কি আছে?

তাঁরা বললেন ঃ তুমি যা বলবার বল। সে বলল ঃ এরা চারজন এক বিত্তবানের পুত্র। এদের পিতা তার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে পুত্রদের মধ্যে ধন বিভাগ করে রেখেছে, যেমন—জ্যেষ্ঠকে দিয়েছে মাটি অর্থাৎ যে-সমস্ত ভূমি তার অধিকারে ছিল—সেগুলি সব জ্যেষ্ঠকে দিয়েছে। দ্বিতীয় জনকে দেওয়া হয়েছে খড়, তাতে বোঝা যাচ্ছে সব রকমের ধান সে দিয়েছে দ্বিতীয় পুত্রকে, তৃতীয়জনকে দেওয়া হয়েছে অস্থি, সুতরাং সমস্ত পশু দেওয়া হয়েছে তাকে। চতুর্থ জনকে দেওয়া হয়েছে অঙ্গার, এতে সূচিত হচ্ছে তাকে দেওয়া হয়েছে সমস্ত সোনা।

এইভাবে শালিবাহন তাদের ভাগনির্দেশ করল। তারাও সুখী হয়ে স্বনগরে ফিরে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিভাগবৃত্তান্ত এবং তার সমাধান শুনে বিস্ময়ান্বিত হয়ে প্রতিষ্ঠান নগরীতে একটি পত্র পাঠালেন ঃ

'স্বস্তি, যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ-ষট্‌কর্মনিষ্ঠ যমনিয়মাদিগুণনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাননগরবাসী মনীষীদিগকে কুশলজিজ্ঞাসান্তে রাজা বিক্রমাদিত্য আদেশ করছেন ঃ

আপনাদের গ্রামে এই চার ভাইয়ের ধনবিভাগকারী ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠাবেন।'

মনীষীরা রাজার প্রেরিত পত্র পাঠ করে শালিবাহনকে ডেকে বললেন ঃ ওহে শালিবাহন, রাজাধিরাজ পরমৈশ্বর্যবান আসমুদ্র পৃথিবীর অধিপতি, সকল কলাবিদ্যা-

বিষয়ক কৌতূহল পরিপূরণে যিনি কল্পতরু, উজ্জয়িনীবাসী সেই রাজা বিক্রমাদিত্য তোমাকে আমন্ত্রণ করেছেন। তুমি সেখানে যাও।

সে বলল: কে সে বিক্রমাদিত্য রাজা? সে ডেকেছে বলে যাব না। যদি তার প্রয়োজন থাকে, সে নিজে আসুক আমার কাছে। তার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তার উত্তর শুনে মনীষীরা রাজার কাছে পুনরায় এই বলে পত্র পাঠাল যে, সে যেতে রাজি নয়।

পত্রের বক্তব্য শুনে রাজার শরীর ক্রোধে জ্বলতে লাগল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ তিনি বেরিয়ে পড়লেন। প্রতিষ্ঠাননগরীতে পৌঁছে শালিবাহনের নিকট দূত পাঠালেন। সেই দূত এসে শালিবাহনকে বলল: ওহে শালিবাহন, রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমাকে ডাকছেন। অতএব তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এস।

শালিবাহন বলল: ওহে দূতগণ, আমি একাকী রাজার সঙ্গে দেখা করব না। ষড়ঙ্গ বাহিনী সহ যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রমাদিত্যের বিক্রম দেখব। রাজার কাছে তোমরা আমার বক্তব্য নিবেদন কর।

তার এই কথা শুনে দূতেরা রাজাকে তদ্রূপ নিবেদন করল। তা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্যও রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

শালিবাহনও কুম্ভকারগৃহে নির্মিত মাটির হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি ষড়ঙ্গ-বাহিনীকে মন্ত্রবলে সজীব করে সেই ষড়ঙ্গ*সেনা*সহ নগর থেকে বেরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল।

তখন দুই বাহিনীর অভিযান সময়ে—দিক্‌চক্র হল আন্দোলিত, সমুদ্র হল ভীষণ বিক্ষুব্ধ, 'পাতালে চঞ্চল হল বাসুকি যার শিরে পৃথিবীর ভার, কম্পিত হল পৃথিবী, টলে উঠল অতিশয় মহাবিষধর অনন্তনাগের ফণার উৎসঙ্গ। সেনানায়কদ্বয়ের বাহিনীর অভিযান সময়ে এমনি সব ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে লাগল।

বায়ুর মতো বেগবান অসংখ্য অশ্ব ও মদমত্ত হস্তিযূথে সৈন্যবাহিনীরা শোভা পেতে লাগল। ধ্বজ, চামর ও উত্তম পতাকাবস্ত্রে সমস্ত আকাশ ঢাকা পড়ল এবং পটহ, মৃদঙ্গ, ভেরীর সুউচ্চ নাদে ত্রিভুবন মুখরিত হয়ে উঠল।

অনন্তর উভয় দল হল মুখোমুখি, এবং তখন অশ্বাদির খুরের ধূলায় ধূলায় আকাশ বহুদূর পর্যন্ত ধূসরিত হল। বাকি অংশ ঢাকা পড়ল ছত্র-চামরাদিতে। ভেরীরব, রণনির্ঘোষ, গজ, অশ্বের শব্দ, কিংকিণীধ্বনি ও যোদ্ধাদের ভয়ংকর রণহুঙ্কারে উভয় সৈন্যদল পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগল।

তখন প্রতিস্পর্ধী উভয় দলের দক্ষ যোদ্ধারা খট্বাঙ্গ, ভল্লাস্ত্র, তীক্ষ্ন খুরণ, গদা, মুদ্গর, অর্ধচন্দ্রাকার বাণ, নারাচ, ভিন্দিপাল, সুদৃঢ় হল ও মুষল, শক্তি, কুন্ড, কৃপাণ, পট্টিশ, শক্তিবজ্র প্রভৃতি এবং আরো বহু সুতীক্ষ্ন দিব্য শস্ত্র দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকল।

রণভূমিতে শত্রুর আঘাতে কেউ কেউ গতাসু হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে নিজ পক্ষের সেবায় উঠে দাঁড়াতে পারছে, কেউ কেউ শত্রুর পক্ষে ভয়প্রদ অট্টহাসি হাসছে, কেউ কেউ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে উরুতে কিংবা বক্ষে করাঘাত করে বীরোচিত আস্ফালনে এবং আত্মসন্তুষ্টিতে অগ্রে ধাবিত হচ্ছে।

কেউ কেউ শত্রুদের সমরত্রাস সৃষ্টি করতে লাগল, কেউ কেউ শত্রুর প্রচণ্ড প্রহারে

ক্ষতবিক্ষত দেহে স্বর্গনারীর পতিত্ব লাভ করল (সম্মুখযুদ্ধে নিহত বীরদের দিব্যাঙ্গনারা পতিত্বে বরণ করে), কোনো কোনো বীরশ্রেষ্ঠ উদরে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে কিংবা শস্ত্রপ্রহারে ছিন্নভিন্ন দেহ হয়েও মৃত্যুভয় ত্যাগ করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে।

শত্রুদের রক্তনদীতে ছুরিকাদি শস্ত্রগুলি যেন মীন; কেশ, স্নায়ু, শিরা, অন্ত্রনালী প্রভৃতি যেন শৈবাল, মৃত গজেন্দ্র-দেহগুলি যেন প্রেতমূর্তি, অস্থিগুলি যেন শংখ—এইরূপ প্রতীতি হতে লাগল। এমন ভয়াবহ দৃশ্যাবলী শম্ভুর যুদ্ধেও দেখা যায় নি।

কালক্রমে বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের সমস্ত সৈন্যকে ভূশায়িত করলেন, শালিবাহন তখন শেষনাগকে স্মরণ করল। শেষনাগ পাঠালেন সাপদের। তারা দংশন করল বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদের। সর্পদষ্ট সৈন্যেরা বিষক্রিয়ায় মূর্ছিত হয়ে রণাঙ্গনে পতিত হল। তা দেখে বিক্রমাদিত্য রাজা একাকী স্বীয় রাজধানীতে চললেন এবং নিজের সৈন্যদের বাঁচাতে জলের মধ্যে অর্ধদেহ নিমগ্ন রেখে ন' বছর অবধি বাসুকি-মন্ত্র জপ করলেন। ফলে বাসুকি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বললেন ঃ হে রাজন, বর প্রার্থনা কর।

বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ হে সর্পরাজ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে সর্পবিষের প্রচণ্ডতায় মূর্ছিত আমার সৈন্যদের সঞ্জীবিত করতে অমৃতঘট দান করুন।

বাসুকি তখন অমৃতঘট দান করলেন। সেই অমৃতঘট গ্রহণ করে রাজা বিক্রমাদিত্য যখন পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ সম্মুখে এসে—

'হিমাদ্রিশিখরের মতো শুভ্র যে দন্তপঙক্তির সংলগ্ন হয়ে ধরিত্রী তার শুভ্রচ্ছটায় শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল, লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্যে বরাহরূপী শ্রীহরির দন্তাকৃতি সেই দন্তপঙক্তি আপনাকে পবিত্র করুন।'—এই আশীর্বাদ করলেন।

তা শুনে রাজা বললেন ঃ হে ব্রাহ্মণ, কোথা থেকে আপনার আগমন ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আমি এসেছি প্রতিষ্ঠান নগর থেকে।

রাজা বললেন ঃ বলুন আপনার কী অভিপ্রায়।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আপনি প্রার্থীদের কাছে চিন্তামণি। কেননা, প্রার্থীদের চিন্তিত বস্তু দান করতে আপনি সমর্থ। অতএব, আমার যে-একটি বস্তুতে অভিলাষ রয়েছে, যদি তা দান করেন, তবে বলি।

রাজা বললেন ঃ আপনি যা কামনা করেন, তা দান করব।

তখন ব্রাহ্মণ বললেন ঃ ঐ অমৃতঘটটি আমাকে দিন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কে পাঠিয়েছে ?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ আমাকে পাঠিয়েছে শালিবাহন।

তা শুনে রাজা বিচার করলেন : আমি পূর্বে এঁকে দেব—এ কথা বলেছি। এখন যদি না দিই তবে অপযশ ও অধর্ম হবে। অতএব যাই হোক না কেন দান করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ হে রাজন, আপনি কী ভাবছেন ? আপনি তো সজ্জন। সজ্জনদের কথার অন্যথা হয় না।

তাই কথিত আছে ঃ

সূর্য যদি পশ্চিমেও উদিত হয়, মেরুও যদি টলে ওঠে, বহ্নিও যদি বা শীতল হয়, পর্বতচূড়ায় পাথরের উপরেও যদি পদ্ম ফোটে, তবু সজ্জনদের কথা কখনও অন্যথা হয় না।

রাজা বললেন ঃ ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার কাজও সে-রকমই হচ্ছে। গ্রহণ করুন এই অমৃতকুম্ভ।—এই বলে রাজা তাঁকে অমৃতঘট দান করলেন।

সেই ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজাও ফিরে চললেন উজ্জয়িনীতে।

এই উপাখ্যান উপন্যস্ত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে এইরকম ঔদার্য ও ধৈর্য যদি থেকে থাকে, তবে এই সিংহাসনে আপনি বসুন।

॥ চতুর্বিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ পঞ্চবিংশ উপাখ্যান ॥

অনাবৃষ্টি নিবারণের উপায়

পুনরায় রাজা যেই সিংহাসনে বসতে যাবেন, অমনি অন্য পুতুল বলে বসল : হে রাজন, যাঁর বিক্রমাদিত্য রাজার মতো ঔদার্যাদি গুণাবলী আছে, তাঁরই এ সিংহাসনে বসার কথা।

রাজা বললেন ঃ ওহে পুতুল, বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের বৃত্তান্ত বল।

সে বলল ঃ শুনুন রাজন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন জনৈক জ্যোতিষী এসে—

সূর্যদেব আপনাকে শৌর্য দান করুন, চন্দ্র দিন আপনাকে ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল আপনার সুমঙ্গল বিধান করুন, বুধ দান করুন আপনাকে সদ্‌বুদ্ধি, বৃহস্পতি দিন আপনাকে গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, কেতু কুলোন্নতি। সমস্ত গ্রহ আপনার অনুকূল হয়ে নিত্য প্রীতিপ্রদ হোন।—এই আশীর্বাদ করে পঞ্চাঙ্গ বর্ণনা করলেন।

অনন্তর, রাজা জিজ্ঞেস করলে জ্যোতিষী বললেন : এই বৎসর রাজা রবি, মন্ত্রী মঙ্গল ও মেঘাধিপতি। শনৈশ্চর রোহিনীশকট ভেদ করে যাবে, তাই সর্বতোভাবে অনাবৃষ্টি হবে।

বরাহমিহির সংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

যখন সূর্যপুত্র (শনি) রোহিণী-যোগ ত্যাগ করেন, তখন মেঘ দ্বাদশ বৎসর জল বর্ষণ করে না।

আরও বলা হয়েছে ঃ

যদি সূর্যনন্দন রোহিণীশকট ভেদ করেন, তবে পৃথিবীতে রক্তবৃষ্টি হয়, আর বেশি কী বলব ? সাগরেও জল থাকে না। সমস্ত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

মতান্তরেও—

এই মন্দগ্রহ (শনি) যখন রোহিণীর শকট ভগ্ন করেন, মেঘ তখন বারো বৎসর ধরে এ ধরায় জল বর্ষণ করে না।

দৈবজ্ঞের এই বাক্য শুনে রাজা বললেন ঃ এই অনাবৃষ্টি প্রতিরোধের কোনো উপায় আছে কি ?

দৈবজ্ঞ বললেন ঃ কেন থাকবে না ? যদি কোনো গ্রহ-হোমের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে দৃষ্টি হবে।

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের কাছে পূর্বকথা বলে তাঁদের সহযোগিতায় হোম করতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত হোমসামগ্রী দিয়ে হোম যথাবিধি

সুসম্পন্ন হল। বিবিধ দ্রব্য, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়ে ব্রাহ্মণদের রাজা সন্তুষ্ট করলেন এবং দশ প্রকার দান করলেন। তারপর, প্রচুর দান করে দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতি অসহায় মানুষকে তুষ্ট করলেন। কিন্তু তবুও বৃষ্টি হল না।

অনাবৃষ্টির ফলে বুভুক্ষায় নিদারুণ কষ্ট পেয়ে সমস্ত লোকে হাহাকার করতে লাগল।

রাজাও তাদের দুঃখে নিজে দুঃখিত হয়ে একদিন যজ্ঞশালায় বসে যখন চিন্তা করছিলেন, তখন আকাশবাণী শোনা গেল ঃ হে রাজন, তোমার নগরস্থিত দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোমার আশা পূরণ করবেন। ঐ দেবতার সম্মুখে যদি বত্রিশ লক্ষণযুক্ত পুরুষের ছিন্ন মস্তক বলি দেওয়া হয়, তবে বৃষ্টি হবে।

তা শুনে দেবালয়ে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে যেমনি রাজা খড়্গ তুলেছেন নিজের মাথার কাছে, অমনি দেবতা তাঁর হাত ধরে বললেন : হে রাজন, তোমার ধৈর্যে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন ঃ হে দেবী, যদি আমার উপর তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করুন।

দেবতা বললেন ঃ তাই করব।

তখন রাজা নিজের সভায় ফিরে এলেন।

এই গল্প বলা শেষ হলে পুতুল বলল ঃ হে রাজন, যদি আপনার মধ্যে এমনি ধৈর্য ও পরোপকারের বাসনা থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসে পড়ুন।

॥ পঞ্চবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ষড়্‌বিংশ উপাখ্যান ॥

কামধেনু-বার্তা

আবারও রাজা যখন সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন আরেক পুতুল বলল ঃ হে রাজন, এই সিংহাসনে বসার যোগ্য তিনিই যাঁর বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্যাদি গুণরাজি আছে।

ভোজ বললেন ঃ ওহে পুতুল, বল সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের কথা।

সে বলল ঃ হে রাজন, শুনুন। ঔদার্য, দয়া, বিবেক, ধৈর্যাদি গুণের সমন্বয়ে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ রাজা দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

শুধু তাই নয়, তিনি যা বলতেন, তার অন্যথা করতেন না। যা তাঁর মনে থাকত, তা ঠিক তেমনি বলতেন, কথায় যেমনটি থাকত, কাজেও তাই হত। অতএব তিনি সজ্জন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যেমন সংকল্প, তেমনি বাক্য, যেমন বাক্য তেমনি কর্ম। চিত্ত, বাক্য ও ক্রিয়ায় সজ্জনদের ঐক্য থাকে।

একদিন দেবনগরীতে ইন্দ্র সিংহাসনে বসে রয়েছেন, তাঁর সভায় অষ্টাশি হাজার ঋষির সমাবেশ হয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা সমবেত রয়েছেন। আট লোকপাল, ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ, বারোজন আদিত্য, নারদ, তুম্বুরু, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনারা সব বসে ছিলেন। গন্ধর্বরাও সবাই ছিল।

সেই সময় নারদ বললেন ঃ ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য রাজার মতো কীর্তিমান পরোপকারী

মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাজা নেই।

তাঁর কথা শুনে দেবসভায় উপস্থিত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

কামধেনুও বললেন : এতে কি সন্দেহর কিছু আছে ? বিস্ময়েরও কিছু নেই।

কথিত আছে :

দান, তপস্যা, শৌর্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নীতি বিষয়ে বিস্ময়বোধ করা উচিত নয় ; যেহেতু বসুন্ধরা বহুরত্নগর্ভা।

আর,

অশ্ব, গজ, লৌহ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, বস্ত্র, তথা নারী, পুরুষ ও জলের মধ্যে বহু প্রভেদ রয়েছে।

অতঃপর, ইন্দ্র সুরভিকে বললেন : তুমি মর্ত্যে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া পরোপকারাদি গুণের বৃত্তান্ত সম্যক অবগত হয়ে আমার কাছে এসে নিবেদন কর।

তখন, সুরভি অত্যন্ত দুর্বল গাভীরূপ ধারণ করে মর্ত্যে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য পথ দিয়ে চলেছেন, এমন সময় সুরভি অত্যন্ত দুস্তর পঙ্ক-কুণ্ডে পতিত হলেন। রাজাকে দেখে কাতর আর্তনাদ করলেন। রাজা তাঁর কাছে এসে যখন দেখলেন যে গাভীটি অতি সংকীর্ণ এবং দুস্তর পাঁকে আবদ্ধ রয়েছে, তখন তার অদূরে বসে রয়েছে একটি ব্যাঘ্র। রাজা গাভীটিকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ততক্ষণে সূর্য অস্তাচলে। এলো রাত্রি। তিনি সেই অনাথা গাভীটিকে পাহারা দিতে সেখানেই রয়ে গেলেন। রাত্রি শেষে উদিত হল সূর্য। গাভীটি রাজার দয়া-ধৈর্য-প্রভৃতি গুণ স্বচক্ষে দেখে নিজেই উঠে দাঁড়াল এবং রাজাকে বলল : হে রাজন, আমি স্বর্গগাভী সুরভি, আপনার দয়াদি গুণ প্রত্যক্ষ করবার জন্য স্বর্গ থেকে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস জন্মেছে আপনার মতো দয়াবান রাজা পৃথিবীতে নেই। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনি বর যাচ্ঞা করুন।

রাজা বললেন : আপনার অনুগ্রহে আমার অভাব নেই। কী চাইব আমি ?

সুরভি বললেন : আমার বাক্য কোনোমতে নিষ্ফল হবে না। তাহলে আমি আপনার নিকটেই থাকব। এই বলে রাজার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর, রাজা যখন তাঁর সঙ্গে পথে চলছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে—

মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্য-কালে নন্দী সানন্দে মুরজে করাঘাত করলে সেই শব্দ শুনে মেঘভ্রমে কুমার কার্তিকেয়ের ময়ূর এসে পড়লে মহাদেবের কটিবেষ্টনী সর্পটি ভয়ে গণেশের নাসারন্ধ্রে (হস্তীমুখের শুণ্ডের বিবরে) শরীর সংকুচিত করে প্রবেশ করলে তাঁর গণ্ডদেশ ঘিরে মদলোভী অলিকুল উড়ে উড়ে গুঞ্জরবে চারদিক মুখর করে তুলছিল ; এমতাবস্থায় ভ্রমরদংশন ও নাসিকাভ্যন্তরে সর্পপ্রবেশের অস্বস্তিতে গণেশের সরব শিরশ্চালনা আপনাকে রক্ষা করুক।—এই আশীর্বাদ করে বললেন : হে রাজন, বিধাতা আমাকে দরিদ্র করেছেন, তাই আমি সমস্ত লোককে দেখছি, আমাকে কেউ দেখতে পায় না।

হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমি (ইন্দ্রজালে) সিদ্ধপুরুষ হয়েছি। কারণ, জগৎকে আমি দেখতে পাই, জগতের কেউ আমাকে দেখতে পায় না।

উপরন্তু, দারিদ্র্য যাকে অপ্রকাশ করে রাখে, তার গৃহে সর্বদা জন্মাশৌচ লেগেই আছে।

[দরিদ্র-দম্পতির সংলাপে দারিদ্র-কষ্টের স্বরূপ]

দরিদ্র স্বামী—সুদর্শনে, নিজ অন্নের গ্রাসটি পথিককে দাও। 'নেই, নেই' শব্দ বলা বৃথা।

স্ত্রী–কেন সখা, বল।

স্বামী–জান না, আমার সূতকাশৌচ হয়েছে।

স্ত্রী–কত দিন? এর শেষটা কবে?

স্বামী–এ অশৌচ চলবে যাবজ্জীবন। বিষম এ পুত্রজন্মাশৌচ, কখনও ঘুচবে না।

—কী বললে, আমার মধ্যে কে জন্মেছে? এ দরিদ্রে আর কে জন্মাবে? জন্মেছে যে পুত্র তার নাম দারিদ্র্য।

রাজা বললেন ঃ হে ব্রাহ্মণ, কী চান আপনি?

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ হে রাজন, আপনি আশ্রিতজনের কল্পবৃক্ষ, সারা জীবন যাতে আমার দারিদ্র্য আর না থাকে, সেই ব্যবস্থা করুন।

রাজা বললেন ঃ বেশ, এই কামধেনু আপনার ইচ্ছা পূরণ করবে, আপনি একে গ্রহণ করুন। এই বলে তাঁকে কামধেনু দান করলেন।

ব্রাহ্মণ যেন স্বর্গসুখ পেলেন–এমনি আনন্দে কামধেনু গ্রহণ করে স্বস্থানে গমন করলেন। রাজাও নিজ নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

—এই উপাখ্যান উপন্যস্ত করে পুতুল ভোজরাজকে বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এ রকমের ঔদার্যাদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

রাজা কোনো কথা বললেন না।

॥ ষড়্‌বিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তবিংশ উপাখ্যান ॥

দ্যূতকার-বার্তা

আবারও যখন রাজা সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলেন, আর একটি পুতুল বলে বসল ঃ হে রাজন, যাঁর রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদি গুণাবলী আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত পাত্র।

'ওহে পুতুল, বল সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যাদি-গুণের বৃত্তান্ত'—বললেন রাজা।

পুতুল বলল ঃ শুনুন, রাজন। রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্যটন করতে করতে এক নগরে গেলেন। সেখানে ছিলেন অতি ধার্মিক এক রাজা। শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান তিনি করতেন, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রজাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন করতেন। তাঁর প্রজারা সকলে ছিল সদাচারনিষ্ঠ, অতিথিবৎসল এবং দয়ালু।

রাজা বিক্রমাদিত্যও 'দিন তিনেক বা দিন পাঁচেক এখানে থাকব'—এইরূপ মনস্থ করে এক অতি সুন্দর দেবালয়ে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে নাটমন্দিরে উপবেশন করলেন। এই সময় রাজকুমারের মতো দেখতে অতি সুদর্শন পট্টবস্ত্রপরিহিত নানালংকারভূষিত কুঙ্কুম-কর্পূর-কস্তুরী-মৃগমদাদিমিশ্রিত চন্দনাদি-অঙ্গরাগানুলিপ্ত এক যুবক সেখানে এলেন; যাদের সঙ্গে এলেন তাদের সঙ্গেই নানাবিধ রসিকতা, হাস্যপরিহাস ও কৌতুক-কথা বলতে বলতে চলে গেলেন।

রাজা তাঁকে দেখে–'কে এই ব্যক্তি?'–এ রকম ভাবতে থাকলেন।

তারপর, দ্বিতীয় দিনে সেই ব্যক্তিই একাকী বস্ত্রাদিরহিত অবস্থায় কৌপীনমাত্র সম্বল করে এসে সেই দেবালয়ের নাটমন্দিরে বসলেন।

রাজা তাঁকে দেখে বললেন, 'হে সৌম্য, গতকাল আপনার দেহে ছিল অলংকার। সঙ্গে ছিল বয়স্য। তাদের সঙ্গে রাজকুমারের মতো এখানে এসেছিলেন। আজ কেন এই করুণ দশা?'

তিনি বললেন ঃ প্রভু কী বলব? গতকাল আমি সে-রকমই ছিলাম, এখন দৈবদোষে এ-রকম হয়েছি।

যেমন ধরুন—

যে ভ্রমরেরা একদা হস্তীদের গণ্ডদেশের মদবারিপানে পুষ্ট হত, প্রস্ফুটিত পঙ্ক-পরাগে যাদের দেহ সুরভিত হত তারা এখন নিয়তির নির্দেশে উঠোনের নিম ও আকন্দফুলে বসে কোনোমতে কাল কাটাচ্ছে।

আর,

আম, কাঁঠাল, ও তালের গন্ধে আমোদিত হয়ে যে মৌমাছিরা আগে খেলায় মেতে থাকত, তারা এখন পোড়া কপালের গুণে শরভসংকুল আকন্দবনে ঘুরে বেড়ায়।

আর,

যে কলহংসশিশুরা পূর্বে মন্দাকিনীর নির্মল জলে মনোরম ভঙ্গীতে দোলায়মান স্বর্ণপদ্মের পরাগ মেখে বেড়ে উঠেছিল, তারা এখন দৈবের বিধানে শৈবাল-সম্পৃক্ত জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

অধিকন্তু, বায়ু-চঞ্চল পদ্মের চ্যুত পরাগ পিঠে মেখে যে কলহংসগণ পূর্বে উজ্জ্বল রাঙা হয়ে উঠেছিল মধুকরদের মুখর মধুর কলগুঞ্জন শুনে যারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে কান্তার চঞ্চুপুটপ্রান্তস্থিত মৃণালগ্রাস গ্রহণের অবসর পেত না, তারা আজ বিধিবশে কাষ্ঠের নিকট তৃণ প্রার্থনা করছে।

তা ছাড়া, কর্মফল নিয়ন্ত্রিত জীব কোন্ কষ্ট না পেয়ে থাকে?

তাই তো বলা হয়েছে ঃ

যে কর্মচক্রের চালনায় ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ডের ভিতরে কুম্ভকারের মতো নিয়ন্ত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, যার চালনায় বিষ্ণু দশপ্রকার অবতাররূপ গ্রহণের মতো গভীর মহা-সংকটে পড়েছেন, রুদ্র যার চালনায় করতলে নর-কপাল নিয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন, সূর্যদেব যার তাড়নায় গগনে নিত্য ভ্রমণ করছেন, সেই কর্মচক্রকে নমস্কার।

রাজা বললেন ঃ কে আপনি?

তিনি বললেন ঃ আমি দ্যূতকার।

রাজা বললেন ঃ আপনি পাশা খেলতে জানেন?

তিনি বললেন ঃ পাশাখেলার ব্যাপারে আমার হাত পাকা। তা ছাড়া, আমি শারীর-ক্রীড়াও জানি, বুদ্ধিবলও আমার আছে। কিন্তু সেগুলি সবই নিরর্থক, দৈববলই সবার ওপরে।

কথিত আছে ঃ

হাতি, সাপ ও পাখিদের লোকে আটকে রাখে রাহু-কেতু সূর্যচন্দ্রকে গ্রাস করে পীড়া দেয় এবং বুদ্ধিমান লোকেরা দারিদ্র্যে কষ্ট পায়—এসব দেখে-শুনে আমি সার বুঝেছি যে, বিধির বিধানই প্রবল।

আর সেজন্যেই বলে ঃ

আকৃতি, কুল, শীল কাজে লাগে না। বিদ্যা কিংবা সযত্ন সেবাও কাজে লাগে না। পূর্ব তপস্যায় অর্জিত ভাগ্যই কালে পুরুষকে বৃক্ষের মতো ফল দেয়।

রাজা বললেন ঃ হে সৌম্য, আপনি বুদ্ধিতে বেশ প্রাজ্ঞ হয়েও কেমন করে এই দ্যূতক্রীড়ারূপ অতি পাপকর্মে প্রবৃত্ত হলেন ?

তিনি বললেন ঃ প্রাজ্ঞ পুরুষও কর্মচক্রে চালিত হয়ে কী-ই বা না করে ?

তাই তো বলা হয়েছে ঃ

প্রাজ্ঞ পুরুষও নিজ কর্মফলে কী না করে ? মনুষ্যদের বুদ্ধি প্রায়শ কর্মফলের অনুসারিণী হয়।

রাজা বললেন ঃ হে সৌম্য, দ্যূত মহা বিপদের মূল এবং সমস্ত ব্যসনের আশ্রয়।

কথিত আছে ঃ

এই দ্যূতক্রীড়া যত অকীর্তির আশ্রয়, চোর ও বেশ্যাদের অতিপ্রিয় ব্যসন, যত প্রকার পাপের নিকটস্থ দ্বার এই দ্যূত। সংসারে সজ্ঞানে কোন্ স্বচ্ছবুদ্ধি বিচক্ষণ মানুষ দুরন্ত নরকের পথ এই দ্যূতক্রীড়ায় নিজেকে জড়ায় ?

আর,

কোথায় অকীর্তি, কোথায় দারিদ্র্য, কোথায় বিপদ, কোথায় ক্রোধলোভাদি রিপু, কোথায় চৌর্যাদি দুরাসক্তি, কোথায় মৃত মানুষদের নরকের দুঃখভোগ ? দ্যূতক্রীড়ার প্রতি দুরন্ত মোহের ফলে মানুষ যে দুঃখে পড়ে, তার কাছে এরা কোথায় ? সংসারে দুর্জনদের সংস্পর্শে এসে একে একে সর্বস্বান্ত হলে প্রাজ্ঞ পুরুষ সকলের স্মৃতিতে শোক ও কৃপার পাত্র হয়ে থাকে।

এই কারণে মহাপাতক সাতটি ব্যসন পরিত্যাজ্য।

কথিত আছে ঃ

দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য এবং পরস্ত্রীগমন—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সাত মহাপাপ থেকে দূরে থাকবেন।

তা ছাড়া,

যে মাত্র একটি ব্যসনে আসক্ত, সেও অনিষ্ট দেখতে পায় না, আর যে-ব্যক্তি সাত সাতটি ব্যসনে ডুবে আছে, তার সম্বন্ধে আর কী বলব ?

যেমন,

দ্যূতক্রীড়ায় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মাংসভক্ষণে বক, মদ্যপানে যদুবংশ, কামপীড়ায় চোর, মৃগয়ায় নৃপতি পরীক্ষিৎ, চৌর্যাসক্তিতে শিবভূতি, পরস্ত্রীসংস্পর্শে দশানন বিনষ্ট হয়েছে। তাই একেকটি ব্যসনেই যেখানে মানুষের এই সর্বনাশ, সমস্ত ব্যসনগুলো সেখানে কাকে না নষ্ট করবে ?

অতএব, আপনি এগুলো পরিহার করুন। দ্যূতকার বললেন ঃ প্রভু, ঐ তো আমার জীবিকা, ত্যাগ করি কেমন করে ? যদি আপনি আমার প্রতি কৃপা করে অর্থোপার্জনের কোনো উপায় করে দেন, তবে আমি দ্যূতক্রীড়া পরিহার করি।

ইতিমধ্যে বিদেশী দুই ব্রাহ্মণ এসে মন্দিরের এক পাশে বসে পরস্পর কথোপকথন করতে লাগল। তাদের একজন বলল ঃ পিশাচলিপিতে যা লেখা আছে সব আমি দেখেছি। সেখানে এ রকম লেখা আছে ঃ

এই দেবালয়ের ঈশানকোণে পাঁচটি ধনুকের মতো দূরত্বে দীনারে ভরা তিনটি কলস আছে, তার কাছে আছে ভৈরবের বিগ্রহ, নিজ রক্তে ভৈরব-বিগ্রহকে অভিষিক্ত করে তা গ্রহণ করতে হবে।

রাজা তার কথা শুনে সেখানে গিয়ে নিজের রক্ত দিয়ে যেমন ভৈরবকে অভিষিক্ত করতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি ভৈরব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ রাজন বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন ঃ এই জুয়াড়িকে দীনারে-ভরা কলস তিনটি দিন।

তখন ভৈরব সেই ধন জুয়াড়িকে দিয়ে দিলেন। জুয়াড়ি রাজার স্তুতি করে নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

রাজাও ফিরলেন তাঁর রাজধানীতে।

এই কাহিনী শেষ করে পুতুল রাজাকে বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে এ জাতীয় ঔদার্য ধৈর্য, পরোপকারাদিগুণ যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।

রাজা চুপ করে রইলেন।

॥ সপ্তবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ অষ্টাবিংশ উপাখ্যান ॥

নরবলি-নিবারণ

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে যাবেন, তখন অন্য এক পুতুল বলল ঃ হে রাজন, ধৈর্যাদিগুণযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যই এই সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

ভোজরাজ বললেন ঃ ওহে পুতুল, বল শুনি সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণের কথা।

সে বলল ঃ শুনুন রাজন। বিক্রমাদিত্য রাজা ভূপর্যটন করতে করতে এলেন এক নগরে। সেই নগরের কাছে স্বচ্ছতোয়া নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীতীরে নানা তরু-পুষ্প-ফলে সুশোভিত এক বন ছিল। তার মধ্যে ছিল অতি মনোরম এক মন্দির। রাজা সেই নদীর জলে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে মন্দিরে বসলেন।

এরপর চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসল। রাজা তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ আমরা অপূর্ব এক দেশ থেকে এসেছি।

রাজা বললেন ঃ সেই দেশে কী কী অপূর্ব বস্তু দ্রষ্টব্য রয়েছে ?

সে বলল ঃ সেই দেশে বেতালপুরী নামে এক নগরী আছে। সেখানে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবতা আছেন। সেখানকার সুবুদ্ধি লোক এবং রাজা প্রতি বৎসর স্বীয় অভিলাষ পূরণের জন্যে এবং অনিষ্ট-নিবারণের জন্যে সেই দেবতার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করেন। সেই বলির দিনে যদি কোনো বৈদেশিক এসে পড়ে তবে তাকেই দেবতার কাছে পশুর মতো বলি দেওয়া হয়। আমরাও সে-রকম দিনে পথের ভুলে সেই নগরীতে গিয়ে পড়ি। তখন সেখানকার লোকেরা যেই আমাদের ধরতে আসছে শুনেছি, অমনি আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এ-রকম ভয়ংকর আশ্চর্য দেশ আমরা দেখেছি। তা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করলেন, তাঁর ভয়ংকরী মূর্তি দেখে স্তব করতে লাগলেন ঃ

ব্রহ্মাণী, কমলা, চন্দ্রশেখরা, মাহেশ্বরী, অবলীলায় শত্রুর দর্পনাশিনী কৌমারী, চক্রায়ুধা, বৈষ্ণবী, ঘনঘোর-ঘর্ঘর-নিনাদিনী বারাহী, বজ্রধারিণী ঐন্দ্রী, গণপতি ও রুদ্র-সহিতা চামুণ্ডা—এই সমস্ত মাতৃকাগণ আমাকে রক্ষা করুন।

এইভাবে স্তব করে নাটমন্দিরে বসলেন। সেই অবসরে একজন বিষণ্নবদন পুরুষ বহু লোককে সঙ্গে করে বাদ্য সহকারে সেখানে এল। তাকে দেখে রাজা মনে মনে আলোচনা করলেন ঃ দেবতার কাছে বলি দেবার জন্যে এ লোকটিকেই এতজনে মিলে ধরে এনেছে। তাই এর মুখটা অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই সুযোগে আমি আমার শরীর দান করে একে মুক্ত করব। এ শরীর খুব বেশি একশ বছর থেকে তারপর তো নষ্ট হবেই। অতএব শরীরধারীদের নিজ শরীরের বিনিময়েও ধর্ম ও কীর্তি অর্জন করা কর্তব্য।

বলা হয়েছে ঃ

লক্ষ্মী চঞ্চল, প্রাণ চঞ্চল, দেহ চঞ্চল, যৌবন চঞ্চল। এই সংসারও অতিশয় অস্থির। কিন্তু কীর্তি এবং ধর্ম স্থির।

আর, শরীর অনিত্য, সম্পদও শাশ্বত নয়। মৃত্যু সর্বদা নিকটে অপেক্ষমান, সুতরাং ধর্ম-সংগ্রহ করাই মানুষের কর্তব্য।

তাই তো বলা হয়েছে ঃ

অর্থ পদধূলির মতো অকিঞ্চিৎকর, যৌবন পার্বত্য নদীপ্রবাহের মতো বেগশীল, মানুষের জীবন যেন বুদ্বুদের মতো অতি চঞ্চল—এই আছে এই নেই।

অতএব, স্থিরবুদ্ধিতে যে ব্যক্তি স্বর্গদ্বারের অর্গল উদ্ঘাটনকারী ধর্ম-অর্জন না করে সে পরে জরাগ্রস্ত হয়ে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়।

এই ভেবে রাজা সেই সব প্রধান পুরুষদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মহাজনগণ, এই বিষণ্নবদন লোকটিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

তারা বলল ঃ একে দেবতার কাছে বলি দেব।

রাজা বললেন ঃ কী কারণে ?

তারা বলল ঃ দেবতা এই নরবলি পেলে তুষ্ট হয়ে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করবেন।

রাজা বললেন ঃ মহাশয়গণ, এর শরীর অত্যন্ত কৃশ, আর এ ব্যক্তি অত্যন্ত ভীতও বটে। এর দেহ বলি দিলে দেবতার কতটা তৃপ্তি হবে ? অতএব, একে ছেড়ে দিন। আমিই এর বিনিময়ে আমার শরীর দান করব। আমার দেহ পুষ্ট, আমার মাংস উপহার দিলে দেবতার তৃপ্তি হবে। অতএব আমাকে আপনারা মারুন।

এই বলে সেই লোকটিকে মুক্ত করে দিয়ে রাজা স্বয়ং দেবতার সম্মুখে গিয়ে যেমনি কণ্ঠে খড়্গাঘাত করবেন, অমনি দেবতা খড়্গ ধরে বললেন ঃ

হে মহাসত্ত্ব, তোমার ধৈর্য ও পরোপকারের প্রয়াসে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন ঃ হে দেবী, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আজ থেকে নরমাংসের বলি গ্রহণ বন্ধ করুন।

দেবতা বললেন ঃ তথাস্তু।

মহাজনেরা রাজাকে বলল ঃ হে রাজন। পরের সুখেই আপনার সুখ—সে সুখই আপনি চান। তাই বৃক্ষের মতো পরের জন্যে নিজে কষ্ট ভোগ করেন।

তাই তো বলা হয়েছে :

বৃক্ষ তীব্র তাপ যতো নিজের মাথায় সহ্য করে, অথচ ছায়া দিয়ে আশ্রিতদের কষ্ট দূর করে। ঠিক সেই রকম লোকের উপকার করতে গিয়ে নিজ সুখ-ভোগে উদাসীন আপনিও প্রাতর্নিয়ত কষ্ট স্বীকার করেন, অথবা আপনার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

তারপর রাজা তাদের অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে গেলেন।—এই কাহিনী শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বলল :

হে রাজন, আপনার মধ্যে এই প্রকার ধৈর্য, ঔদার্য, পরোপকার প্রভৃতি গুণ যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

॥ অষ্টাবিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ঊনত্রিংশ উপাখ্যান ॥

দারিদ্র্য-মোচন

আবারও যেই রাজা সিংহাসনে বসতে যাবেন, অমনি আরেকটি পুতুল বলে বসল : হে রাজন, যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদিগুণ আছে, তিনিই এ সিংহাসনে বসতে পারেন।

ভোজরাজ বললেন : ওহে পুতুল বল সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণের কথা।

সে বলল : শুনুন রাজন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সভায় বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে সব রাজকুমাররা বসে আছেন, এমন সময় একজন স্তুতিপাঠক এসে বলল :

হে নৃপবর, যত কাল পুণ্যসলিলা দেবনদী জাহ্নবী তরঙ্গ-ভঙ্গে কল্লোলিনী হয়ে বয়ে চলবেন যত কাল আকাশপথে লোকপালক সূর্যদেব ভুবনকে তাপ-আলোক দিয়ে যাবেন, যত কাল মেরুশৃঙ্গে হীরক, ইন্দ্রনীল ও স্ফটিকমণিশিলা বিদ্যমান থাকবে, তত কাল পুত্র-পৌত্রসহ স্বজন পরিবৃত হয়ে রাজ্য ভোগ করুন।

এই আশীর্বাণীর পর সে রাজার স্তুতি করে বলল : নিদাঘে আকাশে মেঘোদয় হলে গ্রীষ্মসন্তপ্ত ময়ূর তৃষিত হয়ে, যেমন বারি প্রার্থনা করে, তেমনি আপনার দর্শন লাভ করে আমি (ধন) যাচ্ঞা করছি।

আমি দূরদেশবাসী, আপনার কীর্তি শ্রবণ করে বহু দূর থেকে এসেছি। সপ্তবারিধি-বেষ্টিত ভূমণ্ডলে আপনার কীর্তি বিশ্রুত।

হে রাজন, কর্পূর, কৈরবদল, কুন্দকুসুম, মন্দাকিনীকল্লোল, মুক্তা, কান্তার চঞ্চল লোচন-প্রান্ত এমন কি সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত চন্দ্রকলা অপেক্ষাও আপনার কীর্তি শুভ্রতর, যে কীর্তির ছটায় সপ্তসমুদ্রবলয়িত মেদিনী ধবলিত হয়েছে।

হে রাজন, প্রার্থীদের কাছে কল্পতরুস্বরূপ আপনাকে পেয়ে আজ আমি দারিদ্র্য-ব্যাধি-মুক্ত। আরেক কথা, এ দেশে সকল যাচকদের কল্পতরু আপনাকে দেখে ধনেশ্বর নামে এক রাজার কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। উত্তর দিকে ঈশাণকোণে জবীর নগরে ধনেশ্বর নামে রাজা প্রার্থীদের দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণের জন্যে যাচকদিগকে ধন বিতরণ করতেন। একদিন ধনেশ্বর মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর দিনে বসন্তপূজা করলে সমস্ত বিদেশবাসী প্রার্থীরা এসে উপস্থিত হল।

সেই সময় রাজা আঠারো কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করলেন। উদারতার পরম আদর্শ সেই রাজার মতো এই দেশে দেখলাম একমাত্র আপনাকে।

তার কথা শুনে বিক্রমাদিত্য কোষাগারিককে ডেকে বললেন : ওহে ভাণ্ডারিক, এই স্তুতিপাঠককে ভাণ্ডার গৃহে নিয়ে গিয়ে মহামূল্য রত্নসমূহ দেখাও, তারপর এ যত রত্ন কিংবা অন্য যা যা বস্তু নিতে চায় নিয়ে নিক।

এর পর, ভাণ্ডারিক তাকে ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে বহু বহু দিব্য বস্তু দেখাল। স্তুতিপাঠক তার মনোমত বহু বস্তু এবং রত্নরাজি নিয়ে পূর্ণকাম হয়ে রাজার নিকট এসে বলল : হে রাজন, মহা-ঐশ্বর্যবান আপনার প্রসাদে আমি আজ ধনপতি হয়ে গেলাম, আপনার নিধিগুলি এল আমার হাতে। সম্প্রতি আপনার চরিত্র তুলনার অতীত। হরিহর-ব্রহ্মাদিকেও আপনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কেন না, :

ব্রহ্মা বেদ-পারায়ণেই অভিনিবিষ্ট, গোবিন্দকে গদা ধারণ করতেই হচ্ছে, শূলপাণি শঙ্কর বিষ ভক্ষণ করেছেন—কোন্ দেবতার তুলনা করি আপনার সঙ্গে ?

এইভাবে স্তুতি করে স্তুতিপাঠক 'ব্রহ্মায়ুর্ভব' (ব্রহ্মার মতো চিরজীবী হউন)—এই আশীর্বাদ করে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

এই কাহিনী বলার পরে পুতুল ভোজরাজকে বলল : হে রাজন, আপনার মধ্যে ঈদৃশ ঔদার্য যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে আপনি উপবেশন করুন।

রাজা নীরব হয়ে রইলেন।

॥ ঊনত্রিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ত্রিংশ উপাখ্যান ॥

ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করতে যাচ্ছেন, তখন আর এক পুতুল বলল : হে রাজন, যিনি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্যাদিগুণযুক্ত, তিনিই এই সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

রাজা বললেন : হে পুতুল, বল সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের বৃত্তান্ত।

সে বলল : শুনুন, রাজন।

একদিন রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে সমস্ত সামন্ত রাজা এবং রাজকুমারেরা। সেই সময় জনৈক ঐন্দ্রজালিক এসে 'ব্রহ্মার মতো চিরায়ু হোন' বলে আশীর্বাদ করে বলল : হে দেব, আপনি সকল কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, আপনার নিকট এসে অনেক বড়ো বড়ো ঐন্দ্রজালিক তাদের বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে গেছে, তাই আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আজ আমার একটি বুদ্ধির কৌশল নিরীক্ষণ করুন।

রাজা বললেন : এখন আমাদের অবসর নেই, স্নানভোজনের বেলা হয়ে গেছে, কাল সকালে দেখব। পরদিন সকালে রাজসভার সামনে এসে উপস্থিত হল এক মহাকায় পুরুষ, বিরাট শ্মশ্রু-জালের শুভ্র আভায় তার দেহ উজ্জ্বল, বিশাল স্কন্ধে দেদীপ্যমান খড়্গ, সঙ্গে রয়েছে এক অতি সুন্দরী রমণী। রাজা রাজসভায় সমাসীন হলে সেই পুরুষ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল। তখন সেখানকার অধিকারিপুরুষেরা তার ক্রিয়াকাণ্ড দেখে সবিস্ময়ে বলল : হে নায়ক, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

সে বলল : আমি মহেন্দ্রের সেবক ছিলাম, একসময় প্রভু আমাকে অভিশাপ দিলেন,

তার ফলে এখন আমি ভূমণ্ডলে থাকি। ইনি আমার ভার্যা। আজ দেবাসুরের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তাই আমি সেখানে যাচ্ছি।

এই বিক্রমাদিত্য রাজা পরস্ত্রীর নিকট সহোদরস্বরূপ—এই বিচার করে এঁর কাছে ভার্যাকে রেখে যুদ্ধ করতে যাব।

তা শুনে রাজাও অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলেন। সেই পুরুষ রাজার নিকট তার স্ত্রীকে রেখে রাজাকে তার সংকল্প জানিয়ে খড়্গের উপর ভর করে যেমন আকাশে উঠে গেল অমনি আকাশে উচ্চ ভৈরব রব শোনা গেল—'ধরো, ধরো, মারো, মারো,' ইত্যাদি। সভাস্থ সকলে ঊর্ধ্বমুখে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তারপর, এক মুহূর্ত অতীত হলে আকাশ থেকে রাজসভার মাঝখানে একখানি রক্তমাখা খড়্গ এবং রক্তাক্ত একখানি হাত এসে পড়ল। তা দেখে সবাই বলল : হায়, এই রমণীর বীর স্বামী প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রামে হত হয়েছে, তারই একটি বাহু ও খড়্গ পতিত হয়েছে।

সভার লোকেরা এ রকম বলছে, এর মধ্যেই আবার একটি ছিন্ন মস্তক এবং ক্ষণপরেই মুণ্ডহীন ধড়টাও এসে পড়ল।

এই সব দেখে সেই যোদ্ধার স্ত্রী বলল : হে দেব, আমার পতি রণাঙ্গণে যুদ্ধ করে শত্রুদের হস্তে নিহত হয়েছেন ; এই তাঁর মাথা, হাত, এই তাঁর খড়্গ ও এই তাঁর ধড় এখানে পড়ে রয়েছে। সম্মুখ যুদ্ধে নিহত আমার প্রিয় বীর পতিকে দিব্যাঙ্গনারা বরণ করতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরই জন্যে আমি রেখেছিলাম আমার এ দেহ ; সেই স্বামী আমার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের হাতে মারা গেলেন। এখন এ শরীর আমি কার জন্যে রাখব ? স্ত্রীরা স্বামীর পথ অনুসরণ করে—এ কথা অজ্ঞেরও জানা।

তাই তো বলা হয় :

চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোৎস্নাও অস্ত যায়, মেঘের সঙ্গে বিজলীও হারিয়ে যায়, প্রমদারা পতিদের মার্গ অবলম্বন করে—অচেতন জীবদের আচরণেও এ রীতি অনুসৃত হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রেও এ রকম রয়েছে :

স্বামী মারা গেলে যে নারী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, সে স্বর্গলোকে নিত্য অরুন্ধতীর মতো পূজা পায়।

স্বামী মারা গেলে যত দিন না স্ত্রী অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করবে, তত দিন সে কোনোভাবে নরক থেকে মুক্তি পাবে না।

যে স্ত্রী মৃত স্বামীর অনুগমন করে, সে মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—এই তিন কুলকেই উদ্ধার করে।

তেমনি আরো বলা আছে :

মানুষের গায়ে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে ; যে স্ত্রী মৃত স্বামীকে অনুগমন করে, সে উক্ত-সংখ্যক বৎসর স্বর্গে সুখে থাকে।

সাপুড়ে যেমন বুদ্ধিবলে গর্তের ভিতর থেকে সাপকে বাইরে ধরে আনে, অনুমৃতা স্ত্রীও তেমনি নরক থেকে স্বামীকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে আনন্দে বিহার করে।

স্বামী দুর্বৃত্তই হোক, আর সুবৃত্তই হোক কিংবা সর্ব পাপকর্মে রতই হোক, ধর্মনিষ্ঠ স্ত্রী তাকে উদ্ধার করে।

তা ছাড়া : পতিহীনা নারীর জীবন সত্যই নিষ্ফল। পতিহীনা নারীর অসহায় জীবন রেখে লাভ কী ?

পিতা কন্যাকে পরিমিত দান করে, ভ্রাতা এবং পুত্রও তাই। অপরিমিত দান করে যে পতি, কোন্ সতী না তার পূজা করে? এমনকি, শত আত্মীয় এবং বহু পুত্র থাকা সত্ত্বেও নারীর পতি না থাকলে সে বেচারীর শোচনীয় দশা হয়।

তেমনি, গন্ধ, মাল্য, ধূপ, নানা বসন, ভূষণ, শয্যা দিয়ে বিধবা কী করবে?

তেমনি, তন্ত্রী ছাড়া বীণা বাজে না, চাকা ছাড়া রথ চলে না, শত বন্ধু থাকলেও স্বামী ছাড়া নারীর সুখ হয় না।

দরিদ্রই হোক, ব্যসনাসক্তই হোক, বৃদ্ধই হোক, ব্যাধিগ্রস্তই হোক, বিকলাঙ্গই হোক, পতিতই হোক কিংবা কৃপণই হোক, স্বামী স্ত্রীদের পরম আশ্রয়স্থল।

স্বামীর সমান বন্ধু নেই, স্বামীর মতন আশ্রয় নেই।

তা' ছাড়া, স্ত্রীদের বৈধব্যের মতো দুঃখ আর নেই। স্ত্রীদের মধ্যে সে-ই ধন্য যে স্বামীর সম্মুখে মারা যায়।

এই বলে সেই রমণী অগ্নিপ্রবেশের জন্যে রাজার পায়ে পড়ল। তার উক্তি ও যুক্তি রাজার দুটি কানে যেন করুণ রস ঢেলে দিল। তা শুনে করুণার্দ্র রাজা চন্দনকাষ্ঠাদি দিয়ে চিতা রচনা করিয়ে সেই রমণীকে চিতারোহণের অনুমতি দিলেন।

সেই রমণী তখন রাজার অনুমতি পেয়ে স্বামীর শব-সহ নিজে অগ্নিতে প্রবেশ করল!

এদিকে সূর্যও গেল অস্তাচলে।

পরদিন প্রভাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম সেরে রাজা সিংহাসনে বসেছেন, তাঁকে ঘিরে বসে সব সামন্ত-রাজকুমার। এমন সময় সেই অতিদীর্ঘদেহী নায়ক উজ্জ্বলদেহে খড়্গহস্তে রাজার সম্মুখে এসে তাঁর গলায় পরিয়ে দিল কল্পতরুর ফুল দিয়ে গাঁথা এক মালা যাকে ঘিরে মধুগন্ধে লুব্ধ মুগ্ধ মধুকররা নিরন্তর গুন্ গুন্ রবে ঘুরছে আর ঘুরছে। মালা পরিয়ে সে রাজাকে নানাপ্রকার যুদ্ধ-প্রসঙ্গ বলতে লাগল। তাকে ঐভাবে আসতে দেখে সভাস্থ সকলে বিস্ময়াভিভূত।

সে পুনরায় বলতে লাগল: হে রাজন, আমি এখান থেকে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলে সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যদের প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। সে যুদ্ধে বহু দৈত্য মারা পড়ল, কেউ কেউ পালিয়ে গেল। যুদ্ধশেষে দেবরাজ সানুগ্রহে আমাকে বললেন: হে নায়ক, আজ থেকে তোমাকে আর ভূলোকে যেতে হবে না। তোমার শাপ শেষ হয়েছে। তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন। 'নাও এই পারিতোষিক' এই বলে রত্নখচিত মুক্তাবলয় নিজের হাত থেকে খুলে আমার হাতে দিলেন।

আমি তখন বললাম: প্রভু, এখানে আসার সময় আমি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে আমার স্ত্রীকে রেখে এসেছি। তাকে নিয়ে শীঘ্র ফিরে আসব।

দেবরাজকে এই কথা বলে এখানে এসেছি। আপনি পরস্ত্রীর নিকট সহোদরস্বরূপ। আমার স্ত্রীকে দিন। তাকে নিয়ে স্বর্গে আবার ফিরে যাব।

তার বক্তব্য শুনে সমস্ত সভাসদ্ সহ রাজা বুঝে উঠতে পারলেন না কি করবেন। না পারলেন হাঁ করতে, না পারলেন না করতে। পরম বিস্ময়ে অবাক হয়ে চুপ করে রইলেন।

সে তখন বলল: হে রাজন, চুপ করে রইলেন কেন?

রাজার চারপাশে যারা, তারা বলল: তোমার স্ত্রী অগ্নিপ্রবেশ করেছে।

সে বলল: কী জন্যে?

তারা কিন্তু তখন আর উত্তর দিল না।

নায়ক এবার বলল ঃ হে রাজশিরোমণি, পরস্ত্রীসহোদর, লোককল্পদ্রুম মহারাজ বিক্রমাদিত্য, ব্রহ্মায়ু লাভ করুন। আমি একজন মহান্ ঐন্দ্রজালিক। আপনার কাছে ইন্দ্রজালবিদ্যার চাতুরী দেখালাম।

আশ্চর্যান্বিত রাজা তার প্রতি প্রসন্ন হলেন। এমন সময় ভাণ্ডারিক এসে বলল : মহারাজ, পাণ্ড্যদেশের রাজা প্রভুর নিকট কর পাঠিয়েছেন।

রাজা বললেন ঃ কী কী পাঠিয়েছে ?

কোষাধ্যক্ষ বলল ঃ বলছি প্রভু, আপনি অবহিত হোন ঃ আট কোটি সুবর্ণ, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার, মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুকর-সমাকীর্ণ পঞ্চাশটি হস্তী, তিন শত অশ্ব, তিন-চারি শত বারাঙ্গনা পাঠিয়ে পাণ্ড্যরাজ বলেছেন ঃ শ্রীমৎ বিক্রমাদিত্য ভূমিপাল, আপনার নিকট শ্রীপাণ্ড্যরাজ এগুলি পাঠালেন।

তা শুনে রাজা বললেন ঃ এগুলি সব ঐন্দ্রজালিককে দিয়ে দাও !

তখন সবই তাকে দেওয়া হল।

এই কাহিনী বলার পর পুতুল ভোজরাজকে বলল ঃ হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এমন ঔদার্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন। রাজা মুখ নীচু করে রইলেন।

॥ ত্রিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ একত্রিংশ উপাখ্যান ॥

বেতাল-সিদ্ধি

পুনর্বার রাজা যেই সিংহাসনে বসতে যাবেন, অমনি অন্য এক পুতুল বলে বসল ঃ হে রাজন, এই সিংহাসনে বসার যোগ্য তিনিই যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদি গুণ রয়েছে।

রাজা বললেন ঃ বল, পুতুল, সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যের কথা।

সে বলতে লাগল ঃ শুনুন, রাজন। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ হে রাজন, আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিনে শ্মশানে হোম করব। আপনি যেহেতু একজন পরোপকারী ও মহাসত্ত্বশালী পুরুষ, তাই আপনিই হোন আমার উত্তরসাধক (সহায়ক পুরুষ)। সেই শ্মশানের অনতিদূরে একটি শমীবৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে এক বেতালের বাস। আপনি নীরবে তাকে নিয়ে আসবেন।

রাজা তাই করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

অনন্তর সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিনে শ্মশানে হোমের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। রাজাকে আগেই শমীবৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ বেতালকে সন্ন্যাসী দেখিয়ে রেখেছিলেন। রাজা গিয়ে বেতালকে দেখে কাঁধে নিয়ে চুপচাপ যখন পথে আসছিলেন, তখন বেতাল বলল ঃ হে রাজন, পথশ্রম দূর করতে কোনো গল্প বলুন। রাজা মৌনভঙ্গের ভয়ে চুপ করেই রইলেন।

বেতাল আবার বলল ঃ আপনি মৌনভঙ্গের ভয়ে কথা বলছেন না, আমিই তাহলে বলি। গল্প শেষ হলে মৌনভঙ্গের ভয়ে যদি কথা না বলেন, তবে আপনার শির শতচ্ছিন্ন হবে। এই বলে সে গল্প বলতে লাগল ঃ

শুনুন রাজন। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে বিশ্ব্যবতী নামে এক নগরী আছে। সেখানে বাস করতেন এক রাজা। নাম সুবিচারক। তাঁর পুত্র ময়সেন। সেই ময়সেন একদিন বনে গেল শিকার করতে। বনে এক হরিণকে দেখতে পেয়ে তার পিছু ধাওয়া করতে করতে সে গিয়ে ঢুকল গভীর অরণ্যে। তারপর, যা হোক নগরের পথ একটা খুঁজে পেয়ে সেই পথ ধরে সে যখন আসছিল, তখন পথের মাঝে দেখতে পেল এক নদী। সেই নদীর তীরে একজন ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠান করছিল।

রাজপুত্র তার কাছে গিয়ে বলল: হে ব্রাহ্মণ, আমি যতক্ষণ জল পান করব, ততক্ষণ আমার ঘোড়াটাকে একটু ধরুন।

ব্রাহ্মণ বলল: আমি কি তোমার চাকর যে ঘোড়া ধরব?

তাই শুনে রেগে রাজকুমার তাকে এমন কশাঘাত করল যে ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল। রাজাও ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে পুত্রকে স্বদেশ থেকে নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

মন্ত্রী তখন রাজাকে বললেন: এই রাজকুমার রাজ্যভোগের যোগ্য নয়, কিন্তু একে স্বদেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া উচিত নয়। এটা ঠিক হচ্ছে না।

রাজা বললেন: হে মন্ত্রী, এটা উচিতই হচ্ছে। যেহেতু এ ব্রাহ্মণের দেহে কশাঘাত করেছে, তাই এটা এর সমীচীন দণ্ড হয়েছে। বুদ্ধিমানের ব্রাহ্মণের প্রতি বৈরিতা করা উচিত নয়।

কথিত আছে:

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করবে না, সর্পসহ ক্রীড়া করবে না, যোগীদের নিন্দা এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বৈরিতা করবে না।

হে মন্ত্রী, আপনি কি পুরাণকথা শোনেন নি? পুরাকালে ব্রাহ্মণের অভিশাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত, নৃগরাজের কৃকলাসে পরিণতি, ইন্দ্রের দারিদ্র্যদশা এবং নহুষের অজগরত্ব-লাভ রূপ সব মহানিষ্ট ঘটেছিল। স্বয়ং সম্পন্ন হলেও পূজনীয়দের অবমাননা করা উচিত নয়।

অতি উচ্চ পদ পেলেও মাননীয় ব্যক্তিদের অবমাননা করতে নেই। নহুষ অগস্ত্যকে অপদস্থ করায় স্বর্গচ্যুত হয়ে সর্পরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। অতএব সমস্ত ব্রাহ্মণদের সর্বদা সম্মান করতে হয়।

আর, যাঁদের অভিশাপের ফলে অগ্নি সর্বভুক্, মহাসাগরের জল অপেয়, চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত, তাঁদের প্রকুপিত করলে কার না নাশ হয়?

তাছাড়া, যাঁদের হাত দিয়ে দেবগণ হব্য গ্রহণ করেন এবং পিতৃগণ কব্য (পিতৃলোককে দেয় অন্নাদি) ভোজন করেন, তাঁদের চেয়ে বড়ো কে হতে পারে?

তাইতো, হে ভরতবংশীয়, দেবগণ সকলে যাঁদের পূজা করেন এবং মনুষ্যগণ তো করেনই, যাঁরা তপোব্রতনিষ্ঠ, সেই সকল বিপ্রকে সুষ্ঠু সম্মান দেখানো কর্তব্য।

আর, দ্বারাবতীতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন:

ব্রাহ্মণ শত শাপই দিক আর, কটু কথা বলুক, যে ব্যক্তি আমার মতো ব্রাহ্মণকে অর্চনা না করে, সেই পাপাচারী ব্রাহ্মণরূপ দাবানলে পতিত হয়। আমাদের রাজকীয় নির্দেশ অনুসারে সে দণ্ডনীয় এবং এমনকি বধের যোগ্য।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করতে ইচ্ছা করে সে

সর্বদা ব্রাহ্মণের পূজা করবে এবং এতে আমি তুষ্ট হব।

হে মন্ত্রী, যে হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে তাড়না করেছে, সেই হাত কেটে ফেলা উচিত।—

এই বলে যেমন তার হাত কাটতে যাবেন, অমনি সেই ব্রাহ্মণ ছুটে এসে বলল ঃ হে রাজন, তখন অজ্ঞানবশে এ রকম কাজ রাজপুত্র করে ফেলেছে বটে, তবে আজ থেকে এ রকম অনুচিত কাজ আর করবে না। আমার অনুরোধে রাজপুত্রকে নিষ্কৃতি দিন, আমি প্রসন্ন হয়েছি।

ব্রাহ্মণের অনুরোধ শুনে রাজা নিজ পুত্রকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণও নিজ বাড়ি ফিরে গেল।

এই গল্প বলে বেতাল প্রশ্ন করল ঃ হে রাজন, এই দুজনের মধ্যে গুণের দিক থেকে কে বড়ো?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ রাজাই গুণে বড়ো। তা শুনে, রাজার মৌনভঙ্গের ফলে, বেতাল শমীবৃক্ষে ফিরে গেল।

রাজা পুনরায় সেখানে গিয়ে বেতালকে যখন কাঁধে করে নিয়ে আসছিলেন, তখন বেতাল আবার গল্প বলতে লাগল। এইভাবে বেতাল একে একে পঁচিশটি গল্প বলেছিল।

তাঁর সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে প্রসন্ন হয়ে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল ঃ হে রাজন, এই দিগম্বর আপনাকে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

রাজা বললেন ঃ সেটা কী ভাবে?

বেতাল বলল ঃ আপনি যখন আমাকে ঐখানে নিয়ে যাবেন, তখন আপনার ক্লান্তি দেখা দেবে। 'আপনি শ্রান্ত, এখন অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নিজের জায়গায় যান'—দিগম্বর এই কথা বললে, আপনি যখন দণ্ডবৎ প্রণাম করতে নত হবেন, তখন দিগম্বর খড়্গ দিয়ে আপনাকে বধ করবে। তারপর আপনার মাংস দিয়ে হোম করবে। এ রকম করলে তার অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হবে।

বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ এখন কী করা যায়?

বেতাল বলল ঃ আপনি এমনি করুন। দিগম্বর যখন আপনাকে বলবে, 'আপনি নমস্কার করে চলে যান', তখন আপনি তাকে বলবেন, 'আমি সার্বভৌম নৃপতি, সমস্ত রাজারা আমাকে প্রণাম করে, আমি কখনও কাউকে প্রণাম করি নি। অতএব প্রণাম করতে আমি জানি না। আপনি প্রথমে প্রণাম করে দেখিয়ে দিন। তা দেখে পরে আমি প্রণাম করব।'

সেইমতো সে যখন প্রণাম করতে নুয়ে পড়বে, তখন আপনি তার শিরশ্ছেদ করুন। আমি আপনাকে বাধা দেব না। অষ্ট সিদ্ধি লাভ আপনারই হবে।

বেতাল এই পরামর্শ দিলে রাজা বিক্রমাদিত্য তাই-ই করলেন। রাজার অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হল।

অনন্তর বেতাল বলল ঃ হে রাজন, আপনার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন ঃ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে যখনই আমি স্মরণ করব, তখনই আপনি আমার নিকট আসবেন।

সে 'তাই হবে' এই প্রতিজ্ঞা করে স্বস্থানে চলে গেল। রাজাও গেলেন তাঁর রাজধানীতে।

এই কাহিনী বিবৃত করে পুতুল বলল : হে রাজন, আপনার মধ্যে এ রকম ঔদার্যাদি গুণ যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে আপনি বসুন।

রাজা নিরুত্তর রইলেন।

॥ একত্রিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান ॥

পুতুলের শাপমুক্তি

পুনরায় রাজা যখন সিংহাসনে বসতে যাবেন, তখন আর একটি পুতুল বলল : হে রাজন, এ সিংহাসনে সেই রাজা বিক্রমাদিত্যই বসবার যোগ্য, অন্য কেউ নয়। সেই বিক্রমাদিত্যের মতো নৃপতি ভূমণ্ডলে নেই, যিনি কাঠের খড়্গ নিয়ে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে সমস্ত রাজাদের জয় করে একচ্ছত্র রাজ্য করেছিলেন, যিনি অন্যদের শঙ্কা হরণ করে নিজের শঙ্কা সৃষ্টি করেছিলেন। ভূমণ্ডলে যত রাজা আছেন, তাঁদের সকলের উপর বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করে, সমস্ত দুর্জনদের নির্বাসিত করে, যাচকদের দারিদ্র্যমোচন করে, দুর্ভিক্ষ দুঃখাদি দূর করে নিজ বিক্রমে পৃথিবী পালন করেছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য। অতএব বিক্রমাদিত্যের সদৃশ রাজা নেই। এই রকম ঔদার্যাদি গুণ যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

তা শুনে রাজা ভোজদেব চুপ করে রইলেন। পুনর্বার বত্রিশটি পুতুল সমস্বরে ভোজরাজকে বলতে লাগল : হে ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্য রাজা ঐরকমই ছিলেন, আপনিও সামান্য পুরুষ নন। আপনারা দুজন নরনারায়ণের অবতার। আপনার মতো পরম-পূতচরিত্র, সকল কলাপ্রবীণ, ঔদার্যগুণ বিশিষ্ট রাজা বর্তমান কালে তো আর নেই, আপনার অনুগ্রহে আমাদের বত্রিশ পুতুলের পাপক্ষয় হয়েছে। শাপ থেকে মুক্তিও হল।

ভোজরাজ বললেন : কী রকম? শাপের ব্যাপারটা বল।

পুতুলেরা বলল : শুনুন, মহারাজ। বত্রিশ জন দিব্যাঙ্গনা আমরা পার্বতীর সাথী ছিলাম। তাঁর পরম স্নেহের পাত্র ছিলাম আমরা। আমাদের প্রত্যেকের নাম শুনুন : (১) মিশ্রকেশী, (২) প্রভাবতী, (৩) সুপ্রভা, (৪) ইন্দ্রসেনা, (৫) সুদতী (৬) অনঙ্গনয়না, (৭) কুরঙ্গনয়না, (৮) লাবণ্যবতী, (৯) কামকলিকা, (১০) চণ্ডিকা, (১১) বিদ্যাধরী, (১২) প্রজ্ঞাবতী, (১৩) জনমোহিনী, (১৪) বিদ্যাবতী, (১৫) নিরুপমা, (১৬) হরিমধ্যা, (১৭) মদনসুন্দরী, (১৮) বিলাসরসিকা, (১৯) শৃঙ্গারকলিকা, (২০) মন্মথসঞ্জীবনী, (২১) রতিলীলা, (২২) মদনবতী, (২৩) চিত্ররেখা, (২৪) সুরতগহ্বরা, (২৫) প্রিয়দর্শনা, (২৬) কামোন্মাদিনী, (২৭) সুখসাগরা, (২৮) শশিকলা, (২৯) চন্দ্ররেখা, (৩০) হংস-গামিনী, (৩১) কামরসিকা, (৩২) উন্মাদিনী।

একদিন সিংহাসনে উপবিষ্ট পরমেশ্বর প্রেম-বিলাস-ললিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। তা দেখে দেবী পার্বতী কুপিতা হয়ে আমাদের অভিশাপ দিলেন : তোমরা নির্জীব পুতুল হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে লগ্ন হয়ে থাক।

তখন আমরা প্রণিপাত করে আমাদের শাপের অবসান প্রার্থনা করলাম।

তখন দেবী পার্বতী বললেন : যখন ঐ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন রাজা বিক্রমাদিত্য এবং পরে ঐ সিংহাসন ভোজদেবের হস্তগত হবে, তখন ইন্দ্রসভার অপ্সরাদের সঙ্গে

ভোজরাজের কথোপকথন হবে। আর, যখন তোমাদের কাছ থেকে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা শ্রবণ করবেন, তখনই তোমাদের শাপের অবসান হবে।

অনন্তর রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পুতুলেরা স্বস্থানে প্রস্থান করল। তারপর, ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপরে দেবালয় নির্মাণ করে, তার মধ্যে বেদীতে অষ্টদলের উপরে উমা-মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন ষোড়শ উপচারে পূজা করতে লাগলেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্মে নিরত লোকদের পরিপালন করে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

তখন দেবার্চনা ও স্তবাদিতে পার্বতী দেবী তাঁর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন।

॥ দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা সমাপ্ত ॥